অন্ধকারে রাতবিরেতে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ANDHAKARE RATBIRETE
A Novel by
Saiyed Mustafa Siraj

Price
Rs 50/- Only

ISBN 81-7332-084-5

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সুনীল শীল

দাম
৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

টাক এবং ছড়ি রহস্য

কাকতালীয় যোগ

সেদিন সকালে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু স্বনামধন্য কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় ঢুকে আমি অবাক। একটি ছোট্ট ডিমালো আয়না মুখের ওপব তুলে উনি নিজের বিশাল টাকটি খুঁটিয়ে দেখছেন। বললেন, 'এস ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

বললুম, 'টাকের সঙ্গে আমাব কি সম্পর্ক?'

'আছে।' কর্ণেল আয়নাটি টেবিলে রেখে একটু হাসলেন। 'কাবণ একটি বিজ্ঞাপন ষ্টি তোমাদেরই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায সম্প্রতি বেবিয়েছে। পড়ে দেখতে পাব।'

উনি একটা বিজ্ঞাপনেব কাটিং এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি বেশ মজার একটা পদ্য।

টাক! টাক!! টাক!!!
ট্রাই ইওব লাক্
যদি থাকে দাড়ি
সুফল তাড়াতাড়ি

ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়,
১১১/১পি, খাঁদু মিস্তিবি লেন,
কলিকাতা ১৩

বিঃ দ্রঃ--আগে টাক পবীক্ষা করিয়া তবে ভর্তি। ২৪ ঘণ্টা সময লাগিবে। দবাদরি নিষিদ্ধ।

বললুম, 'ইন্দ্রোদ্ধারটা বোঝা যাচ্ছে না তো?'

কর্ণেল বললেন, 'ইন্দ্র মানে কালো চুল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে টাক পড়াকে ইন্দ্রলুপ্ত বলা হয়।'

'কিন্তু হঠাৎ টাক নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? এতদিন তো টাককে জ্ঞানী ও দার্শনিকের লক্ষণ বলে খুব গালভরা বুলি আওড়েছেন। আজ আবার—

'কাক।' কর্ণেল বিমর্ষমুখে বললেন। 'কাকেব অত্যাচারে, জয়ন্ত! টাকের সঙ্গে কাকেবও গূঢ় সম্পর্ক আছে।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনছিল। কথাটা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, 'এতবাব

করে মনে পড়িয়ে দিই, ছাদে যাবার সময় কেপ পরে যান। বাবামশাই তবু কথাটা কানে করবেন না। কাকের দোষটা কী?'

কর্ণেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে ষষ্ঠী ট্রে রেখে কেটে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ছাদেব বাগানে গিয়ে আবার কাকের ঠোকর খেয়েছেন। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল। যত রাজ্যের বিদঘুটে গড়নের ক্যাকটাস, উদ্ভুট্রে সব অর্কিড আর দুর্লভ প্রজাপতির ঝোপ-ঝাড়। পাশের বাড়ির গা-ঘেঁষে-ওঠা বুড়ো নিম-গাছটা সম্ভবত কলকাতার কাকদের রাজধানী। তাড়ানোর জন্যে একবার পটকা ছুঁড়ে নাকি মামলা বাধার উপক্রম হয়েছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ষষ্ঠী ঠিক বলেছে। আপনার টাককে কাকেরা পাকা বেল-টেল ভাবে। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী বলে একটা কথা চালু আছে।'

কর্ণেল কফির সঙ্গে চুরুটও টানেন। জ্বেলে নিয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'বেল কেন? তালের সঙ্গেও কাকের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে একটা কথা চালু আছে।'

ঝটপট বললুম, 'জানি। কাকতালীয় যোগ। কাক এসে তালগাছে বসল, সেই মুহূর্তে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। লোকে যদি ভাবে কাকের সঙ্গে তাল পড়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে সেটা বোকামি।'

'ডার্লিং, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় ন্যায় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।' কর্ণেল সায় দেবার ভঙ্গীতে বললেন। 'যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা দেখা অব্দি মন ঠিক করতে পারছি না। কী করি তুমিই বলো!'

'যদি থাকে দাড়ি/সুফল তাড়াতাড়ি। আপনার দাড়ি আছে। অতএব ট্রাই ইওর লাক।'

'তাহলে চলো! কফিটা শেষ করে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে পড়া গেল না। কারণ কলিং বেল বাজল এবং আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর দুহাতে মাথার চুল—কালো কোঁকড়া একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, 'ওঃ টাক। হায় রে টাক।'

কর্ণেল হাঁ। আমিও হাঁ। তবে এটুকু বুঝলুম। এই হল কাকতালীয় যোগ। একেবারে হাতে-নাতে আর কী।..........

টাক নিয়ে দুর্বিপাক

গরম কফি খাইয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত-সুস্থ করা হল। তাঁর নাম মুরারিমোহন ধাড়া। ষাটের ওধারে বয়স। ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন। বেজায় লম্বা নাক। মুখে গোঁফ দাড়ি নেই। তবে মাথার চুল দেখার মতো—উজ্জ্বল কালো,

মাঝখানে সিঁথি। পরনে ধুতি ও তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। পায়ে যেমন তেমন একটি চটি। আর হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটি কিন্তু সুন্দর।

মুরারিবাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই ঃ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' যান। একটা ঘিঞ্জি গলির ভেতর জরাজীর্ণ বাড়ি। কোন ব্যবসায়ীর গুদাম বলে মনে হয়েছে। দোতলায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাথায় নতুন সাইন-বোর্ড ছিল। বেঁটে, হোঁতকা-মোটা, গোলগাল চেহারার ডাক্তারবাবুটি অবশ্য খুবই অমায়িক। উঁচু বেডে শুইয়ে মুরারিবাবুর টাক পরীক্ষা করে বলেন, 'ঠিক আছে। চলবে। তবে দাড়ি কামাতে হবে।' মুরারীবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। ডাক্তারবাবু নিজেই যত্ন করে দাড়িগোঁফ কামিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'চোখ বুজুন।' মুরারিবাবু চোখ বোজেন। এরপর কী হয়েছে তাঁর জানা নেই। একসময় চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। উঠে বসেই সব মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে টের পান, টাক নেই, সারা মাথা চুলে ভর্তি। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকা-ডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে অবাক হন। ঘোরালো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন অগত্যা। এই হল রহস্যের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু মারাত্মক। মুরারিবাবু কলকাতায় সবে এসেছেন। রেলে চাকরি করতেন। পাটনায় থাকার সময় রিটায়ার করেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার লেক প্লেসে বহু টাকা সেলামি দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে জিনিস-পত্র নিয়ে উঠেছেন। একা মানুষ। স্বাবলম্বী। স্বপাক খান। গতকাল সন্ধ্যায় মাথার চুল গজানোর পর নিজের ফ্লাটে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, অন্য কে একজন ঢুকে বসে আছে। কতকটা তাঁর মতোই চেহারা ও গড়ন। মাথায় টাক, মুখে দাড়িও আছে। মুরারিবাবুকে দেখে সে বলে, 'কাকে চাই?' মুরারিবাবু ভড়কে যান। তারপর হইচই বাধান। অন্যান্য ফ্লাটের লোকেরা এসে পড়ে। তারা একবাক্যে রায় দেয়, এই কালো চুলের মুরারিবাবুকে তারা চেনে না। এমন কি ওপরতলা থেকে বাড়ির মালিক এসে পর্যন্ত শাসিয়ে বলেন, পুলিশ ডাকা হবে। বেগতিক দেখে মুরারিবাবু চলে আসেন। রাত্তিরটা হোটেলে কাটিয়ে এখন কর্ণেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। থানায় যাননি, তার কারণ তিনি এখন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনিই আসল মুরারিমোহন ধাড়া? কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, চেনা লোকও নেই। থাকলেও কালো কোঁকড়া চুল গজিয়ে তাঁর চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে যে!

আর একটু রহস্য আছে। কর্ণেলের কাছে আসার পথে 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে, গিয়েছিলেন, টাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তো বটেই, কিন্তু গিয়ে দেখেন,

ঘরে তালা। সাইনবোর্ড নেই। খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারল না। কর্ণেলের কীর্তিকাহিনী মুরারিবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকেই তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছেন। এই দুর্বিপাক থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে পারবেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।........ . . . .

ছড়ি বদল পর্ব

ঘটনাটি শোনার পর গোয়েন্দাপ্রবর মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, টাকেব আমি, টাকের তুমি, টাক দিয়ে যায় চেনা।'

বললাম. 'উঁহুঁ. গোঁফ। সুকুমার বায়ের 'গোঁফচুরি' পদ্যে আছে।'

কর্ণেল হাসলেন। 'যাই হোক, এক্ষেত্রে টাক-চুরি নিয়েই সমস্যা বেধেছে।' বলে মুরারিবাবুর দিকে তাকালেন। 'মুরারিবাবু, সেল্‌ফ-আইডেন্টিটি ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমিই যে আমি, আপনি মুরারিবাবুই যে মুরারিবাবু, কোনো-কোনো সময়ে প্রমাণ কবা কঠিন হয়। তবে এ জন্য আদালত আছে।'

মুরারিবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'আছে। আদালতে তো যেতেই হবে। রেলের কর্তারা এবং আমার কলিগরা আছেন। নানা জায়গায় আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। টেলিগ্রাম ট্রাংকল করে সবাইকে ডাকব। ব্যারিস্টারের কাছে যাব। সবই করব। কিন্তু সে তো সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সর্বনাশ হবার তা হতে চলেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজ্ঞাপন দিয়ে চক্রান্ত করে কেউ বা কারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে চেয়েছিল এবং ঢুকে পড়েছে। কেন এ চক্রান্ত, কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেটা নিয়েই আপাতত দুর্ভাবনা।'

'কেন?' কর্ণেল সোজা হয়ে বসলেন। রহস্যের গন্ধটা এবার ঝাঁঝালো তো বটেই।

মুরারিবাবু চাপা স্বরে বললেন, 'হিরে! একটা দুটো নয়, তিন তিনটে হিরে। দাম এ বাজারে কমপক্ষে দেড়লাখ টাকা।'

কর্ণেল নড়ে বসলেন। 'কোথায় রেখেছেন হিরেগুলো?'

মুরারিবাবু তাঁর কালোরঙের ছড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'অবিকল এইরকম একটা ছড়ির ভেতরে। মাথাটায় প্যাঁচ আছে। সেজন্য ছড়িটা সব সময় হাতে রাখতুম। কাল বিজ্ঞাপনটা দেখেই তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গিয়ে ছড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম। বুঝলেন না? টাক পড়া অব্দি কলিগরা তো বটেই, যে দেখত ঠাট্টাতামাসা করত। বেজায় বিদঘুটে টাক কিনা! আপনার টাক অবশ্য মানানসই। তো—'

কর্ণেল ওঁর কথার ওপর বললেন, 'এই ছড়িটা নতুন কিনেছেন—আসার পথে?'

'ঠিক ধরেছেন। নিউ মার্কেটের ওখান থেকে কিনে আনলুম।' মুরারিবাবু ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা হিরেগুলো খুঁজে হন্যে হচ্ছে। পাবে না। তবে বলা যায় না কিছু। যদি দৈবাৎ ছড়িটার বাঁট খুলে ফেলে– তার আগেই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন! আপনার হাতে ধরে বলছি কর্ণেলস্যার! আপনি সব পারেন। কোনো ছুতো করে এই ছড়ি হাতে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি আগে ঢুকুন। আলাপ জুড়ে দিন। তারপর আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক গিয়ে কলিং বেল টিপবেন।'

কর্ণেল একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্ত আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টার।'

মুরারিবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নমস্কার করে বললে, 'তাই বলুন! কাগজে কর্ণেলের কীর্তি-কলাপ তো আপনিই লেখেন। দারুণ আপনার লেখার হাত, মশাই!' ব'লে ফের ফিসফিসিয়ে উঠলেন। 'তাহলে তো আরও চান্স। রিপোর্টার যেতেই পারে ওখানে। কারণ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। কে প্রকৃত মুরারিমোহন ধাড়া এই নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব হবা খুবই স্বাভাবিক। কর্ণেলস্যার যাওয়ার মিনিট কতক পরে জয়ন্তবাবু যাবেন। জাল মুরারি তর্ক করবে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ফাঁকে কর্ণেল স্যার দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ছড়িটা হাতিয়ে এই ছড়িটা রাখবেন। ব্যাটা টেরই পাবে না। বাকিটা সহজ।'

ছড়িটা কর্ণেল নিলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার চুল গজানোটা একটু দেখতে চাই।'

মুরারিবাবু মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'আলবাৎ দেখবেন। দেখুন! মিরাক্‌ল্‌ বলা যায়।'

কর্ণেল একটুখানি হেলেই বললেন, 'সত্যিই মিরাক্‌ল্‌। ভেবেছিলুম, আঠা দিয়ে পরচুলা পরিয়েছে নাকি। তা নয়। প্রকৃত চুল। ঠিক আছে আপনি সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আসুন।'

মুরারিবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে কর্ণেল বললেন, 'তুমি সম্ভবত কী জিগ্যেস করার জন্য উসখুস করছিলে, ডার্লিং!'

উত্তেজনা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বললুম, 'ছড়ি বদলানোটা রিস্কি হবে না? যদি দৈবাৎ—'

কথা কেড়ে কর্ণেল বললেন, 'রিস্ক্ না নিলে রহস্য ভেদ করা তো সম্ভব হয় না, ডার্লিং!'

'কখন বেরুবেন ভাবছেন?'

কর্ণেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে এবং অভ্যাসে শাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যাবার সময় তোমার আপিস হয়ে তোমাকে ডেকে নেব'খন।'...

হুঁকো বিষয়ক প্রবাদ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার আপিসে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি, কর্ণেলের পাত্তা নেই। দুটোয় ফোন করলাম, ষষ্ঠী বলল, 'বাবামশাই তো লাঞ্চো খেয়েই বেইরেছেন।' তিনটে বাজল। চারটে বাজল। পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে আবার ফোন করলুম, ষষ্ঠী ফোন ধরে বলল, 'বাবামশাই এই মাত্তর ফিরেছেন। ছাদে গেছেন। কেপ পরেই গেছেন। বুঝলেন না কাগুজে দাদাবাবু? কাক—কাক।' রাগে অভিমানে ফোন রেখে ভাবলুম, 'এর অর্থ কী?' আমাকে নিয়ে বেরুনোর কথা। অথচ একা বেরিয়েছিলেন। হলটা কী?

যখন কর্ণেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছলুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তায় যা জ্যাম। সটান ছাদে ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে' চলে গেলুম। দেখলুম, একটা বিদঘুটে ক্যাকটাসের দিকে ঝুঁকে আছেন প্রকৃতিবিদ। মাথায় সত্যিই 'কেপ'। কাছে গিয়ে বললুম, 'আশ্চর্য মানুষ আপনি!'

কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমার চেয়েও আশ্চর্য মানুষ বিস্তর আছে, ডার্লিং! চলো নিচে যাই। মুরারিবাবুর আসার সময় হয়েছে।'

'আপনি গিয়েছিলেন ওঁর ফ্লাটে? কী দেখলেন? ছড়িটা বদলাতে পারলেন?'

'হুঁউ। আসলে জয়ন্ত টাক ও দাড়ির সঙ্গে টাক ও দাড়ির বন্ধুত্ব খুব ঝটপট গড়ে ওঠে। এটা বরাবর দেখে আসছি।'

নিচের ড্রইংরুমে ঢুকে কর্ণেল বাথরুমে গেলেন গার্ডেনিং-এর জোব্বা বদলে হাত ধুতে। শুনলুম, গলা চড়িয়ে ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম জারি করেছেন। এই সময় কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দিলুম। হন্তদন্ত ঢুকে পড়লেন মুরারিমোহন ধাড়া। দম আটকানো গলায় বললেন, 'গিয়েছিলেন? কাজ হয়েছে তো?'

কর্ণেল পর্দা তুলে বললেন, 'বসুন, আসছি।' তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুরারিবাবু সোফায় বসে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'আমার ঠাকুর্দার কেনা হিরে: জয়ন্তবাবু! এক সায়েব দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল মাইনিং বিজনেসে। ঠাকুর্দাকে মাত্র দেড় হাজারে বেচেছিল। তা সেসব কথা পরে বলব'খন। বলুন, খবর কী? আমার হার্ট ধুকপুক করছে খালি।' বুকে হাত দিলেন মুরারিবাবু।

কর্ণেল সেইরকম একটি ছড়ি হাতে ফিরে এলেন। মুরারিবাবু খপ করে সেটি প্রায় কেড়ে নিয়ে বাঁটের প্যাঁচ ঘোরাতে শুরু করলেন। খি খি হেসে বললেন, 'জ্যাম হয়ে গেছে প্যাঁচ। বহুকাল খোলা হয়নি কিনা।'

কর্ণেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, 'আগে একটু কফি খান পাঁচুবাবু! তারপর কথা হবে।'

মুরারিবাবু চমকে উঠলেন। 'পাঁচুবাবু! ও কী বলছেন কর্ণেলস্যার? আমার

কর্ণেল চোখ বুজেই বললেন, 'প্যাঁচ খুলবে না পাঁচুবাবু! কারণ ওটা আপনার কেনা সেই ছড়িটাই।'

মুরারিবাবু কিংবা পাঁচুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী অদ্ভুত রসিকতা!'

'রসিকতা আপনারও কম নয়. পাঁচুবাবু?' কর্ণেল চোখ খুলে ফিক করে হাসলেন। 'আপনি আমার হাত দিয়ে আপনার মনিব মুরারিবাবুর হিরে চুরি করতে চেয়েছিলেন। একেই গ্রাম্য প্রবাদে বলে 'অন্যের হাতে হুঁকো খাওয়া।'

'মুরারিবাবু' কিংবা 'পাঁচুবাবু' দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই যেতেই পাশের ঘরের অন্য দরজার পর্দা তুলে এক পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক বেরুলেন। ঢ্যাঙা, মাথায় টাক. মুখে দাড়ি। তিনি 'তবে রে ব্যাটা পেঁচো।' বলে গর্জন করে ঝাঁপ দিলেন এবং 'পাঁচুবাবু'র পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরলেন। তারপর একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক পুলিশ অফিসার এবং দুজন সেপাই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি হাঁ। তক্ষুনি দলটা বেরিয়ে গেলে ঘুরে কর্ণেলের দিকে তাকালুম। স্বপ্ন না, সত্যি?

কর্ণেল চোখ বুজে দুলতে শুরু করেছেন ফের। বললেন, 'হুঁ, একেই বলে পরের হাতে হুঁকো খাওয়া। মাঝখান থেকে পাঁচুবাবুর বিজ্ঞাপন-খরচটা গচ্চা গেল। লম্বাচওড়া একটা গুলগল্পও কাজে এল না। ডার্লিং তোমার অবশ্য একটা বড় লাভ হল। বড়বাজারের শিশি-বোতলের কারবারি মুরারিমোহন ধাড়ার কর্মচারী পাঁচু বা পঞ্চানন্দকে নিয়ে কাগজে দারুণ খবর হবে।' .. ..

ভুতুড়ে জাহাজ

এক
জাহাজ ভূতের রহস্য

মানুষ মরে গিয়ে ভূত হয়। অন্তত কিছু কিছু মানুষ যে হয়ই তা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু কেউ যদি বলে যে আস্ত একটা জাহাজ মরে ভূত হয়েছে, তবে আমি কেন, আমাদের খেঁদা, পেঁচো, ভূতো থেকে শুরু করে স্বয়ং চক্কোত্তিমশায়ও তেড়েমেড়ে ডাণ্ডা হাতে আসবেন। পাগল, না মাথা খারাপ? জ্যান্ত প্রাণী পটল তুললে তার নির্ঘাত ভূত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাই বলে যা জড় পদার্থ, তা মরবেই বা কেমন করে? ভূত হওয়া তো দূরের কথা।

আমাদের ভোম্বল বিজ্ঞানে বড় পাকা। তার মতে, জড়পদার্থের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে। জড়পদার্থ ধ্বংস হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

তাহলেই হল। ভূত তো আসলে একটা স্পিরিট। বাংলা ভাষায় তাকে আমরা শক্তি বলতে পারি অনায়াসে। জাহাজ একটা জড় পদার্থ। জাহাজের মরা মানে ধ্বংস হওয়া এবং ভোম্বলের মতে তা স্পিরিট হয়ে ওঠা।

ইংরাজীতে স্পিরিট কথার একটা মানে কিন্তু আত্মা বা ভূতপ্রেত। কাজেই একটা জাহাজের মরার পর দস্তুরমত ভূতপ্রেত হবার সম্ভবনা রয়েছেই।

কিন্তু যাই বলো, এ তো একেবারে আজগুবি ব্যাপার। পোড়ো বা ভাঙা বাড়িতে ভূতের আড্ডা হয় আমরা শুনেছি। কে শুনেছে, স্বয়ং পোড়োবাড়িটাই ভূত হয়ে ভয় দেখাচ্ছে সবাইকে? তেমনি কে শুনেছে একটা আস্ত জাহাজ জলে ডুবে মরার পর পাকা নির্ভেজাল ভূত হয়ে উঠেছে?

শুনেছে বইকি! সেই আজগুবি কাহিনীটা বলতেই তো আমরা জাঁকিয়ে বসে পড়েছি। শুনেছে আফ্রিকা মহাদেশের সুদান ইরিত্রিয়া আবিসিনিয়ার অজস্র মানুষ—যারা আজীবন জলচর। কেউ নৌকোর মাঝি-মাল্লা, কেউ স্টীমলঞ্চ বা স্টীমারের খালাসী আর সারেঙ, কেউ বা জেলে। তাদের মুখ থেকে শুনেছে আরও অনেক মানুষ। তাদের গায়ের চামড়া সাদা কারো কারো। কিন্তু সবাই মুণ্ডু কাত করে কথাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অন্তত কাছাকাছি গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসার পর আর কারো সাহস হয় নি এ বিষয়ে তর্কাতর্কি করে।

কী বিষম বে-আক্কেলে ভূত এই জাহাজভূতটা। পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে থাকতেই নাকি যা বিদঘুটে কাণ্ড করে ভাবা যায় না। চারপাশে জল তোলপাড়

হতে থাকে। অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যায়: রাত্রিবেলা হলে আরও ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য দেখা যায়। একসঙ্গে হুইসেল বেজে ওঠে অনেকগুলো। হাজার হাজার পিদিম নাচে ঢেউয়ের দোলায়। কালো কালো সব ছায়ামূর্তি জলের ওপর হেঁটে বেড়ায় --তারা দেখতে আস্ত একেকটি মাস্তুল।

মোটর বোটের ড্রাইভার মাহমুদ জাতে আরব; লম্বা চওড়া ছ'ফুট দশাসই চেহারা। সে বাস করে অবশ্য ডাঙায়। বউ কাচ্চাবাচ্চা আছে। সুদানের সোয়াকিন বন্দরের শেষপ্রান্তে তার ছোট্ট পাথরের ঘরখানি। পরিবেশটা বড় বিচিত্র। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে মরুভূমি, আর একদিকে অথৈ জলের সাগর, দেশ-বিদেশ থেকে বেড়াতে আসে নানান জাতের মানুষ। তাদের মোটর বোটে চাপিয়ে সাগরে ঘুরে বেড়ানোই মাহমুদের পেশা। সেও জাতে আরব। গড়নে মাহমুদের চেয়ে অনেক খাটো। রোগা হাড় জিরজিরে দোহারা। তেমনি মেজাজটিও বড় রুক্ষ। হুট্ করতেই লোকের সঙ্গে বচসা তার লেগেই আছে। শেষে পিটুনি খাবার উপক্রম হলে তখন মাহমুদকেই গিয়ে বন্ধুকে বাঁচাতে হয়।

খুব নেশাখোর মানুষ ওমর। কিন্তু একটা গুণে সে মাহমুদের চেয়ে সরেস। খুব ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তার মগজটি কিন্তু বেশ পরিষ্কার থাকে। ভীষণ বেপরোয়া দুঃসাহসী গোঁয়ারগোবিন্দ সে; মাহমুদের মত শান্ত গোবেচারা বা বোকা নয়। এই দুই বন্ধু কমপক্ষে বার চারেক স্বচক্ষে জাহাজভূতের কাণ্ড কারখানা দেখে এসেছে। এটা কিন্তু কম দুঃসাহসের কথা নয় ও অঞ্চলে। একবার দৈবাৎ ওখানে গিয়ে জাহাজভূত দেখার পর আর কেউ কস্মিন্‌কালে ওদিকে যাবার নাম করে না। আর ওমর-মাহমুদ কি না চার-চারবার ওখানে গেছে! বন্দরের বুড়ো জেলে তারিফ করে বলে ওরা এবার গেলেই মরবে। নিশির ডাক লেগেছে ওদের কানে। ওরা না গিয়ে থাকতে পারবে কেন?

আসলে ওমর-মাহমুদ ভূত বলে মানতে পারছে না। ওদের ধারণা, এর পিছনে কিছু একটা রহস্য আছেই। ওরা যদি ডুবুরী হ'ত, অবশ্যই এই রহস্যটা জেনে ফেলে লোকজনকে তাক লাগিয়ে দিত।

অনেক ডুবুরীকে তারা সাধাসাধি করেছে। কিন্তু কেউ রাজী হয়নি। ওরে বাবা! জেনে শুনে মারা পড়তে যায় কেউ? আর---শুধু ভূত হলেও কথা ছিল, ওই তল্লাটে সমুদ্রের তলায় হাঙরের উপদ্রব আছে বারোমাস। তার ওপর আছে রাক্ষুসে একরকম জঘন্য মাছ—তার নাম বারাকুদা। দলে দলে তারা ছুটে এসে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা ভয়ঙ্কর রক্তপাগল। কোনো মানুষ বা প্রাণীর শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, এমন অবস্থায় জলে পড়লে সে যা কাণ্ড শুরু হয় বলতেও গায়ের লোম কাঁটা হয়ে ওঠে। রক্তের চিহ্ন দেখেই হোক বা গন্ধ শুঁকেই হোক,

চারপাশের এলাকায় যত বারাকুদা আছে, বড় বড় করাত দাঁতওয়ালা হাঁ করে তেড়ে আসে।

কাজেই কোন ডুবুরীই রাজী হয়নি প্রস্তাবে। এমন কি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে সৌখিন সাহেব ডুবুরীরা এদিকে এসেছে, অনেক বলেও তারা পিছিয়ে গেছে শেষ অব্দি। হাঙর এবং বারাকুদা ছাড়াও অরেকটা অসুবিধা হচ্ছে—ডুবন্ত জাহাজটার চারপাশে এক মাইল সীমানার মধ্যে যেতে গেলে সুদান সরকারের অনুমতি চাই। স্থানীয় লোকেরা বিনা অনুমতিতে গোপনে ওখানে যেতে পারলেও সাহেব ডুবুরীরা আবার খুব নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ।

বিনা হুকুমে তাঁরা যেতে রাজী নন। আবার অনেক সাধাসাধি করে হুকুম যদি বা মিলল, হাঙর-বারাকুদার ভয়টা বড় হয়ে উঠল! তারপরও অনেকে গেছে অবশ্য। কিন্তু আর তাদের প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেখা যায়নি।

এদিকে আর একটা মজার গুজবও চালু আছে। সাধারণ লোকের মতে, জাহাজটায় নাকি বিস্তর সোনাদানা রয়েছে। কিন্তু সরকার থেকে রটানো হয়েছে, সোনাদানা নয়, ওতে ডুবে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব মারণাস্ত্রের মশলা—যা যুদ্ধের কাজে লাগে। আছে কয়েক হাজার টন ডিনামাইট। আর বিপজ্জনক মিথেন-গ্যাসের সেল। হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গেলে নিজেরা তো মরবেই, এলাকার অনেকগুলো বন্দর বিপন্ন হবে। এমন কি বেশ কিছুকাল এই সাগরের জলপথটাও সব জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

সে কারণেই নাকি বড় সহজে অনুমতি কাকেও দেওয়া হয় না।

এবার ডুবন্ত জাহাজটার ইতিহাস বলি শোনো............ . ...

তখন ইউরোপে সবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা। চারিদিকে সাজো সাজো রব। সুদান এলাকায় বৃটিশ সরকারের রাজত্ব। ঠিক যেদিন ইটালী মিত্রশক্তি অর্থাৎ বৃটেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল, সেদিনই রাত্রির অন্ধকারে ইরিত্রিয়ার দিকে চলেছে একটা ইটালীর বাণিজ্য জাহাজ। যাচ্ছে মাসোয়া বন্দর লক্ষ্য করে। বাইরের চেহারায় সেটি নিছক বানিজ্য জাহাজ—কিন্তু ভিতরে নাকি রয়েছে যুদ্ধের সরঞ্জাম। সোনাদানাও নাকি রয়েছে প্রচুর। আফ্রিকা উপকূলে ইটালী সরকার অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্রের কাজে নাকি জাহাজটাকে ছদ্মবেশে পাঠিয়েছে।

খবরটা সুদানের বৃটিশ কতৃপক্ষ জানতে পেরেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন পাঠিয়ে ইটালীর জাহাজটার তলা ফাঁসিয়ে দিলেন। সুদান বন্দরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং সোয়াকিন বন্দরের সাত মাইল পূর্ব দক্ষিণে জাহাজটা ডুবে গেল চিরকালের মত। জাহাজের লোকজন—যারা প্রাণ বাঁচাতে

সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল বা লাইফবেল্ট পরে ভাসছিল, তারা কেউ হাঙর-বারাকুদার পেটে, কেউ ব্রিটিশ জলসেনার গুলি খেয়ে মারা গেল।

জাহাজটার নাম ছিল 'উম্‌ব্রিয়া'। সবটাই জলের নীচে রইল তার। কেবল জেগে রইল একটা মাস্তুল জলের ওপর। সমুদ্র শকুনদের বিশ্রামের জায়গা হয়ে উঠল সেটা। তাদের সাদা বিষ্ঠায় দিনে দিনে মাস্তুলটা পুরো সাদা হয়ে গেল।

উমব্রিয়া ডুবে যাওয়ার উনিশ বছর পরে এ কাহিনী।

যে সাগরের কথা এতক্ষণ বলেছি, তার নাম রেড সী বা লোহিত সাগর। লোহিত সাগর কেন? ওকে লাল সাগর বলাই ভালো। এই লাল সাগরের শুরু আরব সাগরের উত্তর পশ্চিমের এডেন উপসাগর থেকে। শেষ হচ্ছে একেবারে সুয়েজ ক্যানাল হয়ে ভূমধ্যসাগরে। লাল সাগর চলে গেছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। লম্বালম্বিতে হাজার মাইলের বেশি, চওড়ায় দুশো, কোথাও আড়াইশো, আবার কোথাও বা পঞ্চাশ মাইলও বটে। সুয়েজের দিকে এগোলে লাল সাগরের ডাইনে পড়েছে সউদী আরব, বামে আফ্রিকা মহাদেশের আবিসিনিয়া, ইরিত্রিয়া সুদান আর মিশর। ডাই[illegible] বন্দর বলতে এক জিদ্দা। যেখান থেকে মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র মক্কা খুব কাছেই। বাম উপকূলে কিন্তু বন্দরের সংখ্যা অনেক। ওমর-মাহমুদের বাড়ি সোয়াকিন তেমনি একটা বন্দর।

সাগরের জলের রঙ তো নীল। তাই বলা হয় নীল সাগরের জল। কিন্তু লাল সাগর কেন? জলের রঙ লাল হয় নাকি? না হয় যদি. তাহলে কেন এই আজগুবি নাম লাল সাগর বা রেড সী?

বলছি। সাগরের তলায় প্রবালকীট জমে থাকে কোন কোন জায়গায়। এই সাগরে আবার প্রবালকীটের রাজত্ব বললেই চলে। ডুবো পাহাড়ের সংখ্যা এখানে বড় কম নয়। ওই সব ডুবো পাহাড় ঘিরে থরে-বিথরে লক্ষ-কোটি ঝাঁক প্রবালকীট জমে ওঠে। প্রবালকীটের দরুণ দূর থেকে এ সাগরেব জল সত্যি সত্যি লাল দেখায় অনেক সময়।

তাই কিনা লাল সাগর। আর এই লাল সাগরের দুই জলচর মানুষ সেই ওমর শেখ আর মাহমুদ। 'উম্‌ব্রিয়া' ভূতের রহস্য জানতে তাদের চোখে ঘুম নেই।

উনিশ শো ষাট খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। উপকূল এলাকায় মরুভূমি আর পাহাড়ের রাজত্ব। তাই ঝাঁঝাল গরম হাওয়া বইছে। ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে গায়ে। কে বলে সাগরতীর নাতিশীতোষ্ণ? লাল সাগরের এ তল্লাটে তো নয়ই।

সেই গরমে সুদান থেকে রেলপথে এসে নেমেছে এক জার্মান সায়েব। নেশাটা তার মজার। জলের নীচে ডুবে দিয়ে ঘুরে বেড়ানো। শৌখিন ডুবুরী সে। নাম হচ্ছে হ্যানস্ হ্যাস্। তার বন্ধু সুদানের এক ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বিল--গ্রাহাম

বিল। সোয়াকিনে এসেছে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই। উদ্দেশ্য-লাল সাগরের তলায় ডুবে মেরে বেড়ানো। শখটা আজগুবি নয় শুধু—রীতিমত মারাত্মকও বটে। হাঙর-বারাকুদা মাছের পাল্লায় পড়লে আর জ্যান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না বাছাধনকে। মাঝি-মাল্লা-জেলেরা এই সব মন্তব্য করছিল নিজেদের মধ্যে।

খবরটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল মাহমুদ আর ওমর শেখ। এই সায়েব বাবাজীকে একবার বলবে কথাটা? ব্যস্। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়। সাগরেব ধারে তাঁবু। সেখানেই দুই বন্ধু সরাসরি হাজির।

দুই

যাত্রা হল শুরু

গ্রাহাম বিল একে ম্যাজিস্ট্রেট—তার ওপর গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রিটিশ সায়েব। মাহমুদ ওমরেব প্রস্তাব শুনেই সে লাল চোখে তেড়ে এলে। .... গেট আউট, গেট আউট!

মাহমুদ ঘাবড়ে পড়ল। কিন্তু বগচটা ওমর তেজী আরবী ঘোড়ার মত রুখে দাঁড়িয়ে বলল, আরে থামো থামো সায়েব। তোমাদের ব্রিটিশ লোকগুলোকে চিনতে আমাব বাকি নেই। আমরা তো তোমার কাছে আসিনি! এসেছি যার কাছে তার কথা শুনতে চাই।

মাহমুদ আড়ালে চিমটি কেটে বন্ধুকে হুঁশিয়ার করছিল। সর্বনাশ! স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব—বেশি চটে গেলে এলাকায বোট বাওয়া নিষিদ্ধ করে দেবে। তখন তারা খাবে কী? ওই তো তাদের রোজগারের একমাত্র উপায়!

কিন্তু ওমর সে সব গ্রাহ্য না করে জার্মান সায়েবটির উদ্দেশ্যে বলল, কী সায়েব? তুমি কী বলছ, বলো। যাবে, না যাবে না?

হ্যানস হ্যাস বন্ধুর মত গোমড়ামুখো বদরসিক নয়। সে মিটিমিটি হাসছিল এতক্ষণ। বিল ফেব ক্ষেপে গিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, সে তাকে থামিয়ে বলল, দ্যাখো ওমর, এখানে আসবার অনেক আগেই আমি তোমাদের সেই জাহাজ-ভূতের কথা শুনেছি। আর, সত্যি বলতে কী—আমার আসার পিছনে এই একটিমাত্র কাবণ রয়েছে। কাজেই তোমার নিশ্চিত হতে পারো।

বিল কটমট করে তাকাল বন্ধুর দিকে। তারপর বলল, কী সর্বনাশ! তুমি কি সত্যি ওখানে যাবে নাকি?

হ্যাস একটু হেসে জবাব দিল। ....সেই জন্যেই তো আমি দুজন সাহসী বোটম্যান আর একটা মোটরবোট খুঁজছিলাম। এখন দেখছি, বেঘ না চাইতেই জল।

বিল আঁতকে উঠল। —তোমার মাথা নির্ঘাত খারাপ হয়েছে হ্যাস। এ

সাগব বড় বিপজ্জনক সাগর। বিশেষ কবে সোযাকিনের মাত্র ছ'মাইল দূবে যে এ্যাটল (প্রবালবলয—সমুদ্রেব মধ্যে গোল প্রবাল-পাঁচিল তাব মধ্যেটা হ্রদেব মত) বযেছে—সেখানে হচ্ছে হাঙবেব বাজত্ব। হাঙব-শিকাবীদেব বড় আড্ডা তাই এই বন্দবটা। তুমি কী জীবনে কখনও হাঙব শিকাব কবেছ? হাঙবেব পাল্লায পডলে আব প্রাণ নিয়ে ফিবতে পাববে ভেবেছ? নাঃ, জেনে শুনে এত বড বিপদেব মুখে তোমায ছেড়ে দিলে আমাদেব ব্রিটিশ সবকাবেব অনেক বদনাম হবে।

হ্যাস বলল, আমি সবকাবী ভাবে লিখে দেব যে আমাব জীবনেব জন্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দাযী নন। তাহলেই হল তো?

বিল গুম হযে থাকল কিছুক্ষণ। তাবপব বলল, উহু। আমি তোমায উমব্রিযা অভিযানেব ছাড়পত্র দেব কেমন কবে? সে নিযম এখন নেই।

হ্যাস একটু চটে গেল মনে মনে। বলল, ঠিক আছে। দিও না। আমিও নিযম ভাঙবাব জন্যে জেদ ধবতে বাজী নই। তবে বেড সীতে ডুব দিযে ঘুবে বেডানো তো তুমি আইনত আটকাতে পাববে না। তাই না?

বিল জবাব দিল, সে তোমাব খুশি। তবে আমাদেব দেশেব পুলিশেব পাল্লায পডলে কী হবে [illegible] দাযিত্ব কিন্তু আমাব নয়। ওদেব কর্তা ম্যাকফাবসন আবাব [illegible] [illegible] মুক্তো ছুঁডছে বলে বিপদে ফেলতে পাবে। সাবধান।

হ্যাস হেসে [illegible] তখন তোমাব নাম কবে বলব খোদ ম্যাজিস্ট্রেট আমাব বন্ধু।

[illegible] বিল [illegible] না।

ওমব বলল, তাহলে সাহেব আমি বোট ঠিক বাখছি। কেমন? তুমি [illegible] ঠিক [illegible] হাজিব হবে। ওই যে বালিব পাহাডেব পাশে [illegible]। ঘব [illegible] দেখা যাচ্ছে। ওটা হচ্ছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখ পাবছ। [illegible]

ওমব মাহমুদ [illegible] একবকম নাচতে নাচতে চলে গেল। বিল [illegible] মুখে চুপচাপ বসে বইল ক্যাম্পচেযাবে। হ্যাস তাবপব বেগ থেকে ইতিমধ্যে একটা বাকসো টেনে এনেছে। উজ্জ্বল বোদে বাকসোটা খুলে একগুচ্ছেব টুকিটাকি জিনিসপত্র বেব কবছিল সে। খালি গা, পবনে মাত্র একটা হাফপ্যাণ্ট এবং উৎকট গবম গাযে পোশাক বাখা কঠিন। তাব বলিষ্ঠ শবীব। মুখেব দাডিগুলো কেমন পাঁশুটে দেখাচ্ছে। কিন্তু তাব চেহাবাব মধ্যে সব মিলিযে জার্মান বা যে কোন সাদা চামডাব মানুষেব সঙ্গে কী যেন একটা তফাত সবাব চোখে না পডে পাববে না। একদল সাদাচামড়াব মানুষেব ভেতব হ্যাসকে সহজেই দূব থেকে চেনা যায। তাব শবীবেব বঙ কেমন যেন ফ্যাকাসে—খড়িপডা জিনিসেব মত। এব কাবণ আব কিছু নয, বছবেব

অধিকাংশ সময় জলে ডুবে ঘুরে বেড়ানোর দরুন শরীরের রঙটা ধূসর হয়ে গেছে। সে আসলে একজন 'জলমানুষ'।

যে জিনিসপত্রগুলো সে বের করছিল, তা নিয়েই সে সাগরের তলায় ডুব মারে। সবগুলোই যে দামী—তা নয়। শুনলে তোমাদের হাসি পাবে হয়তো—স্ক্রু ড্রাইভার, রেঞ্জ স্ক্রু থেকে শুরু করে এক টুকরো রবার ও তার জলে ডোবার কাজে এত দরকারী। তবে জলের তলার ছবি তোলবার ক্যামেরাটা অবশ্য একমাত্র দামী জিনিস।

খুব ছেলেবেলা থেকে তাকে সমুদ্র আকর্ষণ করে আসছে। অজানা জলজগৎ আর তার গভীর রহস্য তাকে সারাজীবন পাগল করে রেখেছে। জার্মানীতে তো কোন সমুদ্র নেই। তাই সে সুযোগ পেলেই নানা দেশে ঘুরে বেড়ায়—যেখানে-যেখানে সমুদ্র আছে। সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরে ডুব দিয়ে জলের তলার অনেক নতুন খবর জেনে সে একটা বই লিখেছে। তার ধারণা বইটা বেরোলে সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যাবে।

ভুরু কুঁচকে লালসাগরের দিকে তাকাল হ্যাস। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইল। গ্রীষ্মের দুপুরে লালসাগরে এখন বড় বড় ঢেউ দুলছে। ঢেউয়ের মাথায় চাপচাপ ফেনা। দূর দিগন্তে সামান্য লালচে রঙ—সাগর শান্ত হলে ওই রঙ সবখানে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে। এখন মোটামুটি স্বাভাবিক নীল রঙের খেলা সাগরে। আকাশে শঙ্খচিল সমুদ্রশকুন বা সীগাল আর ক্বচিৎ দলছাড়া দূর সাগরের দু'একটা এ্যালবাট্রস পাখি ওড়াউড়ি করছে। ডুবন্ত ভৌতিক জাহাজ 'উমব্রিয়া'কে খুঁজছিল হ্যাস। এখন খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। সে গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলারটা টেনে নিল। চোখে রাখল। ঢেউয়ের আড়ালে অস্পষ্ট কী যেন একটা খুঁটির মত ভেসে উঠছে মাঝে মাঝে। ওইটে কি?

কী আছে সে রহস্যের পেছনে? জানা যাবে তো সব? নাকি সত্যি সত্যি ওখানে ভূত-প্রেতের হাতে পড়ে অসহায় ভাবে মারা যেতে হবে?

ঠোঁটের কোণে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল হ্যাসের। ধুৎ! যত সব আজগুবি গল্প। অশিক্ষিত দেশ—বোকাসোকা অধিবাসীরা! কুসংস্কারে ভরতি তাদের মন। সব সময় ভূত-প্রেতের চিন্তায় অস্থির।

কিন্তু সায়েব ডুবুরীরা? তারা তো অনেকেই সুশিক্ষিত সভ্যভব্য মানুষ? আমার পথে একজন মার্কিন ডুবুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সে নাকি ওখানে গিয়েছিল একদিন। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। তাছাড়া লোকটার সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন—হিংস্র বারাকুদা মাছের পাল্লায় পড়ে এই দুরবস্থা। সে হ্যাসকে খুব ভয় দেখিয়েছে। নিষেধ করে বলেছে—খবর্দার। ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে যেও

না। একখানা লাঠির বিরুদ্ধে তুমি হয়তো সহজেই লড়াই জিততে পারো বা মাথা বাঁচাতে পারো। কিন্তু আস্ত একটা প্রকাণ্ড মাস্তুল যদি আক্রমণ করতে আসে, তখন কী করবে?

মাস্তুল! সে আবার কেমন করে আক্রমণ করবে? জ্যান্ত মাস্তুল নাকি?......লোকটা অবশ্য আর খুলে বলেনি।

হ্যাস উদ্বিগ্ন হল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। পরক্ষণেই ভাবল, অজানাকে জানবার জেদেই না সে সারা-জীবন জলের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা আছে বরাতে, এ রহস্যের ঝাঁপি সে খুলবেই। বাকসোর জিনিসপত্রগুলো কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। হ্যাস সেগুলো একটা চটের ওপর বিছিয়ে রাখতে থাকল। বিল তখন ঝিমোচ্ছে।..........

বিকেল চারটেয় সমুদ্রে অনেকটা শান্ত হয়েছে। একটা লালচে ছটা দিগন্তজোড়া জলের ওপর পড়ে রয়েছে। কী অপূর্ব দৃশ্য এ রেডসীর বুকে। না জানি তার ভিতরেও কত সৌন্দর্যের খেলা। রঙিন 'এ্যানজেল' মাছ পাখনা মেলে বেড়ায় ফার্ণ শ্যাওলাব বনে। প্রবালের পাঁচিলে বসে বিশ্রাম করে পাখাওয়ালা পাখির মত শান্ত ভীতু 'টোড' মাছ। স্বর্ণবিন্দু বা 'গোল্ড ডট' মাছের ঝাঁক হয়তো জলপরীদের দেহে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়ায়। সে এক আলাদা জগৎ। আমাদের এই মাটির জগতের মতই সেখানে আছে পাহাড় অরণ্য নদী খাল- বিল আর নানা রকম প্রাণী। সে জগতে যে একবার পা দিয়েছে, তার আর এ জগতে ফিরে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

কাঁধের ব্যাগে জিনিসপত্র যতটা দরকার ভরে নিয়ে হ্যাস এগোল। বিল ঘুমোচ্ছে। লাঞ্চ খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক্। জাগিয়ে দিলে আবার কী বাগড়া দিয়ে বসে! হ্যাস খুশিমনে পা বাড়াল। ছোট্ট বাজার একটা—সুটকি মাছের পচা গন্ধে বাতাস বিশ্রী। নাকে রুমাল ঢেকে সে সেই বালিয়াড়ির কাছে কাফেতে পৌঁছল।

ওমর মাহমুদ তৈরীই ছিল। তাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠল। এবার দস্তুরমত সমীহ করে আপনি আজ্ঞে শুরু করে দিল ওরা। ওমর লম্বা সেলাম দিয়ে বলল, আসুন। গোলামের (ভৃত্যের) নৌকা তৈরী।

ওরা যে ভাষায় কথা বলে, তা আরবী ভাষার অপভ্রংশ। স্থানীয় নাম 'অজ্জু-অজ্জু'। হ্যাস এখানে আসবার আগে এ ভাষা মোটামুটি রপ্ত করে এসেছে। তাই ওদের সঙ্গে কথা বলতে বা ওদের কথা বুঝতে খুম একটা অসুবিধে হচ্ছিল না।

ওরা তিনজনে সাগরের দিকে গেল। একটা খাড়ির মুখে ওদের ছোট্ট মোটর বোটটা রয়েছে। হ্যাস প্রথমে বোটটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল। নাঃ

বেশ মজবুত বোট। অকেজো মিলিটারী জিনিসপত্তর নীলামে অনেক সময় বিক্রি হয়। এটাও ছিল তাই। মেরামত করে নিয়েছে ওরা। ঝড়-বাতাসে এ সব বোট ভারি নিরাপদ।

হ্যাস বলল, ওমর! আজ কিন্তু উমব্রিয়ার খুব কাছে আমরা যাব না। নিরাপদ এলাকায় বোটটা রেখে আমি জলে নামব। যদি কোন বিপদ হয়, তোমরা যা খুশি কোরো। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না, কেমন?

ওমর মাহমুদ অবাক। বলে কী? এ যে দেখছি, ডানপিটেদের গুরু স্বয়ং। আচ্ছা, দেখা যাক্। তারা দুজনে হাঁ-হাঁ করে উঠল।.. ....তাই হয় নাকি! আমরা তো জাহাজ-ভূতের কারসাজি ভাঙতেই আপনার সাহায্য চেয়েছি। আপনি একা বিপদের মজাটা লুটবেন আর আমরা পিঠটান দেব—বাঃ!

হ্যাস হেসে বলল, ঠিক আছে। বোটে স্টার্ট দাও। সন্ধ্যার আগেই ফিরব কিন্তু।

মোটর বোটটা সগর্জনে জল ভেঙে এগোতে লাগল। হ্যাসের চোখে বাইনোকুলার। হঠাৎ সে চমকে উঠল। দিগন্তের সেই কালো রেখা দুটো স্পষ্ট হয়েছে। ওই কি উমব্রিয়ার মাস্তুল? হ্যাসের বুকের ভেতর হাতুড়ি পড়তে থাকল যেন।

দু'মাইল গিয়ে হ্যাস বলে উঠল, ব্যাস! এখানেই বাঁধো।

বাঁধো বললেই তো বাঁধা যায় না। জল খুব গভীর হলে তো নয়ই। অভিজ্ঞ বোটম্যান দুজনেই আশেপাশে জল লক্ষ্য করছিল। জলের তলায় প্রবাল-পাঁচিল দরকার। সেখানে নোঙর আটকে রাখা যাবে। হ্যাস বলল, কী হল? আমাদের নীচেই প্রবাল-পাঁচিল। নোঙর ফেলো!

নোঙর গেড়ে ওমর চুরুট ধরাল। মাহমুদ উত্তেজিত। দাড়ি চুলকোচ্ছে ক্রমাগত। ওরা হাঁ করে দেখল, হ্যাস সায়েব ডুবুরীর পোশাক পরে কখন তৈরীই ছিল। আচমকা ধাঁই করে শূন্যে ডিগবাজি বা ডাইভ দিয়ে ঝপাং করে জলে পড়েছে। তারপর বজবজ করে বুজকুড়ি একরাশ। তারপর আর পাত্তা নেই। এরা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে তো আছেই।

তিন
মাস্তুলের অট্টহাসি

হ্যানস হ্যাস এর আগে অনেক অজানা সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়েছে—জলমানুষের মত ঘুরে বেড়িয়েছে তার তলায়। দেখেছে কত বিচিত্র উদ্ভিদ আর প্রাণী—হিংস্রতায় যাদের কাছে বাঘ সিংহও তুচ্ছ। কতবার তাদের পাল্লায় পড়ে কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে ফিরতে পেরেছে সে।

কিন্তু রেড সীর তলায় পৌঁছনমাত্র কেন কে জানে তার মন কী এক অজানা বিপদের ভয়ে কেঁপে উঠল। ডুবো পাহাড়ের চারদিকে ছড়ানো বড় বড় পাথরের চাঁই ঘিরে প্রবাল কীট জমে রয়েছে দেখল সে। অদ্ভুত তাদের গড়ন। কোনটা প্রকাণ্ড ছাতার মতো, কোনটা বা ঝাঁকড়-মাকড় বটগাছের মতো, কোনটা দেখলে মনে হয়, আস্ত একটা দৈত্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের ওপর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুন্দর এ্যানজেল মাছগুলো। জলের নীচে এমনিতেই আলোর বড় অভাব। তবে প্রথমটা ঝাঁপ দেবার পর যে প্রচুর বুজকুড়ি উঠেছিল, সেগুলো উবে গেলে এবং জল থিতিয়ে এলে দৃষ্টি অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এমন কি মাটির পৃথিবীতে এখন সকাল, দুপুর না বিকেল, কিংবা রাত্রি—তাও অনুমান করা যায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ হ্যাসের মাথার ওপরকার জলে ঝিকমিক করছিল। ক্রমশঃ সে দেখল, ওই ঝিকিমিকিটুকু স্বচ্ছ জলের নীচে অনেক দূর অব্দি চমৎকার আলো ছড়াচ্ছে। এবার তার আর দেখতে অসুবিধে হল না। চারিদিকে বিশ ত্রিশ মিটার অব্দি পরিষ্কার নজর হচ্ছিল। ক্ষুদে রিড মাছের ঝাঁকটাকে সে একটা ধূসর রঙের ফার্ণ গাছের ভেতর খেলা করতে দেখছিল। হ্যাস সামনে একটা টোয়াকোনার কাণ্ড দেখে না হেসে পারল না। এই টোয়াকোনা হচ্ছে একটা অদ্ভুত না-মাছ না-ব্যাঙ জাতীয় জীব। আফ্রিকার জঙ্গলে এক বামন-মানুষের জাত আছে—তাদের বলা হয় 'পিগমি'। টোয়াকোনা কতকটা তাদের মতোই দেখতে। দুটো পা ভর করে যখন কোন জলের তলার গাছের ডালে এরা ওঠবার চেষ্টা করে—অবিকল মনে হয়, যেন পিগমি গাছে চড়ছে। এরা হাঁ করলে বড় ভয়ঙ্কর লাগে দেখতে। কিন্তু আসলে এরা বড় নিরীহ জীব। তাদের চেয়ে বড়ো আকারের কোন জীবকে ধারে-কাছে দেখলে প্রাণ ভয়ে পালাবার চেষ্টা করে। এবং সে দৃশ্য দেখলে সবচেয়ে গোমড়ামুখোরও না হেসে উপায় থাকে না।

টোয়াকোনাকে হ্যাস বলে 'জলবানর'। হ্যাসকে দেখামাত্র বেচারা লেজ তুলে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওদিক থেকে একটা 'করাত' মাছের আবির্ভাব হল। লম্বা করাতের মত তার মুখ। বেচারা জলবানর তখন উবুড় হয়ে একটা পাঁচিল বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে থাকল। সেইসময় চারদিক থেকে তাকে খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে এক ঝাঁক রিড মাছ। বেচারা তখন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। হ্যাস কয়েক পা এগিয়ে তার হাতের লম্বা হারপুনটা দিয়ে করাত মাছটাকে তাড়িয়ে দিল। টোয়াকোনাটা সামনের জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচল। আর নির্ভীক ক্ষুদে রিড মাছের ঝাঁকটা হ্যাসের গায়ে পাখনা বোলাতে শুরু করল। খুব আরাম পাচ্ছিল হ্যাস—যদিও অন্য কারো পক্ষে গা সুড়সুড় করবার কথা।

এখানে একটা কথা বলবার দরকার। হ্যাসের ডুবুরী পোশাকটা একটু অন্য

রকম। সচরাচর ডুবুরীরা আগাগোড়া এক ধরনের পোশাকে শরীর ঢেকে নিয়ে জলের তলায় যায়। কিন্তু হ্যাসের পোশাক বলতে একটা মুখোশ—মাথার পেছন থেকে মুখ অব্দি ঢাকা, সামনে কাচের মতোই এক বিশেষ স্বচ্ছ ও শক্ত চশমা। নাক মুখ থেকে একটা নল কাঁধ ঘুরে পিঠে বাঁধা অক্সিজেন সিলিন্ডারে পৌঁছেচে। ওই দিয়ে জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধে হয় না। এবং এই মুখোশটা ছাড়া হাত ও পায়ে হাঁসের পায়ের গড়ন একজোড়া রবারের দস্তানা ও একজোড়া জুতো। সাঁতার কাটবার জন্যে বা জলের নীচে এগোতে হলে এই দস্তানা ও জুতো খুবই জরুরী।। ব্যস, এই হল তার ডুবুরী পোশাক। গা পুরো খোলা। পরনে একটা জাঙিয়া মাত্র।

জলের নীচে হাঁটা আর চাঁদে গিয়ে হাঁটা প্রায় একই রকম। ইচ্ছে মত পা ফেলা কঠিন। বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু অভ্যাস বশে হ্যাস এগোতে পারছিল স্বচ্ছন্দে। কখনও সে একটু ভেসে এগোচ্ছিল, কখনও পা ফেলে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার মন কী এক অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে কেঁপে উঠছিল। ডুবন্ত উমব্রিয়া জাহাজের প্রায় একশো মিটার দূরে সে ঝাঁপ দিয়েছে। কাজেই বেলা থাকতে থাকতে তাকে ফিরে আসতে হবে। তা না হলে সন্ধ্যার অন্ধকারে খুবই অসুবিধেয় পড়ে যাবে।

যত এগোচ্ছিল, তত অকারণে চমকে উঠছিল হ্যাস। তার মনে হচ্ছিল, একটা নিষিদ্ধ এলাকায় সে চলেছে যেন। প্রবাল পাঁচিল ডিঙিয়ে এবং গাছপালার জঙ্গল এড়িয়ে একটা পরিষ্কার জায়গায় যখন সে পৌঁছল তার বুকটা ফের কেঁপে উঠল। আন্দাজ ত্রিশ মিটার দূরে কালো উঁচু পাঁচিল লক্ষ্য করল সে। দুর্গের মত কী একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। ওটাই কি উমব্রিয়া?

পরক্ষণে মনে সাহস এল তার। কই, তেমন কিছু ঘটল না তো?

এত কাছে এসে পড়েছে, অথচ জাহাজভূতটা দিব্যি চুপচাপ শান্ত খোকাটি হয়ে গেছে। ব্যাপার কী? নাকি মানুষ নামক আজব প্রাণীটাকে নিয়ে কিছু মজা করবার মতলব? আর কোথায় বা গেল সেই সব হিংস্র বারাকুদার ঝাঁক? সেই হাঙরগুলোই বা কোথায়?

হারপুনটা শক্ত হাতে ধরে এগোতে থাকল হ্যাস। যত কাছাকাছি হচ্ছিল, তত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশটা লক্ষ্য করছিল সে। ক্রমশ দূরত্ব কমে গেল। পনের মিটার.......বারো.......দশ.......পাঁচ...... হঠাৎ চমকে উঠল হ্যাস।

কালো পাঁচিলের গায়ের ডোরাকাটা একটা অংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ডাইনে। তার গায়ে হেলান দিয়ে কী ওটা দাঁড়িয়ে রয়েছে? প্রকাণ্ড চশমা দুটো মুছল হ্যাস। নাঃ, চোখের ভুল নয়। মুহূর্তে হ্যাসের রক্ত জমে যাবার উপক্রম হল। একটা কঙ্কাল। আর কঙ্কালটা নড়ছে—নড়তে-নড়তে একটু করে এগোচ্ছে যে।

অতি বড় সাহসী পুরুষ হ্যাস। ভূত-প্রেতে তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এ বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি। জীবন্ত একটা কঙ্কালকে এগিয়ে আসতে দেখলে কারই বা মাথার ঠিক থাকে। হ্যাস সাঁৎ করে ভেসে কিছুটা বাঁদিকে সরে গেল। তারপর হারপুনটা শক্ত হাতে ধরে কঙ্কালটার দিকে লক্ষ্য রাখল।

কঙ্কালটা থেমে গেছে হঠাৎ। মাটির ওপরে এ ঘটনা ঘটলে হ্যাস নির্দ্বিধায় হয়তো ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং রহস্যটার সমাধান করতে ব্যস্ত হ'ত। কিন্তু জলের নীচের জগৎ সম্পর্কে তো মানুষের ধারণা এখনও বড় কম। বিশেষ করে, খুশিমত শরীরটাকে ঘোরানো যায় না বা আত্মরক্ষার জন্যে চোঁ-চোঁ দৌড়ে পালানোও কঠিন।

হ্যাস এবার জাহাজটার দিকে এগোল। হাত বাড়িয়ে ছুঁল তলার প্রকাণ্ড পাঁচিলটা। মরচে ধরে গেছে লোহার খোলে। শ্যাওলা আর প্রবালকীটও বিস্তর জমেছে। সে পাঁচিল বেয়ে ভেসে উঠতে থাকল। কতক্ষণ পরে পৌঁছে গেল ডেকের রেলিঙে। রেলিঙগুলো এখনও বেশ শক্ত আছে। ঝকমক করছে অ্যালুমিনিয়ম ও পেতলের আবরণ। কোথাও কোথাও শ্যাওলার চাপ আর ফার্ণ গজিয়েছে। ঝুলন্ত অর্কিডের মতো লালচে রঙের লতার বুনুনিও সে দেখতে পেল। অজস্র নানা জাতের মাছ খেলা করছিল। হ্যাসকে দেখামাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। হ্যাস এবার দ্বিতীয় চমক খেল। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে—হ্যাঁ, সেই কঙ্কালটাই যেন।

হ্যাস কী করবে ভাবছিল। এখানে আলো খুবই পরিষ্কার। সমুদ্রের ওপরের স্তর বলে রোদের ঝিকিমিকি মাথার ওপর দুলছে। কঙ্কালটা যে মানুষের তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাস মরিয়া হয়ে হারপুন বাগিয়ে কঙ্কালটার দিকে এগোতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার বাঁদিকে জাহাজের বন্ধ কামরার দরজা গেল খুলে। তারপর যাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, সে ভূত-প্রেত হলে হয়তো বাঁচার ছিল। একটা প্রকাণ্ড হাঙর লেজের ঘায়ে কপাটটা নাড়া দিয়ে স্থির হয়েছে। জ্বলজ্বলে দুটো চোখে হ্যাসকে দেখছে।

চকিতে হ্যাস তার হারপুনের খোঁচা মারল চোখ লক্ষ্য করে। হাঙরটা পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়বার খোঁচা মারল হ্যাস। জল কালো হয়ে উঠল রক্তে। ফলে, স্পষ্টতাটুকু ঘুচে গেল। এক হাতে রেলিঙ ধরে হ্যাস তৃতীয় আঘাত হানতে তৈরী—কিন্তু হাঙরটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

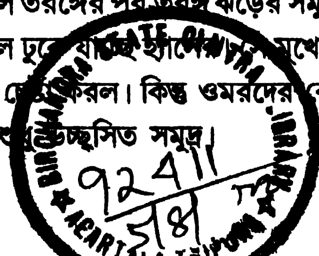
কয়েক মুহূর্ত পরে যা ঘটল, তা অভাবনীয়। জলে রক্তের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে এক ঝাঁক হিংস্র বারাকুদা মাছ এসে হাজির। হ্যাস অসহায়ভাবে

তাকিয়ে দেখল তার পেছনে-পাশে কিছু দূরে বারাকুদাগুলো এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। ধারাল দাঁতগুলো দেখে গা শিউরে উঠল হ্যাসের। সে টের পাচ্ছিল এই সামান্য অস্ত্রটা দিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। বিশেষ করে, একটা প্রকাণ্ড 'মারাত্মক ভুল সে করে বসেছে। হাঙরটাকে কৌশলে এড়ানো তার উচিত ছিল। হাঙরের কেন—যে কোন প্রাণীর রক্ত জলের মধ্যে ঝরলেই বারাকুদারা মড়াখেকো শকুনের মত হাজির হয়। যেন মাথায় টনক নড়ে। ভীষণ রক্ত-পাগল এরা। হাঙরটার রক্ত না ঝরলে এই বিপদটা ঘটত না। এখন পালানোও প্রায় অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ক্ষুধার্ত উত্তেজিত রক্তপায়ী রাক্ষসেরা।

হ্যাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখল, বারাকুদাগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে। আহত হাঙরটা সম্ভবত এদেরই ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এদের না ডরায়, সমুদ্র-জগতে এমন কোন প্রাণী নেই। তবে হাঙরটারও রেহাই নেই। যত তার রক্ত ঝরবে, তত সেখানে যত বারাকুদা আছে—তারা আকৃষ্ট হবে এবং তাকে আক্রমণ করবে।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে কী ঘটে গেল।

জাহাজটা যেন কেঁপে উঠল। জল আলোড়িত হতে থাকল। রেলিঙে ঝুঁকে থাকা কঙ্কালটাও যেন লাফ দিয়ে আরো নীচে কোথাও অদৃশ্য হল। তারপর সে এক অমানুষিক ভয়ঙ্কর একটা চাপা গুর গুর গর্জন শোনা যেতে থাকল জলের নীচে। পরক্ষণে হ্যাস স্তম্ভিত হয়ে দেখল-বারাকুদাগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। জাহাজটা ভীষণ নড়তে শুরু করছে। হ্যাস যত তাড়াতাড়ি পারে, ওপরের দিকে ভেসে উঠল। এবং ভেসে ওঠার সময় তার মনে হল, জাহাজের মাস্তুলগুলো যেন সোজা হয়ে জাহাজের ওপর চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। ভোঁস করে জলের ওপর ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ গেল সামনের দিকে। হ্যাঁ, অস্তগামী সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, উমব্রিয়ার মাস্তুলটা জলের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার জন্যেও বটে এবং খালি চোখে স্পষ্ট দেখবার জন্যে হ্যাস এক টানে মুখোশটা খুলে ফেলা মাত্র তার কানে এল এক অমানুষিক অট্টহাসির শব্দ। যেন হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে হাহা-হাহা করে হাসছে আর হাসছে। বেলা শেষের শান্ত সমুদ্রও গেছে হঠাৎ ক্ষেপে। ফেনিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঝড়ের সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। নাকে মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে হ্যাসের। সে মুখোশটা ফের পরে নিয়ে অনেক কষ্টে ভেসে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওমরদের বোটটা কোথায় গেল।' কোথাও কোন বোট নেই—শুধু উচ্ছ্বসিত সমুদ্র।



চার
এরা আবার কারা

কোথাও কোন বোট নেই। যত দূর দেখা যায়, শুধু জল আর জল। জলের রঙ কালো হল কেন? এ জলের রূপ ভয়ঙ্কর। যেন সাগরের গভীরে কোথাও বন্দী ছিল কত কালের এক দৈত্য। আজ হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করছে।

হ্যাস অসহায় বোধ করছিল। ওমরদের হল কী? বোটসুদ্ধ ডুবে মরে নি তো ওরা? ওই ডুবন্ত জাহাজের অশুভ শক্তি ওদের কি সত্যি সত্যি ডুবিয়ে মারল? এতটুকু চোখের ভুল নয়, সে স্পষ্ট সেই জ্যান্ত কঙ্কাল দুটো। তখন এতখানি ভয় পায়নি হ্যাস, এতক্ষণে ওমরদের দেখতে না পেয়ে ভীষণ ভয় পেল।

অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে সে উমব্রিয়ার মাস্তুল দেখার চেষ্টা করল একবার। দেখল সেটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে আগের মতো।

ওদিকে সূর্য ডুবে গেছে পশ্চিম দিগন্তে। জলের লাল রঙটা দ্রুত ফিকে হয়ে পড়ছে। হ্যাস আন্দাজ করল, ওই দিকটা পশ্চিম—তাহলে তাকে ডাইনে এগিয়ে যেতে হবে। তবে সোয়াকিনের মামি ছোঁবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু অতখানি পথ পাড়ি দেবার ক্ষমতা কি তার আছে? ইতিমধ্যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ভয়ে দুর্ভাবনায় মন গেছে মুষড়ে। এদিকে সামনে এগিয়ে আসছে অন্ধকার রাত।

কোথাও কোন জাহাজও দেখা যাচ্ছে না—তার কারণ একটিই। এখানটা জাহাজ চলাচলের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। তলায় ডুবো-পাহাড়ে ভরতি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল হ্যাসের। সোয়াকিনের ছ'মাইল দূরে—এখান থেকে উত্তর-পূর্বে এবং কাছাকাছি একটা প্রবাল বলয় ছিল না? কোথায় সেটা?

ততক্ষণে সমুদ্র ক্রমশ শান্ত হয়ে এসেছে। বাতাসের গতি অতি মৃদু। একটু জিরোবার সুযোগ পেল সে। চিত সাঁতার দিতে থাকল। তারপর মুখোশটা খুলে উবুড় হয়ে ভাসল। প্রবাল বলয়টা খুঁজল।

আশায় আনন্দে নেচে উঠল হ্যাস। ওই তো সেই গোলাকার প্রবাল পাঁচিল। ড্রীমল্যাণ্ড নামে সেই এ্যাটল। শরীরে জোর এল তার। এগিয়ে চলল সেই দিকে। কতক্ষণ পরে হঠাৎ তার মনে হল কে যেন মাউথ অরগ্যান বাজাচ্ছে। ব্যাপার কী? সে মাথা তুলে স্পষ্ট শোনবার চেষ্টা করল।

নাঃ, মাউথ অরগ্যান নয়। ভেঁপু বাজছে তীব্রস্বরে। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো।

পরক্ষণে হ্যাস দেখল, প্রবাল পাঁচিলের ওপর কে বা কারা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারাই একটা প্রকাণ্ড বিউগল বাজাচ্ছে। বিউগলটা স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছিল—কারণ সেটা অবশিষ্ট দিনের ছটায় চকচক করছিল। ওরা যারাই হোক, বেশ আমুদে লোক তো। ওরা বিপন্ন হ্যাসকে দেখতে পাচ্ছে না?

অনেকটা কাছে গিয়ে হ্যাস একটা হাত তুলল। ইশারা করতে থাকল। ওদের চোখে পড়ছে কি না বোঝা গেল না। তখন সে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল—হেল্‌প্‌, হেল্‌প্‌! বাঁচাও, বাঁচাও!

সত্যি সত্যি হ্যাস ডুবে মরছে না—কিন্তু ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সে উচিত মনে করছিল।

এবার দেখা গেল লোকগুলো ওকে দেখতে পেয়েছে। একজনের হাতে একটা ছোট্ট দূরবীণ। সে অন্য দিকে কী যেন দেখছিল সেই দূরবীণে চোখ রেখে। এবার তার দিকে ঘুরল। তিনজন লোক। একজনের হাতে বিউগল, অন্যজন দূরবীণধারী, আরেকজনের হাতে একটা বন্দুক। কে ওরা? জলপুলিসের লোক. হ্যাস ঠাহর করে দেখল, না—ওরা জলপুলিস হতেই পারে না। অমন বিদ্‌ঘুটে পোশাক জলপুলিস পরে না।

আন্দাজ তিনশো মিটার দূরত্ব। হ্যাস দেখল, এবার একজন পাঁচিলের ওপর থেকে ওদিকে অদৃশ্য হল। তারপরেই দেখা গেল একটা মোটর বোট তার দিকে এগিয়ে আসছে। বোটের লোকটার মাথায় লাল চুল, দাড়ি আছে, থ্যাবড়া নাক, কেমন ভয় দেখানো চেহারা। একটা ধূসর জ্যাকেটের ওপর নীলচে ওয়েস্টকোট আর সেকেলে যোদ্ধাদের মত ব্রীচেস ধরনের আঁটো পাতলুন তাদ পরনে। কোমরে খাপখোলা একটা প্রকাণ্ড পিস্তল ঝুলছে।

বোটটা কাছে এসে স্থির হলে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর পরিষ্কার ইংরাজীতে বলল, উঠে পড়ো।

হ্যাস উঠল। পা ছড়িয়ে হেলান দিল সে। কিছুক্ষণের জন্যে কোন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে। চোখ বুজে বসে রইল সে। কতক্ষণ পরে সে যখন চোখ খুলল, দেখল বোটটা প্রবাল বলয়ের ভেতর ঢুকছে। একটা খাড়ির গায়ে নোঙর করে লোকটা ওর সঙ্গীদের ডাকল।

তারপর তিনজনে ধরাধরি করে বোট থেকে হ্যাসকে তুলল।

নির্জীব হয়ে পড়ে রইল হ্যাস। তার দেহে যেন আর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই।

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলাবলি করছিল। একটু পরে হ্যাস চোখ খুলল ফের। দূরবীণধারী লোকটা। বিশাল দেহ। গায়ে মাত্র একটা হাতকাটা কালো গেঞ্জি। সে হাঁটু দুমড়ে বসল হ্যাসেব পাশে। তারপর বলল, আশা করি, এখন সুস্থ হয়েছো।

হ্যাস একটু হাসল।

বিউগলধারী ব্র্যাণ্ডির বোতলের ছিপি খুলে বলল, নাও। দু'ঢোক খেয়ে তাজা হও তো খোকা। তারপর বল, কে তুমি, খামোকা জলেই বা মড়ার মত ভাসছিলে কেন?

দূরবীণধারী লোকটা বলল, আরে, দেখছ না? লোকটা নির্ঘাত ডুবুরী।

বোটের লোকটি লাফিয়ে উঠল।...............ডুবুরী? এখানটায় কী মণিমাণিক্য তুলতে এসেছিলে শুনি?

পরস্পর তিনজন চোখাচোখি করল। ইশারায় কী যেন বলল ওরা। তারপর হঠাৎ দূরবীণধারী হ্যাসের একটা হাত শক্ত করে ধরে বলে উঠল, বাছাধনের তাহলে উমব্রিয়া অভিযানে যাওয়া হয়েছিল? এ্যাঁ? কী দেখলে বল তো সোনা? সাত রাজার ধন—নাকি সেই বুড়ো কাপ্তেনের ভূতটা? বিকট হেসে উঠল সে।

হ্যাস ব্র্যাণ্ডি খেয়ে উঠে বসল। তারপর বলল, তোমরা কে?

পাল্টা প্রশ্ন করল দূরবীণধারী। ....তুমি কে তাই আগে শুনি।

—আমি হ্যানস হ্যাস। জার্মান ডুবুরী। ভূতটা সত্যি না মিথ্যে দেখতে গিয়েছিলাম।

ওরা হো হো করে হেসে উঠল। বোটের লোকটা বিউগলওয়ালাকে বলল, এর সাহস তো কম নয় ডিক! কী বলল শুনছো? টম, আমার দারুণ সন্দেহ, কোন বিদেশী গভর্নমেন্টের এজেন্ট এই ডুবুরীটাকে ভাড়া করে উমব্রিয়ার মালগুলো হাতাবার ফিকিরে আছে।

হ্যারি, তুমি চুপ করো তো। আমি দেখছি।..........দূরবীণধারী বলল।

টম, ডিক, হ্যারি!.........হ্যাস মনে মনে বলল। ....এ তো ইংরেজদের সাধারণ চলতি নাম! (বাংলায় যেমন রাম, শ্যাম, যদু) নিশ্চয় এরা বোম্বেটে এবং এসব এদের ছদ্মনাম। যাইহোক, এরা কী করে দেখা যাক্।

টম বলল, তা ওহে ধেড়ে খোকা, কে পাঠিয়েছে তোমাকে? ইতালী গভমেন্টের লোকেরা?

হ্যাস একটু হেসে বলল, তা কেন?

কেন নয়? টম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল। .... জাহাজটা তো ওদেরই। ইংরেজদের খতম করবার জন্যে ওই জাহাজে এক অদ্ভুত মারণাস্ত্র পাঠিয়েছিল ওরা। সেগুলো ঝাড়তে পারলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওই ব্যাটাদেরই জয়জয়কার পড়ে যেত। মাঝখান থেকে আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় এ্যাটম বোমা ফেলে দিয়ে কিস্তি মাত্ করে। বাছাধনরা তো জানে না যে ইতালীর জাহাজে এ্যাটম বোমার চেয়ে কী সাংঘাতিক চিজ লুকোন রয়েছে।

হ্যাস বলল, তাই নাকি?

ডিক গর্জে উঠল।...........খবর্দার! ন্যাকামি করো না। এখন বলো সেগুলো কী অবস্থায় আছে দেখে এলে?

হ্যাস বলল, আমি শুধু দুটো কঙ্কালভূত দেখেছি!

হ্যারি দাড়ি চুলকে বলল, সেটা ঠিকই দেখেছো। বুড়ো কাপ্তেন বেনজেল্লো আর তার বদমাইশ সহকারী গিয়েসেপ্পো ডুবে মরে ভূত ছাড়া কি দেবদূত হবে না কি?

টম বলল, ভূতটুত রাখো হে। শুধু জবাব দাও, উমব্রিয়ার ভেতর তুমি ঢুকতে পেরেছিলে?

হ্যাস বলল, উঁহু।

কেন?

সে বড় ভয়ঙ্কর কাণ্ড। জল কেঁপে উঠল। তারপর আস্ত মাস্তুল দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। কারা সব হাসতে লাগল। উঃ, মনে পড়লে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

ডিক বলল, নির্ঘাত ভয় দেখাচ্ছে আমাদের।

টম বলল, দ্যাখো আমিও একজন পাকা ডুবুরী। আসল নাম বললে সোয়াকিনোর তল্লাটে সবাই একবাক্যে বলবে, হ্যাঁ—এত জব্বর ডুবুরী দেখা যায় না। কিন্তু যতবারই উমব্রিয়ার কাছাকাছি গেছি, হাঙর আর বারাকুদোর ঝাঁক আমাকে তাড়া করেছে। তোমার কপাল ভালো বলতে হয় যে তুমি উমব্রিয়া ছুঁতে পেরেছিলে। এবার শোন—একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমাকে বেশ ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া তুমি তো জার্মান। হিটলারের বেআক্কেলে বুদ্ধিতে তোমাদের জাতটার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঈশ্বরের দিব্যি, তোমরা জার্মানরাও উমব্রিয়ার সেই সাংঘাতিক মারণাস্ত্রের একটা অংশ পাবে।

হ্যারি গম্ভীর মুখে বলল, ইংরেজ শতকরা সত্তর ভাগ, ত্রিশ ভাগ জার্মান।

টম বলল, তাই হবে। চলো, আজ রাতের অন্ধকারে আমরা উমব্রিয়ার মধ্যে তল্লাস চালাই। তুমি আর আমি জলে নামব। ওরা পাহারা দেবে।

হ্যাস মনে মনে বলল, আচ্ছা সব পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। তবে যা দেখা যাচ্ছে, সঙ্গী হিসেবে এরা বেশ সাহসী সম্ভবত। উমব্রিয়ায় মারণাস্ত্র থাক বা না থাক, অন্তত যার জন্য সে এদিকে পাড়ি দিয়েছে, জাহাজ ভূতের রহস্য উদ্‌ঘাটন—সেটার একটা কিনারা করা যেতে পারে। কিন্তু ওমর-মাহমুদ গেল কোথায়?

সে বলল, ঠিক আছে। আমি রাজী। কিন্তু দ্যাখো, আমার দুজন সঙ্গী একটা বোট নিয়ে ওখানে অপেক্ষা করছিল। ফিরে এসে তাদের আর দেখতে পাইনি। তাদের দেখেছো তোমরা?

হো হো করে হেসে উঠল টম। ....…আরে, তাই বলো। দূরবীণে আমি তাহলে ওই কাণ্ডটাই দেখছিলাম! জলপুলিসের কর্তা ম্যাকফারসন একটা বোটসুদ্ধ কাদের পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছিল।

হ্যাস উত্তেজিত স্বরে বলল, কখন? কোন্ দিকে?

টম ঘড়ি দেখে বলল, তখন সাড়ে পাঁচটা হবে। ওরা সোয়াকিনের দিকে যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, বেআইনীভাবে কারা মুক্তোর ঝিনুক তুলছিল তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্বস্ত হল হ্যাস। যাক্—ওরা তাহলে বহাল তবিয়তেই আছে। পরে বিলকে বলে ওদের ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন হবে না।

টম বলল, তাহলে কী বলছ হে চাঁদ? কখন বেরোব আমরা?

হ্যাস বলল, খানিক জিরিয়ে নিতে দাও।

হ্যারি বলল, ওহে ডিক, আমাদের নতুন স্যাঙাৎকে কিছু খাইয়ে চাঙ্গা করা দরকার। যাও খাবারের বোঁচকাটা নিয়ে এসো। ফ্লাস্ক ভরতি কফিও আছে। হ্যালো নতুন স্যাঙাৎ, শরীর গরম করবে না?- সে ব্যবস্থাও আছে। ভেবে-চিন্তে আমরা একগাদা শুকনো কাঠও এনেছি। জলে ডুবে শরীরখানার কী দশা হয়, সে কি আমরা জানিনে?

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। প্রবাল পাঁচিলের চওড়া সমতল একটা ধাপের ওপর আগুন জ্বালাল ওরা। তারপর হ্যাসকে ডাকল। হ্যাস আগুনের সামনে গিয়ে বসল। সে ভাবছিল, এ একটা অভাবিত সুযোগ। মারণাস্ত্রের খোঁজ পাক বা না পাক, অন্তত জলের সেই মারাত্মক আলোড়ন, কঙ্কালভূত, চলন্ত মাস্তুল আর অট্টহাসির রহস্য কী একটুও জানা যাবে না? প্রথমবার হঠাৎ কিছু ঘটলে চোখ কানের ভুল মানুষের হয়। ম্যাজিকওয়ালারা তো ওই ভুলেরই সুযোগ নেয় দর্শকের কাছে। দ্বিতীয়বার অতখানি ভুল হয় না। আর এই লোকগুলো যাই হোক, সাহসী বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক!..........

পাঁচ
যখের ধন

আকাশে নক্ষত্র ঝকমক করছে। লাল সাগরের জলে তার ছটা খেলছে ঝিকিমিকি। কাছে ও দূরে ফসফরাসও অল্প ঢেউয়ে চিকমিকিয়ে উঠছে। রাতের সমুদ্রে এ দৃশ্য বড় সুন্দর। লোনা জলে ফসফরাস থাকে। ঢেউ উঠলে রাত্রিবেলা তার ছটা দেখা যায়। ফসফরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে।

রাতের সমুদ্রেও ডুবুরীরা অনায়াসে জলের তলায় পাড়ি দিতে পারে। শুধু

দরকার হয় একটা বাতি। তবে বিপদের ঝুঁকিও থাকে বেশি। জলের তলায় আলো বেশি দূর যায় না। কাজেই কোন মারাত্মক প্রাণী খুব কাছাকাছি না এসে পড়লে দেখা যায় না এবং আত্মরক্ষার ফুরসত পাওয়া যায় না।

দেখা গেল টম সত্যি একজন পাকা ডুবুরী। সে হ্যাসের পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছিল, ওর হাতে একটা বাতি। জলের তলায় কাঁচে ঢাকা সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র এই বাতিগুলো জ্বালার কোনো অসুবিধে হয় না। হ্যাসের অস্ত্র বলতে এক ওই হারপুনটা। কিন্তু টমের হাতে বিচিত্র পিস্তল—যার গুলি জলের ভিতরেও চলে।

হ্যাস বলে দিয়েছিল যে খুব বেশি দরকার না হলে যেন কোন প্রাণীকে আহত না করা হয়। কারণ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তের গন্ধ পেয়ে হিংস্র বারাকুদা মাছের ঝাঁক এগিয়ে আসবে চারিদিক থেকে।

এবার কিন্তু কোন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছিল না। এমন কি উমব্রিয়ার গায়ে হাত ছোঁয়ালেও কোন কঙ্কাল দেখা গেল না। উপরে সমুদ্রও আশ্চর্য শান্ত।

দুজনে ভেসে ওপরে ডেকে গিয়ে উঠল; রেলিঙ ডিঙিয়ে যাবার সময় ওরা দেখল বাঁদিকে একটা দরজা খুলে যাচ্ছে। তারপর বেরিয়ে এল একটা সাপ। সাপটা আলোর সামনে স্থির হয়ে ভাসছিল। নীল জ্বলজ্বলে চোখ তার। কালো জিভটা কাঁপছিল। হ্যাস হারপুনটা উঁচিয়ে তাড়া করলে সাপটা ফের ঘরে ঢুকে গেল।

জলের ভেতর কথা বলা যাবে না। তাহলে হ্যাস টমকে জানিয়ে দিত—এই সাপগুলো নির্বিষ এবং আলো দেখতে অভ্যস্ত। এরা উপকূলের কাছাকাছি বাস করে সচরাচর। তাই সব সময় আলো দেখতে পায় এবং তাই চোখ ধাঁধিয়ে যায় না।

ওরা সামনের ঘরেব দরজাটা খুলে ফেলল। একরাশ বুজকুড়ি উঠল। নানান জাতের মাছ ছোটাছুটি শুরু করল। কিন্তু আলোর ছটায় তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারার ওদের গায়ে গা ঘষতে থাকল। ভেতরে তেমন কোন জিনিসই চোখে পড়ল না। কারা যেন সব তুলে নিয়ে গেছে কবে। শুধু ভাঙ্গাচোরা কাঠ ছাড়া আর কিছু নেই। আর আছে ঘন পাঁক, শ্যাওলা, ফার্ণে। ওরা ওপাশের দরজা ঠেলে এঞ্জিনরুমে নামবার সিঁড়ি পেলে সিঁড়ি বেয়ে প্রথমে নামল হ্যাস। তারপর টম।

এঞ্জিনরুমটা যেন আগাছায় ভরতি। পাঁক জমেছে। আলোয় ঘোলাটে জলে দৃষ্টি চলল না।

একটা ফোকর গলিয়ে ওরা আরো নিচে নামল। পা ঠেকল শক্ত কোন জিনিসে। হ্যাস হেঁট হয়ে হারপুনের সাহায্যে দেখল ওটা একটা প্রকাণ্ড বাকসো। জোর চাপ দিতেই ডালাটা সহজে ভেঙে গেল।

ওগুলো কী?

হাতে তুলে নিল হ্যাস। শক্ত ইঁটের মতো। পরক্ষণে তার বুক ধড়াস করে উঠল। সোনার বাঁট নয়তো?

টম ততক্ষণে হাত বাড়িয়েছে। ওর মাথার ওপর বুজকুড়ি দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে কিছু বলছে। হ্যাসের হাসি পেল। ওর চোখের দিকে তাকাল। কাঁচের ঠুলির ভেতর জুলজুলে লোভী চোখ দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, সোনাই বটে। এ যে কোন কুবেরের ভাণ্ডার।

টম বাকসোটা টানাটানি করছিল। সে ক্ষেপে গেছে যেন। এ সময় মাথা ঠিক রাখা দরকার। হঠাৎ হ্যাস দেখল, একটু দূরে কোণের দিকে—হ্যাঁ, এ বড় অদ্ভুত, একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু একটু দুলছে। টমের গায়ে খোঁচা দিল সে। টমও দেখল। পরক্ষণে টম গুলি ছুঁড়ে বসল। তারপরই শুরু হয়ে গেল মারাত্মক কাণ্ড।

টম যেদিকে গুলি ছুঁড়েছিল, সেদিকটা হঠাৎ ঘন কালো হয়ে গেল। কঙ্কালটাও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল সেই কালো পাঁচিলের আড়ালে। তারপর চাপা কি একটা গর্জন শোনা গেল—গর্জনটা কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরও হতে পারে, আবার সমুদ্রের তলায় একসঙ্গে অনেকগুলো কামানের গোলাও হতে পারে। মাটির ওপর যেমন, তেমনি জলের ভেতরেও শব্দ চলাচল করে। তবে সে শব্দ অনেকটা চাপা। ডুবুরীর মুখোশের দুপাশে জলের তলার শব্দ শোনারও ব্যবস্থা আছে। তাই অভিজ্ঞ ডুবুরী হ্যাস ওই গর্জন শোনামাত্র দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার একহাতে বাতিটার সঙ্গে তখনও সেই বাকসোর একটা ইটের মতন চৌকো জিনিসটা রয়ে গেছে!

বাতির আলোয় দুজনেই অসহায় হয়ে চেয়ে দেখল সেই জ্যান্ত কালো পাঁচিলটা যেন ঘুরছে এবার। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর থমকানো জলে স্রোত জেগে উঠল। আরো কয়েকটি সেকেণ্ডে সেই স্রোতে বেড়ে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়ানো আর সম্ভব হল না তাদের পক্ষে। স্রোতটা তাদের ঠেলে ওপরে তুলল। কেবিনটার ছাদে মাথা ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাস বুঝতে পারল, এখনই বেরিয়ে না পড়লে জলের চাপে তাদের হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাছাড়া, ওই কালো পাঁচিলটা এসে পৌঁছলেই আর বেরোবার পথও খুঁজে পাবে না।

সে টমের একটা হাত ধরে দরজার দিকে ভেসে গেল। টম গোঁয়ার। সে হয়তো আবার ওর অদ্ভুত জলবন্দুকটা থেকে আর এক ঝাঁক গুলি ছোঁড়ার মতলব করছিল। কিন্তু কেবিনের ছাদে সেঁটে যাওয়ায় এবং হ্যাসের টানে তাকে অগত্যা সে ইচ্ছে বাদ দিতে হল।

কিন্তু কোথায় দরজা? যেখানটা দিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিল, তা আসলে তো একটা ফোকর। কেউ বা কারা জাহাজের এঞ্জিনরুমের তলার কাঠ ভেঙে নিচের ঘরটায় ঢুকে থাকবে। হ্যাস মরিয়া হয়ে ফোকরটা খুঁজছিল।

এই সময় সে টের পেল, তার পিঠের সিলিণ্ডারে যেন অক্সিজেন কমে গেছে। সে শ্বাসকষ্ট অনুভব করল। যা অক্সিজেন ছিল, তাতে অন্তত তিনটে ঘন্টা স্বচ্ছন্দে জলের তলায় কাটানো যেত। বড় জোর একঘন্টাও তো কাটেনি, এরই মধ্যে অক্সিজেন কমে গেল কেন? তাহলে কি সিলিণ্ডার ফুটো হয়ে গেছে? তা যদি হয়, তাহলে তো নির্ঘাৎ প্রাণে মারা পড়তে হবে। জল ঢুকলেই পিঠে বিস্ফোরণ ঘটবার আশঙ্কা আছে। তার ওপর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তো আছেই।

মরিয়া হয়ে উঠছিল হ্যাস। সেই অন্ধকার জ্যান্ত পাঁচিলটা এখন তাদের নিচে ঘুরপাক খাচ্ছে। চাপা গর্জনের শব্দও সমানে শোনা যাচ্ছে। সেই সময় হ্যাসের মনে হল, তলার কালো রঙটা অজস্র বুজকুড়িতে ভরা। অবাক হল সে। কিন্তু পরক্ষণেই ফের ফোকরটা হাতড়াতে থাকল। এখন আর কিছু নয়, বেরিয়ে পড়ার রাস্তাটাই জরুরী। টমের কাছে বাতি আছে, কিন্তু সে বাতির মুখটা ধরে আছে নিচের দিকেই।

হ্যাঁ, পাওয়া গেছে ফোকরটা। ঘরের ভেতরকার জল যেন চাপ দিয়ে ওই ফোকর গলিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তাই সেখানে গিয়ে পড়ামাত্র বেবোবাব অসুবিধে আর হল না। জলের টানে দুজনেই একে একে ছিটকে বেরিয়ে এল। এঞ্জিনরুমের দিকে টম এবার বাতি ফেলল। হ্যাস আশ্বস্ত হল কিছুটা। টম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি। ওই তো সেই সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে দুজনে ওপরের ডেকে গেল। প্রথমে হ্যাস ভেসে উঠল। তারপর টম। বাতিটি সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে দিল সে। অনেকদূর থেকেও টহলদা জল পুলিসের চোখে পড়তে পারে।

অন্ধকার রাত। লোহিত সাগরের আবহাওয়া বেশ শান্ত। মাথাব ওপব তারা ঝিকমিক কবছে। মুখোশটা তক্ষুনি খুলে ফেলে হ্যাস প্রাণভরে পৃথিবীর বাতাস নিল। আঃ। আর একটু হলেই দম আটকে মারা পড়ে যেত।

টমের সিলিণ্ডার আস্তই আছে। সেও মুখোসটা খুলে সাঁতার দিচ্ছিল। হ্যাসের কাছে এসে সে বলল—ঠিক আছে খোকাবাবু?

এখন এই অতল সমুদ্রের জলে ভেসেও রসিকতা করতে পারে টম। হ্যাস চিত হয়ে ভেসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কোন জবাব দিল না।

এবার টম বাতির সুইচ টিপে এদিক ওদিক দোলাল একবাব। এটা একটা সংকেত। একটু দূরে ডিকদের বোটটার চাপা গর্জন শোনা গেল। তারপর এসে পড়ল কাছে।

ওপর থেকে হ্যারি বলল—স্যাঙাতের খবর ভালো?

টম জবাব দিল—নতুন স্যাঙাৎ ভড়কে গেছে হ্যারি। দেখছ না, খাবি খাচ্ছে মড়ার মতন। ওকে টেনে তোল শিগ্‌গির।

হ্যাসের আঁতে ঘা লাগল। বোটের কিনারায় ভর দিয়ে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। টম জল থেকে হাত বাড়িয়ে বলল—আগে এই জিনিসটা হাতাও ব্রাদার। কিন্তু খবর্দার, ওই জার্মানটার হাতে দেবে না।

হ্যারি সেই ইটটা নিলে সাবধানে টম উঠে বসল বোটে। তারপর বলল—আগে একটা কড়া সিগ্রেট, তারপর কথাবার্তা।

হ্যারি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে তার ঠোঁটে গুঁজে দিল। ডিক তখন বোটের ড্রাইভারের জায়গায় বসে চারদিকে লক্ষ্য রেখেছে। অনেকদূরের দিগন্তে সোয়াকিন বন্দরের আলোগুলো একবার ডুবে যাচ্ছে, একবার ভেসে উঠছে। হঠাৎ ডিক চেঁচিয়ে উঠল—ও কী? কী ও?

বাকি তিনজনে ঘুরে তাকাল। উমব্রিয়ার সেই মাস্তুলটার দুপাশে দুটো নীল বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে এবং জলে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই আলো দুটোর চারপাশে আরো কয়েকটা ওইরকম ছোট ছোট শিখা দেখা গেল। সেই সঙ্গে এদের বোটের তল ফুঁসে উঠল। মনে হল, কী একটা ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক প্রাণী তলায় ভীষণ বেগে নড়াচড়া করছে।

অমনি টম রুদ্ধশ্বাসে বলল—আর একটুও নয়! শিগগির পালাও এখান থেকে ঝটপট!

বোটটার মুখ ঘুরে গেল। সেই প্রবাল দ্বীপ লক্ষ্য করে জোরে এগিয়ে চলল। হ্যাস উমব্রিয়ার দিকটায় তাকিয়ে ছিল। কেন ওইসব অদ্ভুত ব্যাপার ওখানে ঘটছে? ওই কঙ্কাল দুটোর রহস্যই বা কী? আর, ওই চাপা গর্জন, জ্যান্ত কালো পাঁচিল, জলের ভয়াবহ তোলপাড—এসবই বা কেন হচ্ছে? হ্যাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাস্তুলের দুপাশের বড় ও ছোট নীল কাঁপাকাঁপা রড-লাইটের মতন উজ্জ্বল রেখাগুোলর দিকে তাকিয়ে রইল। জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা সে কখনও ঘটতে দেখেনি কোথাও। তার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে গুলিয়ে যেতে থাকল।

মোটর বোটটা প্রবাল বলয় বা এ্যাটলের খাঁড়ি দিয়ে সাবধানে এগিয়ে সরু প্রণালীটায় ঢুকল। তারপর ভেতরে ঠিক জায়গায় থামল। ভেতরটা শান্ত হ্রদের মতন—চারিদিকে গোল পাঁচিলের মতন দ্বীপের পাহাড়।

একে একে সাবধানে উঠে গেল ওপরে। বোটটা সরু খাঁড়িতে লুকানো রইল। সবার আগে এগোল হ্যারি। তার হাতে টর্চ। হ্যাস দেখল, আগের জায়গায় গেল না এরা। সোজা পূবদিকে ঘুরে দক্ষিণ পূবদিক ঘুরে দক্ষিণ পূব কোণায় ধাপকাটা

পাথরের চাতাল বেয়ে নামতে থাকল। এবার হ্রদের প্রায় সমতলের কিছু উঁচু একটা জায়গা। দুধারে উঁচু পাথর। মধ্যে একফালি পথ চলে গেছে সুড়ঙ্গের মতন।

একটু ইতস্তত করছিল হ্যাস। পেছন ঘুরে হ্যারি বলল—চলে এসো স্যাঙাত। আমাদের নতুন ডেরা দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কে জানত এমন চমৎকার একটা গুহা ড্রিমল্যাণ্ডে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অন্তত পঞ্চাশ ষাট মিটার ঘুরে ঘুরে যাবার পর গুহার দরজায় পৌঁছল ওরা। ভেতরে আলো পড়তেই হ্যাস সত্যি অবাক হয়ে গেল। ঠিক স্বাভাবিক গুহা নয় যেন—খুব সুন্দরভাবে দেয়াল ও ছাদ খোদাই করা রয়েছে। মেঝেয় চমৎকারভাবে রিড নামে এক ধরনের নরম নলখাগড়া জাতের জলজ গাছ (হোগলার মতন) বিছোনো হয়েছে। তার ওপর কম্বল বোঁচকাবুঁচকি স্টোভ আর একটা হ্যাসাগও দেখা যাচ্ছে। তাহলে এরা দস্তুরমত একটা অভিযানেই বেরিয়েছে। তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। কয়েকটা ড্রাম আর কাঠের প্যাকিং বাকসোকে চেয়ার করে রেখেছে। টম আর হ্যারি এবার সেই ইঁটের মতো জিনিসটা হাতে নিয়ে আলোতে পরখ করতে বসল। ডিক হ্যাসাগ জ্বালতে জ্বালতে বলল—কফি খেয়ে তারপর কথাবার্তা শুরু হবে।

সেই সময় হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল—সোনা। এ যে সোনা। হিপ হিপ হুররে। যখের ধন পেয়ে গেছি আমরা।

সে কোমর দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিল। টম একটা বিদঘুটে গানও ধরে ফেললে।

ছয়
নিশির ডাক

সে রাতে টম, ডিক ও হ্যারি গুহাব মধ্যে নাচগানের হুল্লোড় বইয়ে দিল। তিনজনে সরবৎও খেল নানা রকমের। হ্যাসকেও প্রথমে সাধাসাধি করল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু হ্যাসের মেজাজ ভাল নেই। তার মাথায় কেবল ওই উমব্রিয়া রহস্য নিয়ে ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওদিকে বেচারা ওমর মেহমুদ নিশ্চয় এখন ম্যাকফারসনের পাল্লায় পড়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে, অথচ এখন হ্যাসের কিছু করার নেই।

রাত গভীর হলে খাওয়াদাওয়ায় বসল সবাই। একটা বাকসো ভর্তি প্যাক করা খাবার এনেছে টমরা। সার্ডিন মাছের কাবাব, শুওরের হৃদপিণ্ড আর কড়াইশুঁটির কারি, বড় বড় বান রুটি আর তিন-চার রকমের জেলি। হ্যাস কমই খেল। ওরা তিনটিতে নেচে নেচে ক্ষিদে বাড়িয়ে ফেলেছিল হয়তো। যা খেল, দেখে তাক লেগে গেল হ্যাসের। খাওয়া দাওয়ার পর আবার একদফা কফি বানাল ডিক। কফি খেতে খেতে ওদের একটা পরামর্শ সভা বসল।

হ্যাসাগটা কোণায় একটা বাক্সে শোঁ শোঁ করে জ্বলছে। গুহার দরজায় একটা মস্তো বড় পাথর আটকে দেওয়া হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। বাইরে বেরোলে সমুদ্রের নোনা আবহাওয়ায় কিছুটা ঠাণ্ডাভাব টের পাওয়া যাবে। বিশেষ করে এসব অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় দিনে যত গরম, রাতে তত ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু গুহার ভেতরে বেশ গরম জমেছে। আরামে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে টম শুরু করল—খোকাবাবুরা! তাহলে কথা হচ্ছে, আমরা যেখানে এখন পাকাপাকিভাবে আড্ডা গেড়েছি, এর নাম আশা করি তোমরা বুড়ো নাবিকদের কাছে শুনে থাকবে। এ সেই ষোল শতকের পর্তুগীজ জলডাকাত বা বোম্বেটেদের আবিষ্কৃত কুখ্যাত গুহা। বুড়ো নাবিকরা বংশপরম্পরায় এই আশ্চর্য গুহার গল্প বলে আসছে। কিন্তু কেউ জানে না লোহিত সাগরের কোন্ প্রবালদ্বীপে সেটা রয়েছে। এর নাম 'পাইরেটস কেভ'—জলডাকাতদের গুহা। এখানে তিনশো বছর আগে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা সমুদ্রে বাণিজ্য জাহাজ লুঠ করে এনে সব ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত। কিন্তু সেগুলো যে নির্ঘাত কেউ বা কারা কবে হাতিয়েছে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। কারণ, আমরা কদিন আগে একটা মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজতে খুঁজতে যখন দৈবাৎ এর খোঁজ পেলুম, তখনই মেঝে খুঁড়ে এফোঁড় ওফোঁড় করেছিলুম। দেয়াল, কোনো তাক, খাঁজগুলো কোথাও তল্লাসী চালাতে বাকী রাখিনি। কিন্তু আমাদের পোড়াকপাল, একটুকরো ঝুটো মণিমুক্তোও জোটেনি। তখন অগত্যা আবার সব ঠিকঠাক করে নিয়েছি। এখন আমার বক্তব্য হল—'পাইরেটস কেভ' নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই, উমব্রিয়া জাহাজটাই আমাদের লক্ষ্য। এই যে সোনার ইঁটটা আজ আমি আর আমাদের নতুন খোকা উমব্রিয়া থেকে হাতিয়ে এনেছি সেটাই বড় প্রমাণ যে এক সিন্দুক ভর্তি সোনার ইঁট ছাড়াও উমব্রিয়াতে আরো অজ্ঞাত ধনরত্ন আছে। কিন্তু তা হাতাতে হলে মারাত্মক ভুতুড়ে কাণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। আমাদের নতুন খোকাও করে না। অতএব.............

বাধা দিয়ে হ্যারি বলল—বেশ তো! তোমরা দুজনেই উমব্রিয়া থেকে কিছু কিছু করে মাল নিয়ে আসবে। আমার আর ডিকের কোন আপত্তি নেই। কী বলো হে ডিক?

ডিক সায় দিয়ে বলল—মোটেই না। আমরা দুজন বোটে চাপিয়ে তোমাদের পৌঁছে দেব। বন্দুক বাগিয়ে পাহারা দেব। আর শয়তান ম্যাকফারসনের চেলাদের দেখলেই মাথা ফুটো করব। তারপর......................

কথা কেড়ে হ্যারি বলল—তারপর তোমাদের নিয়ে ফিরে আসব। ব্যস!

ডিক বলল—শুধু তোমাদের নিয়ে নয়, সোনার ইঁট নিয়ে।

হ্যারি মাথা দুলিয়ে বলল—আলবাৎ, আলবাৎ।

ডিক আড়মোড়া ভেঙে বলল—তাহলে ওঠ স্যাঙাতরা। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। বলে সত্যিসত্যি ঝোঁকের মাথায় সে উঠে দাঁড়িয়ে শার্টের ওপর একটা অয়েলস্কিনের হাতকাটা চড়াতে থাকল।

টম এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার হঠাৎ বেমক্কা গর্জে বলল— এ্যাই ডিক! এসব পাগলামির সময় এখন নয়। চুপচাপ বসে শোন, যা বলছি।

ডিক তখুনি কেঁচোর মতন গুটিয়ে বসে পড়ল। বোঝা গেল টমই দলপতি এবং ওকে ডিক আর হ্যারি প্রচণ্ড ভয় পায়। হ্যারিও হাত-পা ছড়িয়ে একটা চুরুট বের করে ধরালো। চোখ বুজে টান দিতে থাকল চুরুটটায়। কড়া ঝাঁঝাল গন্ধে গুহা ভরে গেল। এই সময় হ্যাস হাই তুলে বলল—হুঁ। যা বলার শিগগিরি বলে ফেলো ভাই টম। আমি ভীষণ ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে আমার।

টম লোকট বড্ড নোংরা দেখা গেল। সে সামনের দেয়ালের দিকে থুথু ছুঁড়ে মারল। তারপর বলল—কথাটা যেজন্য বলতে শুরু করেছিলুম, সবাই মন দিয়ে শোন। উমব্রিয়া জাহাজের কেবিনে আপাতত আমরা এক সিন্ধুক সোনার ইঁটের খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু ওই ইঁট আনার বিপদও খুব তুচ্ছ করার মতন নয়। জানিনা, এবার ফের হানা দিলে আবার কী সাংঘাতিক বিপদের মুখোমুখি আমাদের পড়তে হবে। মুশকিল হচ্ছে কী, সেই বিপদের মোকাবিলা করব কীভাবে সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না।

ডিক ঘোঁত ঘোঁত করে বলল—বিপদটা কিসের? শুধু তো নীল আলো!

টম তেড়ে গেল।—তখন বললুম কীসব? এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

হ্যারি বলল—ওর মাথায় গোবর পোবা। শোন, আমি বলে দিচ্ছি। বিপদ হচ্ছে সেই একই বিপদ—যা আমারা এ্যাদ্দিন ধরে এলাকার জেলে আর নাবিকদের কাছে শুনে আসছি। অর্থাৎ কি না জ্যান্ত মাস্তুল, জ্যান্ত কঙ্কাল, ক্ষুধার্ত হাঙর আর বারাকুদা মাছ এবং জলের প্রচণ্ড তোলপাড়।

টম সায় দিয়ে বলল—ঠিক, ঠিক। হ্যারিটার স্মরণশক্তি খুব তেজী। তা বন্ধুগণ, এইসব বিতিকিচ্ছিরি বিপদের মধ্যে থেকে আমি আর এই নতুন খোকাটি সোনার ইঁট নিয়ে আসব। আমাদের দুজনের প্রত্যেকের বখরা তাহলে তোমাদের দুজনের ডবল হওয়া উচিত। কী বলো নতুন খোকা?

হ্যাসের এসব বকবকানি একটুও ভাল লাগছিল না। তার ঘুম পাচ্ছিল। সে মাথাটা নেড়ে শুধু সায় দিল।

ডিক কুতকুতে চোখে দলপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল—বেশ তাবপর?

টম হ্যারিকে বলল—হ্যারি, তোমার কথাটা বলো তাহলে?

হ্যারি আঙুল গুনে কী হিসেব করে বলল—তার মানে আমরা দুজনে যদি একটা করে দুটো সোনার ইঁট পাই, তুমি পাবে একা চারটে আর ওই জার্মান স্যাঙাতটাও পাবে চারটে। এই তো?

টম গম্ভীরমুখে বলল—হ্যাঁ।

ডিক বলল—তাহলে দশটা ইঁটের আটটা তোমাদের আর মোটে দুটো আমাদের।

টম আবার বলল, হ্যাঁ।

তখন ডিক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ওতে আমি রাজি নই। আমার বোট আমি নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। আসবার সময় তো এসব কথা হয়নি ভাই টম।

হ্যারিও উঠল। বলল—আমিও তাতে রাজি নই। ভাই টম, ওই ডুবুরীর জিনিসপত্র সব আমি নগদ টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে দিয়েছিলুম। এবার ফেরত দাও। লক্ষ্মীছেলের মতন আমিও ডিকের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাই।

হ্যাস চোখ বুজে সব শুনছিল। এবার চোখ দুটো একটু ফাঁক করতেই সে দেখল, টম চোখ টিপে কী একটা ইশারা করছে দুজনকে। ইশারাটা লক্ষ্য করে ডিক আর হ্যারি ফের বসে পড়ল। অমনি হ্যাসের মনে একটা দারুণ সন্দেহ হল। এরা নিশ্চয় ভেবেছে, হ্যাসও তাদের মতন নিছক ধনরত্নের লোভে উমব্রিয়ায় হানা দিতে এসেছে। অতএব সোনাদানার ভাগ সে ছাড়বে না এবং ভাগ নেওয়ার পর তাকে ওরা হয়তো মেরে ফেলবে। টম চোখ ইশারা করে ওদের যেন একথাটাই বলল।

হ্যাস একটু হেসে চোখ খুলল। তারপর বলল—কী হল? সব চুপচাপ যে?

হ্যারি বলল—চুপচাপ থাকবো না তো কি করব? বখরার হিসেবটা শুনলে তো হে নতুন স্যাঙাত! এতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় না?

ডিক বলল—আলবাৎ!

টম কী বলতে যাচ্ছিল, হ্যাস বলল—দেখ ভাই, তোমরা সবাই একটা মস্ত ভুল করছ। আজ বিকালে তোমরা যখন আমাকে জল থেকে উদ্ধার করলে, তখনও বলেছি—এখনও বলছি, উমব্রিয়ার সোনাদানার প্রতি আমার একটুও লোভ নেই। আমি এসেছি শুধু উমব্রিয়ার রহস্য ফাঁস করতে। ওই কঙ্কাল দুটোই বা অমন করে ঘুরে বেড়ায় কেন, মাস্তুলের জলের ওপর নাচানাচির কারণ কী, ওই কালো রঙের তোলপাড় করা স্রোতটা কোত্থেকে আসে, আর অমন গর্জনই বা কিসের—এগুলো জানা ছাড়া আর আমার কোন উদ্দেশ্যই নেই। কাজেই তোমরা আশ্বস্ত হয়ে ঘুমোও। আমার ভাগের ইঁট আমি ডিক আর হ্যারিকেই দেব। তাহলে হবে তো?

ডিক হ্যারি খুশি হয়ে বলল—খুব ভাল বখরা। হিপ্ হিপ্ হুররে।

টম হিসেব করে বলল—তাহলে আমি একা চারটে ইঁট, আর ডিক ও হ্যারি তিনটে করে ইঁট। তা মন্দ কী! ঠিক আছে—এবার তাহলে হ্যাসাগটা নিভিয়ে শুয়ে পড়া যাক। রাত দেখছি দুটো পনের হয়ে গেল। আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ি। কাল আবার দেখা যাবে, কখন হানা দেওয়ার সুবিধে হয়।

ওরা ঝটপট চামড়ার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হ্যাসাগটাও নিভিয়ে দিল। হ্যাসকে একটা অয়েলপেপার দেওয়া হয়েছিল। সে তাই বিছিয়ে শুল। গুহার ভেতর ঘন অন্ধকার ভরে গেল।

হ্যাস এই লোক তিনটের কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়েছে। এরা বিশেষ লেখাপড়া জানে বলে মনে হয় না। তাই খুব একটা ঘোরপ্যাঁচ জানে না। খানিকটা সরলতা আছে বলেই মনে হচ্ছে। তবে এদের সেজন্যই বিশ্বাস করা কঠিন। ঝোঁকের বশে এরা মানুষ খুন করতে একটুও ইতঃস্তত করবে না। খুব সাবধানে এদের মন বুঝে তাকে চলতে হবে।

বিশেষ করে টমকে সাহসী বেপরোয়া মানুষ হিসেবে তার ভালই লেগেছে। এমন একজন গোঁয়ার লোক সঙ্গে থাকলে উমব্রিয়ার সব রহস্য ফাঁস করা খানিকটা সহজ হতে পারে। টম জ্যান্ত কঙ্কাল দেখেও ভয় পায় নি। হ্যাঁ, টমকে তার চাই। আগামীকাল সকালে যদি আবহাওয়া ভাল থাকে এবং জল পুলিশের বোট না দেখা যায়, তাহলে আবার হানা দিতে যাবে উমব্রিয়ায়।..........

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল হ্যাস। হঠাৎ কী একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। গুহার ভেতর আঁশটে গন্ধ বরাবর টের পেয়েছিল সে। এখন মনে হল, গন্ধটা খুব বেড়ে গেছে। আর কী ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দম আটকে আসে যেন। একবার বাইরে বেরোতে পারলে যেন স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া যেত। সে হাতের ঘড়িতে রেডিয়াম দেওয়া কাঁটাদুটো দেখল। মাত্র একঘন্টা ঘুমিয়েছে তাহলে। এখন রাত সওয়া তিনটে। ফোঁস ফোঁস ঘড় ঘড় করে তিনটে নাক ডাকছে। কিন্তু শব্দটা কিসের সে বুঝতে পারল না। তাহলে কি স্বপ্নের ব্যাপার?

সে ফের ঘুমোবার চেষ্টা করল। আর তখনই মনে হল, গুহার দাজার দিকে একটা চাপা খসখস শব্দ হচ্ছে। তারপরই বেশ জোরে ওদিকে বাইরে কোথাও একটা ভারী পাথর পড়ল যেন। হ্যাঁ, জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তখন এই রকম শব্দেরই রেশ শুনেছিল। পাথর পড়েই থামেনি, একটু গড়িয়ে গেল যেন। তারপর ফের চুপচাপ। খসখস শব্দটাও আর নেই।

হ্যাসের খুব অশ্বস্তি হচ্ছিল। গুহার দরজার বাইরে যে কেউ বা কিছু এসেছে এবং আটকে দেওয়া প্রকাণ্ড ভারি পাথরটা টানাটানি করতে গিয়েই কোথাও

আলগা একটা পাথর পড়েছে, এতে কোন ভুল নেই। যে এসেছে, তাকে শত্রু ছাড়া বন্ধু ভাবার কোন কারণ নেই।

সাবধানে নিঃশব্দে হ্যাস উঠল। তারপর টমের গায়ে হাত রেখে একটু ঠেলল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। আরও খানিকটা ঠেলাঠেলি করেও নাক ডাকা বন্ধ হল না টমের। ব্যাটা শরবতের নেশায় কাহিল হয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে সন্দেহ নেই। এখন কানের কাছে ঢাক বাজলেও ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না।

তখন ডিকের কাছে গেল সে। ডিকের অবস্থাও তাই। একেবারে মড়ার মতন ঘুমোচ্ছে সে।

হ্যাস অন্ধকারে হাতড়ে তার ওপাশে হ্যারির কাছে গেল। এবার ওর মাথার কাছে একটা টর্চ পেল সে। টর্চটা সাবধানে মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে জ্বেলে দেখল, ব্যাটারি টাটকা আছে। হ্যারিকেও ওঠানো গেল না। তিনটির অবস্থা একেবারে সমান। অত অস্বস্তির মধ্যেও হ্যাসের হাসি পেল। এই ঘুম নিয়ে ব্যাটারা এসেছে সোনাদানা হাতাতে।

আস্তে আস্তে টমের কাছে এসে সে তার মাথার কাছে হাতড়ে বেঢপ সেই পিস্তলটা নিল। এটা জলের তলায় গুলিছোঁড়ার পিস্তল নয়। হ্যাস পরীক্ষা করে দেখল, এ পিস্তলটা অটোমেটিক। গুলিও ভরা আছে পাঁচটা। তখন সে ওটা বাঁহাতে নিয়ে ডানহাতে টর্চটা ধরে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল। টর্চ জ্বললে পাছে সেই নিশীথ রাতের আগন্তুক পালিয়ে যায়, তাই জ্বালাল না।

দরজাব মাথায় ফাঁক রয়েছে । সেখানে আকাশের নক্ষত্রজ্বলা একটুখানি চোখে পড়ছে। দরজাটা মাত্র সাড়ে পাঁচফুট উঁচু। কাজেই হ্যাসের ওর ফোকরে চোখ রাখতে অসুবিধে হল না। বাইরে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। দুধারে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গের মতন পথ আর উঁচু পাথরের দেওয়াল, ওপরে ছাদ নেই এই যা। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর দৃষ্টি স্বচ্ছ হল।

সেই সময় হ্যাস দেখল, কী একটা উঁচু প্রকাণ্ড মানুষের মতন মূর্তি আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গপথটার বাঁকের দিকে চলে গেল।

এখন সমস্যা এই দরজার পাথরটা সরানো। তখন চারজনে টানাটানি করে আটকেছে। এখন একা ওটা সরানো নিশ্চয় অসম্ভব হবে তার পক্ষে। তবু হ্যাস একটা দিক ধরে ঠেলে ফাঁক করার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর একটু ফাঁকা হল। তার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে সেঁদেল চোরেদের কৌশলে সে বেরিয়ে গেল। বাইরের বাতাসে দম নিতে পেরে তার বুকে জোর এসে গেল তক্ষুনি। সে সুড়ঙ্গ পথের একধারে দেয়াল ঘেঁষে পা

টিপেটিপে এগোলো। প্রথম বাঁকটা অব্দি গিয়ে সামনে তাকাল। এখন অন্ধকারেও তার দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। দ্বিতীয় বাঁক অব্দি পুরো পথটা একেবারে ফাঁকা। সেই মূর্তিটা নেই। হ্যাস দ্বিতীয় বাঁকে হাজির হল।

এইভাবে অবশেষে প্রবাল হ্রদের ধারে গিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই বিকট প্রাণীটার কোন পাত্তা পেল না। সে পাথরের খাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকল এবার কী করা উচিত? একটা মানুষের মতন প্রাণীর মূর্তি সে দেখেছে, তাতে কোন ভুল নেই। এত ছোট্ট একটা প্রবাল হ্রদের চারদিক গোলাকার পাঁচিলের মতন অ্যাটাল বা বলয়দ্বীপে, সে মানুষ হোক আর কোন অদ্ভুত প্রাণী হোক, কিছুতেই হারিয়ে যেতে পারে না।

হ্যাস মরীয়া হয়ে উঠল। হাতে জোরালো টর্চ আর এমন চমৎকার পিস্তল থাকতে তার আত্মরক্ষা করা তেমন সমস্যা নয়।

হঠাৎ হ্যাসের চোখ গেল উত্তর পূর্ব কোণে উঁচু পাথরের পাঁচিলের দিকে। কী একটা যেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাস টের পেত না, যদি লোকটা আকাশের সঙ্গে না মিশে থাকত। কারণ, তার নড়াচড়ায় আকাশের তারা ঢাকা পড়ছিল মাঝে মাঝে। এতদূর থেকে টর্চের আলো ফেলা ঠিক মনে করল না সে। চুপিচুপি ঢালু পাড় বেয়ে পাথরের পাঁচিলের দিকে উঠতে থাকল।

হ্রদের ধার থেকে শক্ত মাটি আর পাথরের ছোটছোট টিলা উঁচু হয়ে রয়েছে। তার ওপাশে নিচে সমুদ্র। এই গোলাকার দ্বীপটা একেবারে ন্যাড়া। গাছ কেন, এক চিলতে ঘাসও গজায় না এখানে। তাই চোখের দৃষ্টি অনেকটা দূর অব্দি চলে।

মূর্তিটা এদিকে পিছু ফিরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। পা টিপে টিপে তার আন্দাজ পনের মিটার দূরে গিয়েই টর্চের বোতাম টিপল হ্যাস। জোরালো আলো পড়ল মূর্তিটার গায়ে।

অমনি মূর্তিটা ঘুরল।

আলোয় তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাস এমন হতচকিত আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে পড়েছিল যে কয়েক মুহূর্ত তার যেন একটুও সম্বিৎ ছিল না। ও কি মানুষ?

মূর্তিটার কাঁধের ওপর থেকে ছেঁড়া কিছু ন্যাকড়ার মতন কী ঝুলছে, বাকিটা সবই উলঙ্গ। সারা গায়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম। চোখদুটো হিংস্র, নীল, জ্বলজ্বলে। বড় বড় এলোমেলো চুল রয়েছে মাথায়। তার হাতদুটো অস্বাভাবিক লম্বা। একটা হাতে অন্তত দশ পনের কিলো ওজনের একটা পাথর রয়েছে।

প্রথমে পাথরটা হ্যাসের দিকে ছুঁড়ে মারল সে হ্যাসের বরাত জোর, সেটা ডানপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। টর্চটা এইসময় নিভে গেল।

ফের টর্চ জ্বেলে পিস্তল তাক করে সে দেখল মূর্তিটা নেই। একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিক ওদিক আলো ফেলেও আর তাকে দেখতে পেল না সে। তখন তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। এমন বিভীষিকার সঙ্গে জীবনে কোথাও তার পরিচয় হয়নি।

হ্যাস আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। যে পথে উঠেছিল, আছাড় খেতে খেতে কোনরকমে নেমে এল। তারপরা সুড়ঙ্গ পথে এসে দৌড়তে শুরু করল।

পাথরের দরজার সেই ফাঁকটা দিয়ে সে ঢুকতেই এবার টমের ঘুম-জড়ানো গলায় সাড়া পেল।—কে রে? কে রে? কে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে? তিন গোনার মধ্যে জবাব না দিলে গুলি ছুঁড়ব।...........এ্যাঁ। আমার পিস্তল কে নিল? এ্যাই হ্যারি! ডিক! নতুন স্যাঙাত আমার পিস্তল চুরি করে ভেগেছে। ওঠ্ ওঠ্ তোরা! হ্যারি, আলো জ্বালতো।

হ্যারি জড়ানো গলায় বলল—টর্চটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ডিকও উঠে পড়ল। চেঁচামেচি করে বলল—কে ঢুকেছে রে? মার্, মার্! মেরে শেষ করে দে ব্যাটাকে। আগে ওর ঠ্যাঙটা ধরে ফেলো হে বড় খোকা, দেখবে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

হ্যাস তিন মাতালের কাণ্ড দেখে বোকা বনে গিয়েছিল। এবার টর্চ জ্বেলে ধমক দিয়ে বলল—চুপ, সব চুপ। শোন, সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল এদিকে—আর তোমরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

টম এবার ধীরে সুস্থে একটি হাই তুলে বলল—ও, তুমি। কী হয়েছে?

হ্যারি দেশলাইটা জ্বেলে সিগ্রেট ধরাল। ডিক ফের শুয়ে পড়ে কাত হল। তারপর বলল—আলো নেভাও হে স্যাঙাত। ঘুমের সময় কী জ্বালাতন করো, ভাল্লাগেনা।

হ্যাস টর্চটা নিভিয়ে টমের পাশে গেল। চাপা গলায় বলল—ড্রিমল্যাণ্ডে আমরা ছাড়াও আরো এক একজন আছে। সে মানুষ না কী, জানিনা। একটু আগে সে দরজার পাথর সরাচ্ছিল। তখন তোমাদের টর্চ আর পিস্তল নিয়ে তাকে তাড়া করলুম।

টম চমকে উঠে বললে—কী বললে? মানুষ না কী!

—হ্যাঁ। মানুষের অমন ভয়ঙ্কর চেহারা হতে পারে না।

—তাই বটে। তারপর কী হল, বলে যাও।

—সে আমার দিকে পাথর ছুঁড়েছিল।

—তোমার গায়ে নিশ্চয় লাগেনি?

—লাগেনি।

টম খুব গম্ভীর হয়ে বলল—ওহে স্যাঙাতরা তাহলে ড্রিমল্যাণ্ডে যে নিশিতে এসে ডাকে শুনেছিলুম, তা দেখছি সত্যি। নতুন খোকাকে নিশিতেই ডেকেছিল।

ডিক বিছানা থেকে একটুখানি গা তুলে বলল—নিশি? মানে সেই উমব্রিয়ার ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ভূতটা তো? ছেড়ে দাও। বেনজেল্লোর ভূতকে তো আজ অব্দি কারো ঘাড় মটকাতে শুনিনি। তবে মাঝিমাল্লা বা জেলেরা বিপদে পড়ে আশ্রয় নিলে নাকি শুধু দেখাটা দেয়।

টম বলল—দরজাটা ভালো করে আটকে দেওয়া যাক্। ড্রিমল্যাণ্ড দেখছি তাজ্জব জায়গা।

সাত

ভূত না, গুহামানুষ?

তখন সবাল আটটা। কেরোসিন স্টোভ জ্বেলে ডিক ও হ্যারি ব্রেকফাস্ট আর কফির জোগাড় করতে ব্যস্ত রয়েছে। টম তার দূরবীণটা নিয়ে বেরোল। হ্যাসকেও ডাকল সে। —এস হে স্যাঙাত, ঝটপট একবার পশ্চিম দরিয়া উমব্রিয়ার তল্লাটটা দেখে আসি। শয়তান ম্যাকফারসনের দল আনাচে-কানাচে না থাকলে এবেলা আবার হানা দেব।

হ্যাসও তার সঙ্গে বের হল। সুড়ঙ্গ পথটা পেরিয়ে গিয়ে হ্রদের বাঁদিকের পাড়ে উঠল টম। তখন হ্যাস বলল—ভাই টম, তুমি গিয়ে বসো। আমি একবার এদিকটা তল্লাস করে আসি।

টম চোখ পাকিয়ে বলল—ওদিকে কী আছে, শুনি?

—ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ভূতটা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। দেখে আসি, পাথরটা সত্যিকারের পাথর, নাকি ওটাও ভূত! বলে হ্যাস নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।

টম আমুদে মানুষ। সেও হো হো করে হাসল বটে, কিন্তু পরক্ষণে চোখ নাচিয়ে হুঁসিয়ারি দিল—কিন্তু খবর্দার খোকা, এখানে আমাদের আতিথ্য থেকে কেটে পড়ার মতলব করো না। পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। যদি বা অব্যর্থসন্ধানী ডিকের গুলির হাত থেকে, দৈবাৎ মাথাটা বাঁচাও, সমুদ্রের হাঙর আর বারাকুদার ঝাঁক তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

হ্যাস ভুরু কুঁচকে বলল—আমি কি তোমাদের হাতে কয়েদী নাকি?

টম জবাব দিল—তোমাকে আমরা সহজে ছাড়তে চাই না। তুমি একজন

পাকা ডুবুরী যে। দলে আমি ছাড়া আর ডুবুরি নেই। কাজেই তোমাকে আমাদের খুব দরকার হবে।

হ্যাস একটু রেগে গেল। বলল—আমাকে গায়ের জোরে আটকে রাখতে পারবে ভেবো না টম। আমার বোট এসে গেলে কিন্তু আমি তোমাদের ছেড়ে যাব।

টম রাগল না মোটেও। হেসে বলল—সে আশা আর কোরো না, চাঁদ। জলপুলিশের কর্তাটিকে তুমি চেনো না! তোমার বোট এতক্ষণ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আমাদের কমন্স সভায় দরবার করতে পারলে ফেরত পেতে পারো—তার আগে নয়। তবে কমন্সসভার লর্ডরা সবাই জার্মানদের ওপর রেগে আছেন। আর, যদি ভাবো দরিয়া সাঁতরে পালাবে, চেষ্টা করে দেখ। তুমি জার্মান কি না, সখের ডুবুরি হয়েছো—কিন্তু সমুদ্রের খবর বিশেষ রাখোনা। তোমাদের দেশে সমুদ্রই নেই। আর আমরা ইংরেজ, বাস করি দ্বীপে।

টম বকবক করে সমানে নিজেদের বড়াই শুরু করল। হ্যাস আর দাঁড়াল না ওর কাছে। উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তর-পূর্বে খাড়াইয়ের দিকে এগোলো। টম হাসতে হাসতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার প্রণালীটার দিকে চলল।

হ্যাস ভাবল, টমরা হয়তো ভুল বলেনি। ড্রিমল্যাণ্ড থেকে সাঁতার কেটে চলে যাবার বিপদ আছে। প্রচণ্ড হাঙর আর হিংস্র বারাকুদা মাছ ছাড়াও এইসব দরিয়ায় বিষাক্ত সাপের সংখ্যা বড় কম নয়।

রাতের সেই জায়গাটা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারল না সে। মুশকিল হচ্ছে, দ্বীপটায় কোন উদ্ভিদ নেই—পুরো ন্যাড়া। তাই সব জায়গায় একইরকম লাগছে। সে বড় বড় পাথর আর প্রবালকীটের তৈরি শক্ত সব পাঁচিল ও চাঙড় পেরিয়ে অনেকটা এগোল। এবার টের পেল, এই দ্বীপে যা সে মাটি বলে মনে করছে, তা মোটেও মাটি নয়। প্রবালকীটের দেহ জমে এরকম হয়েছে। তাই এখনও কোন ঘাস বা উদ্ভিদ গজাচ্ছে না। তবে দূর ভবিষ্যতে প্রকৃতির নিয়মে এই দ্বীপের অনেকটাই মাটি হয়ে উঠতে পারে—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সেটাই খুব স্বাভাবিক হবে এবং তখন প্রাণের জন্ম সম্ভব হবে।

একেবারে পূবের শেষপ্রান্তে উঁচু জায়গাটায় উঠে সে দেখল, নিচে খাড়া হয়ে নেমেছে পাহাড়টা এবং সমুদ্রের জল সশব্দে আছড়ে পড়ছে। এদিকটায় সমুদ্র বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছিল। আর একটা ব্যাপার, এই দ্বীপে কোন গাছপালা বা উদ্ভিদের চিহ্ন নেই—কিন্তু পাখি আছে। ছোট ছোট পাহাড় আর পাঁচিলের গড়নে তৈরি শুকনো খটখটে জায়গায় অজস্র পাখির গর্ত। এসব পাখিরা সবাই সমুদ্রচর। অজস্র সি-গাল বা সমুদ্র শকুন চুপচাপ এখানে ওখানে মাছের বা মরা সামুদ্রিক জন্তু ভেসে ওঠার আশায় বসে রয়েছে। শঙ্খচিলগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নিচের খাড়ির জলে ছোঁ

দিচ্ছে এবং উড়ে বেড়াচ্ছে। এ্যালবাট্রেসও দেখা গেল অনেক। এইসব পাখির চিৎকারে তুমুল হট্টগোল হচ্ছে এদিকটায়।

হ্যাস সাবধানে পা ফেলে উত্তর বরাবর এগোল। কিছুটা যাওয়ার পর সে দেখল, সমুদ্রের একটা ফালি মতো লম্বাটে অংশ দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে— যেন কোন আদিম যুগে সমুদ্র একবার জিভ বাড়িয়ে দ্বীপটাকে চাটতে শুরু করেছিল, এখনও তাই করে যাচ্ছে।

নিচেটা দেখতে বাধা পাচ্ছিল সে—একটা বড় পাথরের চাতাল চাঁদের মতন ঝুঁকে রয়েছে। প্রবালকীটগুলো কোন যুগে এইসব ডুবো পাথরের গায়েই ঝাঁক বেঁধে ছিল এবং দ্বীপটা গড়ে ওঠার পর সেই পাথরগুলো উঁচুতে উঠে আসার কারণ হয়তো ভূমিকম্প কিংবা ভূগর্ভের লুকানো কোন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ।

পাথরের চাতালটায় লাফিয়ে পড়ে সে উপুড় হয়ে শুল। তারপর নিচে তাকাল। না শুলে পড়ে যাবার চান্স ছিল।

লম্বাটে খাড়িটা বেশি চওড়া নয়, কিন্তু গভীর মনে হল। জল সেখানে শান্ত। পরক্ষণে হ্যাস চমকে উঠল। পূবের সূর্য সোজাসুজি রোদ ছড়াচ্ছে খাঁড়িতে। তাই দুধারের ছোট্ট নুড়িগুলোও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমন কি নুড়ির তলায় কোন পোকাও নজরে পড়ছে। হ্যাস হতভম্ব হয়ে দেখল, রাতের সেই বিকট মূর্তিটাই বটে, একটা পাথর ছুঁড়ে মারল জলে। তারপর হুড়মুড় করে নেবে গেল।

এবার তার হাতে বেশ বড় একটা মাছ দেখতে পেল হ্যাস। মাছটা হাতে নিয়েই সে ঘুরল। তখন হ্যাসের বুক টিপটিপ করে উঠল। কী জ্বলজ্বলে নীল ওর চোখ দুটো। প্রাণীটা মানুষের মতো—অথচ কিছুতেই মানুষ নয়। হ্যাস দ্বিতীয়বার চমকে উঠল। তবে কি এই দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন-মানুষ এখনও টিকে রয়েছে? তা যদি হয়, তাহলে তো এক আশ্চর্য আবিষ্কারের গৌরব সে পাবে।

কিন্তু সভ্যজগতের নাকের ডগায় এমন একটা বলয়-দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক বানর-মানুষ বা বনমানুষ থাকা কেমন করে সম্ভব হল?

সে অবাক হয়ে এসব ভাবতে ভাবতে প্রাণীটিকে দেখছে, সেই সময় আচমকা প্রাণীটা মুখ তুলে ওপরে তাকাল। তারপর কয়েকটি লাফ মেরে নিচের দিকে কোথায় অদৃশ্য হল।

হ্যাসের সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। হারপুনটাও 'পাইরেটস্ কেভে' ফেলে এসেছে। সে গত সন্ধ্যা থেকে শুধু জাঙিয়া পরে খালি গায়েই কাটাচ্ছে—কারণ ওমরদের বোট থেকে ওই অবস্থাতেই জলে নেমেছিল। গুহায় ওরা তাকে একটা পাতলুন দিতে চেয়েছিল, হ্যাস পরে নি। লোকগুলো বড্ড নোংরা। আর পাতলুনটাতেও বিচ্ছিরি গন্ধ।

সে একবার ভাবল, বনমানুষটার খোঁজে নিচে নামবে—পরে ভাবল, বরং হ্যারিদের ডেকে নিয়ে আসাই নিরাপদ হবে।

সেই সময় তার মাথার ওপর দিয়ে নিচে থেকে একটা পাথর শাঁ শাঁ করে চলে গেল এবং কিছুটা পেছনে গিয়ে পড়ল। তারপর আবার একটা পাথর এল। হ্যাস বিপদে পড়ে গেল। বনমানুষটা তাকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে। ওই পাথর এসে লাগলে মৃত্যু অনিবার্য।

হ্যাস বুকে হেঁটে খাঁজের আড়ালে পিছিয়ে আসতে থাকল। কিন্তু একের পর এক পাথর পড়ার বিরাম নেই। বোঝা যাচ্ছে, ওই বনমানুষটার দেহে প্রচণ্ড শক্তি আছে। খুব সহজে দশ-পনেরো কিলো ওজনের পাথর সে এই একশো ফুট উঁচুতে ছুঁড়ে মারতে পারছে।

একটু পরে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হল। তখন হ্যাস সাবধানে যে পথে উঠে এসেছিল, সেই পথেই নামতে শুরু করল। খুব তাড়াতাড়ি নামছিল সে। এর ফলে হ্রদের কিনারায় খাড়া বেয়ে ওঠা একটা দেয়াল থেকে পা ফস্কে সে একেবারে তিরিশ ফুট নিচে হ্রদের জলে পড়ল।

তৈরি ছিল না বলে পিঠে জলের ঝাপটানিটা জোর লাগল। তবে সে ডুবুরি এবং একজন সত্যিকারের জলমানুষ। ওতে তার কিছু ক্ষতি হবার নয়। সাঁতার কেটে তরতর করে এগিয়ে চলল নিচু পাড়ের দিকে।

পাড়ে ওঠার সময় হঠাৎ দেখল তার সামনে একটা হাত এগিয়ে আসছে। চমকে উঠেছিল—কিন্তু হাতটা তখনই চিনল সে উল্কি আঁকা হাতটা টমেরই। টম উপুড় হয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। তার দুচোখে মিটিমিটি হাসি।—চলে এস খোকাবাবু। মনে হচ্ছে, বেজায় ভয় পেয়ে জলে মরণঝাঁপ দিয়েছিলে। তাই না?

টমকে এই মুহূর্তে খুব ভাল লেগে গেল হ্যাসের। ওর হাতটা ধরে ফেলল সে।

ওপরে ওঠার পর টম তাকে বলল—কী স্যাঙাত। আবার ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ভূত দেখে ভড়কে গিয়েছিলে নাকি?

হ্যাস ওর কৌতুকে হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল—দেখ টম, ভূত কি না জানি না, তবে একটা বিকট প্রাণী সত্যি দেখেছি। গতরাত্রে ওটাই এসে আমাদের গুহার পাথর সরাতে চেষ্টা করছিল। এইমাত্র সেটাকে দেখতে পেলুম, উত্তর-পূর্ব কোণের খাঁড়িতে পাথর ছুঁড়ে মাছ মারল। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়তে শুরু করল।

টম এখন নেশা করে ফিরে অবাক হয়ে বলল—বল কি? তাহলে তো সবাই মিলে দ্বীপটাকে চষে ফেলতে হয়। আচ্ছা ভায়া,"কী রকম প্রাণী? কটা ঠ্যাং, কটা হাত, কিসের মতো দেখতে?

—মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ যে নয় তা হলফ করে বলতে পারি।

—হুম! আমাদের কাছে অস্ত্র বলতে এখন তিনটে। এক নম্বর হচ্ছে জল বন্দুকটা, দুনম্বর আমার এই পাঁচঘরা অটোমেটিক পিস্তল, তিননম্বর হ্যারির একটা দূরপাল্লায় গুলিছোঁড়ার রাইফেল। ঠিক আছে। চলো তো, ওদের সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। দাড়িওয়ালা হ্যারিটার মাথা এবসব ব্যাপারে খুব খুলবে মনে হচ্ছে। ও স্কুলে তিন বছর পড়ে ছিল কিনা।

দুজনে কথা বলতে বলতে গুহায় ফিরল। দেখল, ডিক আর হ্যারি ব্রেকফাস্টের জন্য ওদের অপেক্ষা করছে। এদের দেখে হ্যারি ধমক দিয়ে বলল—অতক্ষণ ধরে কফির জল চড়ানো থাকলে জলের স্টক ফুরিয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। দু-পিপে জলের মধ্যে এখন মাত্র দেড়পিপে আছে।

ডিক বলল, ফুরোক না। বোট নিয়ে চলে যাব সটান সোয়াকিন বন্দরে। মিঠে জলের কুয়োর মালিক আমার শাশুড়ীর দূরসম্পর্কের মাসতুতো দাদার ভাইয়ের নাতি। ভেবো না।

টম বসে বলল, ইয়ার্কি ছাড়ো এখন। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমরা কনফারেন্সে বসব। ব্যাপার খুব জটিল হয়ে উঠেছে।

হ্যারি কৌতুহলী হয়ে বলল—কী হয়েছে আবার সুদান সরকার ডুবুরির দল পাঠিয়েছে নাকি? তাহলে ড্রিমল্যাণ্ডের পাঁচিল থেকে রাইফেলের গুলিতে ব্যাটাদের মুণ্ডু ফুটো করে দিতে হয়।

টম ধমকাল।—চুপ করো তো। শোন ডিক, কফি তৈরি করতে করতে শুনে যাও। আমাদের নতুন খোকা আবার ভূত কিংবা কী একটা প্রাণীর পাল্লায় পড়েছিল। আমরা সেটা খুঁজতে বেরুব। কারণ, সেটাকে নিকেশ না করলে এখানে থাকাই দায় হবে। গতরাতে সে দরজার পাথর সরাচ্ছিল। সরাতে পারলে ঘুমন্ত অবস্থায় সব্বাইকে মেরে রেখে যেত। এদিকে, আমাদের এখন কতদিন থাকতে হবে, কিচ্ছু ঠিক নেই। সারাক্ষণ আতঙ্ক নিয়ে বাস করা যায় নাকি?

হ্যারি বলল—প্রাণীটা কেমন?

টম বলল—মলো চ্ছাই। আমি দেখেছি নাকি? দেখেছে আমাদের স্যাঙাত।

কোণা থেকে ডিক বলল—জার্মানরা বড্ড মিছে কথা বলে।

হ্যাস রেগে গিয়ে বলল—দলপতি টম, ওকে নিষেধ করে দাও—যেন জাত তুলে কথা না বলে।

হ্যারি দাড়ি চুলকে বলল—হ্যাঁ, ডিকের এটা অন্যায়। তা ওহে খোকা, প্রাণীটা আদিমযুগের মনে হল নাকি?

হ্যাস জবাব দিল—হ্যাঁ। কিন্তু দেখতে মানুষের মতো।

—তাহলে গুহামানুষ বলো।

—তাও হতে পারে।

টম দুটো ডিম পরপর কোঁৎ করে গিলে ফেলে বলল—ঝটপট সবাই তৈরি হও। হ্যাস ভায়া, তোমাকে বরং ডিক তার মাছমারা বল্লমটা দিক।

ডিক বলল—হ্যাঁ, জার্মানদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। আদিম অস্ত্র ওদের হাতে থাকলে বিশ্বযুদ্ধের বিপদ থেকে বাঁচার চান্স আছে।

টম তেড়ে গেল।—আবার জাত তুলছিস? হ্যারি, এই মড়াখেকো শকুনটাকে বঁড়শিতে গেঁথে, মা মেরীর দিব্যি, আমি তিমি মারতে যাব।

ডিকের কোন রাগের লক্ষণ দেখা দিল না। সে কফির পেয়ালাটা হ্যাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নাও হে বজ্জাত স্যাঙাত! এ হচ্ছে ইংরিজি কফি। দেখো. কাপড়ে-চোপড়ে করে ফেলো না।

রাগ করে থাকা যায় না এই আমুদে লোকগুলোর ওপর—হ্যাস তা প্রথম থেকেই টের পেয়েছে। সে এবার হাসতে হাসতে কফির পাত্রটা নিল। বলল—আমিও মা মেরীর দিব্যি করছি, ডিককে একবার জার্মান কফি খাওয়াব।

ডিক বলল—খেতে রাজি আছি। তবে আগে তোমাকে পোষাক পরে সভ হতে হবে। ছ্যা ছ্যা, একজন ইংরেজ হলে কক্ষনো ওই রবারের লেংটি পরে ভদ্রলোকের বৈঠকে বসে থাকত? টম, ওকে এক্ষুণি পোষাক পরতে বলো তো তাকাতে লজ্জা হচ্ছে আমার!

টম বলল—তাই তো। হ্যারি, তোমার সেই পাতলু‍ন টা কই?

হ্যারি বলল—এই তো। বালিশ করে ঘুমিয়েছি। রাতে পরতে চাইল না তে কী করব?

টম চোখ পাকিয়ে বলল—ভাই হ্যাস, এবার যদি পাতলুনটা না পরো, আমর জোর করে পরাব কিন্তু। ডিক ঠিকই বলেছে। বিশেষ করে গুহামানুষের সামনে ওরকম ন্যাংটো হয়ে যাওয়া আমার বিবেচনায় মোটেও উচিত হবে না। কী ভাবে গুহামানুষটা? বলবে, এই হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য মানুষ তাহলে করলেটা কী? ছ্যা ছ্যা, ওরা দেখছি আমাদের মতো ন্যাংটো হয়ে থাকে। বলবে না হ্যারি

হ্যারি সায় দিল।—একশোবার বলবে।

অগত্যা কফি খাওয়ার পর সেই নীল পাতলুনটা পরল হ্যাস। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা তৈরি হয়েছে। টম বেরোবার মুখে পইপই করে বলে দিল—খবর্দার

কেউ পরাণে মারবে না ওটাকে। বড় জোর পায়ে গুলি ছুঁড়ে কাবু করবে। তবে সেও নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে নয়। আমরা চেষ্টা করব ওটাকে গায়ের জোরে ধরে ফেলতে। তারপর এই দড়িদড়া দিয়ে বাঁধব।

বাকি পথ ওরা চুপচাপ চলল। হ্যাস আগে-আগে যাচ্ছিল। সেই খাঁড়ির ওপর পৌঁছে ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের দিকটা খুঁজতে থাকল, কিন্তু কিচ্ছু দেখা গেল না। তখন হ্যাস ওদের নিচে নামতে ইশারা করল।

সাবধানে পরস্পরকে ধরে একের পর এক নামতে থাকল ওরা। ধাপের মতো চাঙড় থাকায় নামতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। সেই খাঁড়ির ওপর পৌঁছে ওরা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের দিকটা খুঁজতে থাকল, কিন্তু কিচ্ছু দেখা গেল না। তখন হ্যাস ওদের নিচে নামতে ইশারা করল।

খাঁড়ির ধারে কয়েক মিটার সমতল জায়গা পাওয়া গেল। সেখানেই সেই বনমানুষটা তখন দাঁড়িয়ে ছিল। জায়গাটা চাতালমতো। সামনে জল, ওদের ডাইনে বাঁয়ে পা রাখার মতো জায়গা নেই।

ডাইনে পুবে এইখানে একটা পাথর জল থেকে মাথা তুলে আছে। হ্যাস খাড়া দেয়াল ধরে সেই পাথরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর এদের ওইভাবে আসতে ইশারা করল। সামনে আবার ধাপ দেখা গেল। ধাপ বেয়ে কখনও ওপরে, কখনও নিচে চলতে চলতে ওরা পুবের সীমানায় পৌঁছোল। সমুদ্র থেকে অনেক বড়বড় পাথর কিনারা অব্দি মাথা উঁচু করে আছে। হঠাৎ হ্যাস এদের লুকিয়ে পড়তে ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল।

তারপর তিনজনেই অবাক হয়ে দেখল, হ্যাঁ—বনমানুষ বা গুহামানুষ ছাড়া প্রাণীটা আর কিছু নয়, হাত পনের দূরে বুকে হেঁটে ঢালু একটা চাতাল বেয়ে উঠছে। তারা ওভাবে বেড়ালের মতো এগোবার কারণ একটু পরেই বোঝা গেল। কয়েকটা সীগাল চুপচাপ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। গুহামানুষটা একটা সীগাল ধরবে বলেই এগোচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে দিতেই এরা দেখল আঙুলে বড়বড় নখ রয়েছে। কালো কুচকুচে রঙ হাতের—কিন্তু জায়গায়-জায়গায় যেন ঘায়ের দাগ, কতকটা শ্বেতীর মতো সাদা বা ফিকে গোলাপী ছোপ। কাঁধ থেকে পিঠ পেরিয়ে কোমর অব্দি ফালি-ফালি ন্যাকড়ার মতো কী সব ঝুলছে। বাকি দেহ পা অব্দি পুরো উলঙ্গ। সে উবুড় হয়ে এগোচ্ছে।

খপ করে একটা সীগালের ঠ্যাঙ সে ধরে ফেলতেই বাকিগুলো পাখার শব্দ তুলে তক্ষুনি পালিয়ে গেল। হাতে ধরা পাখিটা প্রকাণ্ড ডানা ঝটপট করতে থাকল। তারপর গলায় কামড় বসাতেই পাখিটা বারকতক লাফালাফি করে থেমে গেল।

এতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে সবাই দেখছিল। উত্তেজনার চোটে হঠাৎ হ্যারি বেমক্কা চেঁচিয়ে বলে উঠল—সাবাস বুনো স্যাঙাত।

অমনি বনমানুষটা মাথা ঘুরিয়ে এদের দেখতে পেল। তারপরই সে একলাফে খাড়া হল এবং চোখের পলকে লম্বা কয়েকটা পা ফেলে ওদিকে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হল।

সেই সময় ডিক রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে বসল ঝোঁকের মাথায়। প্রচণ্ড আওয়াজ পাহাড় ও জলে প্রতিধ্বনি তুলল। সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দূরে পালিয়ে গেল।

হ্যাস টমের হাত ধরে বলল—জলদি চলে এস।

চারজনে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে সেই জায়গাটায় গিয়ে উঠল। কিন্তু প্রাণীটার পাত্তা পেল না। যে পথে সেটা পালিয়েছে, অনুমান করে সেই পথে চলল ওরা। একখানে গিয়ে দেখল, নিচে একটা গোলমত খাঁড়ির দুধারে অনেকটা সমতল জায়গা রয়েছে। এখানে খাঁড়ির জলটা এত স্বচ্ছ যে তলা অব্দি রোদ্দুরে ঝকমক করছে।

অনেক কষ্টে নিচে গেল ওরা। টম হেঁট হয়ে পায়ের ছাপ খুঁজতে লাগল। ডিক ও হ্যারি বন্দুক বাগিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে শুরু করল। সেই সময় হ্যাস বলে উঠল—টম, টম! এখানে দেখছি, আর একটা গুহা রয়েছে।

টম মুখ তুলেছে সবে, ডিক ও হ্যারি দৌড়ে কাছে এসেছে—সেই সময় দেখা গেল, প্রাণীটা বেরিয়ে পড়েছে গুহা থেকে। বাধা দেবার আগেই প্রচণ্ড জোরে টমের বুকে এক লাথি মেরে অদ্ভুত কৌশলে সে পাথরের ধাপ বেয়ে ওপরে চলে গেল। টম পড়ে গিয়েছিল। ডিক আর হ্যারি বন্দুক ছোঁড়ার কথা ভুলে তখন তাকেই সামলাতে গেছে। হ্যাস বল্লমটা ছুঁড়তে পারত—ছুঁড়ল না। তার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল কিছুক্ষণ আগে।

টম উঠে প্যান্ট-জামার ধূলোবালি ঝেড়ে তারপর ধীরে-সুস্থে পিস্তল তুলে অকারণ দুটো গুলি ছুঁড়ল।

হ্যাস বলল—থাক, আব মিছিমিছি গুলি ছুঁড়ে কাজ নেই। এস, আমরা ওর থাকার জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে। কিন্তু টর্চ দরকার যে!

হ্যারি বলল—দেশলাই আছে সঙ্গে। চলো।

গুহাটা পাইরেটস কেভের চেয়ে বড়ো। দরজার পাশে বড়ো একটা পাথর রয়েছে। ওটা দেখেই টম বলল—জন্তুটার বুদ্ধি আছে দেখছি, আমাদের মতোই।

ভেতরে ঢুকতেই পচা গন্ধ লাগল নাকে। দেশলাই জ্বলার পর চারজনে হতভম্ব হয়ে দেখল, গুহার মেঝেয় রাজ্যের মাছের কাঁটা আর জন্তুর হাড় রয়েছে।

কোণার দিকে কী একটা জিনিস দেখে হ্যাস এগিয়ে গেল। তারপর বলল—হ্যারি, শিগগির। দেশলাই জ্বালো এখানে।

দেশলাই কাঠিটা জ্বলে উঠতেই হ্যাস জিনিসটা দেখে বলল—একটা ছেঁড়া কম্বল। তাহলে........তাহলে............সে হঠাৎ থেমে গেল।

টম বলল—আরে, বলে ফেলো না স্যাঙাত। আটকে রাখছ কেন?

হ্যাস বলল—টম, টম। আমরা হয়তো উমব্রিয়া জাহাজের সেই হতভাগ্য ক্যাপটেন বেনজেল্লোর দেখা পেয়েছি।

টম আঁতকে উঠে বলল—সর্বনাশ। সে যে আস্ত ভূত।

ডিক ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বুকে ক্রস আঁকতে থাকল।

হ্যারি ফিসফিস করে বলল—বেনজেল্লোর ভূত! ওরে বাবা, কী হবে তাহলে?

হ্যাস উত্তেজিতভাবে বলল—টম, হ্যারি, ডিক! ক্যাপটেন বেনজেল্লো মারা যাননি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। উমব্রিয়ায় মিত্রশক্তির টর্পেডো আঘাত হানতে নিশ্চয় উনি প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তারপর এই দ্বীপে এসে উঠেছিলেন।

হ্যারি বাধা দিয়ে বলল—যুদ্ধের সময় হোক আর যখনই হোক, কোন জাহাজের ক্যাপটেন কক্ষণো সবার আগে নিজের প্রাণ বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দেন না। সমুদ্রের জীবনে অনেক নীতি আর আইনকানুন মেনে চলা হয়।

—হয়, আমি জানি। জাহাজ বিপন্ন হলে ক্যাপটেন সবার শেষে জাহাজ ছেড়ে যান। তাই বেশির ভাগ সময়ই তাঁদের প্রাণ হারাতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো। উমব্রিয়ার ক্যাপটেন নিশ্চয় নিজের প্রাণ বাঁচানো জরুরী মনে করেছিলেন। টম বলল—ব্যাটার বিবেক বলতে কিছু ছিল না।

হ্যাস বলল—যে কারণেই হোক, তিনি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দ্বীপে আশ্রয় পাওয়ার পব হয়তো সেই বিবেকের খাতিরেই সভ্যসমাজকে মুখ দেখাতে চাননি আর। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

হ্যারি বলল—তাহলে আত্মহত্যা করে মরে ভূত হয়েছে ব্যাটা। আর সেই ভূতটাকেই আমরা দেখেছি।

হ্যাস বলল—না, আমরা আস্ত মানুষটাকে দেখেছি। এমন হতে পারে, তিলেতিলে এভাবে কষ্ট সয়ে বেঁচে থেকে উনি সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। আত্মহত্যাকে পাপ ভেবেছেন। কিংবা হয়তো, গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ভেবে ভয়ে লুকিয়ে থাকছেন।

ডিক বলল—এই হল তো, জার্মান পণ্ডিতটা বড় বড় কেতাবী বুলি আওড়াতে শুরু করল। ওদের জাতেব স্বভাবই এই।

টম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তাহলে হ্যাস, তুমি বলছ, আমরা যাকে দেখলুম, 'সে স্বয়ং বেনজেল্লো? মনের দুঃখে অথবা শাস্তির ভয়ে এভাবে পড়ে আছে এখানে?

হ্যাস জবাব দিল—হ্যাঁ।

—তাহলে ব্যাটা অমন ভূতের মতো আচবণ করছে কেন?

—সেটা এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। টম, আমরা বরং কোন কৌশলে ওঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করি। তারপর ওঁকে যেভাবে হোক বুঝিয়ে দিই যে আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি। আমরা বন্ধু।

তিনজনেই সায় দিল। —বেড়ে বলেছ স্যাঙাত। তাই করা যাক্।

আট

বেনজেল্লো ও গিয়েসোপ্পো

সে বেলার মতো বেনজেল্লোর গুহাটা চিনে রেখে ওরা 'পাইরেটস কেভে' ফিরে এল। আবার অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল, কীভাবে বেনজেল্লোর সঙ্গে ভাব করা যায়। ডিক বড্ড গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ। তার মতে, ওই বিদঘুটে জীবটা যদি সত্যি বেনজেল্লো বুড়ো হয়, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে সে বিলকুল পাগল হয়ে গেছে। অতএব, তাকে দড়ির এই ফাঁস ছুঁড়ে আটকে ফেলায় তেমন কিছু বাইবেল অশুদ্ধ হয় না। ডিক এই ফাঁস ছোঁড়ার খেলায় খুব ওস্তাদ। দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে এটা শিখেছে সে। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে জীব-জন্তু ধরা হয় সেখানে।

ডিক বলল—কিছুদিন এক সার্কাস দলে ছিলুম, তখন মাঝে মাঝে টাটকা জন্তু-জানোয়ার ধরতে কোম্পানি আমাকে আফ্রিকার জঙ্গলে পাঠাত। এই কৌশলে আস্ত সিংহ ধরেছি আমি।

শুনে হ্যারি গম্ভীর হয়ে বলল—ডিক ভায়া, তোমার মোটর বোটটা কিনতে কতগুলো সিংহ ধরতে হয়েছে?

ডিক চটে বলল—ভাবছ, আমি মিথ্যে বলছি? ঠিক আছে। ওই তো দড়ি রয়েছে। ওই দিয়েই ব্যাটাকে আমি ধরে ফেলব, কথা দিচ্ছি।

বলে সে তক্ষুনি দড়ির ফাঁস বানাতে ব্যস্ত হল। আপন মনে ফের বলল—তবে এই দড়ি বড্ড নরম। ফাঁসের দড়ি কড়া হওয়া চাই। হুঁ, মোম দিলে এটা কড়া হয়ে যাবে।

হ্যাস ওর কথা মন দিয়ে শুনছিল। তার মনে হল, ডিকের কৌশলটাই সবচেয়ে নিরাপদ হবে। কিন্তু গায়ের জোরে বেনজেল্লোকে আটকানোর চেয়ে ওর সঙ্গে আগে

ভাব করার চেষ্টা করে দেখা যাক্ না কী হয়। সে বলল—হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে আমাদের ডিকভায়ার কৌশলটা অপূর্ব। কিন্তু আমি বলছিলুম কী, আজকের দিন ও রাতটা অন্তত আমাকে সময় দেওয়া হোক না। আমি একা কিছু করতে পারি নাকি দেখি।

টম বলল—কিন্তু তার মধ্যেই হঠাৎ যদি আমাদের কারো মাথা বুড়ো শয়তানটা পাথর ছুঁড়ে গুঁড়ো করে ফেলে?

হ্যারি মাথা নেড়ে বলল—সেটাই ভাবনার কথা। লুকিয়ে থেকে পাথর ছুঁড়তেও তো পারে ব্যাটা।

হ্যাস বলল—বরং আজকের দিন ও রাতটা তোমরা কেউ এখান থেকে বেরিও না। আমি একা বেরোব। দরজাটা ভাল করে আটকে রাখো। আমি ডাকলে তখন খুলে দেবে:

ডিক চোখ পাকিয়ে বলল—শুনছ জার্মানটার মতলব? বাঃ, আমাদের আটকে রেখে ও পালাবার মতলব করছে, বুঝতে পারছ তো?

হ্যারি তাকে সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, নতুন খোকা কেটে পড়বে ভাবছে। তা হবে না চাঁদ। পালিয়ে গিয়ে সেই আরব দুটোকে নিয়ে এসে গুপ্তধন একা হাতাবে সেটি হবে না।

কিন্তু টম ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল—পালাবে কোথায়? বিনা নৌকোয় এই দ্বীপ থেকে কোন মানুষ পালাতে পারে না। উমব্রিয়ার ভূতুড়ে কাণ্ডের ভয়ে এ তল্লাটে প্রাণের দায়ে না ঠেকলে কোন জেলে নৌকোও আসে না। যা খুশি করতে দাও না ওকে।

ডিক ফাঁসটা তৈরি করে রেখে সিগ্রেট ধরাল, তারপর বলল—ঠিক আছে। তবে আজ লাঞ্চে (দুপুরের খাওয়া) টাটকা মাছ না খেলে আমি মরে যাব। টিনের বাসি মাছ আর মুখে রোচে না। চলো হে হ্যারি, আমরা বরং মাছ মেরে আনি দুজনে। টম সায় দিয়ে বলল—কিন্তু সবসময় সাবধানে থাকবে।

ওরা দুজনে বল্লম আর হারপুন নিয়ে বেরিয়ে গেল। টম হাত পা ছড়িয়ে শুল। হাই তুলে বলল—রাত্তিরে মদটা বড় কড়া ছিল। ঢুলুনি এসে যাচ্ছে না। আমি ঘুমিয়ে নিই।

হ্যাস একটু হেসে বলল—আজ একবার উমব্রিয়ায় হানা দেবে না, টম?

টম চোখ বুজে থেকে বলল—দিনের বেলায়? পাগল না মাথা খারাপ? এখান থেকে পাক্কা ছ' মাইল বোট চালিয়ে যাওয়া, তারপর উমব্রিয়ার কাছে আমাদের ছেড়ে দিয়ে আসা—এর মধ্যে অনেকটা ঝুঁকি আছে। বদমাস জলপুলিসগুলোর নজর শকুনের মতো। তোমার সেই আরব দুটোর বরাত দেখে টের পাচ্ছ না। আমাদের চোখে না পড়লে আর ডিকের বোটটা না থাকলে তুমি

নির্ঘাৎ হাঙরের পেটে যেতে। কাজেই উমব্রিয়ায় হানা দিতে হলে সেই শেষবেলায় সন্ধ্যার মুখোমুখি, কিংবা রাত্তিরে।

লোকটা অদ্ভুত তো! বলতে বলতে ওর নাক ডাকতে থাকল।

দিনদুপুরে এরকম ঘুম দেখে তাজ্জব বনে গেল হ্যাস। একটু বসে থাকার পর সে খুব সাবধানে ওর কোমরে ঝুলোনো চামড়ার খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। টম টের পেল না। তারপর হ্যারির টর্চটাও নিল।

হ্যাস বাইরে এসে পাথরটা গুহার মুখে আটকে দিল। তারপর হাঁটতে থাকল। মাথার ওপর সূর্য। রোদে চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। ছায়া বলতে যেটুকু আছে, তা পাথরের খাঁজ কিংবা প্রবালদেয়ালের ধারে। কিন্তু সূর্য মাথার ওপর বলে সেটুকু ছায়া কোন কাজে লাগবার নয়।

সে হ্রদের ধারে এসে দেখল ডিক ও হ্যারি পশ্চিম প্রণালীটার দিকে মাছ মারতে চলেছে। তারা চোখের আড়ালে গেলে হ্যাস ডাইনে ঘুরে বেনজেল্লোর গুহার দিকে চলল।

এবড়োখেবড়ো একটা টিলার ওপর উঠে সে চারিদিকটা এবং ওপরে নিচে ভাল করে দেখতে থাকল। কোন জন-মানুষ নেই। খাঁড়িতে পাখির ঝাঁক ওড়াওড়ি করছে। বাতাস বেড়েছে। তাই সমুদ্রের বুকে বড় বড় ঢেউ উঠছে এখন। খাঁড়িতে জল প্রচণ্ড শব্দে আছাড় খাচ্ছে। সাদা ফেনা ভাসছে চাপচাপ। দূরে এদিকে ওদিকে আবছা দু একটা জাহাজও দেখতে পেল হ্যাস। দ্বীপের পূব ও দক্ষিণে সমুদ্রের তলায় ডুবো পাহাড় আছে। তাই সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয় জাহাজকে। আর দূরে পশ্চিমে উমব্রিয়ার আবছা মাস্তুলটা একটা মোটা বিন্দুর মতো ঢেউএ মাথা উঁচু করে দুলছে। ওদিকটা অনেক দূর অব্দি নিষিদ্ধ এলাকা। তাই ওদিকেও কোন জাহাজকে যেতে দেওয়া হয় না। হ্যাস দেখল উত্তর-পশ্চিম কোণে সোয়াকিন বন্দরটা যেন আকাশে ভাসছে। উজ্জ্বল রোদে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এতদূর থেকে। এমনকি বালির পাহাড়গুলোও ঝকমক করতে দেখল সে। সমুদ্র বা মরুভূমির এই এক ব্যাপার—দূরের কোন জিনিস আকাশে উঁচুতে ভাসছে দেখা যায়।

উমব্রিয়ার মাস্তুলটা আবার দেখতে থাকল হ্যাস। ওটা কেন চলে বেড়াচ্ছিল? আর সেই সব নীল আলোর ঝলকানিই বা কেন দেখা যাচ্ছিল? সত্যি কি ওটা ভুতুড়ে জাহাজ? নানা কথা ভেসে এল হ্যাসের মাথায়। তারপর মনে পড়ল, ক্যাপটেন বেনজেল্লোর কথা। জাহাজ ডুবেছে উনিশ বছর আগে। এই উনিশ বছর ধরে লোকটা এই দ্বীপে কাঁচা মাছ-মাংস খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু দ্বীপ ছেড়ে যাবার চেষ্টা করেনি, তা বোঝাই যায়। কেন? নাকি অতবড় কাণ্ডের পর লোকটা মানসিক আঘাতে জড়বুদ্ধি বা পাগল হয়ে গেছে?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। তারপর টের পেল, কড়া রোদে তার গায়ে ফোস্কা পড়তে শুরু করেছে, সারা গায়ে নুন জমে গেছে। সে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর ডাইনে ধাপে ধাপে নামতে শুরু করল। ঘন্টা তিনেক আগে এই জায়গাটা ভালো করে দেখে গিয়েছে। তাই চিনতে ভুল হল না।

একটু পরেই গোল খাঁড়িটার ধারে পৌঁছোল সে। তারপর সাবধানে গুহাটার দিকে পা বাড়াল। গুহামুখের একপাশে দাঁড়িয়ে সে চাপা গলায় ইটালিয়ান ভাষায় ডাকল—ক্যাপটেন বেনজেল্লো।

কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। তখন সে ফের ডাকল—ক্যাপটেন। আমি আপনার বন্ধু। কোন ভয় নেই আপনার। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি।

তবু কোন সাড়া নেই।

—ক্যাপটেন বেনজেল্লো। আমি একজন জার্মান ডুবুরি। সরকারী লোক নই' দয়া করে সাড়া দিন।

কিন্তু গুহা থেকে কোন শব্দ ভেসে এল না। তখন হ্যাস গুহায় ঢুকে গেল। ভেতরটা প্রচণ্ড অন্ধকার। টর্চ জ্বালল সে। সেই একই দৃশ্য। মাছের কংকাল আর হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে মেঝেয়। কোণায় ছেড়াখোঁড়া কম্বলটাও রয়েছে। হ্যাস কম্বলটা সাবধানে সরাল। তলায় কিছু থাকবে ভেবেছিল, নেই।

এবার সে গুহার ভেতরের দেয়ালগুলোয় আলো ফেলল। হঠাৎ দেখল কোণায় একটা আন্দাজ চারফুট—দুফুট ফোকর রয়েছে। একটু ইতস্তত করে সে ফোকরের ভেতর আলো ফেলল। বাঃ। এ যে দিব্যি একটা সুড়ঙ্গপথ রয়েছে।

তার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল হ্যাস। আলো ফেলে এগোল। পথটা ঘুরে ঘুরে যেখানে শেষ হল, সেখানে আর একটা চওড়া ঘর। কিন্তু ছাদ থেকে বটের ঝুরির মতো অনেক থাম এসে মেঝেয় মিলেছে। থামগুলো এবড়োখেবড়ো। বোঝা যায়, প্রাকৃতিক কারণেই গুহাটা গড়ে উঠেছে—অন্য সব গুহার মতোই।

টর্চের আলো একটা থামের কাছে পড়ামাত্র হ্যাস চমকে উঠল। এ কী দৃশ্য। সেই উলঙ্গ ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে কে আস্টেপিস্টে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল হ্যাস। এবার সে কাছে গেল। হতভাগ্য লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আলোর দিকে। ওই দৃষ্টি অস্বাভাবিক। হ্যাস কাছে হাঁটু মুড়ে বসে বলে উঠল—ক্যাপটেন বেনজেল্লো। আমি আপনার বন্ধু। দয়া করে ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে আসিনি। আমি একজন জার্মান ডুবুরি।

লোকটা কি বোবা? শুধু বড় বড় হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। গা শিউরে ওঠে সেই চাউনি দেখলে।

হ্যাস ওর গা থেকে কড়া দুর্গন্ধ পাচ্ছিল। নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ বমি হয়ে যাবার দশা একেবারে। তবু সে ওর নোংরা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফের বলল—ভয়ের কিছু নেই ক্যাপটেন। বলুন, কে আপনাকে এমন করে বেঁধে রেখে গেল? আমি তাকে শাস্তি দেব। আমি আপনার বন্ধু। বলুন, ভয়ের কিছু নেই।

আশ্চর্য, এবার ওর দুচোখে ফেটে ঝরঝর করে জল ঝরতে থাকল। তারপর লোকটা হাঁ করল। হ্যাস বুঝতে পারল, কী বলতে চায়। সে টর্চের আলো ফেলে মুখের ভিতরে যা দেখল, শিউরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ওর জিভটা আদ্ধেক কেউ কেটে নিয়েছে কবে। তারপর আশ্চর্যভাবে ঘা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কথা বলা দূরে থাক, এর ফলে কোন আওয়াজ করার ক্ষমতাও যেন ও হারিয়ে বলেছে।

হ্যাস তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে বাঁধনগুলো কেটে ফেলল। ভাগ্যিস ছুরিটা তার ডুবুরির জাঙিয়ার পকেটে ছিল। হ্যারির পাতলুনটা এবার খুলে ফেলল সে। ক্যাপটেন বেনজেল্লো তখন মেঝেয় কাঠ হয়ে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। পাতলুনটা তাকে পরাল হ্যাস। কোন বাধা দিল না সে। এখন খানিকটা জল পেলে ভাল হত। কিন্তু জল তো পাইরেটস কেভে। এই ওজনদার প্রকাণ্ড মানুষকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কি তার আছে।

হ্যাস উদ্বিগ্ন মুখে বলল—আপনার জলতেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়? কিন্তু এখানে তো খাবার জল নেই।

বলেই হঠাৎ মনে হল, তাহলে কি জল না খেয়েই টানা উনিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন বেনজেল্লো? তা অসম্ভব। নিশ্চয় প্রবালদ্বীপের কোথাও স্বাভাবিক প্রস্রবণ আছে, যেখানে মিঠে জল পাওয়া যায়।

সে বলল—ক্যাপটেন, আপনি কোথায় খাবার জল পেতেন? দয়া করে শিগগির বলুন। আমি এক দৌড়ে সেখান থেকে জল নিয়ে আসব।

বেনজেল্লো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে ইশারা করল। হ্যাস তাকে ধরল। তখন অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল সে। হ্যাসের কাঁধে ভর করে পা বাড়াল। বাইরে বেরিয়ে গোল খাঁড়িটার পশ্চিমে গেল ওরা। তারপর হ্যাস অবাক হয়ে দেখল, একটা ফাটল বেয়ে ওপর থেকে এক ফালি স্বচ্ছ জলের ধারা নেমে এসে পাথরের ফাঁক দিয়ে খাড়ির লোনা জলে মিশে যাচ্ছে। যা ভেবেছিল, তাই বটে। ওপরে কোথাও একটা প্রস্রবণ আছে।

বেনজেল্লো সেই জলে মুখ রেখে জন্তুদের মতো অদ্ভুত ভঙ্গীতে তেষ্টা মিটিয়ে নিল। তারপর হাত বাড়াল ফের।

না, লোকটা পুরো পাগল নয়। তবে পাগলামি কিছুটা আছে, তা ঠিকই। তা না হলে হ্যাসদের পাথর ছুঁড়েই বা তখন মারতে চেষ্টা করবে কেন?

হ্যাস তাকে ধরে আস্তে আস্তে চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করল। যখন তারা টিলাটার মাথায় পৌঁছেচে, হঠাৎ মাথার ওপর প্রচণ্ড গুলির শব্দ হল। বেনজেল্লো তাকে আঁকড়ে ধরে তক্ষুনি মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। আবার তিনবার গুলি ছুঁড়ল কে। একটা গিয়ে লাগল সামনে একটা পাথরের দেয়ালে। খানিকটা চটা উঠে গেল। তখন হ্যাস তার পিস্তলটা বের করে যেদিক থেকে গুলি আসছিল, সেদিকে পরপর দুবার গুলি ছুঁড়ল।

সেই সময় নিচের দিকে একটা জায়গার দিকে বেনজেল্লো ইশারায় হ্যাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হ্যাস দেখল, অবিকল তিমির বাচ্চার মতো কী আজব একটা সামুদ্রিক প্রাণী ডাঙা থেকে পিছলে সমুদ্রের জলে গিয়ে ডুবল। কয়েক মিনিট তাকিয়ে থাকল হ্যাস। কিন্তু সেটা আর দেখা গেল না। যেখানে ডুবেছিল, সেখান থেকে বড়বড় বুদ্বুদ উঠছিল। একটু পরেই বুদ্বুদগুলো মিলিয়ে গেল।

হ্যাস অবাক হয়ে বেনজেল্লোকে বলল—কী ওটা?

কিছু বলার চেষ্টা বরল বেনজেল্লো। কিন্তু চাপা গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া কিছু বোঝা গেল না।

তখন হ্যাস বলল—কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? আপনাকে যে বেঁধে রেখেছিল সেই লোকটা নিশ্চয়?

বেনজেল্লো জোরে মাথা দোলাল। অর্থাৎ হ্যাঁ, সেই বটে।

হ্যাস আবার প্রশ্ন করল—তিমিমাছের বাচ্চার মতো যেটা দেখলুম, সেটা কী?

এবার বেনজেল্লো একটুকরো প্রবালমাটি ভেঙে নিয়ে একটা কালো পাথরের ওপর পরিষ্কার ইটালিয়ান ভাষায় লিখল—শয়তান গিয়েসেপ্পো। সে এখনও বেঁচে আছে। উমব্রিয়ার যখের ধনের মালিক সে। এতদিন সে আমাকে ধরার চেষ্টা করেছে, পারেনি। আজ ধরে ফেলেছিল।

এই প্রখর রোদে বসে থাকা কঠিন। হ্যাস বলল—চলুন, আগে আমাদের আস্তানায় যাওয়া যাক। তারপর সব শুনব।

বেনজেল্লো লেখাটা আগে সাবধানে মুছে ফেলল। তারপর এগোল হ্যাসের কাঁধে ভর দিয়ে। এতক্ষণে হ্যাস দেখল, বুড়োকে শয়তান গিয়েসেপ্পো বেঁধে প্রচণ্ড মার দিয়েছে। পিঠের দিকটায় লাল ছোপ পড়েছে। কোথাও কোথাও বিশ্রিভাবে কেটে গেছে বা ফুলে রয়েছে। হ্যাসের খুব কষ্ট হল।

ওরা যখন 'পাইরেটস কেভে' পৌঁছাল, ডিক আর হ্যারি তখনও মাছ ধরে ফেরেনি। টম ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

বেনজেল্লো গুহায় ঢুকেই হঠাৎ নাক উঁচু করে কী শুঁকছিল। এবার সে লাফ দিয়ে কোণায় রাখা প্যাকিং বাক্সোগুলোর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর খাবারের টিনগুলো হিংস্র হাতে বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। হ্যাস হাসিমুখে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে টমকে ডাকল—হ্যাল্লো দলপতি! ওঠ, ওঠ শিগগিরি! মজা দেখবে তো উঠে পড়ো।

বেনজেল্লো তখন কৌটোর মুখ প্রায় দুমড়ে ঢাকনা খুলে সার্ডিন মাছের শুঁটকিগুলোয় কামড় বসিয়েছে।

টমের ঘুম ভেঙে গেল। লাল চোখে তাকিয়ে সে বলল—এত চেল্লাচেল্লি কিসের হে স্যাঙাত? বললুম না তখন, ঘুম পণ্ড করবে না?

—আরে দাদা ওঠ। দেখনা ওদিকে কী কাণ্ড হচ্ছে!

টম বেনজেল্লোর দিকে ঘুরেই কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বিকট চেঁচিয়ে বলল—কোন্ হতচ্ছাড়া বদমাস রে তুই? ওরে ব্যাটা রাক্ষসের ধাড়ি! ওরে মামদো খোক্কস! কে—কে তুই? যাঃ, সব খেয়ে নিকেশ করল।

তারপর হ্যাসকে তেড়ে এল।—হাঁ করে খাবারগুলো ধ্বংস হওয়া দেখছ তুমি? ডিক ঠিকই বলে দেখছি। জার্মানগুলোর আক্কেল কবে হবে?

বলে সে কোণের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর বেনজেল্লোর দু কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওই ক্ষুধার্ত পাথর নড়ানোর শক্তি তার নেই।

এবার বেনজেল্লো দুধের কৌটো কামড়াতে কামড়াতে তার দিকে ঘুরতেই টম বিকট চেঁচিয়ে এবং আঁতকে উঠে এক লাফে সরে এল।—ওরে বাবা! এযে দেখছি, সেই ভুতুড়ে গুহা মানুষটা! ওকে গুলি করে মারব!

হ্যাস টমের একটা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। বলল—চুপ করে বসো তো দাদা! ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে খেতে দাও। উনিশ বছর ধরে শুধু কাঁচা মাছ মাংস খেয়ে কাটাচ্ছেন বেচারা। আজ সভ্য জগতের খাবারদাবার খেয়ে উনি ফের সভ্য হোন।

টমের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। সে বলল—তাহলে উনিই সত্যিসত্যি উমব্রিয়ার ক্যাপটেন বেনজেল্লো?

—হ্যাঁ। আমার অনুমান ভুল হয়নি, টম।

—তুমি গিয়ে ডাকলে, আর ভালমানুষের মতো চলে এল?

—না। সব বলছি। তুমি ততক্ষণে ডিক আর হ্যারিকে শিগগির ডেকে আনো। আমাদের জরুরী কনফারেন্স বসবে।

নয়

সর্বনাশের সূচনা

গুহার মেঝেতে খড়ি দিয়ে হতভাগ্য বেনজেল্লোবুড়ো যা লিখল, তা এই :

...........উমব্রিয়ার সহকারী ক্যাপটেন গিয়েসেপ্পোর ফুসলানিতে ক্যাপটেন বেনজেল্লোর বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুদান এলাকায় গোপনে আঘাত হানবার জন্য ইতালী সরকার জাহাজটা পাঠায়। কিন্তু গিয়েসেপ্পো তলে-তলে ব্রিটিশ গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল। উমব্রিয়া যখন সুদানের উপকূল থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে, তখন শয়তান গিয়েসেপ্পো ক্যাপটেনকে সব খুলে বলে এবং টাকার লোভ দেখায়। ক্যাপটেন বেনজেল্লো ভুল করল। সে রাজী হয়ে গেল সহকারীর কথায়। ভাবল, ইতালী-জার্মানি তো হেরে ভূত হবে এই যুদ্ধে। কাজেই ফাঁকতালে কিছু রোজগার হয়ে যাক না।

.........কথা ছিল, উমব্রিয়া কবে কখন কোথায় পৌঁছচ্ছে, এ খবরটা বেতারে গোপন সংকেতের সাহায্যে সুদানের ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে জানিয়ে দিতে হবে। তখন রাত বারোটা। উমব্রিয়া প্রবালদ্বীপের ছ' মাইল পশ্চিমে পৌঁছানোর পর গিয়েসেপ্পো ক্যাপটেনকে কথাটা জানিয়েছিল। তখন ক্যাপটেনেরও অবশ্য কিছু করার নেই—সায় দেওয়া ছাড়া। কারণ, শয়তানটার হাতে বেতারের ভার। সে জানাতই ব্রিটিশদলকে।

.........যাই হোক, বোকার মতো কিছুটা টাকার লোভে, কিছুটা প্রাণের মায়ায় বেনজেল্লোকে রাজি হতে হল। খবর পাঠাবার পর কথামতো সাবমেরিন রওনা হল সুদান থেকে। এদিকে প্রবালদ্বীপের কাছে একটা মোটর বোট অপেক্ষা করবে। ক্যাপটেন ও সহকারী ক্যাপটেনকে তুলে নেবে আগে ভাগে।

ঠিক সময়ে চুপিচুপি দুজনে লাইফবেল্ট পরে সমুদ্রে নেমে পড়ল। কেউ টের পেল না এই কাণ্ড। জাহাজ চলতে থাকল। কিছুদূরে যাবার পর কথামতো গিয়েসেপ্পো প্রবাল দ্বীপের দিকে টর্চ দুলিয়ে ইশারা দিল—শিগগির বোট নিয়ে এসো।

—বোট এসে গেল। কিন্তু গিয়েসেপ্পো—শয়তান আর লোভী যেমন, তেমনি নিষ্ঠুর সে—বেনজেল্লোকে ওঠাতে বারণ করল। বলল—এই পাজিটা খুব দেশভক্ত। ওকে উদ্ধার করলে বিপদ বেড়ে যাবে। ওকে খতম করে দাও।

অমনি বোট থেকে একজন ব্রিটিশ সেনা বন্দুক তাক করে গুলি ছুঁড়ল বেনজেল্লোর দিকে। বেনজেল্লো ব্যাপারটা টের পেয়েই প্রাণ বাঁচাতে লাইফ বেল্ট খুলে ফেলেছিল। জলে ডুব দিল স্কিনি। বেল্ট না খুললে ডুবতে পারত না।

........সেই মুহূর্তে খানিকটা দূরে উমব্রিয়ার তলায় ঢুঁ মারল টর্পেডো। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটল। তখন গিয়েসেপ্পো চেঁচিয়ে উঠল—শিগগির সরে পড়া যাক্ এখান থেকে। ব্যাটা হাঙরের পেটে যাবে। ছেড়ে দাও।

.........তক্ষুনি বোট নিয়ে ওরা সুদানের দিকে চলে গেল প্রচণ্ড বেগে। আর অসহায় বেনজেল্লো সাঁতার কাটতে থাকল। অন্ধকারে লাইফবেল্টা আর খুঁজে পেল না সে। ঈশ্বরের দয়ায় হাঙর আর হিংস্র বারাকুদা মাছের ঝাঁক তাকে আক্রমণ করতে এল না। সে প্রবাল দ্বীপটা কোন্ দিকে তা জানত। সাঁতার কেটে সেদিকেই এগিয়ে চলল সে অবশেষে দ্বীপে পৌঁছতে পারল।

.....তারপর? আর কিছু মনে নেই বেনজেল্লোর। উনিশটা বছর কীভাবে যে কাটিয়েছে, তা বলা অসম্ভব তার পক্ষে। প্রাণ বাঁচাতে কাঁচা মাছ আর সামুদ্রিক পাখি পাথর দিয়ে মেরে কাঁচা কামড়ে খেয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারেনি। একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটিয়েছে সে। তাকে নিশ্চয় এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ফাঁসি দেওয়া হবে। তাই দ্বীপে দৈবাৎ কেউ এসে পড়লে সে ভয় পেয়ে ভেবেছে, তাকে গ্রেফতার করতে লোক পাঠানো হয়েছে। তাকে তাই পাথর ছুঁড়ে মারতে চেয়েছে।

আর গিয়েসেপ্পো?

.......গিয়েসেপ্পোর পরবর্তী জীবনের ঘটনা সে কিছু জানে না। তবে কবছর আগে এক রাত্রে হঠাৎ গিয়েসেপ্পো আর কয়েকজন লোককে এই দ্বীপে বোট নিয়ে আসতে দেখে বেনজেল্লো। তাদের কাছে রাইফেল আর রিভলভার ছিল। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে ওদের কথাবার্তা শুনেছিল। উমব্রিয়া জাহাজে নাকি এক সিন্দুক সোনার ইঁট আছে। আর আছে একরকম সাংঘাতিক 'অস্ত্র। সেলে ঠাসা মিথেন গ্যাস। এই গ্যাস বড় মারাত্মক। গিয়েসেপ্পো সোনার দিকে তত মনোযোগী নয়। ওই গ্যাসের সেলগুলো কোন দেশের সরকারকে পাচার করতে পারলে কোটিকোটি টাকা রোজগার করতে পারবে সে। সোনার দাম বড় জোর পঞ্চাশ ষাট লাখের বেশী হবে না। কিন্তু গ্যাসের সেলগুলো নাকি পঞ্চাশ-ষাট কোটি টাকায় যেকোন দেশের সরকার এক্ষুনি লুফে নেবে। ওই গ্যাস তৈরি করতেই ইতালী সরকার কয়েকশো কেটি টাকা খরচ করেছিল। দেনায় এখনও চুল বিকিয়ে রয়েছে তাদের।

........গিয়েসেপ্পো তারপর থেকে প্রায়ই আসে আর সম্ভবতঃ খোঁজাখুঁজি করে যায়। উমব্রিয়ার কোন্ গোপন জায়গায় সেই সেলগুলো আছে সে এখনও তার পাত্তা পায়নি। ব্যাটা পাকা ডুবুরি। অদ্ভুত জলপোষাক আছে তার। দেখলে মনে হবে, আস্ত তিমি মাছের বাচ্চা;

বেনজেল্লোকে আবিষ্কার করল সে কীভাবে?

........বুদ্ধির ভুলে নিজে থেকেই একদিন সামনে গিয়েছিল বেনজেল্লো। তাকে মেরেই ফেলতে চেয়েছিল গিয়েসেপ্পো। কিন্তু দলের এক স্যাঙাতের মনে দয়া হল—বলল, মিছিমিছি মানুষ খুন করে আবার কী হাঙ্গামায় পড়বে. তার চেয়ে ওর জিভটা কেটে নেওয়া যাক। বোবা হয়ে যাবে। কাকেও কিছু বলতে পারবে না। সে বড় অমানুষিক যন্ত্রণায় কাটাতে হয়েছে বেনজেল্লোকে। তারপর থেকে মানুষ দেখলেই সে প্রতিহিংসায় পাথর ছুঁড়ে মারে। আজ একটু আগে ব্যাটা কখন ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল গুহার মধ্যে। আচমকা অন্ধকারে ধরে ফেলে তাকে এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। হয়তো প্রাণেই মেরে দিত এবার। কিন্তু ভাগ্যিস, হ্যাসের সাড়া পেয়ে সে পালিয়ে যায়।

এতক্ষণ ধরে সব শোনার পর হ্যাস বলল—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গিয়েসেপ্পো মাঝে মাঝে দ্বীপে আসে এবং তিমিমাছের পোষাকে উমব্রিয়ায় যায়। কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে না।

টম বলল—কী?

—কেন ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে সে বাঁচিয়ে রাখল?

ডিক বলল—বেড়ে বলেছ। একথাটাই বুঝতে পারছি না।

হ্যারি বলল—আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয় ক্যাপটেনবুড়ো কিছু লুকোচ্ছে আমাদের। ওর কাছেই বোধ হয় মিথেন সেলগুলোর খোঁজখবর আছে—বুঝলে টম ভায়া? জ্বালাতন করে তা আদায় করতে চায় গিয়েসেপ্পো।

হ্যাস কথাটা শুনতে শুনতে ক্যাপটেন বেনজেল্লোর দিকে তাকাল দেখল, বুড়ো অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি এগিয়ে গিয়ে বলল—ক্যাপটেন বুড়ো! ওসব চালাকি দয়া করে ছাড়ুন, এবার সত্যি কথাটা ঝেড়ে ফেলুন তো ভালমানুষের মতো। মিথেন সেলের ভাঁড়ার জাহাজের কোন্ খোলে আছে, নিশ্চয় আপনি জানেন। আমার ধারণা, টর্পেডোর আঘাতেও সে জায়গাটা ফাঁসানো যায়নি—এমন কোন শক্ত ধাতুতে সেই জায়গাটা তৈরি। ফাঁসলে তো প্রলয়কাণ্ড হত। কী বলেন, ক্যাপটেন স্যার?

অমনি বেনজেল্লো তার গলাটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল। হ্যারি গোঁ গোঁ করে উঠল। হ্যাস, টম আর ডিক ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিকষ্টে ছাড়াল ওকে। বুড়োর গায়ে যেন অসুরের শক্তি। হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—ওরে বাবা! বুড়ো যে সাক্ষাৎ দত্যিদানো! রক্ষে করো বাবা, ওর ধারে কাছে আর আমি যাচ্ছিনে। যেতে হলে আগে মুণ্ডুটি রাইফেলের গুলিতে ফুটো করব—বলে দিচ্ছি হ্যাঁ।

টম ক্যাপটেন বুড়োকে ধমক দিয়ে বলল—আপনি তো ভারি নেমকহারাম লোক মশাই। আমাদের তিনদিনের খাবার একবেলায় গিলে এবার রীতিমতো বেইমানি শুরু করলেন দেখছি। থাক্, ওই মিথেনগ্যাসের কথা আমাদের বলতে হবে না। আমরা খুঁজে বের করব'খন।

হ্যাস বলল—ওঁকে এখন বিরক্ত করা উচিত নয়। বিশ্রাম করতে দাও। মাথা আরো খানিকটা ঠিকঠাক হোক।

ডিক গজগজ করল।—সব চালাকি বুড়োর। গিয়েসেপ্পো এমনি-এমনি তো জিভ কাটেনি ওর!

হ্যাস ক্যাপটেন বুড়োর কাঁধে হাত রেখে বলল—স্যার, আপনি শুয়ে পড়ুন। এদের কথায় কান দেবেন না।

বেনজেল্লো হ্যাসের কথায় শিশুর মতো বাধ্য হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে খালি মেঝেতেই শুয়ে বড়ল।

টম বলল—কিন্তু ওর গায়ের গন্ধে যে ঘরে টেকা দায় হচ্ছে!

তবে। ওকে হ্রদের জলে আচ্ছাসে রগড়ে চান করাতে হবে।

ডিক বলল—এক কাঁড়ি সাবান লাগবে তাহলে। বাপ্‌স্! এমন আজব জন্তু চিড়িয়াখানায় পাঠালেই তো ভাল হয়।

হ্যাস বলল—শোন স্যাঙাতরা। আর ফষ্টিনষ্টি নয়। বেনজেল্লোকে আমরা নিয়ে এসেছি, গিয়েসেপ্পো টের পেয়ে গেছে। এবার আমরা বেশ খানিকটা বিপদের মধ্যে পড়েছি ভুলো না। কিচ্ছু বলা যায় না। সে হয়তো দলবল নিয়ে বন্দুকবাজি করতে আসবে। হুঁসিয়ার থাকা দরকার।

ডিক গোঁফে তা দিয়ে বলল—আসুক না। মুণ্ডু ঝাঁঝরা করে দেব।

টম বলল—মেলা বকোনা। আমাদের ভাল অস্ত্র বলতে তিনটে মাত্র। ডিক, তুমি, হ্যারি বেরিয়ে পড়ো বরং। বোট নিয়ে সোয়াকিনে চলে যাও। দি শার্ক বা হাঙর নামে রেস্তোরাঁ আছে, তার মালিক ওয়েগার আমার বন্ধু। হ্যারির সঙ্গে তার আলাপ আছে। হ্যারি, তুমি গিয়ে ওকে বলো—অন্তত গোটা তিনেক ভাল রাইফেল আর প্রচুর কার্তুজ দাও। টম পালিয়েছে। ওয়েগার চোরা অস্ত্রশস্ত্রের কাবারী। দাম চাইলে বলবে, টম দেবে। দেখো ওর সংগে দরদাম নিয়ে তর্কাতর্কি কোরোনা। ওয়েগার খুব চড়া মেজাজের লোক। ডিক, উঠে পড়ো এক্ষুণি।

হ্যারি বলল—ওয়েগারটা যা জিনিস! নগদানগদি কিছু মালকড়ি না পেলে ও ব্যাটা কিছুতেই রাজি হবে না—হলফ করে বলতে পারি।

টম বলল—আহা, আগে যাও না বাবা! গিয়ে দেখই না কী বলে? হ্যারি বেঁকে বসল।—পাগল না মাথা খারাপ! আমি বেশ টের পেয়েছি, ব্যাটা পয়সা না দেখে মুখই খুলবে না।

টম কী বলতে যাচ্ছিল, হ্যাস বলল—দেখ টম, বরং এক কাজ করো। সোনার ইঁটটা ভেঙে খানিকটা দাও হ্যারির হাতে। ওটা জমা রেখে রাইফেল আনুক।

হ্যারি আর ডিক লাফিয়ে উঠল। বলল—বেড়ে বলেছ।

একটা চামড়ার ওপর সোনার ইঁটটা রেখে হাতুড়ি মেরে খানিকটা ছাড়াল টম। তারপর হ্যারি সেগুলো পকেটে পুরে বেরোল। ডিক তার সংগে চলল।

এই সময় হ্যাস লক্ষ্য করল, ক্যাপটেন বেনজেল্লো আড়চোখে সোনার ইঁটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডিক ও হ্যারি চলে যাবার পর সে উঠে বসল হঠাৎ। তারপর সেই খড়িটা খুঁজে নিয়ে মেঝেয় লিখল—ওদের ফিরে আসতে বলো। তোমরা যা সোনা ভাবছ, তা সোনা নয়। একরকম নকল পাথুরে জিনিস।

হ্যাস ও টম চমকে উঠে বলল—সে কী। সোনা নয়?

বেনজেল্লো আগের লেখাগুলো মুছে লিখল—না। ওগুলো নকল সোনা। ওই ইঁটগুলোর কোন একটার মধ্যে একটা নক্সা আছে।

দুজনে আরও চমকে রুদ্ধশ্বাসে বলল—কিসের নক্সা?

বেনজেল্লো তখন হঠাৎ খড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। তাকে অনেক অনুরোধ করেও আর ওঠানো গেল না।

টম বলল—নক্সা। বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো?

হ্যাস একটু হেসে বলল—টমভায়া। আশা করি, নকল সোনা শুনে তুমি মনমরা হয়ে পড়েছ। নক্সাটা কিসের তা আমি বুঝতে পেরেছি। এখন শোন, শিগগির ডিক আর হ্যারিকে ফিরে আসতে বলোগে। তোমার বন্ধু ওয়েগার সম্ভবত আমাদের মতো অতটা বোকা নয়। নকল সোনা গছাতে গেলে হয়তো পুলিশে দেবে ওদের।

শুনে টম ভড়কে গিয়ে তক্ষুনি দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আর হ্যাসকে অবাক করে বেনজেল্লোও আবার উঠে বসল। তারপর সেই খড়িটা দ্রুত কুড়িয়ে খসখস করে লিখল—সাবধান, এই বেলেল্লা বোম্বেটে গুলোকে একতিল বিশ্বাস করো না। বিপদে পড়ে যাবে। কাজ উদ্ধার করতে পারলে এরা তোমাকে মেরে ফেলতে দেরি করবে না।

হ্যাস হাসতে হাসতে বলল—সে আমি বেশ বুঝি ক্যাপটেন বেনজেল্লো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বেনজেল্লো লেখাগুলো মুছে শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই তিনমূর্তিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সবাই যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসছে। টম গুহায় ঢুকেই রুদ্ধশ্বাসে বলল—ওহে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের বোটটার পাত্তা নেই। সমুদ্রের চারদিকে খুঁজে দেখলুম, একেবারে উধাও!

হ্যাস বলল—সে কী।

হ্যারি বলল—নির্ঘাৎ শয়তান গিয়েঁসেপ্পোর কীর্তি। তখন বললুম ডিককে, বোটটা কোথাও ভালভাবে লুকিয়ে রাখো। এখন ঠেলা বোঝ। এই বুড়োর মতো বাকি জীবন কাঁচা মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচাও আর খোক্কস হয়ে পড়ো।

ডিক ভাঙা গলায় বলল—আহা। অমন সাধের বোটটা আমার। ও জিনিস আর পাব কোথায়।

টম ভয়ার্তস্বরে বলল—এ কী সর্বনাশে পড়া গেল দেখ দিকি। এখন দ্বীপ থেকে যাবার উপায়ই বা কী হবে?

সবাই হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ বসে রইল। প্রত্যেকটি মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছে। এই নির্জন প্রবালদ্বীপের এত দুর্নাম আছে, কেউ এদিকটায় ভুলেও নৌকো বা লঞ্চ নিয়ে আসে না। চেঁচিয়ে মাথা খুঁড়লেও কোন উপায় নেই। সাঁতার দিয়ে সোজাসুজি দক্ষিণ বা উত্তর উপকূলের দিকে পাড়ি জমানো সহজ কথা নয়—দু দিকেই লোহিত সাগর এখানে দেড়শো মাইলের বেশি চওড়া। কিন্তু তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে, দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রে হাজার হাজার হিংস্র হাঙর আর বারাকুদা মাছের আড্ডা। তাছাড়া আছে অক্টোপাশ, অজগরজাতীয় সাপ আর মাকড়সার ঝাঁক। তাদের মুখ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কাজেই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই, ওরা বুঝতে পারছিল।

শুধু হ্যাস অন্য একটা কথা ভাবছিল। গতকাল সন্ধ্যা থেকে তার কোন খোঁজ নেই। সোয়াকিনের ম্যাজিস্ট্রেট বিল হ্যাসের বন্ধু। সে কি এখনও চুপচাপ বসে থাকবে?

পরক্ষণে তার মনে হল, বিল তো চুপচাপ নিরুদ্বেগে বসেই আছে দেখা যাচ্ছে! তা না হলে এখনও কোন খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করছে না কেন? অদ্ভুত মানুষ তো বিল!

হ্যাসের খুব অভিমান হল নাকি নিজে ইংরেজ বলে জার্মান বন্ধুর বন্ধুত্বের মর্যাদা সে আসলে দিতে চায় না, শুধু মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়েছে? তাই হবে।

কিংবা ভাবছে, হাঙরের পেটে চলে গেছে জার্মানটা। তাই নিশ্চিন্তে বসে আছে।

বিলের অদ্ভুত আচরণের মানে খুঁজে পাচ্ছিল না হ্যাস। কিন্তু একটা কিছু করা দরকার। সে ডাকল,—টম।

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—বলো খোকাবাবু!

রসিকতা ও ছাড়তে পারে না। হ্যাস একটু বিষণ্ণ হেসে বলল—শোন, এখন একটামাত্র উপায় হচ্ছে, সেই শয়তান গিয়েসেপ্পোর ওপর নজর রাখা। দ্বীপটা তেমন

বাকিটা বেশ খাড়া। টম কী কৌশলে চড়ে বসেছিল, কে জানে। ডিক ধপাস করে দশফুট নিচে পড়ে গেল। বেচারার শরীরটা প্রকাণ্ড জালার মতো। সামলানো কঠিন। এবার হ্যারি তাকে ঠেলে তুলে দিলে একটা খাঁজে। ততক্ষণে হ্যাস গিয়ে পৌঁছল সেখানে। ওপর থেকে টম প্রচণ্ড হাত পা নাড়ছে। চাপা গলায় ডাকছে। কিন্তু খাড়া দেয়ালের মতো জায়গাটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ডিক ওপরের খাঁজে পা দিয়ে গিরগিটির মতো আরেকটা খাঁজ হাতড়াচ্ছে পা বাড়িয়ে। নিচে হ্যারি নির্দেশ দিচ্ছে—বাঁয়ে, বাঁয়ে। ডিকের বাঁ পা কাঁপতে কাঁপতে বাঁদিকে এগোচ্ছে আর পিছিয়ে আসছে।

দৃশ্যটা হাস্যকর। কিন্তু এখন হাসির ব্যাপার নয়, জীবনমরণ সমস্যা। হ্যাস খুঁজছিল, কোন্ পথে টম ওখানে উঠেছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ডিকের হাত তিনেক তফাতে ছোট বড় অনেক খোঁদল রয়েছে। দেখলে মনে হয়, কামানের গোলায় ওইসব গর্ত হয়ে গেছে। আসলে ওগুলো পাখির বাসা। হ্যাস চেঁচিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ডিককে। তারপর নিজে সেদিকে তরতর করে উঠতে থাকল। ডিকের আগেই সে ওপরের চাতালে পৌঁছে গেল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল।

সেই সময় হ্যারি চেঁচিয়ে উঠল—সাপ! সাপ!

ডিক হাত ছেড়ে দিয়েই ফের ধপাস করে পড়ল নিচে। হ্যাঁ, সত্যি সাপ। একটা গর্ত থেকে মুণ্ডু বাড়িয়ে প্রকাণ্ড সাপটা বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। তার লাল জিভটা লকলক করছে। ওপর থেকে হ্যাস উঁকি মেরে সাপটা দেখে শিউরে উঠল। এগুলো উভচর সাপ। জলেও থাকে, ডাঙাতেও থাকে। বিষ নেই। কিন্তু কামড়ে মাংস তুলে নিতে পারে এবং শরীরে কোথাও পাক দিয়ে মড়মড় করে হাড়গোড় ভেঙে দিতেও পারে। সাপটা বেরিয়ে দড়বড় করে নেমে পালিয়ে গেল।

ডিক নিচে রয়ে গেল। হ্যারি মরিয়া হয়ে উঠে পড়ল হ্যাসের সাহায্যে। বলল—ডিকের ওঠার দরকার নেই। বরং ডিকভায়া, ওখান থেকে হ্রদের দিকটা লক্ষ্য রাখো। অস্ত্রটাও তৈরি রাখো। শত্রুর মুণ্ডু দেখলেই ফুটো করে দেবে।

ওপরে গিয়ে একটা পাথরের আড়াল থেকে ওরা দেখল বোটটা দ্বীপের পশ্চিম দিকটা ঘুরে কোণার প্রণালীটার কাছে যাচ্ছে, যেটা হ্যাসা পেরিয়ে এসেছে একটু আগে। বোটে মাত্র চারজন লোক আছে। তাদের পোষাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তারা সরকারী লোক মোটেও নয়। প্রত্যেকের বুকে আড়াআড়িভাবে কার্তুজের বেল্ট বাঁধা, হাতে রাইফেল। যে লোকটা বোট চালাচ্ছে, তার সামনে কেটো কাঠের টবে বসানো জিনিসটা দেখেই টম অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—সর্বনাশ। ওদের মেসিনগান আছে দেখছি। কী চায় ওরা?

হ্যাস ফিসফিস করে বলল—হ্যাঁ, লাইট মেসিনগান। ওরা গিয়েসেপ্পো আর তার সঙ্গীরা—তাতে কোন ভুল নেই।

হ্যারি তার রাইফেলটা তাক করে বলল—শিগগির বলে দাও কোন্ ব্যাটা শয়তান গিয়েসেপ্পো? তার মুণ্ডুটা ফুটো করে দিই।

হ্যাস তার রাইফেলের নলটা ধরে বলল—চুপ! খবর্দার ও কাজ কেরো না এখন। কে গিয়েসেপ্পো আমি চিনি না। তোমরাও কেউ চেনো না। আমি তাকে তিমিমাছের পোষাকে দেখেছিলুম—চেনার উপায় ছিল না।

টম বলল—আমার হুকুম না পেলে গুলি ছুঁড়বে না। আগে দেখা যাক ওরা কী করে।

হ্যাস পিছিয়ে হাঁটু গেড়ে হ্রদের দিকে এসে ফিসফিস করে নিচে ডিককে বলল—শুয়ে পড়ো ডিক। ওরা প্রাণালী দিয়ে ঢুকছে। সাবধান, যেন তোমাকে দেখতে না পায়।

বেচারা ডিক অমনি শুয়ে পড়ল। একটা ঢিবির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে মুণ্ডুটা বের করে রাখল। ওর টুপিটার রঙ ধূসর। তাই ওকে দূর থেকে মানুষ বলে চেনা কঠিন হবে।

বোটটা প্রণালীর দিকে গেলে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ল কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর সেটা হ্রদে ঢুকছে দেখা গেল।

এবার টম, হ্যাস আর হ্যারি ঝটপট নিজেদের লুকিয়ে ফেলল পাথরের আড়ালে। বোটটা সোজা গিয়ে হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ভিড়ল। টম বলে উঠল—সর্বনাশ। ওরা কি পাইরেটস কেভে হানা দিতে যাচ্ছে? ওখানে গেলেই তো ক্যাপটেন বুড়োকে পেয়ে যাবে!

হ্যাস চিন্তিতভাবে বলল—তাই তো দেখছি!

হ্যারি ওর ওপর রেগে গিয়ে বলল—যাই বলো, তোমার জার্মানি বুদ্ধির গলায় দড়ি! বেনজেল্লোকে ওরা হাতালেই আমাদের কপালে লবডঙ্কাটি জুটবে! ছ্যা ছ্যা, তোমার কথায় পড়ে টমভায়াও বুদ্ধু বনে গেল।

হ্যাস বলল—আমি দুঃখিত ভাই হ্যারি! এমন সরাসরি ওরা হানা দিতে যাবে ভাবিইনি। আমাদের উচিত ছিল, এক্ষুনি কোন গোপন পথে ওই গুহাতে গিয়ে. ......
বাধা দিয়ে টম বলল—ধুত্তের। এতক্ষণ গেলে না কেন?

হ্যাস একটু হেসে বলল—বোট দেখে আমরা প্রত্যেকেই তো ঘাবড়ে গিয়েছিলুম টম। গুহায় চলে যাওয়ার কথা মাথায় আসেনি।

হ্যারি ঘোঁত ঘোঁত করে বলল—তার ফল ভোগো। তবে আমার স্পষ্ট কথা—যদি বেনজেল্লো বুড়োকে ওরা হাতায়, তোমার মুণ্ডুটি আমি ফুটো করব স্যাণ্ডাত।

বোটটা বাঁধা রইল হ্রদের কিনারায়। বন্দুকবাজরা চলে গেল। মনে হল, সুড়ঙ্গ পথটা ওরা চেনে। একটু পরে ওরা অদৃশ্য হতেই হ্যাস লাফিয়ে উঠল।—নেমে পড়, এস শিগগির। এক মুহূর্তও দেরি নয়। আগে আমাদের ওই বোটটা হাতাতে হবে। তারপর যা করার বলব। ডিক, ডিক। তুমি দৌড়ে চলে যাও আগে। বোটটার কাছে চলে যাও।

এরা তিনজনে নাবার আগেই ডিক একলাফে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল হ্রদের কিনারায়। তারপর পূবমুখে দৌড়তে শুরু করল। কিনারায় একগজেরও বেশি চওড়া সমতল জমি থাকায় হ্রদটা চক্কর দেওয়ার অসুবিধে নেই। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রণালীটা পেরোতে যা ঝক্কি। তবে ওদিকে যাবার দরকার কী? পূব পাড় ঘুরে গেলেই বোটের কাছে পৌঁছানে যায়।

হ্যাস, টম আর হ্যারিও দৌড়চ্ছিল—ডিক অনেকটা আগে। বোটের কাছে পৌঁছেই ডিক দুহাত তুলে নাচতে লাগল। বোঝা গেল, বোটটা তারই সেই হারানো ধন। প্রাণালীর পথে ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলো ওর মুখে পড়েছে। ওর বড়বড় দাঁতগুলো ঝলমল করছে। নিঃশব্দে হাসছে ডিক। হাসতে হাসতে বোটে গিয়ে বসেও পড়েছে।

দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাকি তিনজনে বোটটার কাছে হাজির হল। হ্যাস চাপা স্বরে বলল—খর্বদার ডিক, বোটে স্টার্ট দিতে যেওনা। এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাবে ওরা। তুমি বোট ছেড়ে চলে এস। তারপর দড়ি ধরে ওটা টানতে টানতে উত্তর-পূব কোণায় চলে যাও। ওই যে পাথরের খাঁজটা হ্রদের ধারে উঁচু হয়ে আছে, ওর আড়ালে লুকিয়ে রাখো। তারপর ঝটপট চলে এসো। হ্যারি, ওকে সাহায্য করো।

ডিক আর হ্যারি কথামত দড়ি ধরে মোটরবোটটা টানতে টানতে নিয়ে চলল। তারপর ঠিক জায়গায় ওটাকে লুকিয়ে রেখে দৌড়ে ফিরে এল।

সেই মুহূর্তে আচমকা কোথায় হুলুস্থুল বেধে গেল। প্রথমে কয়েকবার রাইফেলের শব্দ, তারপর একটানা মিনিটখানেক ধরে টাট টাট টাট টাট............ নির্ঘাৎ মেসিনগান চালাচ্ছে ওরা

চারজনে দৌড়ে সুড়ঙ্গ পথটার উঁচু দেয়ালটার মাথায় গিয়ে হাজির হয়। কিছু দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে। তবে আন্দাজ করা যায় কী ঘটছে। পাইরেটস কেভের পাথরটা বাইরে থেকে সরানো যায় না। এমনি কৌশলে আটকাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিতর থেকে ঠেলে সরানো খুবই সহজ অবশ্য। গিয়েসেপ্পোরা নিশ্চয় দরজাটা মেসিনগানের গুলিতে ফাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সেটা অসম্ভবই হবে। ওই প্রকাণ্ড পাথরটা প্রবালকীটের তৈরি নয়—আস্ত পাথর। ইস্পাতের মতো শক্ত।

তবে গুহার মুখে গুলি লাগলে প্রবালপিণ্ড খসে পড়ার আশঙ্কা আছে। এর ফলে মুখটা বড়ো হয়ে যেতে পারে এবং তখন পাথর ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা সহজ হবে।

চারজনে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে রইল। ওপর-ওপরে এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। যে কোন মুহূর্তেই ওদের চোখে পড়ে যাবে! টাট.....টাট.......টাট......সমানে গর্জাচ্ছে মেসিনগানটা। মনে হচ্ছে গিয়েসেপ্পোরা পাগল হয়ে উঠেছে। এই পুরোনো গুহাটা ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবে না।

কিন্তু তাহলে যে বুড়ো ক্যাপটেনও মারা পড়বে। তখন কে আর দেবে তাকে মিথেন গ্যাসের শেলগুলোর খোঁজ? হ্যাস এসব ভাবছিল। তার মনে হল, আর যাই করুক, প্রাণে বুড়োকে মারবে না গিয়েসেপ্পোরা। এতকাল তো মারেনি।

এতক্ষণে গুলির শব্দ হল। তারপর আর কোন সাড়া নেই। টম ফিসফিস করে বলল—ব্যাটাচ্ছেলেরা এ পথেই তো ফিরে আসবে। তখন আমরা ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব। অস্ত্রগুলো কেড়ে নেব। প্রত্যেকে তৈরী হও।

হ্যাস বলল—কিন্তু.......

টম চোখ পাকিয়ে বলল—না, কোন কিন্তু টিন্তু নয়। তোমার পাল্লায় পড়ে আর তোমার বুদ্ধি নিয়েই দেখছি যত বিপদ ঘটছে। ডিক, হ্যারি? তৈরি তো? ওরা চারজন আমরা চারজন। আমি শিষ দিলেই ঝাঁপ দেবে। গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেবে। প্রথমে শ্বাসনালীতে একটা মারাত্মক টিপুনি দিলেই হাতদুটো অবশ হয়ে পড়বে।

হ্যারি তার রাইফেলটা পিঠে আটকে নিল। মাটিতে হাত দুটো ঘষল। দেখাদেখি টম আর ডিকও তাই করল। হ্যাস দেখল—এরা কোন কথা শুনবে না। বড্ড গোঁয়ার এই লোকগুলো। তবে টম যা করতে বলছে, তাতে ওর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। এর নাম হল গেরিলা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সেনা দলকে ভড়কে দেওয়া যায়। হ্যাসও মাটিতে ঘষে হাত দুটো তৈরি করে নিল।

কিন্তু তখনও ওদের পাত্তা নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আকাশে নক্ষত্র ফুটল। দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল। অথচ আর কোন সাড়া শব্দ নেই। ব্যাপার কী?

হ্যাস ফিসফিস করে বলল—ওরা নিশ্চয় আমাদের গুহায় গিয়েছে। সম্ভবত ক্যাপটেন বেনজেল্লোর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। টম, বরং এভাবে অপেক্ষা না করে চলো আমরা চুপিচুপি গুহার কাছে যাই।

টম বলল—ঠিক বলেছ। অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে বসে থাকলে আর নামবার পথ খুঁজে পাব না। ডিক, হ্যারি, উঠে পড়ো।

চারজনে যে পথে উঠেছিল, সাবধানে সেই পথেই আস্তে আস্তে নেমে এল। অন্ধকার এখন বেশ ঘন হয়েছে। সুড়ঙ্গ পথে ঢুকল ওরা। তখন আর কেউ কাউকে দেখতে পেল না। এত বেশি অন্ধকার জমে উঠেছে সেখানে যে পরস্পরকে ছুঁয়ে ওরা পা টিপে টিপে এগোতে থাকল। টর্চ আছে হ্যারির কাছে কিন্তু জ্বালাতে গেলেই তো শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে।

একটু পরে সুড়ঙ্গপথের শেষ বাঁকটায় ওরা থামল। হ্যাস উঁকি মেরে দেখে বলল—কী কাণ্ড! ব্যাটারা দেখছি হ্যাসাগ জ্বেলেছে!

বাঁক ছাড়িয়ে পা বাড়াতেই পাথরের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেখা গেল। হ্যাঁ, ওরা পাথরটা সরাতে পারেনি। কিন্তু গুলির আঘাতে গুহার বাঁ দিকটা অনেকখানি ফাটিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

হ্যাসের ইশারায় প্রত্যেকে গুঁড়ি মেরে এগোল। টম ফিসফিস করে বলল—ব্যাটারা ভেবেছে কী! আমাদের ঘর দখল করে আমাদেরই হ্যাসাগ জ্বেলে ফুর্তি করছে!

হ্যাঁ—ফুর্তি করছে, তাতে কোন ভুল নেই। একপ্যাটরা সরাব ছিল। ফাঁকে চোখ রেখে দেখা গেল, বোতলগুলো থেকে চোঁ চোঁ করে চাব বদমাস বেদম সরাব গিলছে। আর বেচারা বেনজেল্লোকে পিঠমোড়া করে বেঁধে কোণার দিকে ফেলে রেখেছে।

সরাব নিকেশ করতে দেখে ডিক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল আর কী? হ্যারি তার মুখ চেপে ধরল। তখন টম ফিসফিস করে বলল—আহা রে। খাবারগুলো ব্যাটারা মেরে দিচ্ছে!

হ্যারি রাইফেলটা খুলে ফোকরে নলটা রাখতেই হ্যাস ওকে ইশারা করল। ফিসফিস করে বলল—না, না। আগে দেখা যাক, ওদের কাণ্ডটা।

রাইফেলগুলো পাশে ফেলে রেখেছে ওরা। মেসিনগানটাও একপাশে রেখেছে। হ্যাস খুঁজছিল—কোন্ লোকটা গিয়েসেপ্পো।

ততক্ষণে সরাব সব সাবাড় করে ফেলেছে ওরা। বান-রুটিতে জেলি মাখিয়ে কামড় দিচ্ছে। তারপর একজন বলল—স্যাঙাতরা গেল কোথায় বলো তো হে! এখনও পাত্তা নেই। আমার হাত যে নিসপিস করছে।

আরেকজন বলল—মনের দুঃখে জলে ডুবে মরেছে।

অন্য একজন বলল—ব্যাটাদের আয়োজনটা দেখছ? ভেবেছিল—উমব্রিয়ার সম্পত্তি হাতিয়ে দিব্যি ফুড়ুত করে কেটে পড়বে। সেগুড়ে বালি। গিয়েসেপ্পোভায়া, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

একটা লোক লাল চোখে তাকিয়ে ধমক দিল—হৈ হল্লা করো না। নিকি, তুমি টর্চ নিয়ে একবার উঁকি মেরে বাইরেটা দেখতো।

তাহলে ওই গিয়েসেপ্পো। বড় বড় চুল, গোঁফ, খোঁচাখোঁচা বিচ্ছিরি দাড়ি — বাঘের মতো তুম্বো মুখ। লোকটার ছাতি চওড়া, হাতগুলোও মস্তো লম্বা। দানব বলা যায়। বেনজেল্লোর মতোই স্বাস্থ্য—তবে বয়স ওর চেয়ে কম।

নিকি টর্চ নিয়ে টলতে টলতে গুহার দরজার দিকে আসছে। এরা তক্ষুনি গুহামুখের প্রকাণ্ড পাথরটার নিচে বসে পড়ল। একেবারে সেঁটে রইল পাথরটার সঙ্গে। যদি পাশের ফোকর গলিয়ে নিকি বেরিয়ে আসে, তাহলেই বিপদ। হ্যাস ফিসফিস করে বলল হ্যারিকে—তৈরি থাকো।

কিন্তু না—নিকি ভেতর থেকে উঁকি মেরে সুড়ঙ্গপথে টর্চের আলো ফেলল। এরা ওর নিচেই রয়েছে, তাই দেখতে পেল না।

নিকি সরে গেল। —নাঃ! কেউ কোথাও নেই।

গিয়েসেপ্পো বলল—তাহলে গেল কোথায় ব্যাটারা?

কে জবাব দিল—তখন বললুম না। সোয়াকিনের ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর একটা লঞ্চ পাঠিয়েছে উমব্রিয়ার দিকে। সেই জার্মান ডুবুরিটার খোঁজে।

গিয়েসেপ্পো বলল—লঞ্চ টঞ্চ তো আমরা দেখলুম না।—আরে সে তো দুপুর বেলার খবর। লঞ্চ আমরা আসার আগেই ফিরে গেছে। আমরা বেরিয়েছি পাঁচটা নাগাদ। এর মধ্যে জার্মানটাকে দ্বীপ থেকে নিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব।

—তাহলে বোম্বেটে বদমাসগুলোও কি লঞ্চে কেটে পড়ল?

—আলবাৎ। তবে নিজে থেকে কেটে পড়েনি। বোঝা যাচ্ছে, ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তিন ব্যাটাই তো ফেরারী আসমী।

টম ফিসফিস করে গাল দিল—তেরে কত্তাবাবা ফেরারী আসামী।

হ্যাস ভাবছিল, তাহলে বিল তার খোঁজে লঞ্চ পাঠিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত লঞ্চের লোকগুলো তো। ভাল করে না খুঁজেই ফিরে গেল। সম্ভবত, তারা যখন ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখনই লঞ্চটা এসে উমব্রিয়ার আশেপাশে দায়সারা গোছের তল্লাস চালিয়ে কেটে পড়েছে। সরকারী লোকজনের কারবারই এইরকম। ওদের মাথায় আসা উচিত ছিল যে ভাসতে ভাসতে এই প্রবাল বলয়ে আশ্রয় নিতে পারে হ্যাস।

ভিতরে এবার নিকের গলা শোনা গেল।—আরে একটা গিটারও এনেছে দেখছি ব্যাটারা। বাঃ। ভারি তুখোড় স্যাঙাত ছিল তো ওরা। হো, হো। কী আনন্দ, কী আনন্দ।

তারপর গিটারের বাজনা শোনা গেল।, গিয়েসেপ্পোর ধমকেও কোন ফল

হল না। নেশায় ওরা হুল্লোড় করতে ব্যস্ত। হেঁড়ে গলায় কে গানও গেয়ে উঠলঃ

মামদোখুড়োর বোনের ছেলে
গেল আলেপ্পোতে
আড়াই ডলার খরচ করে
বউ কিনেছে ভাই
হো হো বউয়ের নামটা কী
সেটা আস্ত এক ডাইনি
হাড় মটমট চিবিয়ে খায়
নিঝুম নিশিরাতে
হো হো গেল আলেপ্পোতে
হোঃ হোঃ হো হো! হোঃ হোঃ হো হো।

কোমর দুলিয়ে নাচ জুড়ে দিল সবাই। দেখা গেল, গিয়েসেপ্পোও নাচছে। এত আনন্দের কারণ কী? তাহলে কি বেনেজেল্লো ওদের নক্সাটার খবর দিয়ে ফেলেছে?

হ্যারি উসখুস করছিল। এবার চমৎকার সুযোগ ওদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। কিন্তু হ্যাস বাধা দিল। এখনও সময় হয়নি।

বিষণ্ণ হয়ে হ্যারি বসে রইল। ওদিকে নাচ গান তুমুল চলেছে। কতক্ষণ পরে নাচগান থামল। তিনজন ধপাস করে বসে পড়ল। বোঝা গেল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গিয়েসেপ্পো ঘড়ি দেখে বলল—আর দশ মিনিট পরে আমরা বেরোব। তোমরা আমাকে বোটে করে উমব্রিয়ায় পৌঁছে দেবে। কাছাকাছি বোট নিয়ে অপেক্ষা করবে। সোনার ইঁটগুলো আমি বয়ে নিয়ে বোটে দেব। আরেকজন ডুবুরি পেলে ভাল হত। যাকগে, কাজটা করতে হবে। উপায় কী? তারপর চলে আসব এই গুহায়। বেনজেল্লোবুড়ো। শোন—যদি ইঁটের ভেতর নক্সাটা না বেরোয়, আজ তোমার দফারফা হবে। এখনও বলছি।

কথাটা শেষ হতেই হ্যাস ফিসফিস করে বলল—তোমরা আমার সঙ্গে চলে এস শিগগির।

টম, হ্যারি, ডিক ওকে অনুসরণ করল। হ্রদের ধারে গিয়ে হ্যাস বলল—হ্যারি। ডিক। বোটটা নিয়ে এসে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দাও। জলদি। ওরা এসে পড়ল বলে।

টম বলল—কী সে।

—যা বলছি করো, হ্যারি আর সময় নেই।

হ্যারি গোঁ ধরে বলল—আমার বোট ওদের দেব? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? এই বোট কিনতে আমার বউয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হ্যাস বলল—আঃ, বুঝতে পারছ না তোমরা? ওদের দিয়েই আমরা কাজ বাগাব।

অমনি টম বুঝে ফেলল। হ্যারি ও ডিকও অবশ্য বুঝল। কিন্তু খুঁতখুঁত মন নিয়ে ওরা এগোল।

টম বলল—নাঃ তোমার বুদ্ধি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি হ্যাস ভায়া।

একটু পরে মোটরবোটটা টানতে টানতে নিয়ে এল হ্যারি ও ডিক। সেটা আগের জায়গায় একইভাবে আটকে রেখে তক্ষুনি আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টর্চের আলো দেখা গেল সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে। তারপর আলোটা হ্রদের জলে বোটের ওপর পড়ল। ওরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে এসে বোটে চেপে বসল একে একে। তারপর বোটটা আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল।

তখন হ্যাস বলল—এখন আমরা গুহায় যাব না। যতক্ষণ ওরা না ফেরে চুপচাপ এখানে বসে অপেক্ষা করব তারপর কী করতে হবে, বলে দেব।..........

এগারো
মহাপ্রলয়ের পরে

রাত তখন দশটা। বসে থাকতে থাকতে ওদের শরীরে ব্যথা ধরে গেল। তবু গিয়েসেপ্পোদের ফেরাব নাম নেই। এতক্ষণ ধরে কী করছে ওরা? হ্যাস বলল—তবে কী গিয়েসেপ্পো অধৈর্য হয়ে ইঁটগুলো বোটে বসেই ভাঙতে শুরু করেছে নকসার লোভে?

টম বলল—তাই মনে হচ্ছে! নক্সা হাতিয়ে গ্যাসের সেলগুলো জাহাজের কোথায় আছে খুঁজে বের করবে। সেটাই তো সুবিধে—দুবার হয়রান হতে হবে না।

হ্যাস একটু ভেবে নিয়ে বলল—তাহলে বরং চলো, আমরা পশ্চিমপাড়ের উঁচু পাহাড়টায় গিয়ে বসি কোথাও। বোট এলে দেখতে পাব।

—সেই ভাল। বলে টম উঠে পড়ল।

চারজনে উত্তর দিকটা ঘুরে হ্রদের পশ্চিমপাড়ে উঠতে শুরু করল। এখন টর্চ জ্বালার অসুবিধে নেই।

পাহাড়টা এদিকে ঢালু। দৌড়েই ওঠা যায়। বড় জোর একশো ফুট মাত্র উঁচু। চুড়োয় পৌঁছে টম বলল—হুঁ বোটটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওই দেখ, আলো জুগজুগ করছে।

হ্যাস কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না—আচমকা পশ্চিমদিগন্তে, সম্ভবত উমব্রিয়ার ওখানে একটা বিশাল আগুনের গোলা সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠল। মনে

হল, যেন অসময়ে পশ্চিমে সূর্য উঠেছে। এ কি কোন মহাপ্রলয়ের সূচনা? তারপর আবার একটা প্রকাণ্ড লাল গোলা জল থেকে উঠে আগের গোলাটার সঙ্গে মিশে গেল। তারপর আবার........আবার.........একটা করে গোলা উঠছে আর ক্রমে সারা দিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরই জেগে উঠল একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। যেন হাজার হাজার বাজ পড়ল এবং মেঘ ডাকতে থাকল। এতদূরে থেকেও সেই আওয়াজে কানে তালা ধরার উপক্রম হল এদের। টম বলে উঠল—ও কী? ও কিসের আগুন? কিসের শব্দ?

কেউ জবাব দিল না। আগুনের ছটায় সারা সমুদ্র ঝলমল করে উঠেছে। আর সেই বিশাল লাল গোলার মাথায় চাপচাপ কালো মেঘ পাহাড়ের মতো আকাশে উঠতে শুরু করেছে। এরা রুদ্ধশ্বাসে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকল সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের দৃশ্য।

তারপর হঠাৎ কোত্থেকে আগুনের উল্কার মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রচণ্ড ঝড়। গায়ে ফোস্কা পড়তে থাকল যেন। হ্যাস লাফিয়ে উঠল।—পালাও পালাও। উমব্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। শিগগীর, গুহার দিকে চল সব?

চারজনে দৌড়ে নামতে শুরু করল। মোটা মানুষ ডিক গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—হ্যারি। আলো দেখাও, আলো।

ওকে ধরে ওঠাল টম। তারপর হ্রদের উত্তর পাড় হয়ে দৌড়ে চলল। ঝড়টা তখন হু-হু করে প্রণালীর পথে হ্রদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। জলে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে।

সুড়ঙ্গ পথে পৌঁছোবার সময় হ্যারি ঘুরে আলো ফেলল হ্রদের দিকে। সবাই থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্যে। হ্রদের জল ফুলে ফেঁপে পাড়ে উঠে পড়েছে। আবার দৌড়তে থাকল ওরা। গুহা অনেক উঁচুতে। কিন্তু তাহলেও বলা যায় না, সমুদ্রের জল ঠেলে হ্রদে ঢুকছে। বন্যায় দ্বীপটা তলিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

ফোকর গলিয়ে ঢুকল হ্যাস। হ্যাসাগটা জ্বলছিল। প্রথমে সে পকেট থেকে ছুরি বের করে বেনজেল্লোর বাঁধন কেটে দিল। তারপর বলল—ক্যাপটেন, চলে আসুন। বান আসছে। গুহাটা ডুবে যেতে পারে। টম, হ্যারি, ডিক! তোমরা যে যা পারো, তোমাদের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। গুহার ওপরকার পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমি ক্যাপটেনকে নিয়ে যাচ্ছি।

ওরা সাধ্যমত জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে রাখল। তারপর পালা করে ওপরে নিয়ে গেল। হ্যাস ক্যাপটেন বেনজেল্লোকে ধরে আস্তে আস্তে এগোল। বেচারাকে যথেষ্ট মার দেওয়া হয়েছে আবার। পা বাড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

হ্যাস যা ভেবেছিল তাই—হ্রদের জল হু হু করে সুড়ঙ্গ পথে চলে আসছে।

ওপরে গিয়ে ওঠার পর দেখা গেল পশ্চিমের সমুদ্রে সেই টকটকে লাল আগুনটা এখন ফিকে হয়ে গেছে। তবে উৎকট গন্ধ আসছে কিসের। ঝড় কিছুটা কমেছে। কিন্তু সমুদ্রের কল্লোল আরো বেড়ে কেছে। বিস্ফোরণের চাপে চারদিকের জল কেঁপে উঠেছিল। শান্ত হতে দেরি হবে। আকাশে তারাগুলো ঢেকে সেই বিশাল মেঘটা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হ্যাসাগের আলোটা ওপরে আনা হয়েছে। তার আলোয় দেখা গে ক্যাপটেন বেনজেল্লো নিঃশব্দে হাসছে। হ্যাস বলল—ওই বিস্ফোরণ কিসের ক্যাপটেন?

বেনজেল্লো পাথরের ওপর লিখে বলার ইসারা করল। খড়িটা গুহাতেই পড়ে আছে। তখন ডিক একটুকরো পাথর কুড়িয়ে দিল ওর হাতে। লালরঙের এই পাথরগুলো আসলে প্রবালকীট জমে তৈরী হয়েছে। কতকটা শুকনো লাভার মতো। বেনজেল্লো লিখতে শুরু করল :

.........পাপী গিয়েসেপ্পো তার শাস্তি পেল। এ চক্রান্ত আমারই। ইঁটের মধ্যে দুটো নক্সা ছিল। একটা নক্সার উল্টো পিঠে অদৃশ্য কালিতে আরেকটা নক্সা আঁকা ছিল। সেটা দৃশ্য নক্সা, সেটায় মারাত্মক জায়গায় গিয়ে পড়ার হদিশ আছে। সেখানে গিয়ে একটা আংটা টানাটানি করলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। আর অদৃশ্য নক্সায় মিথেনের শেল যে কুঠুরিতে আছে, সেখানে যাবার আংটা কত নম্বর তা লেখা রয়েছে। এই আংটা টানলে একটা দরজা খুলে যাবে। গিয়েসেপ্পোকে ইচ্ছে কবলে অনেক আগেই এভাবে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারতুম। দিইনি। তার কারণ, আমি চেয়েছিলুম, ওই গ্যাসের শেলগুলো নষ্ট হওয়ার চাইতে মানুষের উপকারে লাগুক। এমন কাকেও ওই হদিশ দিতুম, যে ডাকাত বা বদমাস নয়, হ্যাসের মতো একজন মানুষ। হ্যাসকেই আমি খোঁজ দিতুম। তার আগেই গিয়েসেপ্পো এসে পড়ল। আমার ওপর অত্যাচার শুরু করল। তখন রাগের বশে ভাবলুম, ও ধ্বংস হয়ে যাক।

হ্যাস বলল—কিন্তু কতকগুলো রহস্যের সমাধান হল না ক্যাপটেন। দুটো কংকাল, মাস্তুলের নাচ, অট্টহাসি, সমুদ্রের জলে তোলপাড়, প্রচণ্ড গর্জন, আর একটা কালো পাঁচিল—এগুলো কী? তাছাড়া নীল সব আলো জলতেও দেখেছি। সেগুলো কিসের?

বেনজেল্লো আগের লেখা মুছে দিয়ে লিখল :

....সব গিয়েসেপ্পোর কারসাজি। ও নিজে ছিল পাকা ডুবুরি। খুব মাথাওয়ালা কারিগরও বটে। আমাকে সব বলেছিল সে। ওগুলো করার কারণ, উমব্রিয়ার শেলগুলো হাতাতে কেউ সাহস পাবে না এবং ভূতের গল্প ছড়াবে। কংকাল দুটোর মধ্যে স্প্রিং রয়েছে। জাহাজের ডেকে কেউ ডুবে গিয়ে রেলিঙে হাত রাখলেই একটা

কংকাল লাফিয়ে উঠে সামনে আসবে। আর অন্যটা রেখেছিল নাকি এঞ্জিনরুমের তলায়। ইঁটগুলোর খোঁজ সে পায়নি। এবার বলছি, গর্জনটা কিসের। ভেসে থাকলে কিন্তু গর্জনটা শোনা যাবে না। কতকগুলো বিশেষ কব্জায় কেউ পা রাখলেই চাপ পড়বে এবং একটুকরো লোহার পাত গিয়ে পড়বে একটা ক্যানেস্তারার ওপর। জলের ভেতর সেই চাপা আওয়াজ কাছ থেকে শুনলে ভুল হয়। আসলে কংকালটা দেখেই ডুবুরির মনে আতঙ্ক ঢুকে গেছে তো। এরপর যে-কোন আওয়াজ শুনলে আতঙ্কের ঘোরে ভূতুড়ে মনে হয়। তারপর ওই অট্টহাসি। ওটা মিথেন গ্যাসের বুজকুড়ির শব্দ। জাহাজের গায়ে আটকানো একটা তার আছে। সেটা গ্যাসের সেলের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। দড়িতে কোনরকম চাপ পড়লে গ্যাসের সেলের মুখ খুলে যায়। তখন বুজকুড়ি উঠতে থাকে প্রচণ্ডরকমের। তাছাড়া জলের চাপ বেড়ে যায় গ্যাসর দরুণ। সেই চাপে মাস্তুল দুলতে থাকে। জলের রঙও ঘোর কালো হয়ে যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায়। ডুবুরি ভাবে, কালো একটা কী এগিয়ে আসছে। এবার নীল আলোর কথা বলি! সেও গ্যাসের একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। জলের সংস্পর্শে এসে সামুদ্রিক ফসফরাসের স্বাভাবিক মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। তখন আগুনের শিখা দেখা দেয়।

টম বলল—অদ্ভুত ঘড়েল লোক তো গিয়েসেপ্পো।

ডিক বলল—কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না।

হ্যারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আমাদেরও হল না। এখন ঘরের ছেলে পোড়ামুখ করে ঘরে ফিরে যাই চলো।

ডিক বলল—কিন্তু য়াবে কী করে? পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে?

হ্যাস বলল—দেখ, এই বিস্ফোরণের নিশ্চয় তদন্ত হবে। আগামী কাল আশা করছি, ব্রিটিশ সরকার সুদান থেকে বিজ্ঞানীদল পাঠাবেন। তাঁদের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই।

আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে ওরা শুয়ে পড়ল খোলা আকাশের নিচে। দূরে পশ্চিমের সমুদ্রে তখনও আগুনের ছটা দেখা যাচ্ছিল।.......

ভোরে প্রচণ্ড বিউগলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হ্যাসের। টম উঠে দাঁড়িয়ে গাল ফুলিয়ে তার বিদঘুটে বিউগলটা বাজাচ্ছে। ডিক-হ্যারি ধেই ধেই করে নাচছে।

উত্তর-পূর্বে সমুদ্রে একটা মোটরবোট। মোটরবোটটা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

হ্যাস বলল, ম্যাকফারসন আসছে আমার খোঁজে।

ক্যাপটেন বেনজেল্লো চুপ করে বসে আছেন। চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। উনিশ বছর পরে মুক্তি এল আশ্চর্য সুন্দর এক প্রত্যূষে।

অলৌকিক আধুলি রহস্য

ইদানীং রোজ ভোরবেলা জগিং শুরু করেছি। আমাদের এই ছোট শহরে অত সকালে রাস্তাঘটে একেবারে নিরিবিলি হয়ে থাকে। তাতে শীতকাল। খেলার মাঠ পেরিয়ে নদীর ধার অব্দি গিয়ে বাড়ি ফিরতে এক কিলোমিটার দৌড় হয়ে যায়। গা ঘেমে উঠে।

আমার ভাগনে শ্রীমান ডন টের পেয়ে একদিন বলল, "চোরটাকে ধরতে পেরেছিলেন মামা?"

"চোর? কোথায় চোর?" আকাশ থেকে পড়লুম। "আমি তো জগিং করছিলুম, হতভাগা! চোর কোথায় দেখলি?"

ডন আকাশ থেকে পড়ল। "জগিং! ও মামা, জগিং মানে কী? তুমি তো দৌড়চ্ছিলে।"

গম্ভীর হয়ে বললুম, "জগিং মানে দৌড়-ব্যায়াম। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। খিদে বাড়ে। জম্পেশ রকমেব ঘুম হয়।"

ডন খুশি হয়ে বলল, "আমিও জগিং করব, মামা।"

"বেশ তো। ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে উঠিস। তোর তো সাতটার আগে ঘুমই ভাঙে না।"

পরদিন অবশ্য ওকে বিছানা থেকে টেনেই ওঠাতে হল। কিন্তু অতটুকু ছেলে। খেলার মাঠ অব্দি গিয়ে "ধুস" বলে নেতিয়ে বসল! আমি হাসতে-হাসতে ধুকুর-ধুকুর দৌড়ে নদীর ধারে রোজকার টারগেট পোড়োমন্দিব চক্কর দিলুম। তারপর খেলার মাঠে এসে দেখি. ডন। ফের পুরোদমে শুরু করেছে। মনে মনে বললুম, "ভাল! বাহাদুর ছেলে!"

তারপর টের পেলুম ব্যাপারটা। ডন আসলে পাড়ার সেই বদরাগী নেড়ি কুকুরটাকে উচিত শিক্ষা দিতে চলেছে। তার হাতে আধলা ইঁট। কুকুরটা লেজ গুটিয়ে ঝিলের ধারে রামু ধোপার গাধার পেটের তলা দিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইতে বুঝি গাধাটা অপমানিত বোধ করে চার ঠ্যাং তুলে লাফ দিল। তখন শ্রীমান বেগতিক দেখে থমকে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে বললুম, "খুব হয়েছে। তোমার দ্বারা জগিং হবে না। বাড়ি এসো।"

ডন ফিক করে হেসে বলল, "তখন অমন বসে পড়লুম কেন বলো তো মামা?"

"দৌড়ুতে পারছিলে না বলে।"

ডন বলল, "যাঃ! সেজন্যে নাকি! একটা আধুলি পড়ে ছিল যে ওখানে।"

সে আধুলিটা দেখাল। চকচকে নতুন আধুলি। বললুম, "কার পড়ে-টড়ে গেছে আর কী? ওটা দিয়ে যদি ফের ঘুড়ি কেনার মতলব করিস, গাঁট্টা লাগাব বলে দিচ্ছি। গাছে ঘুড়ি আটকাবে আর আমাকে গাছে চড়তে হবে—কক্ষণো না।"

ডন মনমারা হয়ে বলল, "তাহলে কী করব বলো না মামা?"

"বরং কোনো ভিখিরীকে দান করে দিস। পুণ্যি হবে।"

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলুম শীতের রোদে রাস্তার মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরিটা বসে আছে—রোজই থাকে। ডনকে ইশারা করলে সে গম্ভীর মুখে আধুলিটা ভিখিরির মগে ঠকাস করে ফেলে দিয়ে এল। বোঝা যাচ্ছিল, আধুলিটা নিয়ে তার কোনো মতলব ছিল।

সন্ধ্যায় এক কাপ চা নিয়ে আরাম করে বসে একটা গোয়েন্দা গল্পের পাতায় চোখ রেখেছি, ডন এসে বলল, "মামা, ও মামা! দ্যাখো দ্যাখো—সেই আধুলিটা না?"

ডনের হাতে একটা আধুলি ছিল। সেটা কুড়িয়ে-পাওয়া আধুলিটার মতোই নতুন এবং চকচকে বটে। বললুম, "সেই আধুলিটা, কী বলছিস? এটা তুই তো ঠকাস করে ভিখিরির মগে ফেললি সকালে?"

ডন চোখ বড় করে বলল, "অবাক, মামা, অবাক! পিসিমা একটা টাকা দিয়েছিল আমাকে, জানো তো? টাকাটা নিয়ে গেলুম হাবু বাবুর দোকানে খাতা কিনতে। এই দ্যাখো খাতাটা।"

সে খাতাটা দেখাল। বিশ্বাস করে বললুম, "আধুলিটা বুঝি হাবুবাবু দিলেন?"

ডন চাপা গলায় বলল, "দিলেন তো। ও মামা, এটা সেই আধুলিটা—সত্যি বলছি, দ্যাখো না ভাল করে। ঠিক সেইটে। কুড়িয়ে পেতে কতক্ষণ ধরে দেখেছিলুম না? সেই লাল ফুটকিটা পর্যন্ত। দেখতে পাচ্ছ?"

তর্ক করে লাভ নেই ওর সঙ্গে। ঝামেলা বাড়বে। হাত বাড়িয়ে বললুম, "ওটা আমায় দে। তার বদলে তোকে আট আনা দিচ্ছি।"

ডন একপা পিছিয়ে বলল, "উঁহু! এটা দিয়ে আমি ম্যাজিক করব না বুঝি?"

"বেশ, তাই করিস। যা এখন।"

ডন বলল, "তুমি বিশ্বাস করলে না তো? ঠিক আছে। কাল ভোরবেলা জগিং করবার সময় ফের এটা ভিখিরিকে দেব। দেখবে, ফের ঘুরে আসবে আমার হাতে।"

পরদিন ওকে ঘুম থেকে ওঠাতে হল না। আমাকেই বরং ওই ওঠালে। মামা-

ভাগ্নে মিলে ঠণ্ডা হিমে ভোরবেলায় ধুকুর-ধুকুর দৌড় শুরু করলুম। আজ ওর খাতিরে একটু আস্তে। নদীর ধারে পোড়োমন্দির ঘুরে খেলার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে লক্ষ করলুম ডনটা একটুও কাবু হয়নি। রহস্যটা কী?

মোড়ের অন্ধ ভিখিরিকে দেখে আধুলিটার কথা মনে পড়ল। বললুম, "হ্যাঁরে. আধুলিটা ওকে দিবি বলেছিলি যে?"

"দিচ্ছি।" বলে ডন ভিখিরির কাছে গেল।

ঠকাস শব্দ এবং ভিখিরির আশীর্বাদ শুনে বুঝলুম, মুদ্রাটি যথাস্থানে গেছে।

এদিন ছিল রবিবার। ডন একদফা পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছিল। এগারোটা নাগাদ তার পায়েব ধুপধুপ আওয়াজ শুনলুম। তারপর এক চিক্কুর—"মামা! মামা! ম্যাজিক, মামা, ম্যাজিক।" তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে সে বলল, "বলেছিলুম না। এই এই দ্যাখো।"

ওর হাতে সেই আধুলিটার মতোই চকচকে নতুন আধুলি দেখে হাসতে হাসতে বললুম, "চালাকি? কোত্থেকে নতুন একটা আধুলি এনে বলছ সেইটে?"

ডন কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, "তোমার দিব্যি, মামা। মা পান কিনতে পাঠিয়েছিল। পানওয়ালা এটা দিল। সে আমার হাতে ওটা গুঁজে দিল। তুমি দেখে রাখো না। এই লাল ফুটকিটা দেখছ—ওইটা দেখেই চিনতে পারছি।"

"ঠিক আছে। আমার কাছে থাক এটা। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখব'খন!"

ডন ছোঁ মেরে আধুলিটা তুলে নিয়ে ছিটকে সরে গেল। রাগী মুখ করে বলল, "দিচ্ছি তোমায়! অত করে মার কাছে বকুনি খেয়ে এটা ফিরে পেলুম। এ দিয়ে ম্যাজিক করব।"

পরদিন ভোরে জগিং করতে গিয়ে নদীর ধারে পোড়োমন্দির চক্কর দিচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল শ্রীমান সঙ্গে নেই। ঘুরে দেখি অনেকটা দূরে খেলার মাঠে ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেতেই ভ্যাঁ করে কলল, "আধুলিটা হারিয়ে গেছে মামা!"

রাগ করে বললুম, "বেশ হয়েছে হতভাগা ছেলে। আধুলি হাতে নিয়ে কেউ দৌড়ায়?"

ডন আমাকে খামচে ধরে থামাল। তারপর চোখ মুছতে মুছতে বলল, "খুঁজে দাও না মামা। আমার ম্যাজিক করা হবে না যে!"

ঘাসে শিশির চকচক করছে। সূর্যটা সবে বিছানা থেকে উঠে বসে হাই তুলছে। পিটপিটে চাউনি। তার ওপর উত্তুরে হাওয়ার ঠাণ্ডাহিম দুষ্টুমি। এমন সময় একটা আধুলি খুঁজে বের করা বড় কষ্টসাধ্য কাজ। ডনের খাতিরে তবু অনেক কষ্ট করতে হল। কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। ডনকে বললুম, "ঠিক এখানেই পড়েছে তার মানে কী? অন্য কোথাও ফেলেছিস তাহলে।"

ডন জোরের সঙ্গে বলল, "এখানেই!"

কিন্তু প্রচণ্ড খুঁজেও আধুলিটা পাওয়া গেল না। কাজেই আমাদের পায়ের শব্দে রাস্তার মোড়ের অন্ধ ভিখিরি নড়েচড়ে বসলেও তার মগে ঠকাস করে সেই মিঠে শব্দটা বাজল না। বেচারা নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে গেল।

মনমরা হয়ে রইল শ্রীমানও। শরীর খারাপ বলে স্কুলে গেল না। বিকেল নাগাদ ভাবলুম ছেলেটাকে চাঙ্গা করা উচিত। আমার ডাক শুনে ডন চোখ পিটপিট করতে করতে ঘরে ঢুকল। তারপর নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল. "কী?"

ওকে টেনে আদর করে বললুম, "যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। চল্, বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। মন ভাল হয়ে যাবে।

ডন ঘাড় গোঁজ করে বলল. "যাব—একটা আধুলি দাও, নতুন আধুলি না হলে নেব না কিন্তু।"

"আধুলি?" চিন্তিত হয়ে বললুম। "আধুলি যদি না থাকে, সিকি হলে চলবে না?"

ডন ঠোঁটের কোণায় কেমন একটু হাসল। "তোমার টেবিলের ড্রয়ার খুঁজে দ্যাখো না।"

টেবিলের ড্রয়ারে খুচরো পয়সা রাখি. একথা সত্য। ডনের এ খবর জানা থাকার কথা নয়—এ বাড়ির কারুরই নয়। খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেলুম একটা আধুলি। এবং চকচকে আনকোরা আধুলিটা। ডনের তর সইল না, খপ করে কেড়ে নিল। তারপর উলটে-পালটে দেখতে দেখতে আচমকা এক চিল-চিক্কুর ছাড়ল, "মামা, ও মামা! ম্যাজিক. মামা, ম্যাজিক।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী রে?"

"সেই লাল ফুটকিটা।" ডন নাচতে নাচতে বলল। "আমার আধুলি। আমার আধুলি। দ্যাখো, দ্যাখো!"

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। ওর হাত থেকে আধুলিটা নিয়ে আরও অবাক হলুম। এ কী! সত্যি সেই লাল ফুটকিওয়ালা আধুলিটা যে! কোথায় পেলুম এটা—কার, কিছুতেই মনে পড়ল না। কিন্তু জিনিসটা যে অলৌকিক এতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আর এত ঠিক এই পড়ে পাওয়া অলৌকিক আধুলি যখন ডনকে ভালবেসে ফেলেছে, তবে ডন এটা মোড়ের অন্ধ ভিখিরিকে দিক কিংবা লারিয়ে ফেলুক, আবার তার কাছে এ-হাত সেহাত ঘুরে ফিরে আসবেই। নিজেকে চেনাবার জন্যে কপালে একটা লাল ফুটকি তো থাকবেই। সুতরাং ডন দৌড়ে বেরিয়ে গেলে ওর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। এমন ভাগনের মামা হওয়াটাও তো কম গর্বের কথা নয়।

দুঃস্বপ্নের দ্বীপ

এক

আমার কুকুর জিমকে নিয়ে জ্বালায় পড়েছি দেখছি। এমন নয় যে তাকে কখনও বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতে আনি নি। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে নিয়ে কাশ্মীরের বরফ ঢাকা পাহাড়ী মুল্লুকে ঘুরেছি। কিন্তু জিমের এমন পালাই-পালাই ভাবভঙ্গি তো কখনও দেখি নি।

প্রথমে ভেবেছিলুম, একেবারে বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় এসে ওর বুঝি অসুখ-বিসুখ করেছে। আমাদের সঙ্গে আছেন ভাগ্যক্রমে প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর মুরলীধর প্রসাদ। নৈনিতালের লোক। তিনি জিমকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, জিম ইজ অলরাইট। ওর কিস্যু হয়নি। তবে কী জানেন জয়ন্তবাবু? মানুষের যেমন, তেমনি সব প্রাণীরই এই একটা ব্যাপার আছে। সব জায়গায় মন টেকে না।

ভেবে পাই নি, এমন সুন্দর জায়গায় মন না টেকার কারণ কী থাকতে পারে। চারিদিকে নীল সাগরে ঘেরা এই দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। আমাদের ক্যাম্পের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা সমতল মাঠ। সেখানে নির্ভয়ে হরিণের পাল চরে বেড়ায়। কখনও লুকোচুরি খেলতে আসে সাদা রঙের দু'একটা খরগোস। পাখিও কম নেই। ঝাঁক বেঁধে মাঠে নেমে তারা পোকামাকড় খুঁজে খায়। কিন্তু আশ্চর্য, জিমকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছি, সে অভ্যাসমতো পশুপাখিদের মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে বা তাড়া করে মজা লুটতে ছোটে না।

এমন কী, তার প্রায় নাকের ডগায় কোনো পাখি বা খরগোস বেয়াদপি করে গেলেও জিম মুখেও ধমকায় না। খালি মুখ তুলে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। তার শরীর কেমন যেন থরথর করে কাঁপে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ, সন্ধ্যার দিকে। ক্যাম্পের সামনে খোলামেলায় আগুন জ্বেলে আমরা যখন বসে গল্পসল্প করি, জিম আমার কোলে বসে মুখের ভেতরে কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে। মাঝে মাঝে যেন সে ভীষণ চমকে ওঠে।

সারারাত যতবার ঘুম ভাঙে, শুনতে পাই জিমের ওই বোবার মত চাপা অদ্ভুত আওয়াজ। রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা বলে তার গায়ে এক টুকরো কম্বল জড়ানো থাকে। দেখেছি, জিম কম্বলের ভেতর মুখটাও ঢুকিয়ে তালগোল পাকানো শরীরে

পুঁটুলির মতো গুটিয়ে রয়েছে। ভয়েই কি? কিসের ভয়? এখানে ভয় পাবার মতো কিছু দেখছি না তো।

আজ তিন দিন হলো আমরা এই দ্বীপে এসেছি। আমরা মানে, ওই ডঃ মুরলীধর প্রসাদ, আমি এবং আমাদের প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘু' কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয়। আর একজন সঙ্গীও অবশ্য আছে। সে কর্ণেলের 'পুরাতন ভৃত্য' শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। তাকে না আনলে এ অখদ্যে দ্বীপে না খেয়ে মরতে হত। তবে শুধু রান্নাবান্না নয়, ষষ্ঠীচরণ প্রহরী হিসেবও বড় কড়া লোক। খুব চালাকচতুর এবং এই প্রৌঢ় বয়সেও তার গায়ের জোরের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি।

আজও কর্ণেল ভোরবেলা ডঃ প্রসাদকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সামনের মাঠের পারে উঁচু পাঁচিলের মতো বিশাল পাহাড় দ্বীপের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বীপটাকে নাকি দু'ভাগে ভাগ করেছে পাহাড়টা। কর্ণেলেরা যান ওই পাহাড়ে।

এ দ্বীপের নাম ভেগা আইল্যাণ্ড। আর ওই পাহাড়টার নাম ওয়াকিমো মাউন্টেন। ওয়াকিমো কথাটার মানে নাকি 'বদরাগী'। পাহাড়টার এমন বিশ্রী নাম কেন? শুনেছি এ সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে আসে, তাদের বিশ্বাস, ওখানে একটা বেজায় বদরাগী দানো বাস করে। তাই মাছধরা জাহাজ এ দ্বীপের ছায়া মাড়ায় না।

কর্ণেল কি দানোটাকে জব্দ করতে এসেছেন তাহলে? মোটেও না। কর্ণেল যা বলেছেন, শুনে তাক লেগে যায়। ওয়াকিমো পাহাড়ে এক ধবণের বিচিত্র প্রাণীর বাস। প্রাণীটা নেকড়ে এবং কুকুরের মাঝামাঝি। পনের হাজার বছর আগে গুহাবাসী আদিম মানুষেরা জন্তু শিকার করে এনে গুহার ভেতর বসে মহানন্দে খেত। আর হাড়গোড় ফেলে দিত বাইরে। নেকড়েরা সেই সব হাড়গোড়ের লোভে গুহার কাছে জড়ো হত। কালক্রমে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেতে খেতে তারা শিকার করাই ভুলে গেল। মানুষ-ঘেঁষা হয়ে পড়ল। তারপর মানুষ তাদের বশ করে ফেলল। তারাই গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু মানুষের ভেতর যেমন, তেমনি জন্তুদের ভেতরেও কিছু বেয়াড়া জীব থাকে। তেমন কিছু বেয়াড়া নেকড়ে মানুষের পোষ মানল না, অথচ শিকারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তারা কী করল তখন? তারা অগত্যা পেটের জ্বালায় বাঁদর-হনুমানদের মতো উদ্ভিদভোজী—যাকে ইংরিজিতে বলে 'ভেজিটারিয়্যান' হয়ে গেল। গাছের পাতা, ফলমূল—এসব খেয়েই বেঁচে রইল।

প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা, এইসব জাত-খোয়ানো নেকড়ের বংশধর এখনও

কোথাও টিকে থাকতে পারে। কর্ণেল কোন সূত্রে খবর পেয়েছেন, ভেগা দ্বীপের পাহাড়ে নাকি সেই আজব নেকড়ে-কুকুর এখনও আছে। তাই প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদকে নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন।

আর আমি তো কর্ণেল বুড়োর ছায়াসঙ্গী। যাকে বলে ন্যাওটা। তাই আমাকেও আসতে হয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে হেলিকপ্টার আসতে ঘন্টা পাঁচেক লেগেছে। কিন্তু একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি জাগে নি। জিমকে সঙ্গে আনার কারণ, সেই আজব নেকড়ে-কুকুর বা কর্ণেলের ভাষায় 'নেকুর' যদি একটা পাকড়াও করতে পারেন, পোষা কুকুরের সামনে তার আচরণ কেমনধারা হবে, পরীক্ষা করে দেখবেন। তাছাড়া জিমের জন্য একটা জরুরী কাজও আছে। জিমকে দেখিয়ে নেকুরদের ফাঁদে ফেলার মতলব ছিল কর্ণেলের। পোষা ঘুঘু পাখির সাহায্যে ব্যাধরা যেভাবে বুনো ঘুঘু পাখি ডেকে এনে ফাঁদে ফেলে, ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু দ্বীপে এসে জিমের হাবভাব দেখে কর্ণেল আপাতত সে মতলব কাজে লাগাচ্ছেন না। লাগাতে চাইলে আমিও আপত্তি করতুম।

আজ তিন দিনের দিন একটা সন্দেহ জেগেছে। জিম কি তাহলে 'নেকুরের' ভয়ে এমন অস্থির?

কর্ণেলের কাছে কথাটা তুলতে হবে। তবে জিম শক্তিমান এ্যালসেসিয়ান। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। দশাসই গতর। একবার একজন খুনে গুণ্ডাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। জিমের মতো সাহসী দুর্দান্ত কুকুর শাকপাতা-খেকো নেকুরকে ভয় পাবে বলে মনে তো হয় না।

কিন্তু কিছু বলাও যায় না। গরিলাও তো মাংসাশী প্রাণী নয়। অথচ গরিলাকে সিংহও ভয় পায়।

দুই

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সকালে ক্যাম্পের সামনে চেয়ার পেতে বসে কফি খাচ্ছি। ষষ্ঠীচরণ তার কিচেন-তাঁবুর সামনে খোলামেলায় পিকনিকের উনুনের মতো উনুন বানাতে ব্যস্ত হয়েছে, কারণ কেরোসিন তত বেশি সঙ্গে আনা হয় নি এবং কতদিন থাকতে হবে, তার ঠিক নেই। জিম আমার চেয়ারের পায়া ঘেঁষে বসে আছে—মুখটা বেজায় বিষন্ন। হঠাৎ ষষ্ঠীচরণ কাজ ফেলে আমার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে একটু হেসে বলল, ছোট সায়েব যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।

বললুম, অত বিনয়ের অবতার তো তোমায় কোনোদিন দেখি নি ষষ্ঠী। ব্যাপারটা কী?

ষষ্ঠীচরণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলল, আজ্ঞে, আমার বড্ড গা বাজছে।

অবাক হয়ে বললুম, সে কী হে ষষ্ঠী! তুমি অমন ডানপিটে সাহসী মানুষ। তোমার গা বাজছে মানে?

ষষ্ঠীচরণ আরও গলা চেপে বলল, এ দ্বীপটায় অমানুষ থাকে আজ্ঞে।

অমানুষ মানে? হাসতে হাসতে বললুম। ও ষষ্ঠী! তুমি কি ভূতের ভয় পেয়েছ?

ষষ্ঠীচরণ এবার বসল। চারিদিকটা দেখে নিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, এই মাত্তর আমার ওপর টুপটুপ করে ঢিল পড়ছিল। আপনার দিব্যি ছোট সায়েব। মিথ্যে কথা আমায় কখনও বলতে শুনেছেন?

মার্চ মাসের উজ্জ্বল সকালবেলা। আকাশে মেঘের কুটোটিও নেই। তাঁবুর পেছনে অবশ্য একটু তফাতে ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। কিন্তু সামনেটা ফাঁকা। সবুজ ঘাসের মাঠ ওয়াকিমো পাহাড় পর্যন্ত ছড়ানো এই ফাঁকা জায়গায় দিনদুপুরে ষষ্ঠীকে ভূতেরা ঢিল ছুঁড়ে নাকাল করেছে, ভাবতেই হাসি পায়। আমি হো-হো করে হেসে বললুম, কই, চলো তো দেখি —ভূতের কেমন সাহস!

ষষ্ঠীচরণ বলল, বন্দুকটাও সঙ্গে নিন স্যার।

পা বাড়িয়ে বললুম, ভুতের গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধে না। কই, চলো দেখি। আয় জিম!

জিম যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার সঙ্গে এগোলো। মাত্র তিরিশ হাত তফাতে ষষ্ঠীচরণের কিচেন-তাঁবু। ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার গায়ে টুপটুপ করে কী যেন পড়ল কয়েকবার। ঠাহর করে দেখি, সেগুলো ক্ষুদে মার্বেলের মতো গড়নের গোল ঢিল। চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কাকেও দেখতে পেলুম না। দৌড়ে ওই তাঁবুর পেছনে ঢুকলুম। কেউ কোথাও নেই। ওদিকটা প্রায় পঁচিশ গজ অব্দি ফাঁকা। তারপর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে ঢিল ছুঁড়ছে কি? তারা কারা?

জিম আমার পেছন-পেছন এসে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে তাকে ইশারা করলুম। কিন্তু জিম কথা মানল না। শুধু লেজটা গুটিয়ে কেমন চাপা শব্দ করতে লাগল।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এসে বলল, ঢিলটা পরখ করে দেখুন তো স্যার! এ তো ঢিল বলে মনে হচ্ছে না।

হাতের তালুতে রেখে দেখলুম, খুব হালকা ধূসর রঙের গুটি। গুটিটা শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি। সাধুবাবারা গাঁজা খাওয়ার জন্য নারকোল ছোবড়ার যেমন ক্ষুদে গুলতি বানায়, ঠিক তেমনি। কিন্তু এগুলো আরও ছোট। ওজনে হালকা হলেও দৈবাৎ চোখে লাগলে বিপদ হতে পারে।

ততক্ষণে ষষ্ঠীচরণ আরও কয়েকটা ভূতের ঢিল খুঁজে পেয়েছে। সেগুলো সে একটা কাগজের মোড়কে রেখে বলল, বড় সায়েবকে দেখাতে হবে। কী বলেন স্যার?

ভূত-পেরেতে আমার বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় এভাবে ভূতুড়ে ঢিল ছুঁড়ে কারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

দৌড়ে আমার তাঁবু থেকে রাইফেল নিয়ে বেরুলুম। জিম অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনুসরণ করল। ষষ্ঠীচরণ ব্যাপার দেখে আরও ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! আমার কী হবে?

কিচ্ছু হবে না। ভূতেরা ঢিল ছুঁড়লে। তুমিও ঢিল ছুঁড়বে। বলে যেদিক থেকে ঢিলগুলো এসেছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলুম।

কিন্তু আর ঢিল ছুঁড়ল না কেউ। ঝোপজঙ্গল দুর্ভেদ্য বললেই হয়। ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। চোখে পড়ল, বড় বড় পাথরও রয়েছে জঙ্গল জুড়ে। একখানে প্রকাণ্ড একটা পাথর জঙ্গলের বাইরে অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে দেখে সেখানে গেলুম। প্রথমে জিমকে তুলে দিলুম পাথরটার ওপর। তারপর আমি উঠলুম;

জঙ্গলের মাটিটা ক্রমশ ওদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি হল। ওই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন আমাকে দেখছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি না, অথচ তারা আমাকে দেখছে—অস্বস্তিটার কারণ এই।

কিন্তু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছিল না।

তবু হলফ করে বলতে পারি। একদল অদৃশ্য আজব প্রাণী যেন আড়াল থেকে আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। কিছুতেই এ অনুভূতি মন থেকে তাড়াতে পারলুম না।

তারপর জিম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। আমাকে ফেলে রেখে লাফ দিয়ে পাথর থেকে নামল। তারপর লেজ গুটিয়ে গলার ভেতর অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে খোলা ঘাস জমির ওপর দিয়ে তাঁবুর দিকে দৌড়ল। আমি রেগেমেগে চিৎকার করে ডাকলুম, জিম! জিম! কী হচ্ছে! এই জিম।

জিম কানে করল না। কিচেন-তাঁবুর পাশে ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। তার হাতে একটা বল্লম কিংবা লাঠি। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। জিম সটান গিয়ে আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে ঘুরে ছিলুম জিমের জন্যে। এবার জঙ্গলের দিকে ঘুরে চমকে উঠলুম।

আন্দাজ গজ বিশেক দূরে নীচে এমনি একটা পাথরের পাশে তিনটে বিদঘুটে প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর রোদ্দুর পড়েছে বলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তারা মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। গলা কাঠির মতো। মাথা তেকোণা এবং প্রকাণ্ড। নীচের ধড়টা ঝোপের ভেতর বলে বোঝা যাচ্ছে না কেমন। সবচেয়ে অদ্ভুত ওদের চোখ। তোকোণা মাথায় দুটো গোল রঙীন কাচের মতো মস্তো চোখের রঙ কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে উঠছে।

আমার মাথায় পলকে ভেসে এল, ওরা যেন অতিকায় পিঁপড়ে। কিন্তু পিঁপড়েরা কি অমন খাড়া দাঁড়াতে পারে মানুষের মতো?

ভয় হল, ওরা আমাকে আক্রমণ করবে না তো? তাই রাইফেল তাক করলুম।

অমনি প্রাণীগুলো গা ঢাকা দিল পাথরের আড়ালে। বুঝলুম, জিম কেন ভয় পেয়েছে। এও বুঝলুম, ঘাসের গুলতিগুলোও কারা ছুঁড়ছিল।

তিন

বেলা দুটোয় কর্ণেল এবং ডঃ প্রসাদ ঘেমে-তেতে ফিরলেন। নেকুরের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পান নি। তবে ওয়াকিমো পাহাড়ের অনেকটা চিনে ফেলেছেন। পাহাড়টা যত দুর্গম দেখায়, তত কিছু নয়। সহজে ওঠা যায় এবং যতদূর খুশি ঘোরাঘুরি করা যায়।

ঘাসের গুলতি আর পিঁপড়ে মানুষের কথা শুনে প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ তো ভীষণ উত্তেজিত। কর্ণেল বললেন, বোঝা গেল, কেন ভেগা দ্বীপ ভুতুড়ে দ্বীপ বলে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত হয়েছে। ক'বছর আগে এক জাহাজের কাপ্তেন আমাকে এখানকার পিঁপড়ে-মানুষের কথা বলেছিলেন। বিশ্বাস করি নি। এখন দেখা যাচ্ছে, কথাটা সত্যি।

ডঃ প্রসাদ বললেন, কর্ণেল! নেকুর থাক্। বরং আমরা পিঁপড়ে-মানুষের দিকে মন দিই।

আমি বললুম, একটা কথা বুঝতে পারছি না। এই ঘাসের গুলতির রহস্যটা কী?

কর্ণেল বললেন, এগুলো পিঁপড়ে-মানুষদের অস্ত্র। পোকামাকড় ওদের খাদ্য। এই গুলতি ছুঁড়ে ওরা পোকামাকড়কে কাবু করে। বুঝলে?

হাসতে হাসতে বললুম, ব্যাটারা আমাদেরও গুলতি ছুঁড়ে কাবু করবে ভেবেছে। একটা মানুষের মাংসে ওদের বছর চলে যাবে কি.না।

ষষ্ঠীচরণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কথা শুনছিল। আতঙ্কে সে বলে উঠল, ওরে বাবা।

কর্ণেল সকৌতুকে বললেন, ষষ্ঠী। তোমার গা-গতর দেখে ওদের বেজায় লোভ হয়েছে মনে হচ্ছে। নইলে প্রথম তোমার ওপর গুলতি ছুঁড়ল কেন ওরা?

ষষ্ঠীচরণ আরও ভয় পেয়ে করুণ স্বরে শুধু বলল, ওরে বাবা।

কিছুক্ষণ পরে কর্ণেল আর ডঃ প্রসাদ একটা ফাঁদ নিয়ে বেরুলেন। যেখানে আমি পিঁপড়ে-মানুষদের দেখেছি, সেখানে কোথাও ফাঁদটা পেতে রাখবেন। সঙ্গে ষষ্ঠীচরণকেও নিয়ে গেলেন। সে দা দিয়ে কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে চলার রাস্তা বানাবে। যা দুর্গম জঙ্গল।

আমি রইলুম তাঁবুর পাহারায়। জিম সেই যে তাঁবুর ভেতর খাটের তলায় ঢুকেছে, আর বেরুবার নাম করে না। তার ওপর রাগ হচ্ছিল। খুব বকাবকি করলুম তাকে ভীতু বলে। শাসালুম, কলকাতায় ফিরে বেচে দেব ব্যাটাচ্ছেলেকে। জিম গ্রাহ্য করল না। শুধু গলার ভেতর সেই চাপা কান্নার মতো আওয়াজ করল।

বিকেল নেমেছে। গুলিভরা রাইফেল কাঁধে রেখে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে লক্ষ্য রেখে সান্ত্রীর মতো পায়চারি করছিলুম।

দূরে একপাল হরিণ চরছিল। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাচ্ছিল। একসময় উত্তরদিকে জঙ্গলের মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড বেলুন দেখতে পেলুম। হলুদ রঙের বেলুনটা নিঃশব্দে ওদিকে কোথাও আস্তে আস্তে নামছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। বেলুনটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হলে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। এই নির্জন আজব দ্বীপে বেলুন নামাটা বড় রহস্যময়।

তাঁবুর দরজার পর্দা শক্ত করে বেঁধে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটা দেখতে। যেদিকে পিঁপড়ে-মানুষ দেখেছিলুম, এটা তার উলটো দিকে। ওদিক দিয়েই আমরা এ দ্বীপে ঢুকেছি। আমাদের হেলিকপ্টার ওদিকে সমুদ্রতীরে বালির বীচে নেমেছিল। যখন আমাদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় হবে, তাঁবুর ভেতর রাখা বেতার যন্ত্রে খবর পাঠাবেন কর্ণেল। তাহলে ওঁর বন্ধু এক সামরিক অফিসার হেলিকপ্টারটা নিয়ে আসবেন দ্বীপে।

জিমকে নাড়ানো যাবে না। তা না হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম।

জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে চললুম। একটু পরেই জঙ্গলের ওধারে ঢালু পাহাড়ী জমি নীচে সমুদ্রের বীচে গিয়ে মিশেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, বেলুনটা চুপসে বালির ওপর পড়ে রয়েছে। বেলুনের তলায় দড়িদড়া থেকে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড বাস্কেটের মত আসন। একটা বেঁটে গাব্দা মোটা লোক সবে বেরুচ্ছে। তার চেহারা চীনাদের মতো। কোমরে বাঁধা একটা লম্বাটে রিভলবার। লোকটাকে দেখে পছন্দ হল না। কেমন খুনে মার্কা চেহারা।

বেলুন সেভাবেই পড়ে রইল। লোকটা এদিকে ঘুরে ঢালু জমিটা বেয়ে উঠতে থাকল। তখন আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

সে জঙ্গলে ঢুকে পশ্চিমে এগোলো। তাকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ফাঁকা মাঠের দিকে না গিয়ে সে সমুদ্রের সমান্তরালে জঙ্গলের ভেতরে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা পাথরের ওপর উঠল। তারপর তিনবার হাততালি দিল।

জঙ্গলের ভেতর ছায়া ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর ক্রিয়াকলাপ। মিনিটখানেক পরে যা দেখলুম, আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্ন, না সত্যি সত্যি ঘটছে!

পাথরের ওপাশ থেকে এক দঙ্গল পিঁপড়ে-মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে মুঠো মুঠো কী সব জিনিস ছড়িয়ে দিল। আর পিঁপড়ে-মানুষগুলো কাড়াকাড়ি করে তা কুড়িয়ে খেতে থাকল। একটু পরে লোকটাকে দেখলুম ওদের সঙ্গে চলেছে। আমি আড়ালে-আড়ালে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পাথরের কাছে এসে ওদের হারিয়ে ফেললুম। ওরা যেন বেমালুম উবে গেছে।

এদিক-ওদিক সাবধানে খোঁজাখুঁজি করেও ওদের পাত্তা পেলুম না। ততক্ষণে পশ্চিমে ওয়াকিমো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। জঙ্গল থেকে দক্ষিণে এগিয়ে ফাঁকা মাঠটায় পৌঁছুলুম। তাঁবুর দিকে প্রায় দৌড়ে চললুম।

জিমের জন্যে ভাবনা হচ্ছিল।

আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। দরজার পর্দা ছেঁড়া। শুধু ছেঁড়া নয়, কুটিকুটি করে কেটে কেউ বা কারা ছড়িয়ে রেখেছে।

ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলুম, জিম। জিম!

জিমের সাড়া নেই। ক্যাম্প-খাটের তলা ফাঁকা। টর্চ জ্বেলে তাঁবুর ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলুম। জিম নেই।

রাগে দুঃখে বাইরে বেরিয়েছি। কর্ণেলদের সাড়া পাওয়া গেল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ওঁদের দেখা যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছেন তাঁবুর দিকে।

চার

কর্ণেল তাঁর ধুরন্ধর গোয়েন্দাবুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, পিঁপড়ে-মানুষরাই জিমকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে হলে পিঁপড়ে-মানুষদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। কর্ণেলের ধারণা, জিমকে মেরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। আপাতত সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

এ রাতেও জ্যোৎস্না ছিল। আমরা চুপিচুপি একটা কাজ সেরে ফেললুম। সমুদ্রতীরের সেই বেলুনটা গুটিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে এলুম তাঁবুতে। তারপর পালাক্রমে রাইফেল হাতে পাহারা দিলুম। কিন্তু রাতে কোনো ঘটনা ঘটল না।

ভোরবেলা কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন, ব্যাটাচ্ছেলেরা ফাঁদটাকে কুটিকুটি করে কেটেছে। তবে লুকিয়ে রাখা ক্যামেরায় ছবিগুলো উঠেছে। কর্নেলের ক্যামেরার কীর্তিকলাপ আমার জানা। অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে দেখালেন। পিঁপড়ে-মানুষরা ফাঁদ কীভাবে দাঁত দিয়ে কাটছে, তার পরিস্কার ছবি উঠেছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমি, কর্নেল ও ডঃ প্রসাদ বেরিয়ে পড়লুম উত্তরদিকের জঙ্গলে—যেখানে কাল সন্ধ্যায় বেলুনের একটাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

সেই পাথরের কাছে গিয়ে দিনের আলোয়একটা ব্যাপার দেখতে পেলুম। পাথরের গায়ে সাদা আঁকিবুঁকি রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষদের ছবি আঁকার শখ? নাকি ওতে কিছু লেখা রয়েছে? তাহলে স্বীকার করতে হয়, ওরা মানুষের মতো লেখাপড়াও করে।

প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ হেসে উড়িয়ে দিলেন। কর্নেল হাঁটু গেড়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে ও ঘাসে কিছু খুঁজছিলেন। ওই অবস্থায় বাঁ দিকে এগিয়ে আরও একটা বড় পাথরের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলেউঠলেন, পেয়েছি! পেয়েছি!

ডঃ প্রাসাদ বললেন, কী পেয়েছেন কর্নেল?

কর্নেল কোনো জবাব না দিয়ে পাথরটার ওপর উঠতে শুরু করলেন। তারপর দেখি, উনি হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কী দেখার পর ইশারায় আমাদের ডাকলেন। ডঃ প্রসাদ আর আমি পাথরে উঠে ওঁর মতো উপুড় হতেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলুম।

পাথরের ওদিকে ঢালু হয়ে মাটিটা নেবে গেছে এবং একটা বিশাল গর্তের মতো সমতল জায়গায় অসংখ্য প্রকাণ্ড উইঢিবির মতো ঢিবি রয়েছে। ঢিবির দরজা আছে এবং জানালার মতো ফোকরও আছে কয়েকটা। ঢিবিঘরের ভেতর থেকে পিঁপড়ে-মানুষরা বেরুচ্ছে, আবার ভেতরে ঢুকছে। একখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল পিঁপড়ে-মানুষ। মধ্যিখানে একটা বেদীমতো উঁচু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। ওর মাথায় ঘাসের মুকুট। মুকুটে রঙীন পালক গোঁজা এবং একটা উজ্জ্বল মণির মতো কী জিনিস—তা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, বেদীর নীচে ঘাসের মোটা দড়িতে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেলুনের লোকটা।

আমরা দম আটকানো ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ওই আজব দৃশ্য দেখতে থাকলুম। তারপর কানে এল, পিঁপড়ে-মানুষেরা পোকামাকড়ের ডাকের মতো চাপা

ক্ষীণ শব্দে কথাবার্তা বলছে। সে শব্দ এত চাপা যে মনে হচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও হাজার হাজার পোকামাকড় ডাকছে।

তারপর যা দেখলুম, আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কী—কর্ণেল টেনে ধরে ফের শুইয়ে দিলেন।

সামনেকার একটা ঢিবিঘর বেশ বড়ো—প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু এবং ফুট তিনেক চওড়া। সেটার রঙ পাটকিলে। সেটা নিশ্চয় রাজার বাড়ি। সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে পিঁপড়ে-রক্ষীরা আমার জিমকে বের করে আনছিল।

পেছনে আরেকটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় রানী। কিন্তু জিম যেন মড়া। টুকটক করে তাকাচ্ছে। নির্জীব অবস্থা।

রানী বেদীতে উঠে রাজার পাশে দাঁড়ল। জিমকে পিঁপড়ে রক্ষীরা তাদের পায়ের কাছে বেদীর ওপর শুইয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য, জিম ছাড়া পেয়েও তেমনি নির্জীব হয়ে পড়ে রইল।

এবার রানীকে দেখলুম দু'হাত তুলে জোরে নাড়ছে। তারপর ঢিবি রাজবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা অদ্ভুত প্রাণী। ধূসর রঙের হায়নার মতো দেখতে। কিন্তু অত কুৎসিত নয়। বরং নেকড়ে বলে মনে হল। পিঁপড়ে রানীর মাথাতেও মুকুট আছে। মুকুটে ফুল গোঁজা। রানী একটা ফুল মুকুট থেকে নিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রাণীটা বেদীতে উঠে খপ করে ফুলটা মুখে পুরল। চিবুতে থাকল। তারপর জিমের গা শুঁকতে শুরু করল।

ডঃ প্রসাদ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, নেকুর! নেকুর!

নেকুর তাহলে পিঁপড়ে-মানুষদের কাছে পোষ মেনেছে! অবাক হয়ে নেকুর দেখতে থাকলুম। জন্তুটা জিমকে যেন আদর করছে। জিম তেমনি নিঃসাড়।

জিমের চারপাশে ঘুরে নেকুরটা খেলা করতে থাকল। সবাই এবার ভিড় করে খেলা দেখছিল। ঢিবিঘরগুলো থেকে ছোটবড় সব পিঁপড়ে-মানুষ ভিড় জমিয়েছে ততক্ষণে। এই সময় কর্ণেল ফিসফিস করে বললেন, সাবধানে নেমে এস তোমরা। ঢিবিঘরগুলোর পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তারপর কী করতে হবে, বলে দেব'খন।

সাবধানে তিনজনে পাথরের টুকরো আর খাঁজের আড়ালে আড়ালে নীচে নেমে গেলুম। বুঝলুম, এই সমতল বিশাল গর্তমতো জায়গাটা কোন যুগের আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। ঢিবিঘরের পেছনে ঝোপের আড়ালে তিনজনে বসে পড়লুম।

তারপর দেখি, কখন ওদের অজান্তে বেলুনের লোকটা দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাক করে বেমক্কা রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল দু'বার।

পলকের মধ্যে হুলুস্থুল পড় গেল। পিঁপড়ে-মানুষরা পিলপিল করে এদিকে-ওদিকে ক্রেটারের কিনারায় ঢালু পাড় বেয়ে উঠল এবং পালিয়ে গেল। রাজা ও রানী যেন হতভম্ব। স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা বেদীর ওপর লাফ দিয়ে উঠল এবং রাজার মুকুট ধরে টানাটানি শুরু করল।

নেকুরটা জিমকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার আচমকা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। রিভলবার ছিটকে পড়ল নীচে। নেকুরটা ওর গলা কামড়ে ধরেছে। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে হাত-পা ছুঁড়ছে।

কর্ণেল বলে উঠলেন—চলে এস সবাই!

আমরা যেই দৌড়ে গেছি, রাজা-রানী তীরের মতো ছুটল উল্টোদিকে। বেদীর কাছাকাছি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে নেকুরটাও দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্ণেল বেলুনের লোকটার কাছে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। ওর গলাটা ফাঁক হয়ে গেছে, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ওকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। এক মিনিটের মধ্যে হাত-পা খিঁচিয়ে ওর দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

জিম আমাকে দেখে এতক্ষণে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। ওকে দু'হাতে বুকের কাছে তুলে নিলুম। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কর্ণেল লোকটার পকেট হাতড়ে একটা নোটবই পেলেন। চীনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। নোটবইটা নিজেব পকেটে ঢুকিয়ে কর্ণেল বললেন, আসুন ডঃ প্রসাদ, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। বেচারী পিঁপড়ে-মানুষদের বিব্রত করে লাভ কী? ওদের কচি বাচ্চারা নিশ্চয় ঘরে আছে। ওরা না ফিরলে সেগুলো না খেয়ে মারা পড়বে।

ঠিক তাই। ঢিবিঘরের দরজায় ক্ষুদে পিঁপড়ে-মানুষরা উঁকি দিচ্ছিল দেখে মায়া হয়। আমরা চলে গেলে ওদের মা-বাবা ফিরে এসে খেতে দেবে। এ-বেলা হয়তো বেলুনের লোকটার মাংস দিয়েই পিঁপড়েপুরীতে বড় রকমের একটা ভোজ হবে।

পাঁচ

তাঁবুতে ফিরে দেখি আরেক কাণ্ড। ষষ্ঠীচরণ বন্দী। কিচেন-তাঁবুর ভেতর তার ক্যাম্পখাটে ওকে কারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যা দিয়ে বেঁধেছে, তা শক্ত ঘাসের দড়ি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মুখে কথা নেই।

কর্ণেল একটা ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে ওকে মুক্ত করলেন। তখন ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জব্বর একটা হাই তুলল।

বললুম, ব্যাপার কি ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ বলল, খুব ঘুম পেয়েছিল স্যার।

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে বললুম, কিন্তু তোমায় অমন করে বেঁধেছিল কারা?

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণের যেন খেয়াল হল। কাটা দড়িগুলো দেখে নিয়ে বলল, তাহলে আমাকে সত্যি সত্যি বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা? আমি ভাবছি, স্বপ্ন দেখছিলুম! ওরে বাবা। এ কি বিদঘুটে জায়গায় এসে পড়েছি!

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, তুমি নিশ্চয় আরাম করে খাটে শুয়েছিলে?

ষষ্ঠীচরণ জিভ কেটে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মাফ করে দিন। আপনারা যাওয়ার পর কেমন ঢুলুনি পেয়েছিল। ভাবলুম একটু শুয়ে নিই। রাত্তিরে তরাসে ঘুম হয় না কিনা।

কর্নেল বললেন, ভাগ্যিস, তোমাকে পিঁপড়ে-মানুষরা ধরাধরি করে জিমের মতো বয়ে নিয়ে যায় নি। তাহলে আজ দুপুরের খাওয়া-দাওয়া আর জুটত না আমাদের।

ষষ্ঠীচরণ ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! তারপর সে ব্যস্তভাবে উনুন ধরাতে গেল।

আমরা কর্ণেলের তাঁবুতে গেলুম। ডঃ প্রসাদ বললেন, লোকটার নোট বইয়ে নিশ্চয় সব কথা লেখা আছে। চীনা ভাষা জানলে ভাল হত। কিন্তু.........

কথা কেড়ে কর্ণেল বললেন, আমি অল্পস্বল্প জানি চীনাভাষা। দেখি, কী লেখা আছে?

কর্ণেল মিনিট দশেক ধরে নোটবইটা নিয়ে মেতে রইলেন। আমরা দুজনে চুপচাপ কৌতূহল নিয়ে বসে রইলুম। তারপর কর্ণেল বললেন, লোকটার নাম সান ওয়ান-সু। হংকং-এ বাড়ি। কীভাবে ভেগা দ্বীপের পিঁপড়ে-মানুষদের কথা জেনেছিল, লেখা নেই। তবে এটুকু লেখা আছে, মোট তিনবার এসেছে এর আগে। পিঁপড়ে-মানুষদের রাজার মুকুটে যে বহুমূল্য মণি দেখেছি আমরা, সান ওয়ান-সু ওটা হাতাতে চেয়েছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, ওদের সঙ্গে ভাব করল কী ভাবে, লেখা নেই?

কর্ণেল বললেন, আছে। প্রথমবার এসে ওদের গতিবিধি জেনে গিয়েছিল আড়াল থেকে। দ্বিতীয়বার সঙ্গে এনেছিল একটা প্রকাণ্ড কেক।

বললুম, কেক দিয়ে পিঁপড়ে-মানুষদের সঙ্গে ভাব করেছিল? ভারি বুদ্ধিমান তো।

কর্ণেল বললেন, হ্যাঁ। তৃতীয়বার এনেছিল এক বস্তা চিনি।

বললুম, কিন্তু এবার তার সঙ্গে ছিল না। আমি দেখেছি।

কর্ণেল হাসলেন। বললেন, এই চতুর্থবার সে যা এনেছিল, তা বেলুনের বাস্কেটে এখনও আছে। ওই যে দেখেছ প্যাকেট-বাঁধা জিনিসটা, ওটা লজেঞ্চুস।

আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। কর্ণেল ফের বললেন, প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে কেন যায় নি, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমার মনে হচ্ছে, পিঁপড়ে-মানুষদের রাজাকে সে সমুদ্রের ধারে তার বেলুনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হয়তো বলেছিল, ওখানে গেলেই রাজাকে উপহারটা দেবে। তার মতলব ছিল, ওইভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মণিটা কেড়ে নিয়ে বেলুনে চড়ে পালাবে। কিন্তু পিঁপড়ে-মানুষরা বুদ্ধিমান। ওর মতলব টের পেয়েছিল।

আমার বুদ্ধি খেলল এবার। বললুম, উঁহু। তা নয়, বেলুনটা আমরা নিয়ে এসেছিলুম বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যখন পিঁপড়ে-মানুষরা কিছু পায় নি, তখন রেগে গিয়ে ওকে বন্দী করেছিল।

কর্ণেল সায় দিয়ে বললেন, মন্দ বলো নি জয়ন্ত। সম্ভবত........

কর্ণেলের কথা হঠাৎ বন্ধ হল। উনি কোণের দিকে গুটিয়ে রাখা বেলুনটার দিকে হঠাৎ এগিয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, সর্বনাশ! বেলুনের অবস্থাটা কী করেছে! কুটিকুটি করে রেখে গেছে যে।

আমি ও ডঃ প্রসাদ হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলুম। বেলুনের ভাঁজকরা রবারটা আর আস্ত নেই। ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে। তার মানে বেলুনটা আর ওড়ানো যাবে না। শুধু দোলনার মতো বাস্কেটটা টিকে আছে। তার মধ্যে বসার আসন, লজেন্সের প্যাকেট, অল্পস্বল্প কলকব্জা রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষরা সে সব ছোঁয়নি। লজেন্সের প্যাকেটটা অন্তত নিয়ে পালানো উচিত ছিল। কেন নেয় নি?

ডঃ প্রসাদ একটু হেসে বললেন, আমরা লজেন্সগুলো দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করব। কী বলেন কর্ণেল?

কর্ণেল গম্ভীর মুখে বললেন, ওই লজেন্সে তীব্র বিষ মেশানো আছে, ডঃ প্রসাদ।

আমরা দুজনে আঁতকে উঠলুম। বললুম, সে কী! কী ভাবে বুঝলেন?

কর্ণেল বললেন, ওই দেখ, কত ক্ষুদে পিঁপড়ে আর পোকামাকড় ঘরে পড়ে রয়েছে। তাই দেখে পিঁপড়ে-মানুষরা প্যাকেটটা ছোঁয় নি। এবার আশা করি বুঝতে পারছ, লেকটাকে কেন ওরা অমন অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিচ্ছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, সর্বনাশ! পিঁপড়ে-মানুষরা দেখছি ভারি ধূর্ত। আমরা বেরিয়ে গেছি, আর ওরা সেই ফাঁকে এত সব কাণ্ড করেছে! তার মানে, ওরা সারাক্ষণ আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। কিন্তু ওদের আস্তানা থেকে আমরা এতদূরে রয়েছি। আমরা ওদের আস্তানায় পৌঁছবার আগেই অত তাড়াতাড়ি কী ভাবে ওরা এখানে এল এবং ফিরে গেল?

কর্ণেল বললেন, সেটা একটা রহস্য বটে। আমার মনে হচ্ছে, এখানে কোথাও একটা সিধে পথ আছে, মাটির তলায়-তলায়। অর্থাৎ সুড়ঙ্গ পথ। খুঁজে দেখা যাক।

তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম তিনজনে। জিম আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। নিভে যাওয়া আগ্নেগিরির ক্রেটার অর্থাৎ পিঁপড়ে-মানুষদের বসতি এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে মাইলটাক দূরে। ওদিকটা জঙ্গল আর পাহাড়ে বড় দুর্গম দেখাচ্ছে।

এইসময় হঠাৎ জিম একটা চাপা গরগর আওয়াজ করল। আগের আতঙ্ক মেশানো আওয়াজ। তারপর এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলুম।

আমাদের সামনে খোলামেলা ঘাসের মাঠে আচম্বিতে পিলপিল করে কালো রঙের পিঁপড়ে-মানুষরা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। অসংখ্য জায়গা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ আর তাদের সঙ্গে সেই নেকুরের পাল।

বুঝলুম অজস্র গর্ত ছিল ঘাসের আড়ালে। ওগুলো সুড়ঙ্গ পথ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গোটা মাঠ জুড়ে একটা মোটা কালো রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে একটা করে নেকুর নিয়ে একজন করে পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় ওরা সেনাবাহিনী।

তারপর দীর্ঘ সেই কালো রেখা অর্ধবৃত্তাকার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকল আমাদের দিকে। কতক্ষণ হতবাক হয়ে ছিলুম কে জানে। হঠাৎ কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠলেন, সমুদ্রের কাছে চলো সবাই! সমুদ্রের কাছে! তারপর দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

কখন ষষ্ঠীচরণ রান্না ফেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, রাইফেল এনে গুলি ছুঁড়ি কর্ণেল!

কর্ণেল তাঁবুর ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, না জয়ন্ত! গুলি করে ওদের শেষ করা যাবে না। সারা দ্বীপের মাটির তলায়-তলায় দুর্গের মতো কোটি কোটি পিঁপড়ে-মানুষ রয়েছে মনে হচ্ছে। এস, সবাই সমুদ্রের দিকে পালাই।

আমরা চারজনে সব কিছু ফেলে পূবে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চললুম। কর্ণেল শুধু বেতার যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়েছেন দেখা গেল।

যখন বীচে পৌঁছুলুম, তখন আমাদের দম আটকানো অবস্থা। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে কীভাবে ওদের হাত থেকে বাঁচব। এদিকে সমুদ্র অনেকটা শান্ত। কর্ণেল সোজা জলে নেমে গিয়ে ডাকলেন, এস জয়ন্ত। আসুন ডঃ প্রসাদ! আমরা এখন নিরাপদ।

ষষ্ঠীচরণ কর্ণেলের সঙ্গেই জলে নেমেছে। ঢেউয়ের ঝাপটায় কোমর অব্দি

ভিজে যাচ্ছে ওদের। আমি ও ডঃ প্রসাদও ওদের কাছে গেলুম। বললুম, কর্ণেল! আমরা এখানে কীভাবে নিরাপদ? ওই তো ওরা এগিয়ে আসছে!

কর্ণেল বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে কোন বেতার কেন্দ্র ধরার চেষ্টা করছেন। বললেন, ওরা জলকে বড় ভয় পায়।

জিমকে আমি দু'হাতে বুকের কাছে ধরে রেখেছি। সে থরথর করে কাঁপছে। বীচের ওধারে উঁচু ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে নেমে আসছে পালে পালে নেকুর। বীভৎস তাদের মুখভঙ্গি। জিভ লকলক করছে। পিঁপড়ে-মানুষরা তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে নাচতে আসছে ওদের পেছন।

বীচের বালিতে এসে ওরা থমকে দাঁড়ল।

কর্নেল বেতার যন্ত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনলুম উনি বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভেগা আইল্যাণ্ড। শীগগির হেলিকপ্টার নিয়ে আসুন। আমরা বিপন্ন।

ষষ্ঠীচরণ চোখ বুজে ঠকঠক করে কাঁপছে এক হাঁটু জলে। জিম আমার বুকে মুখ লুকিয়েছে। ডঃ প্রসাদ বিড়বিড় করে বলছেন, আহা! ক্যামেরাটা আনলে কত ভাল হত! কেউ কি বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?

কথাটা কানে যেতেই কর্নেল প্রায় আর্তনাদ করে বললেন,ওই যাঃ! আমার ক্যামেরাটা আর কি ফিরে পাব? কী ভুলো মন আমার!

উজ্জ্বল রোদে সোনালী বীচের ওপর পালে পালে জিভ বের করা নেকুর আর অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ একইভাবে দাঁড়িয়ে।

ঘরের ছেলে বেঁচে বর্তে ভেগা আইল্যাণ্ড থেকে ঘরে ফিরতে পেরেছিলুম, এই যথেষ্ট। দিন সাতেক পরে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর্ণেল তাঁর বন্ধু বিমান বাহিনীর সেই জাঁদরেল অফিসারের সাহায্যে হেলিকপ্টারে চেপে ভেগা দ্বীপে তাঁর অত্যদ্ভুত ক্যামেরা আর আমার রাইফেলের খোঁজে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোথায় ভেগা দ্বীপ? দ্বীপ যেন বেমালুম তলিয়ে গেছে ভারত মহাসাগরে। অনেক ওড়াউড়ি করে তাঁরা ফিরে আসেন।

এখন কর্ণেল বলেন, তাহলে কি আমরা চারজনেই একইরকম বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম? ষষ্ঠীচরণ বলে, তা আর বলতে?

আমিও সায় দিয়ে বলি, ঠিক ঠিক। স্বপ্নই বটে। তবে স্বপ্নে যদি ক্যামেরা বা রাইফেল হারায়, তাহলে তো বড় রহস্যের ব্যাপার! ও কর্ণেল, জীবনে কত রহস্যের সমাধান করেছেন, এটার করবেন না?

কর্ণেল উদাসভাবে শুধু বলেন, তাই তো!

নীল দ্বীপের দুঃস্বপ্ন

সকাল ৯-৩০

আজও সেই লাল চাকাটা দেখতে পেয়েছিলাম। ঘড়িতে তখন রাত দুটো। পায়ের যন্ত্রণায় ঘুমোনো অসম্ভব। লাল চাকাটা ছোট্ট হ্রদের ওপারের কালো পাথরের পাহাড়ের গায়ে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে মিলিয়ে গিয়েছিল। ওটা কী হতে পারে, বুঝতে পারছি না।

ক্রমশ বুঝতে পারছি মৃত্যু এগিয়ে আসছে। পায়ে সম্ভবত গ্যাংগ্রিন ধরেছে। দুর্ভাগা প্লেনটা আছড়ে পড়ার মুহূর্তে কেন যে লাফ দিতে গেলাম। পাথরে পড়ে আমার বাঁ পায়ে মারাত্মক চোট লাগল। প্লেনটা আমার ওপর দিয়ে কয়েকশো গজ এগিয়ে পাহাড়ের মাথায় ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মনে হয় আমি বাদে একুশ জন যাত্রী ও বৈমানিকদের কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে অন্তত নড়াচড়াটাতো চোখে পড়ত। যেখানে আছি, সেখান থেকে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দিনের বেলা স্পষ্ট দেখা যায়।

অনেক কষ্টে হ্রদের ধারে গিয়ে জল খেয়েছিলাম। তারপর তেমনি করে শরীর ঘষটাতে ঘষটাতে পাথরের এই ছোট্ট গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে খেয়েছি শুধু দুটো বিস্কুট আর চকোলেট, প্লেনের এয়ারহোস্টেস কফির সঙ্গে দিয়েছিল, না খেয়ে পকেটে রেখেছিলাম ভাগ্যিস।

কী দীর্ঘ কষ্টকর সময়! ওদের সঙ্গে মৃত্যু হলে কত ভাল হত। যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পেতাম।.........

দুপুর ১-১৫

কিছুক্ষণ আগে হ্রদের ওপারে একটা অদ্ভুত চেহারার প্রাণী দেখলাম। অনেকটা বানরের মতো দেখতে। কিন্তু গায়ের লোম কালো। বাজি রেখে বলতে পারি, ওটা গরিলা বা ওরাংওটাং নয়। চারপায়ে চলাফেরা করলেও মাঝে মাঝে দুপায়ে ভর করে মানুষের মতো দাঁড়াতে পারে। হাঁটতেও পারে।

সে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে হ্রদের জলে ছুঁড়ে মারল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড মাছ মারতে পেরেছে সে। মাছটা দুহাতে ধরে মানুষের মতো দৌড়ে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল। তারপর পাহাড়ের একটা ফাটলে ঢুকে গেল।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। আর তার পাত্তা পেলাম না।.........

বিকেল ৩-৩০

যা যা দেখছি, নোট বইতে লিখে রাখছি—আমার মৃত্যুর পর যদি কোনো মানুষের হাতে পড়ে, যে জানবে হ্যারি বার্নেস নামে একজন মানুষ এইসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিল। সে কি বিশ্বাস করবে না? না করলেও কিছু যায় আসে না।

সেই আজব প্রাণীটিকে এবার সপরিবারে দেখলাম। দুজন নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী, বাকী দুটি তাদের বাচ্চা, বাচ্চা দুটি ভারি দুরন্ত। জলে নেমে তারা মানুষের মতো স্নান করছিল। বাচ্চা দুটি জল ছিটিয়ে খুব দুষ্টুমি করছিল। তার ফলে ওদের চাঁটি খেতেও হল। স্নান হয়ে গেলে ওরা চারপায়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল এবং সেই ফটলে গিয়ে ঢুকল। সম্ভবত এদেরই বনমানুষ বলা হয়।..........

সকাল ৭-১০

আমার বাঁদিকে শ'তিনেক গজ দূরে পাহাড়ের গায়ে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে সেই বনমানুষটা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিল ভোরবেলা থেকে। সে কিছু জিনিস কুড়িয়ে কামড়ে পরখ করছিল আর ছুঁড়ে ফেলছিল। জিনিসগুলো গড়াতে গড়াতে হ্রদের ধারে বালির ওপর এসে পড়ল। মাত্র তিরিশ গজ দূরে সেগুলো পড়েছিল। বনমানুষটা পাহাড়ের ওপিঠে চলে গেলে আমি সতর্ক ভাবে শরীর ঘষটাতে ঘষটাতে এগোলাম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, আমাকে দেখতে পেলে আক্রমণ করবে।

জিনিসগুলো দেখে আমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টিনে ভর্তি সন্দেশ, ভেজিটেবল স্যুপ, জ্যাম, দুধ, মাংসের স্টু—এই সব। খাদ্য দেখে সব ভয় চলে গেল। রাক্ষসের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাগ্যিস পকেটে নোখকাটা ক্লিপ ছিল। তাই দিয়ে টিন কেটে পেট ভরে আহার করলাম। তারপর হ্রদের জল খেয়ে কয়েক মিনিট চুপচাপ রোদে শুয়ে রইলাম। বনমানুষের চোখে পড়লে কী হত জানি না!

মনে পড়ামাত্র আবার শরীর ঘষটে এগিয়ে যতগুলো পাবলাম খাদ্যের টিন দুহাতে বুকের কাছে ধরে, এবং কিছু পকেটে পুরে অনেক কষ্টে আস্তানায় ফিরে এলাম। এই খাদ্যে অন্তত দুটো দিন চালিয়ে নেব।

খাদ্য এমন জিনিস—পায়ের ক্ষতস্থানে আর যেন তেমন যন্ত্রণা টের পাচ্ছি না। গ্যাংগ্রিনের আশঙ্কা করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, ওটা অমূলক আতংক।......

দুপুর ১২টা

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। প্যাকেটগুলোর মধ্যে একটা চুরুটের প্যাকেটও ছিল। কিন্তু আগুন কোথায় পাই? প্লেন বিগড়ে যাবার মুহূর্তে পাশের ভদ্রলোক লাইটার চেয়ে নিয়েছিলেন। সে মুহূর্তে ফেরত চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তখন সে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা। আমার সিগারেটের প্যাকেটটা আসনের হাতলের ওপর ছিল, মনে পড়ছে।

চুরুটগুলো দেখে ধূমপানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ দেখি, গুহার পাশে বেঁটে শুকনো একটা গাছ রয়েছে। দুটো শুকনো ডাল ভেঙে ঘষতে শুরু করলাম। পনের মিনিট পরে ধোঁয়া দেখা গেল। আরও পাঁচ মিনিট পরে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুন ধরালাম।

মনের সুখে চুরুট ধরালাম। আগুনটা জিইয়ে রাখা দরকার। আরও কিছু কাঠ ভেঙে আনলাম। রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে নিষ্কৃতি পাব। শুধু ভয়, ধোঁয়া দেখে বনমানুষগুলোর কী প্রতিক্রিয়া হবে? চুরুট টেনে খুব গরম লাগছিল। পোশাক ছেড়ে শরীর ঘষটে সরীসৃপের মতো হ্রদে নামলাম। জলটা খুব স্বচ্ছ। প্রাণভরে স্নান করলাম। তারপর জল থেকে মাথা তুলে দেখি সেই বনমানুষ পরিবার নেমে আসছে ওপারে। হ্রদের নলখাগড়া গাছের ভেতর গলা ডুবিয়ে বসে রইলাম। আধঘন্টা পরে ওরা চলে গেল। তখন হ্রদের ধারে একটা পাথরের আড়ালে পা ছড়িয়ে বসে রোদে শরীর শুকিয়ে নিলাম।

বিকেল ৪টা

কী আশ্চর্য! পায়ের ক্ষত স্থানে আর একটুও যন্ত্রণা নেই। পাটা সোজা করতে গিয়ে আরও অবাক হলাম। এ নিশ্চয় হ্রদের জলের গুণ। গুহার ভেতর উঠে দাঁড়ালাম। একটু ব্যথা করছিল অবশ্য। কিন্তু কিছুক্ষণ গুহার বাইরে পায়চারি করতেই ব্যথাটা চলে গেল। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।.........

সন্ধ্যা ৭-৩০

বনমানুষ পরিবার হ্রদের ধারে সন্ধ্যাপর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে গেল। ওরা বার বার এদিকে তাকাচ্ছিল। কিছু টের পেয়েছে? একটা বড় পাথর আটকে দিয়েছি গুহার মুখে। শুকনো কাঠে আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আলোয় লিখছি।

একটু আগে বাইরে একটা হুংকার শুনলাম মনে হল। কানের ভুল? নাকি বনমানুষটা এসে পড়েছে? আগুন জ্বলছে, সেই একটা বাঁচোয়া। আগুনকে সব প্রাণী ভয় পায়।..........

সকাল ৯টা

হ্যাঁ, বনমানুষ পরিবার এসেছিল। গুহার সামনে তাদের পায়ের ছাপ রয়েছে। ছোট ছাপগুলো দেখে বুঝেছি, বাচ্চা দুটোও এসেছিল।

কাল রাতে শুয়ে পড়ার আগে পাথরের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আবার সেই লাল আলোর চাকাটা দেখেছি। ওটা কী হতে পারে? ইচ্ছে করছিল, বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু বনমানুষের ভয়ে সাহস পাইনি। যা আছে বরাতে আজ রাতে ওটার রহস্য ফাঁস করতেই হবে।

এদিকে মুশকিল হয়েছে। গোগ্রাসে খাবারগুলো এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছি। এখনই প্লেনের ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে আরও খাবার আছে কি না খোঁজা দরকার। একটু আগে দেখলাম, এতক্ষণে শকুনের পাল এসে জুটেছে ওখানে। ৭২ ঘন্টারও পরে। এর একটাই অর্থ হয়। এটা সমুদ্রের মধ্যে কোনো দ্বীপ। এ দ্বীপে শকুন ছিল না। থাকলে এত দেরি হত না আসতে। প্লেনটা চাগোস দ্বীপপুঞ্জের কোনো দ্বীপে ভেঙে পড়েছে? মরিসাস থেকে কলম্বো যাবার পথে এই দ্বীপগুলো পড়ে।........

বিকেল ৪-৩০

শকুন তাড়ানোর জন্য গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়েছিলাম। পচা মড়ার গন্ধে টেঁকা দায়। শকুনগুলোর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করে কয়েকটা টিন কুড়িয়ে এনেছি।

যখন নেমে আসছি, দেখি বনমানুষটা একটা পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দূরত্ব প্রায় তিরিশ গজ। আমি চেঁচিয়ে তাকে বললাম, হ্যাল্লো!

আশ্চর্য, সে দুহাত নাড়তে থাকল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। আমার সাহস হল না তাকে আর ঘাঁটাই। ওটা যুদ্ধের আহ্বানও হতে পারে।

খাবারগুলো রেখে বাঁদিকে ঢালু পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকলাম। ভাগ্যিস, মাউন্টেনিয়ারিংয়ে ট্রেনিং নেওয়া ছিল। দুঘন্টা লাগল চূড়ায় পৌঁছতে। হ্যাঁ—যা ভেবেছিলাম তাই। আমি একটা ছোট দ্বীপে রয়েছি। চারদিকে সমুদ্রে। দিগন্তে কালো ধ্যাবড়া রেখাগুলো নিশ্চয় আরও সব দ্বীপ। চাগোস দ্বীপপুঞ্জই বটে। বহুদূরে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছিল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব।

কিন্তু আমাদের প্লেনটার সন্ধানে উদ্ধারকারীরা এখনও কেন আসছে না? তারা কি ভুল জায়গায় হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে!

ঠিক করলাম, এই চূড়াতেই কাল আশ্রয় নেব।

নেমে এসে গুহার দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি গুহার ওপাশ থেকে বনমানুষ পরিবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গুহার দরজায় উঁকি মারছে! পাথরের আড়ালে বসে পড়লাম। দেখলাম, তারা নিজেদের ভাষায় গর্জন করে কী যেন বলাবলি করতে থাকল। তারপর লম্বাটে বনমানুষটা সোজা দাঁড়িয়ে একটা ডাক ছাড়ল।

ও কি আমাকেই ডাকছে? কিন্তু সাড়া দেবার ভরসা পাচ্ছি না। সে বারকয়েক সেইরকম ডাক ডেকে চারপা হল। তারপর সপরিবারে আস্তে আস্তে চলে গেল। তারা হ্রদের পশ্চিমতীর হয়ে উত্তরে পৌঁছুলে আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর ঝোপঝাড় ও পাথরের আড়াল দিয়ে গুহায় ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ পরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। ঝটপট বেরিয়ে এসে

দেখি, একটা হেলিকপ্টার চলে যাচ্ছে। রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে পড়লাম। ওরা কি প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল না?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম—যদি হেলিকপ্টারটা চক্কর দিয়ে ফের আসে! এল না। হতাশায় ভেঙে পড়লাম।.......

সকাল ৮টা

গত রাতে লাল চাকাটা পাহাড়ের গায়ে দেখামাত্র বেরিয়ে পড়েছিলাম। অস্ত্র বলতে একটা লম্বা ডাল। মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।

বাঁদিকে এগিয়ে ঘাপটি পেতে বসলাম। ঘন অন্ধকার। শীত করছিল। কিছুক্ষণ পরে লাল চাকাটা সটান নেমে এল। আমার কাছ থেকে আন্দাজ হাত বিশেক দূরে স্থির হল। ওটা মাটি থেকে অন্তত তিন ফুট উঁচুতে ছিল। লক্ষ্য করলাম চাকাটার কোনো ছটা নেই—কোনো জিনিসকে আলোকিত করছে না।

যা থাকে বরাতে বলে ছুটে গেলাম। কাছাকাছি হতেই ওটা ফুটবলের মতো যেন কার অদৃশ্য কিক খেয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গুহায় ফিরে এলাম।

এখন গুহা ছেড়ে দক্ষিণের পাহাড়ের চূড়ায় চলে এসেছি। এখানে প্রচুর গাছপালা আর ঝোপ-জঙ্গল রয়েছে! আস্তানা হবে ডালপালা ভেঙে। অনেক কাজ।......

বিকেল ৩টা

মোটামুটি একটা আস্তানা তৈরি করতে পেরেছি। গুহার মতো আরামদায়ক হবে না। তবে একটা সুবিধে, তিনদিকে তিনটে প্রকাণ্ড পাথর থাকায় ঘরটা মজবুত হয়েছে। সামনে বেড়া বানিয়েছি লতার দড়ি বেঁধে। গুহা থেকে আগুনটা এনেছি। ভেতরে জ্বালানো নিরাপদ নয়। বাইরে জ্বলুক। যদি কোনো জাহাজ অথবা উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের নজরে পড়ে।

বিশ গজ এগোলে দক্ষিণে গভীর খাঁড়ি। সমুদ্রের জল গর্জন করে আঘাত করছে পাথরের দেয়ালে। প্রচণ্ড ফেনা জমে আছে নিচে। সামুদ্রিক পাখিরা ঝাঁকবেঁধে ওড়াউড়ি করছে।

কিন্তু খাবার প্রায় শেষ। আবার প্লেনের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে বেরুতে হবে। কিছু না পেলে বনমানুষ পরিবারের মতো জীবনযাপন করতে হবে। পাথর ছুঁড়ে মাছ এবং পাখি মেরে আগুনে পুড়িয়ে খাব। কী আর করার আছে তা ছাড়া—মৃত্যু যখন হলই না।..........

সকাল ৯-৩০

কাল রাতে লাল চাকাটা আমার এই নতুন আস্তানার কাছে চলে এসেছিল। সাহস করে যেতেই একটু সরে গেল। তখন আমিও কয়েক পা এগোলাম। পাহাড়ের এই শীর্ষদেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাছিমের পিঠের মতো। এক পা এক পা করে উজ্জ্বল লাল জিনিসটার দিকে এগোই, সেটাও সমান দূরত্বে পিছিয়ে যায়। তারপর এইখানে স্থির হয়ে রইল। তখন আমি আরও একটু এগোলাম মধ্যে মাত্র ফুট দশেক দূরত্ব। খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম জিনিসটা। চাকার মতো মনে হয়েছিল—কিন্তু চাকা নয়। একটা লাল গোলাকার ফুটবল। ছটা একেবারে নেই ভেবেছিলাম, তাও ঠিক নয়। খুব সামান্য ছটা আছে। নিচের ঘাসগুলো এবং দুপাশে ও ওপরে লতাপাতার ওপর ক্ষীণ ছটা পড়েছে।

আরও দু' পা এগোলাম। লাঠিটা বাড়িয়ে ওটাকে ছোঁবার কথা ভাবলাম। কিন্তু সাহস পেলাম না। মাত্র তিন ফুট দূরত্ব। ইচ্ছে করলেই ওটার ওপর হাত রাখতে পারি। কিন্তু যদি কিছু ঘটে!

লাল ফুটবলটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে রয়েছে। ওটা আগুন হলে আঁচ লাগত। নিশ্চয় আগুন নয়। এর ফলে সাহস বেড়ে গেল। ওটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম—যেভাবে হরিণের ওপর শিকারী চিতা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। পড়েই বুঝলাম জিনিসটা জেলির মতো পিছল, থলথলে, আঠালো এবং ভীষণ ঠাণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম। কয়েক পা পিছিয়ে এলাম। মাটিতে ঘাসের ওপর পড়ে সে খুব লাফালাফি করতে থাকল আহত জন্তুর মতো। তখন কষে লাঠির বাড়ি মারলাম গোটা কতক। ওটা বুঝি মরে গেল। লাঠির ডগায় তুলে থ্যাঁতলানো লাল বস্তুটা অথবা প্রাণীটা আমার ঘরের সামনে আগুনের কাছে এনে রাখলাম।

হ্যাঁ— জেলিফিশ জাতীয় প্রাণীই বটে। কিন্তু এরা আকাশে স্বচ্ছন্দে উড়তে বেড়াতে পারে। এমন বিদঘুটে প্রাণীর কথা কস্মিনকালে শুনি নি। জোনাকি-জাতীয় পতঙ্গেরই সম্ভবত দৈত্য-সংস্করণ। কিন্তু জোনাকির আলো হলুদ এবং আলোটা থাকে তার পেটে। এই পতঙ্গটি দেখছি গোটাটাই আলো এবং এর কোনো আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই।

মৃত বিস্তৃত পতঙ্গটি পড়ে রইল। আমি ঘরে ঢুকে ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে সেটাকে খুঁজলাম। আগুন নিভে গিয়েছিল। কিন্তু অঙ্গার প্রচুর ছিল। পাহাড়ের শীর্ষে প্রবল বাতাস সারাক্ষণ। আর একটু হলে অঙ্গারগুলো নিভে যেত।

দিনের আলোয় পতঙ্গটি খুঁজে বের করলাম। আসলে দিনের আলোয় ওর রঙও পাথরের মতো কালচে—ঈষৎ ধূসরও বটে জায়গায়-জায়গায়। আঠালো

থলথলে জীবটির দুটো চোখও দেখতে পেলাম এতক্ষণে। এবং একটা মুখও। কিন্তু এদিকে দেখি আমার পোশাকে ওর আঠার মতো মাংস লেগে রয়েছে। ধুয়ে ফেলা দরকার।......

দুপুর ১২-৩০

হ্রদে স্নান করতে গিয়ে বনমানুষ পরিবারের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। দুটি বড় এবং দুটি ক্ষুদে জীব অঙ্গভঙ্গী করছিল এবং মুখে অদ্ভুত শব্দ করছিল। আমিও অবিকল তাদের নকল করলাম। তখন ক্ষুদে বনমানুষদুটো চারপায়ে দৌড়ে এসে আমার দুই কাঁধে চাপল। আপত্তি করলাম না। মানুষের ভাষায় বললাম, 'আমি তোমাদের মামা! আমি তোমাদের মামা!' তারা কিচির মিচির শব্দে খুশি জানাল।

তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। তাদের বাবা-মা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করল যেন! তারপর তারা ঘুরে হাঁটতে থাকল। কাঁধের বাচ্চা দুটো লাফ দিয়ে নেমে আমার দুটো হাত ধরে টানতে থাকল।

হ্রদের উত্তর তীরে ঢালু পাহাড় বেয়ে ওদের আস্তানায় পৌঁছলাম। বিশাল গুহার ভেতর মানুষের মতো ওদের সংসার। ব্রেডফ্রুট জাতীয় ফলমূল, শুকনো মাছ, আতে মৌচাক সাজানো রয়েছে। দেখে মনে হল, এরা কি লক্ষ বছর আগে লুপ্ত ক্রোম্যাগনন মানুষের একটা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী?

ফুঁ দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটুকরো মৌচাক আমাকে খেতে দিল। চুষে প্রাণভরে মধু খেলাম। একগাদা ফলও সাবাড় করলাম। ওরা আমার খাওয়া দেখছিল। দুর্বোধ্য শব্দে বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

খাওয়া হলে ওরা চারজনে আমার পোশাক, জুতো, গায়ের চামড়া, মাথার চুল খুঁটিয়ে হাত বুলিয়ে পরখ করল। তারপর পুরুষ বনমানুষটি গুহার কোণে চলে গেল।

সে যে জিনিসটা নিয়ে এল, দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একটা ভাঙা জীর্ণ বাইনোকুলার। কোথায় পেল?. আমাদের প্লেনের ধ্বংসাবশেষই কি? ইশারায় জিগ্যেস করলে সে আমার হাত ধরে গুহার বাইরে নিয়ে গেল। তারপর উত্তর-পূর্ব কোণের পাহাড়টা দেখাল। আমি ওকে সেখানে যেতে ইশারা করলাম।

পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে জায়গাটায় পৌঁছুলাম। সেখানে একটা সংকীর্ণ গুহার সামনে মানুষের কংকাল পড়ে রয়েছে দেখে শিউরে উঠলাম। কোন দুর্ভাগার কংকাল এটা? গুহার ভেতরে উঁকি মেরে কিছু দেখতে পেলাম না। সূর্যের আলো সরাসরি গুহার ভেতরে পৌঁছেছে। কোনো চিহ্ন নেই যে লোকটাকে সনাক্ত করব। ওর গায়ের পোশাকও ং ড়ো হয়ে গেছে। বহু বছর আগের ঘটনা সম্ভবত।

এবার বুক কেঁপে উঠল। তাহলে কি আমার বরাতেও এমনি মৃত্যু আছে?' এখানেই বুড়ো হয়ে এমনি করে মরে যেতে হবে? . -

বনমানুষটাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় বেয়ে হ্রদের পূর্বতীরে নামলাম। তারপর দক্ষিণের পাহাড়ে উঠে আমার নতুন আস্তানায় পৌঁছলাম। তাকে সেই অদ্ভুত পতঙ্গের মড়াটা দেখাতেই সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল। গলার ভেতর গরগর শব্দ করে সে পিছিয়ে যেতে থাকল। তারপর হঠাৎ ঘুরে চার পায়ে অবিকল বাঘভালুকের মতো দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। আমার ডাকে কান দিল না।

বুঝলাম, পতঙ্গটিকে তারা প্রচণ্ড ভয় পায়।..........

সকাল ৭টা

কাল এক ভয়ংকর রাত গেছে। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে আগুনটা নিভে এসেছে দেখে ভাবলাম একটা কাঠ এনে ফেলে দিই। দরজার ঝাঁপ ঠেলেই চোখে পড়ল অসংখ্য লাল আলোর ফুটবল—নাকি প্রকাণ্ড সব বুদ্বুদ আমার ঘরের চারদিক ঘিরে রয়েছে। তারা শনশন শব্দ করছে। আক্রমণ করতে এসেছে কি? আমি লাঠি নিয়ে তেড়ে বেরুলাম। অমনি কিম্ভূত পতঙ্গগুলো অসংখ্য ফুটবলের মতো আমার ওপর পড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বরফের আঘাত যেন। আগুন জ্বলা একটা কাঠ তুলে তাদের ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা দূরে সরে গেল মাত্র। গতিক বুঝে ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর আর কোনো গণ্ডগোল ঘটেনি।

কিন্তু সকালে আরেক উৎপাত। আমার জ্বর হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, সারা শরীরে চাকা চাকা ঘায়ের মতো অ্যালার্জি বেরিয়েছে। পতঙ্গগুলো নিশ্চয় বিষাক্ত। বনমানুষ বন্ধুটির কাছে যাব ভাবছি। কিন্তু ক্রমশ জ্বরটা বেড়ে যাচ্ছে। গায়ের অ্যালার্জিগুলো লাল হয়ে উঠছে। অসহ্য চুলকুনি, আর লেখা যাচ্ছে না।

ডেলি মেলে প্রকাশিত একটি সংবাদ

সেন্ট ভার্জো (চাগোস আইল্যাণ্ডস), ৭ জুন—সম্প্রতি নিরুদ্দিষ্ট শ্রীলংকা এয়ারলাইনসের ডাকোটা বিমানটির ধ্বংসাবশেষ গতকাল নীল আইল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্ধারকারী দলের হেলিকপ্টার যেখানে নেমেছিল, সেখানে একটি কংকাল দেখা যায়। পাশেই ডালপালা দিয়ে তৈরী একটি কুটির ছিল। কুটিরে একটি নোটবই পাওয়া গেছে। সেটি জনৈক হতভাগ্য যাত্রী হ্যারি বার্নেসের। তাতে কিছু অদ্ভুত কথা লেখা আছে। উদ্ধারকারী দলটি ছোট্ট দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এমন কিছু দেখতে পাননি, যাতে মিঃ বার্নেসের ঐবৃত্তান্তের সত্যতা মেলে।

ভদ্রলোক ওই পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তা ও হতাশার ঘোরে উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। —রয়টার

চিরামবুরুর গুপ্তধন

জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছি। হঠাৎ দেখি, ইয়া বড় এক কেঁদো বাঘ হালুম করে সামনে দাঁড়াল। পা দুটো মাটিতে সেঁটে গেছে ভয়েব চোটে। তারপর দেখি, বাঘটা আদতে বাঘই নয়, কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। তিনি কেন বাঘ হয়ে গেছেন বুঝলুম না। খুশি হয়ে বললুম, "হ্যালো মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান! হাউ ডু ইউ ডু?"

কর্ণেল হাঁউমাউ করে কেঁদে বললেন, "ভাল না ডার্লিং। আমার লেজ হারিয়ে গেছে।" এ বয়সে লেজ হারানোর চেয়ে অপমানজনক কিছু নেই। কর্ণেলের লেজ হারানোর কথা শুনে আমি দুঃখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললুম।..

তারপরই টের পেলুম আমি মশারির ভেতরে শুয়ে আছি। আশ্চর্য, আমার চোখ দুটো ভিজে স্যাঁতসেঁতে। ধুড়মুড় করে তক্ষুণি উঠে বসলুম এবং খিকখিক করে হাসতে থাকলুম। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে কী- সব নাড়াচাড়া করছিলেন যিনি, তাঁব মাথায তখনও প্রাতঃভ্রমণের নীলচে টুপি। সেই টুপি ও তাঁব সাদা গোঁফ দাড়িতে তখনও জঙ্গলের শুকনো পাতার কুচি, কাঠকুটো, পাখির বিষ্ঠা, মাকড়সাব জালের ছেঁড়া অংশ, এমন কী দু-একটা পোকামাকড়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। না ঘুবেই সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।"

মশারি থেকে বেরিয়ে বললুম, "হাসছি কেন, জিজ্ঞাসা কবলেন না?"

"হাসছিলে নাকি? তুমি তো খুঁঃ খুঁঃ কবে কাঁদছিলে মনে হল।"

"কাঁদছিলুম আপনার দুঃখে।" একটু চটে গিযে বললুম। "আপনাব লেজ হারানোর কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি আমায জাগিয়ে দেননি। লেজটা আপনারই ছিল।"

"আমার লেজ!" বলে কর্ণেল নিজের পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিযে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "ডার্লিং! সত্যি যদি মানুষের লেজ থাকত, ব্যাপারটা কত সুখের হত বলো তো। লেজ দিয়ে পিঠ চুলকোনো, মাছি তাড়ানো, আবার দরকার হলে কাউকে লেজের বাড়ি মারা—কত কাজ হত। তাছাড়া, কারুর ওপর রাগ হলে মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও চলত। লেজ খাড়া হলেই সে টের পেত আমি রেগেছি। ব্যাপারটা কি সভ্য মানুষের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত হত না ডার্লিং? আরও ভেবে দ্যাখো, লেজ থাকলে তারও পোশাক দরকার হত। নিত্যনতুন

ডিজাইনের লেজ-ঢাকা তৈরি করত টেলররা। নাম দিত টেলেক্স। আর মহিলাদের বেলায় টেলেক্সি। ম্যাক্সির মতো।"

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধু একবার মুখ খুললে সহজে বন্ধ করেন না। বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘন্টা পরে বেরিয়ে দেখি, তখনও তেমনি বসে আছেন। পাশে অবশ্য ব্রেকফাস্টের ট্রে রেখে গেছে বাংলোর চৌকিদার। বললুম, "লেজ সম্পর্কে আরও কথা থাকলে এবার বলতে পারেন। এখন আমি ফ্রী।"

কর্নেল কতকগুলো ছবি দেখছিলেন। ছবিগুলো সদ্য প্রিন্ট করা। এখনও ভিজে রয়েছে। বললেন, "লেজ মুখের শ্রম কমিয়ে দিত, জয়ন্ত। তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করলেই তিনি খুশি হতেন। রিপোর্টিংয়ে ভুল বেরুলে লেজটা শিথিল করে মেঝেয় ফেলে রাখতে। তারপর লেজটা গুটিয়ে সম্পাদকের চেম্বার থেকে বেরুতে। সাতখুন মাফ!"

হাসতে হাসতে একটা ছবি তুলে নিতেই আমি অবাক। "এ কী! এও যে লেজ!"

"হ্যাঁ, লেজ। আমার জাদু-ক্যামেরার রাতের ফসল, জয়ন্ত!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন।

"অবিশ্বাস্য! মানুষের কখনও লেজ হয়?" ছবিটা ভাল করে দেখে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। "কর্নেল! এ নিশ্চয় কোনো প্রাণী—মানুষের মতো দেখতে এই যা।"

কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিয়ে আওড়ালেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! জয়ন্ত, পাশের ঘরের ভদ্রলোক—নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র আমায় এরকম একটা আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কানে নিইনি। কাল সন্ধ্যায় গোপনে একখানে ক্যামেরা পেতে এসেছিলুম। উদ্দেশ্য তো জানো! জন্তুদের জল খাওয়ার সময় ছবি তোলা। ভোরে ক্যামেরা আনতে গিয়ে জলার ধারে বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম। অবাক লাগল। খুব বদনাম আছে জলাটার। বাগাদা আদিবাসীদের ওটা তীর্থক্ষেত্র ছিল প্রাচীন যুগে। কিন্তু গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ওখানে তারা যায় না। অভিশাপ লেগেছে নাকি। তো পায়ের ছাপ কাদের তো দেখতেই পাচ্ছ।"

এই সময় দরজার বাইরে ডঃ মহাপাত্রের সাড়া পাওয়া গেল। "আসতে পারি কর্নেল?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "আসুন, আসুন।" তারপর ট্রেটা তুলে ছবিগুলোর ওপর রাখলেন। বুঝলুম, কোনো কারণে ব্যাপারটা নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে জানাতে চান না কর্নেল। কাজেই আমাকেও মুখ বুজে থাকতে হবে।.............

বিবর্তনবাদ ও কার্টুন

ডঃ মহাপাত্র কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "কাল আপনাকে বাগাদা ট্রাইবের কথা বলছিলুম। বাংলার বাগদি জনগোষ্ঠির সঙ্গে চেহারা ও পেশায় কী আশ্চর্য মিল। এরাও মাছ ধরে। আবার একসময়ে এরাও সেকালের বাঙালি বাগদি গোষ্ঠীর মতো লাঠিয়ালি, ডাকাতিতেও পটু ছিল। এখনও এরা শক্ত গাছের ডাল থেকে তৈরি লাঠি ব্যবহার হরে। ধাতুর ব্যবহার এদের মধ্যে অচল। কাজেই একই ট্রাইবের দুটি গোষ্ঠী দু জায়গায় বাস করছে। আরও মজার কথা, এই মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বাউরি ট্রাইব রয়েছে। মোটামুটি ফর্সা বা তামাটে গায়ের রঙ। আশা করি, বাঙালি বাউরি সম্প্রদায়ের কথা আপনি জানেন, কর্ণেল। তো কথা হল—এরা ভারতের আদিম বাসিন্দা। অস্ট্রিক জাতির একটা শাখা।"

বনজঙ্গলে বেড়াতে এসে এসব কচকচি কার বা ভাল লাগে? রাগ হল দেখে যে, গোয়েন্দা প্রবর দাড়ি নেড়ে সায় দিচ্ছেন এবং প্রশংসাসূচক উক্তিও করছেন। 'এক্সিউজ মি' বলে সোজা বাইরে চলে গেলুম। এপ্রিলে চিরামবুরু পাহাড় ও জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য টিলা ও পাহাড়। সবুজ, খয়েরি, লাল, সাদা কত রঙের বাহার। একটা টিলার গায়ে এই বাংলো। লনের ঘাসে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দেখি, কথা বলতে বলতে দুই পণ্ডিত বেরুচ্ছেন।

"হ্যাঁ, মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরের একটা দ্বীপে লেজওয়ালা মানুষ দেখার কথা বলেছেন। পনেরো শতকের কথা। তো লেজ নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই, কর্ণেল। আমাদের শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্তে যেটা ককসিক্স বা পিকচঞ্চু বলা হয়—কোকিলের ঠোঁট আর কী—সেটাই লেজের প্রমাণ। বিবর্তনের একটা পর্যায়ে লেজ খসে গিয়েছিল। কারণ হল ভাষা। মানুষের ভাষাই যখন ভাবপ্রকাশে সমর্থ তখন লেজের দরকারটা কী?"

কর্ণেল বললেন, "ঠিক, ঠিক। তবে ধরুন, হাতের নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ক্ষমতা বেড়েছিল। লেজের কাজ হাতে আরও ভালভাবে করা যায়। কাজেই....."

হঠাৎ কথা থামিয়ে কর্ণেল কান খাড়া করে কী শুনলেন। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ মহাপাত্র হকচকিয়ে গেছেন দেখলুম। একটু পরে কর্ণেল বাইনোকুলার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর দৌড়ে বাংলোর গেট পেরিয়ে ঢালুতে বড় বড় পাথর আর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কোথায় একটা পাখি ডাকছিল টু টু টুইক।

ডঃ মহাপাত্রর কাছে গিয়ে বললুম, "ওঁর ওই বাতিক। পাখি, প্রজাপতি, ঘাসফড়িং, পোকামাকড় নিয়ে থাকেন।"

"ও। উনি একজন ন্যাচারালিস্ট তাহলে। আমি ভেবেছিলুম শিকারি।"

একটু হেসে বললুম, "প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তো ডঃ মহাপাত্র, কর্ণেলের কাছে কি লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা দেখলেন?"

ডঃ মহাপাত্র চোখ বড় করে বললেন, "অ্যাঁ! ছবি! কোথায় ছবি! কিসের ছবি?"

অমনি বুঝলুম, ভুল করেছি। ঝটপট বললুম, "মানে একটা কার্টুন আর কী। বিলিতি পাঞ্চ পত্রিকার।"

ডঃ মহাপাত্র একটু হেসে বললেন, "তাই বলুন। তবে কর্ণেল কার্টুন দেখাননি আমায়। প্লিজ, আপনি নিয়ে আসুন না ওটা, দেখি। পাঞ্চের কার্টুনের কোন তুলনা হয় না। নিশ্চয় ডারউইন-শতবাতর্ষকী উপলক্ষে বেরিয়েছে।"

বেগতিক দেখে বললুম, "দুঃখিত ডঃ মহাপাত্র! কর্ণেলের জিনিসপত্রে আমার হাত দেওয়াটা ঠিক হবে না?"

"তাও ঠিক।" বলে ডঃ মহাপাত্র মুখ গোমড়া করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ওঁর মুখে সন্দেহের ছাপ রয়েই গেল। বুঝলুম, আমার কথাটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু ওঁকে কর্ণেল ওই অদ্ভুত ছবিটা কেন দেখাতে চাইছেন না কে জানে। নাকি কর্ণেল নিজেই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে লেজওয়ালা মানুষ আবিষ্কারের গৌরব পেতে চান?..........

জঙ্গলের বিপদ-আপদ

কর্ণেল সেই যে পাখির পেছনে দৌড়ুলেন, তো আর ফেরার নাম নেই। দুপুর পর্যন্ত বনেজঙ্গলে একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল। একা যেতে সাহস পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে ডাকব নাকি?

কিন্তু উনি নিশ্চয় চটে আছেন আমার ওপর। অগত্যা একা বেরিয়ে পড়লুম। জঙ্গলে রাস্তা না হারানোর সহজ উপায় হয়, চলার সময় কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে রাখা। আমি অবশ্য রাস্তা ধরে যাচ্ছিলুম না। কখনও পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, কখনও ঝোপঝাড়ের ভেতর ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কখনও বা উঁচু গাছপালার ভেতর দিয়ে। খেয়ালখুশি মতো হেঁটে যাওয়া। একটা করে গাছের ডাল ভেঙে চিহ্ন রাখছিলুম। ফেরার সময় চিহ্নগুলো কাজে লাগবে।

একসময় থমকে দাঁড়ালুম। হাতি-বাঘ-ভালুকের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে কেন যে ছাই রাইফেলটা নিতে ভুলে গেলুম। এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এখানটা বেশ উঁচু জায়গা। ঘন ঘাস আর বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা একরকম গাছ গজিয়ে রয়েছে। তারপর ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে

গিয়ে একটা গভীর শালবনে ঢুকেছে। ডাইনে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর, তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা রুনিগাছ। পাথরটা ঢেকে লতার ঝালর। ঝালরে চোখঝলসানো ফুলের সাজ। ফুলগুলো কাছ থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। রুনিগাছটার তলায় গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছি, কালো পাথরটা থেকে কালো কুচকুচে একটা প্রাণী ঝুপ করে গড়িয়ে হাত-দশেক তফাতে মানুষের মতো দু' ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কানে-তালা-ধরানো এক ডাক ছাড়ল "আঁ-আঁ-ক্!"

সর্বনাশ ! এ তো দেখছি একটা ভালুক। ইংরাজিতে এদের বলা হয় শ্লথ বিয়ার। মারাত্মক হিংস্র জানোয়ার। দিশেহারা হয়ে দৌড়তে থাকলুম।

প্রতি মূহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ভালুকটার তীক্ষ্ণ নখে আমার পিঠ ফালা-ফালা হয়ে যাবে।

শালবনের ভেতর দিয়ে বহু দূরে দৌড়ে যাবার পর ফাঁকা ঘাসজমিতে পৌঁছুলুম। জমিটাতে অসংখ্য পাথর ছড়ানো। কতবার যে আছাড় খেলুম, প্যান্টশার্ট ছিঁড়ে গেল কাঁটা ঝোপে, তারপর সামনে পড়ল নলখাগড়ার জঙ্গল। জঙ্গল ফুঁড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে জলে পড়লুম। ভালুকটাকে এতক্ষণ একবারও ঘুরে দেখার সাহস পাইনি। এবাব জলাটার মাঝঅবধি একবুক জলে এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। কোথায় ভালুক?

ভালুকটার সঙ্গে নিশ্চয় রেসে জিতে গেছি। জলাটা তত বড় নয়। ওপারে বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছিল। খুব সাবধানে জলের ভেতর পা ফেলে এগোতে হচ্ছিল। কাদার মধ্যে পাথর রয়েছে প্রচুব। জল কোথাও এককোমর, কোথাও একবুক। বালির তটে পৌঁছে দু-পা ছড়িয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। নিজের বোকামির জন্য রাগ হচ্ছিল খুব। তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু জলটা খাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্তিটা চলে গেল। তখন উঠে দাঁড়ালুম। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে চমকে উঠলুম। কর্ণেল কি এই জলার ধারেই কোথাও ক্যামেরা পেতে রেখেছিলেন? সেই লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা এখানকার বলেই তো মনে হচ্ছে। ভালুকের চেয়ে লেজওয়ালা মানুষ কতটা বিপজ্জনক কে জানে। এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়াই ভাল।

বালিয়াড়ির পর প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সার-সার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাঁক গলিয়ে যাব কি না ভাবছি, হঠাৎ বাঁ দিকের স্তূপটার আড়াল থেকে একটা বিদঘুটে চেহারার লোক বেরিয়ে এল। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কোমরে এক টুকরো লাল

ন্যাকড়া জড়ানো। গলায় একগুচ্ছের লাল পাথরের মালা। দুহাতে ওই রকম লাল পাথরের মালা জড়ানো। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। থ্যাবড়া নাক। কপালে লাল রঙের কয়েকটা আঁকিবুকি। তার মাথায় একরাশ জটাচুল। তার হাতে বেঁটে কাঠের লাঠি। লাঠিটায় বিকট সব মুখ খোদাই করা আছে। সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠল, "কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

এবার আরও চমকে উঠলুম তার লেজ দেখে। হ্যাঁ, লেজ। ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখেছি—কতকটা হনুমানের লেজের মতো দেখতে, কিন্তু বেশ মোটা। তত লম্বা নয় অবশ্য। তাছাড়া ঠিক এই লোকটাকেই তো ছবিতে দেখেছি।

সেই ভোরবেলা থেকে টানা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ রগড়ে নিয়ে তাকালুম। তারপর দেখলুম, ওর লেজটা খাড়া হচ্ছে। তারপর সেই লেজওয়ালা লোকটা আচমকা কাঠের লাঠিটা তুলে আমার মাথায় মারল। টের পেলুম, ভূমিকম্প হচ্ছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে অন্ধকার।

ডঃ মহাপাত্রের দুরবস্থা

চোখ মেলে দেখি, আলো জ্বলছে এবং আমি বাংলোর খাটে শুয়ে আছি। তাহলে আগাগোড়া সবটাই লেজঘটিত দুঃস্বপ্ন। ওঠার চেষ্টা করতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলুম, "উঁহু, নড়ো না, নড়ো না!"

একটু তফাতে বসে আছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। একটা-কিছু করছেন। মাথাটা চিনচিন করছিল। হাত দিয়ে টের পেলুম ব্যাণ্ডেজ রয়েছে।

কর্নেল একটু হেসে পাশে এসে বসলেন। বললেন। "বনে জঙ্গলে গোঁয়র্তুমি ভাল না ডার্লিং! তোমায় কতবার পইপই করে বলেছি। ভাগ্যিস, আজ একটু সকাল-সকাল জলাটার ধারে ক্যামেরা পাততে গিয়েছিলুম। ধরেই নিয়েছিলুম তুমি ডঃ পত্রের সঙ্গে বরমডির আদিবাসী মেলায় গেছ। চৌকিদার সঠিক কিছু বলতে পারল না। তাকে তুমি বা ডঃ মহাপাত্র কিছু বলে যাওনি।"

আমার শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল। কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। তারপর গরম দুধ নিয়ে ফিরলেন। বললেন, "দুধটা খেয়ে নাও। রাত মোটে সাড়ে-আটটা। সাতটার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল তোমার। তখন ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়েছি। কী-সব ভুল বকছিলে—লেজওয়ালা মানুষের কথা বলছিলে।"

কর্নেল হাসতে লাগলেন।

জোর করে উঠে বসলুম। "ভুল বকিনি। আমি ঠিক আছি। জলার ধারে একটা লেজওয়ালা বিদ্‌ঘুটে মানুষ আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল। আপনার ছবির কিম্ভূত প্রাণীটাই।"

"বলো কী। আমি ভেবেছিলুম পাথরের স্তূপে উঠে পা হড়কে গেছ এবং মাথায় চোট লেগেছে।"

"না।" বলে আগাগোড়া যা ঘটেছিল, সব বললুম কর্নেলকে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে একবার টাকে একবার দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, "হুম্। কিন্তু আমাদের নৃবিজ্ঞানী গেলেন কোথায়? বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।"

এ-রাতে ঘুমটা স্বভাবত গভীর হয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখিনি। দেখিনি লেজঘটিত কোনো দৃশ্যও। মশারির ভেতর থেকে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে কালকের মতোই আপন কাজে মগ্ন দেখলুম। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে রইল। কাল ওই বিপদসংকুল জলার ধার থেকে এই শক্তিমান বুড়োমানুষটি আমায় কাঁধে করে অতটা পথ বয়ে এনেছেন। ছেঁড়া নোংরা পোশাক বদলে দিয়েছেন। স্নেহশীল পিতার মতো আচরণ করেছেন। আস্তে বললুম, "গুড মর্নিং মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান।"

কর্নেল 'মর্নিং' বলে উঠে এসে মশারি তুলতে থাকলেন। তড়াক করে উঠে বসে বললুম, "থাক্। আর শোবার দরকার নেই। আপনার রাতের ক্যামেরায় কী ফসল তুললেন দেখি।"

টেবিলের একটা ছবি তুলে দেখে হকচকিয়ে গেলুম। জলার ধারে সেই পাথরের স্তূপ বলেই বনে হচ্ছে। একটা স্তূপের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে আছেন নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র। হাতে শাবলজাতীয় কিছু।

"কী কাণ্ড!" অবাক হয়ে বললুম। "নৃবিজ্ঞানী দেখছি প্রত্নবিজ্ঞানীর মতো খননকার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কর্নেল, ওখানে কি কোন প্রাচীন সভ্যতা লুকিয়ে আছে নাকি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য রাতদুপুরে লুকিয়ে কেউ করে না ডার্লিং—যদি না তুতান-খামেনের মতো কোনো সম্রাটের গুপ্তধন পোঁতা থাকে।"

"মাই গুডনেস। ডঃ মহাপাত্র কি গুপ্তধন খুঁজছেন ওখানে?"

"জানি না।" বলে কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিলেন। বললেন, "শিগগির বাথরুম সেরে এসো। বেরুব।"

বাথরুম থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম, "ডঃ মহাপাত্র রাতের খাটুনির পর নিশ্চয় এখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন? গুপ্তধন পেলেন কি না ওঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য মন ছটফট করছে।"

"উনি ফেরেননি।"

"সে কী!"

কর্ণেল কোনো কথা না বলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। আমি কফিটুকু ঝটপট গিলে নিলুম। এইসময় বাইরে মোটর-গাড়ির গর গর শব্দ শোনা গেল। দুজনে বেরিয়ে দেখি, বন দফতরের অফিসার সূর্যপ্রসাদ রাও জিপ থেকে গেটের কাছে নামছেন। হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, "কর্ণেল। সাংঘাতিক ব্যাপার। বাগাদা আদিবাসীরা ডঃ মহাপাত্রকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। ভাগ্যিস ফরেস্ট গার্ডরা ভোরবেলা ওদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওঁকে উদ্ধার করে আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে ওঁকে বরমডি হাসপাতালে রেখে এলুম। বাঁচবেন কি না বলা কঠিন।"

কর্ণেল বললেন, "বাগাদা বস্তিতে কেন গিয়েছিলেন ডঃ মহাপাত্র?"

মিঃ রাও বললেন, "ওদের দেবতার থান আছে জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট লেকের ধারে। ওখানে বাইরের কোনো লোকের যাওয়া বারণ। ওরা বলল, এই লোকটা তাদের পবিত্র থানের অপমান করেছে। ওদের বুঝিয়ে বললুম, ভদ্রলোক না জেনে দৈবাৎ ওখানে বেড়াতে গিয়ে থাকবেন। ওদের বোঝানো বৃথা। তাছাড়া গভর্নমেন্ট তখন ট্রাইবালদের ব্যাপারে খুব সতর্ক। বস্তার এলাকার বিদ্রোহের কথা তো জানেন।"

"হুম্। তাহলে ডঃ মহাপাত্রকে ওরা দেবতার থান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলুন!"

"ঠিক বলেছেন।" বলে মিঃ রাও ডঃ মহাপাত্রের ঘরের তালা খুললেন। বললেন, "ওঁর পকেটে চাবিটা ছিল। ওঁর জিনিসপত্র কী-সব আছে, হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।".................

লেজ তুলে পলায়ন

মিঃ রাও চলে গেলে কর্ণেল বললেন, "জয়ন্ত, সঙ্গে রাইফেল নাও তোমার। সেই ভালুকটার মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ সেই লেজওয়ালা মানুষটা এসে পড়লে ব্ল্যাংক ফায়ার করে তাকে ভয় দেখাবে।"

কর্ণেল হাসছিলেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে পা বাড়িয়ে বললুম, 'আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"গুপ্তধন খুঁজতে।"

সারা পথ আর মুখ খুললেন না গোয়েন্দাপ্রবর। সতর্ক ভাবে সেই জলার ধারে পৌঁছে পাথরের স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "খোঁড়ার জায়গাটা বাগাদারা বুজিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে আগের মতো। যাই

হোক, তুমি চারিদিকে লক্ষ্য রাখো। বাগাদারা যে-কোনো সময় এসে হামলা করতে পারে আমি এমন-কিছু অনুমানই করিনি। নইলে কোন সাহসে এখানে ক্যামেরা পাততে আসব?"

একটা পাথরের স্তূপের গায়ে খাঁজে কী-একটা তোলা রয়েছে। কর্ণেল সেটা তুলে নিয়ে বললেন, "আরে! এটা দেখছি ডঃ মহাপাত্রর নোটবই। এখানে রেখে গুপ্তধন খুঁড়ছিলেন নাকি?"

নোটবইটা ছোট। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্তূপগুলোর গায়ে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি চোখে পড়ছিল। কর্ণেল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইসময় হঠাৎ আমার পেছনে চাপা শব্দ হল। ঘুরে দেখি, কালকের সেই লেজওয়ালা। লাঠিটা যেই তুলেছে, আমিও রাইফেল তাক করেছি। ধমক দিয়ে বললুম, "ফ্যাল হতচ্ছাড়া হনুমান! ফেলে দে লাঠিটা! নইলে গুলি করে মারব।"

লাঠিটা ফেলে সে পিঠটান দেবার জন্য ঘোরা মাত্র কর্ণেল তীরের মতো এসে ওর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন। লেজটা খুলে এল। সে অজানা ভাষায় চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে গেল।

কর্ণেল লেজটা দেখতে দেখতে বললেম, "একটা চমৎকার ট্রাইবাল আর্টের নিদর্শন! যাই হোক, জয়ন্ত! আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কেটে পড়ি। বাংলোতে পৌঁছেই ঝটপট সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে হবে।"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগোলেন। আমি পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললুম, "আমিও বা ট্রাইবাল আর্টের এ-নিদর্শন হাতছাড়া করব কেন? বিশেষ করে এটা আমার একটা স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে—মার খাওয়ার।"

বিদঘুটে বেঁটে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে কর্নেলের সঙ্গ ধরলুম।........

বাদশাহি সোনাদানা

চিরামবুরু-বরমডি রোডে একটা কাঠবোঝাই ট্রাক পেয়ে গিয়েছিলুম। বরমডিতে কর্ণেলের সামরিক জীবনের বন্ধু মেজর অর্জুন সিংয়ের বাড়ি। ওখান থেকেই আমরা চিরামবুরু জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মেজর অর্জুন সিং আমাদের দেখে হকচকিয়ে গেলেন। "কী ব্যাপার? এত শিগগির চলে এলেন যে জঙ্গল থেকে!"

কর্নেল বললেন "পরে বলছি সব। এখন ভীষণ খিদে-তেষ্টায় ভুগছি।"

মেজর অর্জুন সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচুর খাদ্য এল টেবিলে। খেতে-খেতে কর্ণেল চিরামবুরুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

মেজরসাহেব বললেন, "আপনাকে তো বলেইছিলুম মশাই, বাগাদা ট্রাইবের ওঝারা সবসময় লেজ পরে থাকে। ওদের বিশ্বাস, রামায়ণের হনুমানজির অবতার ওদের ওঝা।"

কর্ণেল বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আসার সময় ট্রাকে বসে ডঃ মহাপাত্রের নোটবইটা পড়ে ফেলেছি। ওতে মোগল আমলের এক ঐতিহাসিক মির্জা মেহেদি খানের বই থেকে একটা উদ্ধৃতি আছে। পড়ে শোনাচ্ছি।"

নোটবইটা বের করে কর্ণেল পড়তে থাকলেন।

"..................দাক্ষিণাত্য থেকে বাদশাহ আলমগিরের পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ বিদ্রোহ দমন করে ফিরে যাবার সময় সঙ্গে বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে যান। পথিমধ্যে সিরামবোরাত নামক ভীষণ অরণ্যে শাহজাদার পশ্চাদ্‌বর্তী দলটি জংলিদের কবলে পড়ে। জংলিরা রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক ধনরত্ন লুন্ঠন করে। পরে অগ্রবর্তী দলের নায়ক মর্দান খাঁ জংলিদের ওপর প্রতিশোধ নেন। আমি মর্দান খাঁয়ের জামাতা সেহাবুদ্দিনের কাছে শুনেছি, জংলিদের অস্ত্র বলতে শুধু কাঠের লাঠি ছিল। তাদের দলপতির নাকি বানরের মতো লেজ ছিল। মর্দান খাঁ জংলিদের বন্দী করেন। কিন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্নের সন্ধান পাননি। জংলিরা বলে, সব জিনিস তাদের লেজওয়ালা দলপতি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। মর্দান খাঁ জঙ্গল তল্লাশ করে তার সন্ধান পাননি। ফলে ক্রোধের বশে তিনি জংলিদের হত্যা করেন।"

কর্ণেল বললেন, "এর তলায় ডঃ মহাপাত্রের নোট রয়েছে। লিখেছেন, "বাগাদাদের নিয়ে গবেষণার সময় ওদের একটি লোক-কথায় মির্জা মেহেদি খানের বর্ণিত ঘটনার সূত্র রয়েছে। বাগাদা ওঝারা নাকি বংশপরম্পরায় সেই ধনরত্নের সন্ধান জানে। এই ওঝাদের কিন্তু কৃত্রিম লেজ থাকে।"

ডঃ অর্জুন সিং অভ্যাস মতো হো-হো করে হেসে বললেন, "লোক-কথা? লোক-কথা মানেই গালগল্প!"

জটায়ুর পালক

সেদিন খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছি, পায়ে কুট করে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। পা আলগোছে নাড়া দিয়ে ফের বইয়ের পাতায় ডুবে রইলাম। ভারী জমাটি গোয়েন্দা কাহিনী। গোয়েন্দা অফিসারকে বেঁধে ডাকাতরা বস্তায় ভরছে। এক্ষুণি সমুদ্রে ফেলে দেবে। কী হয় কী হয় অবস্থা। উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

ফের কুটুস করে যেন পিঁপড়ের কামড়। এবার যেন ডেঁয়ো পিঁপড়ে। বিরক্ত হয়ে থাপ্পড় মারতে গিয়ে দেখি, শ্রীমান ডন টেবিলের তলায় বসে এই কম্মটি করছে।

খপ্ করে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বের করলুম। তারপর গর্জে বললুম, "তবে রে বাঁদর ছেলে! গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি!"

ডন কাঁচুমাচু মুখে বলল, "অত যে ডাকলুম, তুমি তো শুনতেই পেলে না!"

"তাই বলে তুই চিমটি কাটবি হতভাগা?"

"তোমার সঙ্গে যে আমার ভীষণ দরকার মামা!" ডন মুখে-চোখে কাকুতি-মিনতি ফুটিয়ে বলল, "সত্যি বলছি, দারুণ দরকার!"

ডনের দরকারে আমার সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। কারণ, তাহলে আর বইটি পড়াই হয়ে উঠবে না। পিঁপড়ের কামড় দিয়ে সবে তার জ্বালাতনের নমুনা শুরু। এর পর জানলা দিয়ে আস্ত ইঁটের টুকরো এসে পড়ারও চান্স আছে। যা বিচ্ছু ছেলে!

তাই বললুম, "ঝটপট বলে ফেল তাহলে। দেরি কোরো না। দেখ না আমি এখন ব্যস্ত।"

ডন তার পিঠের দিকের জামার ভেতর থেকে কী একটা টেনে বের করল। অবাক হয়ে দেখি, আন্দাজ ফুটখানেক লম্বা একটা সাদা-কালোয় চকরা-বকরা পালক। জানলা দিয়ে উপচে আসা শেষবেলার রোদ্দুরে পালকটাতে ফিনফিনে সবুজ রঙও ঝিলমিলিয়ে উঠল একবার। ডন বলল, "বলো তো মামা, এটা কোন্ পাখিব পালক?"

পালকটা ওর হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললুম, "ঠিক বুঝতে পারছি না। সারস জাতীয় কোনো পাখির পালক হয়তো। এ তুই কোথায় পেলি রে?"

ডন মুখ টিপে হাসল। "বলতে পারলে না তো। মামা, তুমি রামায়ণের গল্প পড়োনি?"

"রামায়ণের সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক?"

ডন ফিসফিস করে বলল, "রাবণরাজা সীতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সেই যে একটা পাখি এসে রাবণরাজার মাথায় ঠুকরে দিল আর মুকুট পড়ে গেল—তখন রাবণরাজা মারল তলোয়ারের কোপ। এক কোপে পাখিটার ডানা কেটে গেল। কী যেন নাম পাখিটার, বলো না মামা? পেটে আসছে, মুখে আসছে না............"

হাসতে হাসতে বললুম, "হুঁ—জটায়ু পক্ষী"

"পক্ষী না মামা, পাখি।"

"বেশ তাই হল।"

স্বীকার করে নিলুম। নইলে কথা বাড়বে। ডনটা যা তর্কবাজ! "তো, তুই কি বলতে চাস, এটা সেই জটায়ুর পালক—মানে, রাবণের তলোয়ারের কোপে যেটা কাটা পড়েছিল?"

ডন রহস্যের ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক বলেছ। সেজন্যই তো তোমার কাছে এলাম।"

"ঠিক আছে। এখন যাও, আমি ব্যস্ত!"

ডন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ধুস্! এখনও আমার দারকারটা বলাই হয়নি। তুমি জিজ্ঞেস করো পালকটা কোথায় পেলুম!"

তারপর সে আমার জিজ্ঞেস করার আগেই বলতে শুরু করল, "পালকটা পেয়েছিল হারু গয়লা—ওই যার খাটাল আছে শিবমন্দিরের পেছনে। কোথায় পেল জানো? তার একটা গরু বেজায় দুষ্টু। চরতে-চরতে নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল। গরুটাকে খুঁজতে গিয়ে হারু পালকটা পেয়েছে।"

"বুঝলুম। এবার এসো।"

ডন গ্রাহ্য করল না। বলল, "এই পালকটা যদি সুতো দিয়ে পিঠে বাঁধো মামা, তাহলে তুমি দিব্যি পাখির মতো উড়তে পারবে। দাও না মামা খানিকটা সুতো।।"

জানি, সুতো যেভাবে হোক যোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে রেহাই পাব না। কাজেই উঠতে হল। পাশের ঘরে ডনের দাদা শ্রীমান টমের ঘুড়ির লাটাই থেকে খানিকটা সুতো ছিঁড়ে আনতেই হল। টম এখন ক্রিকেট খেলতে গেছে। বাড়ি থাকলে কাজটা কঠিনই হত।

ডন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "পালকটা পিঠে বেঁধে দাও মামা। শক্ত করে বাঁধবে যেন। নইলে যদি খুলে যায়, পড়ে ছাতু হয়ে যাব।"

কষে বেঁধে দিলুম ওর ডান কাঁধের কাছে পালকটা। তারপর ডন বলল, "এবার দেখ মামা, আমি উড়ে চললুম, রেডি। ওয়ান........টু.........থ্রি........"

সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ফের গোয়েন্দা কাহিনীর পাতায় চোখ রাখলুম।.........

ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়াবে ভাবতে পারিনি। সন্ধ্যার মুখে টম ফিরে এসে যেভাবেই হোক টের পেল যে, তার লাটাইয়ের সুতো ছেঁড়া হয়েছে। খুব লম্ফঝম্প করে সে ডনকে খুঁজে বেড়াল। আলমারিরর পেছন, টেবিলের তলা, এমন-কী খাটের তলা খুঁজে ডনকে পিট্টি দেবার তাল করল। কিন্তু কোথায় ডন? দিদি চেঁচামেচি করেও ছেলেকে শান্ত করতে পারলেন না। শেষে ওদের বাবার নামে শাসালেন। জামাইবাবু মফস্বল শহরের উকিল। কোর্ট থেকে ফিরে কোন্ ক্লাবে যেন দাবা খেলতে যান। ফেরেন রাত নটার পরে।

বেগতিক দেখে বললুম, "টম! তোর সুতো ইঁদুরে ছিঁড়েছে। বাড়িতে কত ইঁদুর দেখতে পাসনে? থাম, কালই একডজন বেড়াল এনে রাখব।"

টম শান্ত হয়ে পড়তে বসল। এবার আমিই ডনকে খুঁজতে থাকলুম। টমের ভয়েই ডন নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। বাড়ির চারধারে সবজি ও ফুলফলের বাগান। জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাগানে গিয়ে চাপাগলায় ডাকলুম, "ডন। ও ডন! বেরিয়ে আয়। অল ক্লিয়ার! তোর ভয় নেই। চলে আয়!"

কিন্তু কোনো সাড়া পেলুম না। তাহলে কি পাশের বাড়ি ওর বন্ধুদের কাছে আছে? গিয়ে দেখি, সেখানেও নেই! গেল কোথায় ও? কাছাকাছি আরও কয়েকটা বাড়ি খোঁজাখুঁজি করলুম। কোথাও নেই। এবার একটু ভয় পেয়ে গেলুম। বাড়ি ফেরার মুখে নিশ্চয় টমের চেঁচামেচি শুনে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল নাদুবাবুর ছেলে ন্যাড়ার সঙ্গে ডনকে ঘুরে বেড়াতে দেখি। নিশ্চয় ন্যাড়ার কাছে আছে ও। নাদুবাবুর বাড়ী নদীর ধারে খেলার মাঠের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখি, ন্যাড়া তুম্বো মুখ করে পড়তে বসেছে। নাদুবাবু গম্ভীর গলায় ওকে মুখস্থ করাচ্ছেন. "ক মূর্ধন্য ষয়ে টয়ে কষ্ট! জোরে জোরে বল্ ক মূর্ধন্য ষয়ে......" আমাকে দেখে মুখ নামিয়ে চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, "কে হ্যা?"

"আমি জ্যাঠামশাই! ন্যাড়ার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

"ন্যাড়ার সঙ্গে?" খুব অবাক হয়ে নাদু সিঙ্গি অনেকটা হাঁ করে ফেললেন। "নেড়ুর সঙ্গে তোমার কী?"

ঝটপট বললুম, "মানে ডনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই......."

খাপ্পা হয়ে সিঙ্গি মশাই বললেন, "বোলো না। ওই পাজি হতচ্ছাড়া ছেলেটার কথা আমায় বলতে এসো না?"

"আজ্ঞে না জ্যাঠামশাই। আপনাকে বলতে আসিনি। ন্যাড়াকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।"

"নেড়ু কিচ্ছু জানে না। দেখছ না এখন ও পড়তে বসেছে? ওকে ডিসটার্ব কোরো না।"

ন্যাড়া বইয়ের পাতায় চোখ রেখে পড়া মুখস্থ করার সুরে বলে দিল, "ডন জটায়ুর পালক পেয়েছে। ডন মাঠে উড়ে চলে গেল।"

"মাঠে! মানে খেলার মাঠে?" উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। "কিন্তু ও নেড়ু! উড়ে চলে গেল কী বলছ?"

নাদুবাবু গর্জে উঠলেন, "হয়েছে, হয়েছে। আর কোনো কথা নয়। কাজ নেই কম্ম নেই, রোজ খালি ডন ডন ডন। ডন ডন ডন ডন। হুঁ! উড়ে যাবে না তো কি হেঁটে যাবে? ভাগ্নের পিঠে ডানা গজিয়েছে যে। এবার চাঁদে গিয়ে বসে থাকবে।"

হনহন করে খেলার মাঠে চলে গেলুম। তারপর যত জোরে পারি গলা ছেড়ে ডাকলুম, "ডন! ডন।" আচমকা একটা গাধা বিকট চেঁচিয়ে সাড়া দিল। পিলে-চমকানো ডাক। আকাশে টোল-খাওয়া চকচকে চাঁদ যেন মজা পেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। ঘাসে ভরা মাঠে জ্যোৎস্না ঝলমল করছিল। মাঠের শেষে নদীর ধারে পোড়ো মন্দির ঘিরে একটা জঙ্গল। সেদিক থেকে ভেসে এলো পেঁচার ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও চেঁচানি। অমঙ্গলের ডাক। বুক কাঁপতে লাগল। ডনের কোনো বিপদ হয়নি তো?

এই রাতবিরেতে জঙ্গলটার দিকে পা বাড়াতে গা ছমছম করছিল। ভূত না থাকলেও ভূতের ভয়টা থাকে। কিন্তু ডন বেচারার জন্য তখন ভূতের সঙ্গে লড়াই কবতেও তৈরি আছি। জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে গলা ছেড়ে ফের ডাকলুম, "ডন! ডন!"

এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কান্না-জড়ানো গলায় কেউ চিঁ-চিঁ করে সাড়া দিল যেন। আরও খানিকটা এগিয়ে ডাকলুম, "ডন! তুই কোথায়?"

মাথার ওপর থেকে করুণ সুরে ডন বলল, "এই যে এখানে মামা!"

"সর্বনাশ! তুই গাছের ডালে কেন রে?"

"নামতে পারছিনে মামা!" ডন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

রেগেমেগে ভেংচি কেটে বললুম, "নামতে পাঁরছিনে মাঁমা! হতভাগা ছেলে! গাছে উঠতে গেলি কেন? উঠলি যদি নামতেই বা পারলিনে কেন?"

ডন কান্না থামিয়ে বলল, "আমি কি গাছে চড়তে পারি? জটায়ু পাখির পালক আমায় উড়িয়ে এনেছে না?"

হাসতে হাসতে বললুম, "উড়ে-উড়ে নামছ'নে কেন তাহলে?"

"গাছের ডালে লেগে পালকটা ভেঙে গেল যে!" ডন আবার চিক্কুর ছেড়ে কেঁদে উঠল।

"কৈ লাফ দে। তোকে ধরে ফেলব।"

"পারব না।"

"চেষ্টা কর্ বাঁদর। রেডি! ওয়ান.....টু.....থ্রি....."

ডন মরিয়া হয়ে লাফ দিল এবং তাকে ধরে ফেললুম। তারপর ছায়াঢাকা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মাথায় এল, তাই তো! ডন গাছটাতে চড়তে পারল কেমন করে? চড়তে পারলে নামতে পারাটা কি কঠিন হত? বরং চড়াটাই কঠিন, নামাটা সোজা।

আমার গা শিউরে উঠল। তাহলে কি সত্যি পালকটার কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে? মাঠে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে বললুম, "দেখি পালকটা।"

সত্যি পালকটা ভেঙে গেছে। পস্তানি হল, পালকটা না ভাঙলে একবার আমি নিজে পরখ করে দেখতুম। কিন্তু কী আর করা যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে বললুম, "হ্যাঁরে বোকা! গাছ থেকে যে নামতে পারছিলিনে, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকলিনে কেন? বুদ্ধি করে আমি না এলে সারা রাত্তির তোকে গাছের ডালে থাকতে হত।"

ডন এবার ফিক করে হাসল। "জানো মামা, রামু ধোপা ওর গাধার পিঠে কাপড় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে যেই ডেকেছি, ও রামুকাকা! আমায় নামিয়ে দেবে? অমনি রামু রাম-রাম বলতে বলতে গাধাটাকে ডাকিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি সন্ধ্যাবেলা গাছ থেকে ডেকেছি তো ভেবেছে ভূত! হি-হি-হি!"

ডন খুব হাসতে লাগল। কথাটা কিন্তু ঠিক। ভাগ্যিস ডন আমার ভাগ্নে এবং তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। নইলে অন্য কেউ ওই পোড়ো মন্দিরের জঙ্গল থেকে ডাকলে আমিও বেজায় ভয় পেতুম না কি?

ডনকে সুতোর ব্যাপারে টমের কথাটা বললুম। তখন ডন বলল, "সুতোগুলো খুলে দাও মামা। শিগগির!"

সুতো খুলে ফেলে দিলুম। ভাঙা পালকটা হাতে নিয়ে ফের আমার গা শিরশির করতে থাকল। বললুম, "পালকটা তাহলে সত্যি জটায়ুর! হারুর কাছে কত দিয়ে কিনেছিলি রে?"

ডন আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। জ্যোৎস্নায় ওর সাদা সরু দাঁতগুলো ঝিকমিক করছিল। বললুম, "হাসছিস যে?"

ডন জবাব দিল না। গুলতির মতো হঠাৎ বোঁও করে ছুটে গেল। অদ্ভুত ছেলে তো! এমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পালকটার ওপর একটুও মায়া করল না দেখে অবাক লাগছিল।

কিন্তু হাসল কেন অমন করে? ভাঙা পালকটা পকেটে ভরে খুব ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে চললাম। হুঁ, ব্যাপারটা ভাববার মতো।.............

প্রতিবিম্ব

এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সানফ্রান্সিসকোতে। সেখানে যে মার্কিন সাহিত্যিকের বাড়িতে অতিথি ছিলুম, তিনি এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পরিচয় থেকে আলাপ এবং আলাপ থেকে বন্ধুত্বে পৌঁছতে কয়েক মিনিট লেগেছিল। বন্ধুত্ব বলছি, অথচ ইনি আমার বাবার বয়সী মানুষ। নাম ডঃ পিটার এরিখসন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ঢ্যাঙা, রোগাটে গড়নের মানুষ। প্রায় সওয়া ছ'ফুট উঁচু; একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। আস্তে আস্তে কথা বলেন। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ আনমনা হয়ে যান। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। হয়তো বিজ্ঞানীদের এই স্বভাব। আলাপে জানা গেছে উনি একসময় কয়েকবছর ভারতে ছিলেন গবেষণার কাজে। দক্ষিণ ভারতে বাঁদর নিয়ে কী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এর ফলে আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, "চলুন না আমার সঙ্গে একটা চমৎকার জায়গায়। আপনার খুব ভাল লাগারই কথা। একটু দূরে অবশ্য। তাতে কী? আপনি তো আমেরিকা ঘুরতেই বেরিয়েছেন।"

তক্ষুণি রাজি। দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম ওঁর সঙ্গে। সাহিত্যিক ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের লম্বা সাঁকো পেরিয়ে ওকল্যাণ্ড স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন। এই রেলপথের নাম অ্যামট্রাক। উপসাগরের কিনারা ধরে এগিয়ে একটা নদীর পাড় ঘেঁষে চলেছে। রিভারিয়া নামে একটা স্টেশনে পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লাগল। নেমে ডঃ এরিখসন বললেন, "এখান থেকে শুরু হল মার্শল্যাণ্ড এলাকা। মাইলের পর মাইল জলাভূমি। রিড ঘাস, ক্যাপিয়াস, নলখাগড়া জাতীয় জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে সবখানে—তার ফাঁকে ফাঁকে জল। কোথাও কোথাও জলের বিস্তার দেখে সমুদ্র বলে মনে হবে। পাখির রাজত্ব বলতে পারেন।"

অবাক হয়ে বললুম, "জলাভূমিতে মানুষের বসবাস আছে নাকি?"

এরিখসন হাসলেন। "অনেক জায়গায় জলটুঙ্গির মতো উঁচু মাটির ছোট্ট দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলোতে একটা করে বাড়ি। পয়সাওয়ালা লোকেরা দ্বীপ কিনে বাড়ি বানিয়েছে।"

"আপনিও বানিয়েছেন তাহলে?"

"হ্যাঁ। তবে ওটা বাড়ির চেয়ে গবেষণাগার বলাই ভাল। ছুটিছাটায় ওখানে

গিয়ে থাকি। মাথায় যেসব উদ্ভট-উদ্ভট চিন্তা গজায়, তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি।"

"উদ্ভট বলছেন কেন? আমার ধারণা, বিজ্ঞানীদের কোনো চিন্তাই উদ্ভট নয়।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলুম আমরা। ওভারব্রিজ পেরিয়ে নদীর ধারে জেটিতে পৌঁছে দেখি. অসংখ্য মোটরবোট, লঞ্চ, স্টীমার, থিকথিক করছে। কিন্তু লোকজন তত নেই কোথাও। এরিখসন একটা মোটরবোট দেখিয়ে বললেন, "এইটে আমার। আসুন।"

একটু পরে মোটরবোটটা চলতে থাকল। চাপা গড় গড় আওয়াজ হচ্ছিল। এরিখসন সামনে বসে ড্রাইভ করছেন। আমি ওঁর পেছনে বোটের খোঁদলে আরামদায়ক চেয়ারে বসে রইলুম। নদীপথে মাইলটাক চলার পর বাঁদিকে জলাভূমিতে ঢুকল বোট। জলে হাজার হাজার হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ জঙ্গলে ওড়াউড়ি করছে ঝাঁকে ঝাঁকে ধূসর রঙের পাখি—চড়ুইয়ের মতো দেখতে। অনেক মাছরাঙা দেখলুম। একটা গাছে সারস দেখলুম অনেকগুলো। পাখিদের রাজত্বই বটে। মোটরবোট দেখে বা তার শব্দে কেউ একটুও ভড়কাল না।

কখনও সমুদ্রের মতো বিশাল জলের বিস্তার, কখনও ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর সংকীর্ণ জলপথের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের বোট একটা দ্বীপ পৌঁছুল। দ্বীপ বা আইল্যাণ্ড বলার চাইতে এগুলোকে জলটুঙ্গি বলা ভাল। টুঙ্গির মাথায় জঙ্গলের ভেতর একটা দোতলা ধূসর রঙের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির চাল সবুজ রঙের টালির। একফালি সুন্দর পথ জলের ধারে কাঠের থেকে এগিয়ে গেছে বাড়িটার দিকে। পাটাতনের মাথায় লেখা আছে : এমিলি কটেজ। তার তলায়, 'আইল্যাণ্ড নম্বার ৩৭।'

পাটাতনের উঠে চারদিকে চোখ বুলোচ্ছি, এমন সময় এরিখসন চড়া গলায় অদ্ভুত সুর ধরে ডাকলেন, "এ-মি-ল! এ-মি-ল।"

তারপর দেখলুম, বাড়ির দিক থেকে সংকীর্ণ রাস্তায় ছুটে আসছে বছর সাত-আট বয়সের একটি সুন্দর মেয়ে। ফুটফুটে সাদা গায়ের রঙ। একমাথা সোনালী চুল। সাদা ও ধূসর ডোরাকাটা ফ্রক পরনে। পায়ের জুতোটা কালো রঙের—কিন্তু কেমন অস্বাভাবিক গড়ন—চৌকো মতো। হাঁটার সময় পায়ে কেমন একটা ধাতব শব্দ হচ্ছিল বলেই জুতোর দিকে চোখ গিয়েছে আমার।

ওর চুলের ওপর মাথার ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট কাচের টুপি দেখেও অবাক হলাম এ আবার কি? এমন বিদঘুটে জুতো তো এদেশে কোথাও কাকেও পরতে দেখিনি।

সে ছুটে এসে এরিখসনের বুকেঝাঁপিয়ে পড়ল। এরিখসন বললেন, "এমিলি! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।" বলে আমার নামধাম জানালেন এমিলিকে। এমিলি নীল দুটো চোখে আমাকে দেখছিল। "ও আমার মেয়ে এমিলি।" ডঃ এরিখসন একটু হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে।

এমিলি হাত বাড়াল। আমিও বাড়ালুম। হ্যাণ্ডশেকের সময় হঠাৎ মনে হল ছোট্ট এমিলির হাতে যেন দৈত্যের জোর। আমার হাত গুঁড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। হাত ছাড়াতে গিয়ে দেখলুম, সে ছাড়ছে না এবং খিলখিল করে হাসছে। আমার দফারফা হয়ে আসছে। এরিখসন ব্যাপারটা দেখামাত্র ধমক দিলেন, "এমিলি! এমিলি! কী হচ্ছে দুষ্টু মেয়ে? খুব হয়েছে। চলো, বাড়ি চলো তো।"

সঙ্গে সঙ্গে এমিলি হাত ছেড়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। এরিখসন বললেন, "আপনি নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছেন এই নির্জন দ্বীপের বাড়িতে এমিলিকে দেখে।"

"হয়েছি ডঃ এরিখসন। ও কি এখানে একা থাকে?"

"হ্যাঁ।"

"সে কী!"

এরিখসন একটু হাসলেন। "এমিলি একটু অসাধারণ মেয়ে বলতে পারেন। ওর গায়ের জোর, বুদ্ধিসুদ্ধি, সবকিছুই ওই বয়সের মেয়েদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। আপনি কি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আণবিক জীববিজ্ঞানী জাঁকমোদের নাম শুনেছেন?"

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বি-বি-সি—ব্রিটিশ বেতার সংস্থায় ওঁর ইন্টারভিউয়ে উনি কি বলেছিলেন জানেন? মানুষ যন্ত্র মাত্র। গবেষণাগারে তৈরি করা যায়।"

আঁতকে উঠে বললুম, "কী সর্বনাশ। এমিলিকে কি আপনি গবেষণাগারে...."

আমাকে থামিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন এরিখসন! "না, না! এমিলি আপনার আমার মতো রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আমার স্ত্রী ওর জন্মের সময় মারা যান। অনেক যত্নে এমিলিকে লালন-পালন করেছি। তবে একটু অসাধারণ প্রকৃতির মেয়ে এই যা।"

"আপনি জাঁকমোদের কথা বললেন যে?"

"একসময় আমি প্যারিসে মোদের সহকারী ছিলুম। মোদের একটা থিওরি হল, মানুষ মূলত যন্ত্র বলেই যন্ত্রের কার্যকারিতা বা শক্তি বাড়ানোর মতো মানুষেরও বাড়ানো যায়। বুদ্ধিসুদ্ধি, গায়ের জোর—সবকিছুই। আপনি নিশ্চয় ক্লোনিং কথাটার মানে জানেন? প্রাণীমাত্রেরই দেহের কোষে ক্রোমোজোম নামে একরকম জিনিস

আছে। এ জিনিস জোড়ায় জোড়ায় থাকে। মানুষের আছে তেইশ জোড়া। তো ক্রোমোজমের ভেতর আছে জিন। জিনগুলো থোকবাঁধা মালার মতো। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রাণীটির স্বভাব। যাকে বলা হয় বংশাণু। তার ভেতর রয়ে গেছে সেগুলো। আপনি ডি এন এর কথা শুনে থাকবেন। তো এই ডি এন এ এবং সামগ্রিকভাবে জিনের হেরফের ঘটানো সম্ভব। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে এই পদ্ধতিকে। এই পদ্ধতির সাহায্যে জিনে ওই রকম হেরফের ঘটিয়ে পছন্দ মতো আকৃতি-প্রকৃতির মানুষ সৃষ্টি করার নাম ক্লোনিং। ধরুন, এভাবে অসংখ্য রবীন্দ্রনাথ কিংবা অসংখ্য হিটলার সৃষ্টি করা যায়।"

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডঃ এরিখসন বললেন, "আপনার কন ঝালাপাল করে ফেললুম। ভেতরে আসুন।"

সত্যি কান ঝালাপালা হয়ে গেছে আমার। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে এসব কথা শুনে। দরজা খুলে এরিখসন ভেতরে ঢুকলেন। আমি ওঁর পেছনে। ঢুকে মনে হল যেন একটা পোড়ো বাড়ি। আসবাবপত্র কতকালের পুরনো। ঝুলকালি জমে আছে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধও পাচ্ছি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে যে ঘরে ঢুকলুম, সেটা পরিচ্ছন্ন দেখে আশ্বস্ত হলুম। এরিখসন বললেন, "আরাম করে বসুন। আমি কফির ব্যবস্থা করি।"

উনি চলে গেলে পেছনের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। উঁচুতে আছি বলে চারদিকে বিস্তীর্ণ জলা-জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। সূর্য গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমে। হাল্কা গোলাপী রোদ্দুরে পড়েছে। ভারি সুন্দর জায়গা বটে। চোখ জুড়িয়ে গেল দেখে।

তারপর চোখ গেল জলার ধারে। একটা পাথরে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি। একা ওখানে কি করছে মেয়েটা? এ বাড়িতে একা থাকেই বা কেমন করে? এতটুকু মেয়ে! খাওয়া-দাওয়ার অবশ্য অসুবিধে থাকার কথা নয়। প্যাকেট ফুড, দুধ, ফলের রস সারা বছরের জন্যে ঘরে রাখা যায়। রান্নাকরা খাবারের ধার ধারে না এদেশের লোক।

হঠাৎ এমিলি এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাডল। আমিও নাড়লুম। তরাপর সে কয়েকপা এগিয়ে এসে বলল, "এই লোকটা। এস না এখানে। তোমায় একটা জিনিস দেখাব।"

ব্যালকনির শেষপ্রান্তে কাঠের সিঁড়ি ঘোরালো হয়ে নেমে গেছে। বাড়ির পেছনদিক এটা। নেমে গেলুম ওর কাছে। ভয় বলব না, তবে কেমন অস্বস্তি জেগেছিল। তবু গেলুম, ওকে খুঁটিয়ে দেখে ওর অসাধারণতা টের পেতেই।

এমিলি জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে একটা জায়গায় দাঁড়াল। কাছে গিয়ে দেখি, একটা পাথরের কবর। কবরটা দেখিয়ে সে বোবার মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কবরের ফলকে চোখ পড়তেই আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। লেখা আছে : 'এমিলি এরিখসন। জন্ম : ৭ জুন, ১৯৪০, মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৪৮।'

কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, "ওটা কার কবর এমিলি?"

এমিলি চাপা গলায় শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল, "আমার।"

মাথা ঘুরে উঠেছিল। কিন্তু তখনই ডঃ এরিখসনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড় এসে বললেন, "এমিলি? দুষ্টু মেয়ে। ঘরে যাও এক্ষুণি। যাও বলছি।" তারপর আমার হাত ধরে টানলেন। "আসুন। কফি এনেছি।"

"ও কবর কার ডঃ এরিখসন?"

এরিখসন জবাব দিতে গিয়ে এমিলির দিকে তাকালেন। স্থির. পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। এরিখসন ধমক দিয়ে বললেন, "কী হল? চলে এস।"

এমিলির চোখ বুজে এল। তারপর তাকে পড়ে যেতে দেখলুম। ডঃ এরিখসন দুহাতে ধরে ফেললেন মেয়েকে। তারপর ওর মাথার সেই অদ্ভুত কাচের টুপিটা নাড়াচাড়া করতে থাকলেন। বললুম, "ফিট হয়ে গেছে। ওকে ঘরে নিয়ে চলুন ডঃ এরিখসন।"

ডঃ এরিখসন গম্ভীর মুখে বললেন, "আপনি চলুন। আমি যাচ্ছি।"

সেই ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখলুম, উনি মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিচের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলুম। ব্যাপারটা ভারি রহস্যময় মনে হচ্ছে। দূরে মার্শল্যাণ্ডের দিগন্তে সূর্য ডুবে গেছে ততক্ষণে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ডঃ এরিখসনের সাড়া পেলুম ঘরে। "এ কী! কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে! আসুন।"

ভেতরে ঢুকে বললুম, "এমিলির জ্ঞান ফিরেছে?"

এরিখসন ম্লান হাসলেন। "কেন জানি না, এসে অব্দি লক্ষ্য করছি এমিলি কেমন যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। সূর্যাস্তের সময় আর বাইরে থাকার কথা নয় ওর। অথচ আজ সূর্যাস্তের সময় ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনি কফি খাচ্ছেন না কিন্তু।"

"খাই।" বলে চুমুক দিলুম কফির পেয়ালায়। কিন্তু সূর্যাস্ত কথাটা আমাকে নাড়া দিতে থাকল। কেন সূর্যাস্তের পর এমিলির বাইরে থাকার কথা নয়? ওর মাথার ওই কাচের টুপিই বা কেন? তাছাড়া ওটা কোন্ এমিলির কবর দেখলুম?

"আপনি তখন কবরটার কথা জিগ্যেস করছিলেন।" এরিখসন ঘরে সুইচ

টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। নিশ্চয় জেনেরেটরের ব্যবস্থা আছে বাড়িতে। ফের বললেন, "ঠিকই দেখেছেন। ওটা আমার মেয়ে এমিলির কবর। জলে ডুবে মারা গিয়েছিল।"

"তাহলে....... তাহলে এ কোন্ এমিলি?"

"তখন আপনাকে ক্লোনিংয়ের কথা বলছিলুম..... "

"ডঃ এরিখসন। কী বলছেন!"

"হ্যাঁ, এ এমিলি আমারই সৃষ্টি। মৃত এমিলির অবিকল প্রতিবিম্ব।" ডঃ এরিখসন কফিটুকু একচুমুকে শেষ করে দিলেন। "মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহকোষ নষ্ট হয়ে যায় না। খানিকটা সময় লাগে নষ্ট হতে। এমিলির দেহকোষ থেকে একটু অংশ কেটে নিয়েছিলুম। তাতে জিনের ভেতর ডি এন এ তে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় নতুন বংশাণুগুচ্ছ তৈরি করেছিলাম। আপনি দেখেছেন, অণুর মতো ক্ষুদে বীজ থেকে কী প্রকাণ্ড গাছ গজায়। আসল এমিলির সেই আণবিক বীজ—যা স্বাভাবিকভাবে বাড়তে প্রায় আট-ন'বছর লেগেছিল, আমার গবেষণাগারে তা একবছরেই বিকশিত হয়ে এমিলির বর্তমান শরীরে রূপ পেয়েছে।"

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে। তারপর বললুম, "এই যুগান্তকারী ঘটনা এখনও চেপে রেখেছেন?"

ডঃ এরিখসন বললেন, "রেখেছি। কারণ এখনও কিছু কাজ বাকি। ওকে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত করার আগে বাইরে প্রচার করব না, এই আমার ইচ্ছা। এখনও ওর মাথায় আটকানো সৌর প্যানেলের সাহায্যে প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছি—কারণ, ভুলে যাবেন না, মৃত এমিলির দেহকোষ থেকে আণবিক বীজ নিয়েছিলুম। ফলে সূর্যাস্তের পর ওর শরীর থাকে, প্রাণ থাকে না।"

হাসতে হাসতে বললুম, "আমি স্বচক্ষে দেখলুম—বাইরে প্রচার করে দেব যে!"

এরিখসনও হাসলেন। "আপনার কথা কেউ বিশ্বস করবে না। সবাই বলবে উদ্ভট গল্প।"............

সকালে ঘুম ভাঙল ডঃ এরিখসনের ডাকে। হাতে কফির পাত্র। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। বললুম, "কী হয়েছে ডঃ এরিখসন আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?"

এরিখসন আস্তে জবাব দিলেন, "রাতে এমিলি মারা গেছে। ওকে বাঁচাতে পারলাম না।"

"সে কী?"

"কফি খেয়ে চলুন, দেখবেন ওকে।"

কফি ঝটপট গিলে ওঁর সঙ্গে নিচে একটা ঘরে গেলুম। এটা ওঁর গবেষণাগার। একটা বাথটাবের বিছানায় লম্বা ধাতব কফিনে এমিলি—সুন্দর ফুটফুটে সাদা মেয়েটা চোখ বুজে শুয়ে আছে। আমার চোখে জল এসে গেল।

"ওকে কবর দেকেন না ডঃ এরিখসন?"

এরিখসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "লক্ষ্য করে দেখুন—আপনি যা দেখছেন, তা একটা মেয়ের চেহারার প্রতিবিম্ব। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে চেহারাটা মুছে যাবে। তারপর যা থাকবে, তা একমুঠো ছাই মাত্র। ছাইগুলোও একসময় মিলিয়ে যাবে। বাতাসের মধ্যে কার্বন অণু হয়ে মিশে যাবে। আমারই ভুল হয়েছিল। বিজ্ঞানের সীমানা ডিঙিয়ে যখন আসল এমিলিকে মাথা ভাঙলেও ফিরে পাব না তখন তার প্রতিবিম্ব নিয়ে কী হবে?"

ডঃ এরিখসন, প্রখ্যাত আণবিক জীববিজ্ঞানী এরিখসন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কা বলে ওঁকে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পাচ্ছিলুম না।..........

যেখানে কর্নেল

হরিচরণ এবং হরদয়ালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাদ্রাজ মেলের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে। আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন বটে! সারাটা রাত্তির গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন।

ট্রেন জার্নিতে ঘুমনো আমার পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর ওই বকবকানি আর মাঝে-মাঝে কর্নেলের হা-হা-হা-হা বিকট অট্টহাসি। কেন হাসছেন, গল্পটাই বা কী, ওপরের বার্থে শুয়ে একটুও ঠাহর হচ্ছিল না আমার। তার চেয়ে বিকট হাসি হরদয়াল নামে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটির। বিকটই বলছি। কারণ, নাদুসনুদস গড়নের মধ্যবয়সী এবং প্রচণ্ড গুঁফো কোনও লোকের কণ্ঠস্বর যে অমন মেয়েলি আর ভূতুড়ে হতে পারে, কস্মিন্‌কালে শুনিনি। ভূতুড়ে বলারও কারণ আছে। ভূত-পেরেত নাকি খোনা গলায় কথাবার্তা বলে। হরদয়ালবাবু যদি আড়াল থেকে কথাবার্তা বলেন, দিন-দুপুরেও রীতিমত সাহসী লোককেও আঁতকে উঠতে হবে।

হরিচরণবাবু দেখছিলুম একেবারে উলটো। কথাবার্তা বলছিলেন কম। গড়ন বা চেহারায়, তা ছাড়া পোশাকেও তাঁর সঙ্গীর একেবারে উলটো। লম্বাটে শক্তসমর্থ গড়নের লোক। চিবুকে কুচকুচে কালো দাড়ি এবং দু'পাশে জাঁকালো জুলপি। পরনে প্যান্ট-শার্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরটিও বেশ গম্ভীর।

প্রথম আলাপেই জানতে পেরেছিলুম আমাদের মতো ওঁদেরও গন্তব্য গোপালপুর-অন-সি। কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকায় 'হরিহর এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে দু'জনে মিলে একটি কোম্পানি গড়েছেন। আমদানি-রপ্তানি কারবার করেন। কারবারি জীবনের একঘেয়েমি, কাটাতে মাঝে-মাঝে কয়েকদিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। মাদ্রাজ মেল চিল্কা স্টেশনে পৌঁছতে সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল। তখন কর্নেলের তাড়ায় আপার বার্থ থেকে নেমে এলুম। হরিচরণবাবুও ওপাশের আপার বার্থ থেকে নামলেন। একটু পরে চা খেতে-খেতে হরিচরণবাবু কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা উঠছেন কোথায়?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কিছু ঠিক করে আসিনি। শুনেছি গোপালপুর-অন-সি'তে ট্যুরিস্টদের চেয়ে নাকি হোটেল বা লজের সংখ্যা বেশি। এও শুনেছি, ওখানে সমুদ্রতীরও নাকি বেশ নির্জন আর খোলামেলা।"

হরদয়ালবাবু তাঁর ভুতুড়ে গলায় হিঁহিঁ করে হেসে বললেন, "অপূর্ব। অপূর্ব।

আমরা তো মশাই প্রতি বছর পুজোর ঠিক পরেই ওখানে যাই। বুঝলেন না? কারবারি মগজ ঠাণ্ডা করার জন্য এমন সি-বিচ আর পাব কোথায়?”

হরিচরণবাবু বললেন, “সি-ভিউ হোটেলে উঠতে পারেন। আমাদের সঙ্গে মালিকের খুব চেনাজানা আছে। তা ছাড়া এখন নভেম্বরে সব হোটেল তো খালিই পড়ে থাকে। ট্যুরিস্ট সিজন শুরু হবে ডিসেম্বর থেকে।”

হরদয়ালবাবু সায় দিয়ে বললেন, “কোনও অসুবিধে হবে না। চলুন, সি-ভিউতেই ব্যবস্থা করে দেব। কী বলো হরি?”

হরিচরণবাবু মাথা দোলালেন। “হ্যাঁ, সি-ভিউ নতুন হোটেল। একেবারে মর্ডার্ণ ব্যবস্থা। সায়েব-ট্যুরিস্টরা এলে দেখেছি ওখানেই ওঠেন।”

বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছতে আটটা বেজে গেল। ট্রেন বেশ খানিকটা লেট করেছে। চারজনে মিলে একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে গোপালপুর-অন-সি’তে পৌঁছতে মাত্র আধঘন্টা লাগল। মাইল পঁয়ত্রিশেক দূরত্ব। সি-ভিউ হোটেলটি সত্যই সুন্দর। ম্যানেজার ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক আর আলাপী মানুষ। হরিচরণবাবু আর হরদয়ালবাবর সঙ্গে ওঁর ভালরকম চেনাজানা। চারতলা হোটেলের চারতলাতেই একটি স্যুইট পেয়ে গেলুম আমরা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের স্যুইটটির নম্বর চার। তারই উল্টো দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে তিন নম্বর স্যুইটটি হরিচরণবাবুর তদ্বিরেই আমাদের ভাগ্যে জুটল। এক মন্ত্রীমশাই নাকি হঠাৎ এসে পড়ার আভাস পাওয়া গেছে। তাই ম্যানেজার একটু ইতস্তত করছিলেন। শেষে হরিচরণবাবু রফা করে দিলেন, যদি সত্যিই মন্ত্রীমশাই এসে পড়েন, আমরা অন্য একটি স্যুইটে চলে যাব। হোটেল তো এখন প্রায় ফাঁকা। চারতলার মোট বারোটা স্যুইটের মধ্যে গোটা পাঁচেক স্যুইট ভর্তি আছে।

চারতলার চার নম্বর স্যুইটটি হরিচরণ-হরদয়ালের কলকাতা থেকে বুক করা ছিল। দুই বন্ধু মিলে সেটিতে ঢুকলেন। তিন নম্বরে ঢুকলুম আমরা। ব্যালকনিতে গিয়ে অভ্যাসমতো কর্ণেল চোখে বাইনোকুলার রেখে সম্ভবত সামুদ্রিক পাখপাখালি খুঁজতে থাকলেন। আমি দেখতে থাকলুম সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে প্রকাণ্ড সব কালো-কালো পাথর মাথা তুলে আছে। সেইসব পাথরগুলোর সঙ্গে সমুদ্র যেন খেলা করছে। মাঝে-মাঝে সেগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে। কর্ণেলের মতোই হা-হা করে সমুদ্র হেসে উঠছে আর ফেলাগুলো যেন কর্ণেলেরই সাদা দাড়ি।

ভাবলুম, এই লাগসই উপমাটি ওঁকে শুনিয়ে দিই। কিন্তু উনি বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, “জয়ন্ত, তুমি তো একজন সাংবাদিক। ওদের সম্পর্কে তোমার কাগজে কিছু লেখা উচিত।”

অবাক হয়ে বললুম, "কাদের সম্পর্কে?"

"এখানকার মৎস্যজীবীদের," কর্ণেল দুঃখিত মুখে বললেন, "দূরের সমুদ্রে জলটা তত অশান্ত নয়। সেখানে মাছও প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্য করো, বিচের কাছাকাছি অনেকটা দূর পর্যন্ত সমুদ্রের কী সংঘাতিক অবস্থা। ভেবে দ্যাখো, জয়ন্ত, ছোট্ট সব নৌকো নিয়ে এই অংশটা পেরোতে বেচারাদের কী লড়াই না করতে হয়। প্রতিদিন ওরা এই লড়াই করে তবে সামান্য কিছু মাছ ধরতে পারে। ফেরার সময় আবার সেই লড়াই। তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছ, সমুদ্রে কতসব পাথরও মাথা উঁচিয়ে আছে। দৈবাৎ ধাক্কা লাগলে নৌকো ভেঙে গুঁড়িয়ে তো যাবেই, ওরাও বাঁচবে না! ওদের এই প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামের কথা তোমার লেখা উচিত, ডার্লিং। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে যখন বিশেষ-বিশেষ সামুদ্রিক মাছের সুস্বাদ নিয়ে প্রশংসা করি, তখন কি চিন্তা করে দেখি যে... ..."

আমার বৃদ্ধ বন্ধুর সারগর্ভ ভাষণে বাধা পড়ল দরজার কলিং-বেলের বাজনায়। গিয়ে দরজা খুলে দেখি, হরিচরণবাবু একেবারে সমুদ্রস্নানের জন্য তৈরি হয়ে আমাদের ডাকতে এসেছেন। বললেন, "আসুন কর্ণেল, সমুদ্রস্নান করে খিদে চাঙ্গা করা দরকার, নইলে ব্রেকফাস্ট জমবে না। জয়ন্তবাবু, দেরি করবেন না! পোশাক বদলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বাই দা বাই, আপনারা বাথ-স্যুট সঙ্গে এনেছেন তো? এখানে সমুদ্র কিন্তু বিপজ্জনক।"

কর্ণেল একটু হাসলেন, "বাথ-স্যুটের দরকার হবে না, হরিচরণবাবু! কারণ, এ-বেলা আমি সমুদ্রে নামছি না। তবে জয়ন্তর কথা আলাদা। ইয়াংম্যানরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় না। কী বলো ডার্লিং?"

ঝটপট বললুম, "আমার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।"

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, "সমুদ্রের জলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। আসুন না, নুলিয়া পাওয়া যাবে। পুরীর সমুদ্রে কি কখনও স্নান করেননি?"

আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করলেন হরিচরণবাবু। টের পেলুম, ভদ্রলোকের গায়ের জোর আছে বটে। কর্ণেলও বেরোলেন। করিডোরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হরদয়ালবাবু স্নান করতে যাবেন না? নাকি আমার মতোই জলকাতুরে মানুষ?"

হরিচরণবাবু বললে, "যা বলেছেন! ওকে টেনে ওঠাতে পারলুম না বিছানা থেকে। দাঁড়ান, আবার চেষ্টা করে দেখি।"

উল্টোদিকে চার নম্বর স্যুইটের দরজা ফাঁক করে উনি ডাকলেন, "হর. ও হর, স্নান না-ই বা করলে। অন্তত বিচে বসে আমাদের স্নান করা দেখবে এসো। সমুদ্র দেখলে খিদে বাড়বে হে, রাক্ষসের মতো খেতে পারবে।"

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, খাটে হরদয়ালবাবু চিত হয়ে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর একটা হাত। ওই অবস্থায় শুয়ে থেকেই সেই ভূতুড়ে কণ্ঠস্বরে বললেন, "না হে, ট্রেন-জার্নির ধকল সামলে নিতে দাও আগে। বরং দুপুরের দিকে দেখব।"

হরিচরণ সহাস্যে বললেন, "তুমি তো বরাবর এখানে এসে আগে স্নান না করে ব্রেকফাস্ট করতে না! এবার হলটা কী?" বলে কর্ণেলের দিকে ঘুরলেন। "আমার ফ্রেণ্ড, বুঝলেন তো, বড্ড খামখেয়ালি। গত বছর ও আমাকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নামিয়ে ছেড়েছিল। সত্যি বলতে কী, এখানকার সমুদ্রকে আমারও বড্ড ভয় করত। ওর পাল্লায় পড়েই সে-ভয়টা কেটে যায়।"

কর্ণেল ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু কি অসুস্থ বোধ করছেন? ও হরদয়ালবাবু!"

হরদয়াল সেইরকম মেয়েলি এবং খোনা গলায় জবাব দিলেন, "আরে না. না, আপনারা যান না, আমি দুপুরে স্নান করব'খন।"

হরিচরণ রাগ করে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললেন, "ছেড়ে দিন। ও বরাবর ওইবকম একগুঁয়ে!"

হোটেল থেকে বেরিয়ে সি-বিচে নামার সময় কর্ণেল বললেন, "হরদযালবাবুর টনসিলের গণ্ডগোল আছে। কাল রাত্রে সে নিয়ে আলোচনা করছিলুম। উনি বললেন, দু'বার অপারেশন করিয়েও কিছু হয়নি।"

হরিচরণ বললেন. "আসল গণ্ডগোল থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে। ডাক্তাবদের মতে, ওই গ্ল্যাণ্ডে অপারেশন না করলে গলার স্বর বদলাবে না, তাছাড়া ক্রমশ বডিটাও আবও মোটা হয়ে যাবে। কিন্তু সার্জারিতে হর'র বড্ড আতঙ্ক। দু'বাব টনসিল অপারেশন কবিযেছিল, সে একরকম আমারই চেষ্টায়। বড্ড জেদি ও।"

সমুদ্রের বিচ ভাটার সময়ও তত কিছু চওড়া নয়। খানিকটা ঢালুও। আমাকে টানাটানি কবে হরিচরণ সমুদ্রে নামাতে পাবলেন না। কর্নেল বিচে বসে বাইনোকুলাবে লাইটহাউস কিংবা অন্য কিছু দেখতে থাকলেন। হরিচরণ ভাল সাঁতারু নিঃসন্দেহে। একদল কাচ্চাবাচ্চাও ওঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল। ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলো মৎস্যজীবী বস্তির। এখন থেকেই ওরা এমনি করে এই সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। ভবিষ্যতের বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। কর্ণেল ঠিকই বলেছেন, এদের কথা 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় আমার লেখা উচিত।

কিছুক্ষণ পরে কর্ণেল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বিচের ওপরদিকের বালিয়াড়ি থেকে প্রায় আছাড় খেতে খেতে নেমে এলেন সি-ভিউ হোটেলের সেই ম্যানেজার ভদ্রলোক। তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে স্যার! হরদয়ালবাবু খুন হয়েছেন।" বলে সাঁতারু হরিচরণের উদ্দেশে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত ছোঁড়াছুঁড়ি এবং লম্ফঝম্ফ করে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

কর্ণেল তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বালিয়াড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁর টুপি খসে পড়ল। প্রশস্ত টাকটি ঝকমক করে উঠল। কিন্তু টুপির দিকে মনই দিলেন না। অদৃশ্য হয়ে গেলেন বালিয়াড়ির ওধারে।

এতক্ষণে আমার মাথার ঘিলু চাঙ্গা হল এবং আমিও দৌড়ে চললুম। বালিয়াড়ির খাঁজ থেকে কর্ণেলের টুপিটি কুড়িয়ে নিয়েই গেলুম।

হরদয়ালবাবুর মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছিল। হোটেলের পরিচারক গোবিন্দরাম আমরা বেরিয়ে আসার আন্দাজ মিনিট পনেরো পরে জিজ্ঞেস করতে যায়, ব্রেকফাস্টে কী কী খাবেন বাবুরা। দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। প্রথমে সে কলিং-বেলের বোতাম টেপে। তারপর সাড়া না পেয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। সে হরিচরণকে বেরোতে দেখেছিল। কাজেই সে জানত, হরদয়ালবাবু ভেতরে আছেন। বাথরুমে আছেন ভেবেই সে অপেক্ষা করছিল। শেষে অধৈর্য হয়ে দরজা খোলে এবং হরদয়ালবাবুকে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দ্যাখে। বাবুর সাড়াশব্দ না পেয়ে তার সন্দেহ হয়। তখন সে ওঁর দিকে ঝুঁকে কপালে হাত রাখে। কপাল ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল। তারপব তার চোখে পড়ে বালিশের ওপর রক্তের ছোপ। মাথার পেছন দিকটা থেকে সামান্য একটু রক্ত গড়িয়ে এসে বালিশে ছোপ ফেলেছিল।

পুলিশ এসে যথারীতি মৃতদেহ বহরমপুর শহরের মর্গে নিয়ে গেল। সবাইকে তন্নতন্ন জেরা করে বিবৃতি লিখে নিয়েও গেল। হরিচরণ বন্ধুর শোকে কাঁদতে কাঁদতে পুলিশের গাড়িতে বহরমপুর চলে গেলেন। সেখান থেকে ট্রাংককল করে হরদয়ালের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেবেন।

হরিচরণের মুখেই আমরা জানতে পেরেছিলুম, হরদয়ালের অ্যাটাচিকেসে প্রচুর টাকা ছিল। সেটা উধাও হয়ে গেছে।

পুলিশের গাড়িতে উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের স্যুইটে ফিরে কর্ণেলকে বললুম, "আপনার সঙ্গে আর কোথাও যাচ্ছি না। যেখানে আপনি, সেখানেই খুনখারাপি। ব্যাপারটা কী?"

কর্ণেল একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ব্যাপার তত কিছু গুরুতর নয়।"

অবাক হয়ে বললুম, "গুরুতর নয়? কী বলছেন! যে-হোটেলে এভাবে খুনে চোর-ডাকাত ঢোকে, সেই হোটেলে আমার আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

কর্ণেল ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে-এগারোটা বাজে। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। চলো দেখি, ক্যান্টিনে একটু সকাল সকাল লাঞ্চ পাওয়া যায় কি না।"

সূর্যাস্তের পরও কর্নেল ও আমি সি-বিচে গিয়ে বসে আছি, সেই সময় পিছনের বালিয়াড়িতে কয়েকটি ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। ডান দিকে বিচের মাথায় কতকগুলো

পাথরের ভাঙাচোরা বাড়ি। খুব পুরোনো আমলের বাড়ি। ছায়ামূর্তিগুলো বালিয়াড়ি থেকে সোজা না নেমে সেই ভাঙা বাড়িগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ল। অমনি ভয় পেয়ে চাপা স্বরে বলে উঠলুম, "কর্নেল, নির্ঘাত চোর ডাকাতের দল!"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা তো ব্যবসায়ী নই। টাকাকড়িওয়ালাও নই। চোর-ডাকাত লোক চেনে ডার্লিং!"

"তাহলে ওরা কারা?"

"যারাই হোক, আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।"

একটু পরে সমুদ্রের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠল ঝলমলে এক বিশাল লাল-হলুদ রঙের গোলা। ওটা যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। তারপর পিছন থেকে কে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "কর্নেলসায়েব নাকি?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "হরিচরণবাবু? আসুন, আসুন। কখন ফিরলেন বহরমপুর থেকে?"

"এইমাত্র," বলে হরিচরণ এসে আমাদের পাশে বসলেন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে ভাঙা গলায় বললেন, "আপনি কী বলবেন বলছিলেন, তাই চলে যাওয়ার আগে দেখা করতে এলুম।"

কর্নেল আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা হরিচরণবাবু, আপনি কি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন?"

হরিচরণও চমক-খাওয়া গলায় বললেন, "কেন বলুন তো।"

কর্নেল বললেন, "আমি অনেকদিন যাবৎ তন্ত্রসাধনা করেছি। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আপনার বন্ধু হরদয়ালবাবুর আত্মার সঙ্গে যদি আপনি বাক্যালাপ করতে চান, করতে পারেন। ডাকব তাঁকে?"

হরিচরণ বললেন, "এ-কথা বলতেই ডেকেছিলেন কি?"

কর্নেল জবাব না দিয়ে ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু, আপনার বন্ধু এখানে উপস্থিত আছেন। কিছু বলার থাকলে বলুন ওঁকে।"

সামনে সমুদ্রের প্রচণ্ড আলোড়ন এবং সেই আলোড়নের মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার রঙ দুলছে। ঝকমক করছে। যেন এক বিশাল অলৌকিক দৃশ্যের সামনে বসে আছি। আর সেই অলৌকিকতাকেও তুচ্ছ করে দিয়ে ভেসে এল হরদয়ালবাবুর ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর, "কী হরি, এখনও কী করছ এখানে? শিগগির কলকাতা চলে যাও। আমার তো ছেলেপুলে নেই। এখন তোমারই সব। হরিহর এন্টারপ্রাইজের একচ্ছত্র মালিক হতে অসুবিধেও নেই।"

হরিচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই চালাকির অর্থ কী?"

কথাটা বললেন কর্নেলকে। জবাব এল হরদয়ালের প্রেতাত্মার কাছ থেকে। "চালাকি তুমিও কম জানো না হরি, ও কী পালাচ্ছ কেন? আরে শোনো, শোনো!"

হরিচরণ সত্যি পালাচ্ছিলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে বসে আছি। হঠাৎ ডান দিকের সেই ভাঙা পাথুরে বাড়িগুলো থেকে একঝাঁক টর্চের আলো এসে পড়ল এবং একদল ছায়ামূর্তি ঘিরে ধরল হরিচরণকে। তখন বুঝতে পারলুম, সেই ছায়ামূর্তিগুলো পুলিশ। হরিচরণকে গ্রেফতার করছে।

কর্নেল বললেন, "কী ডার্লিং, বোবা হয়ে গেলে যে?"

বললুম, "কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না।"

কর্নেল হাসলেন. "স্রেফ ভেন্ট্রিলোকুইজিম! আমি এই স্বর-জাদু বিদ্যাটি সম্প্রতি শিখেছি। যাই হোক, হরদয়ালের মাথার পিছনে সাইলেন্সার-লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে হরিচরণ ওঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। আমরা ওঁদের স্যুইটের দরজার ফাঁক দিয়ে ওঁকে দেখেছিলুম ঠিকই। তখন আসলে উনি মৃত। কিন্তু এই হরিচরণ ভেন্ট্রিলোকুইজমে খুব পাকা। বিশেষ করে হরদয়ালবাবুর ...সিলের ত্রুটি থাকায় হরিচরণের সুবিধে হয়েছিল। আমাদের সাক্ষী রাখতে চেয়েছিল যে, হোটেল থেকে বিচে আসার সময় আমরা হরদয়ালকে জীবিত দেখেছি, কারণ, ওঁর কথাবার্তা শুনেছি।"

সবকিছু আমি দেরিতে বুঝি! ঝটপট বললুম, "বুঝেছি, বুঝেছি!"

কর্নেল বললেন, "এখনও সবটা বোঝনি। গতরাত্রে ট্রেনে হরদয়ালবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জানতে পেরেছিলুম, হরিচরণ একসময় ম্যাজিশিয়ান ছিল। আর আজ সকালে সমুদ্রস্নানে সে এসেছিল পিস্তলটা সমুদ্রে ফেলতে।"

তুরুপের তাস

এক
কাগজের খবর

অক্টোবর মাসের এক অত্যুজ্জ্বল রবিবারের সকাল কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ একপ্রকার কিম্ভূত আকৃতির ক্যাকটাসের সামনে চোখ বুজে ধ্যানস্থ রয়েছেন এবং তাঁর কানে হেডফোন চাপানো। হেডফোনের তার গিয়ে ক্যাকটাসের গায়ে বেঁধানো একটা আলপিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকেছিলুম, বুড়োকে একটু চমকে দেবার আশায়। কিন্তু উল্টে আমাকেই ভীষণ চমকে উঠতে হল, যখন উনি হঠাৎ ঠকঠক করে কেমন অদ্ভুত ভংগিতে কাঁপতে শুরু করলেন।

আমি ভাবলুম, ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন কর্ণেল। তাই শশব্যস্তে কাছে গিয়ে প্রথমে দেয়ালের সুইচবোর্ডের সঙ্গে হেডফোনের সংযোগ খুঁজলুম। না দেখতে পেয়ে ধারণা হল, হয়তো ওই উদ্ভুট্টে উদ্ভিদটা থেকেই কোনো মারাত্মক বিদ্যুৎশক্তি নির্গত হয়ে ওঁকে শকে জর্জরিত করছে।

অতএব তক্ষুণি ক্যাকটাসের গা থেকে পিনটা উপড়ে ফেললুম।

আমনি কর্ণেল 'আহা হা' করে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়ে করুণ স্বরে বললেন, করলে কী জয়ন্ত। আমার বাইশ ঘন্টার রক্ত জল করা পরিশ্রম বরবাদ করে ফেললে?

আমি তো অপ্রস্তুত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললুম, আমি ভেবেছি আপনাকে ইলেকট্রিক শক লেগেছে।

কর্ণেল হতাশ ভংগিতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেডফোনের মতো যন্ত্রটা মাথা থেকে খুলে বললেন. "তুমি কী ক্ষতি যে করলে জয়ন্ত, তোমায় বোঝাতে পারব না। এই যে যন্ত্রটা দেখছ, এটা উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার জগদীশ বসুর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এক রুশ বিজ্ঞানী সম্প্রতি তৈরি করেছেন। উদ্ভিদদের যে ভাষা আছে, তা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় এবং সে যা বলছে, তার জবাবও তার ভাষায় দেওয়া যায়।"

অবাক হয়ে বললুম, "আপনি ম্যালেরিয়ায় পাওয়া লোকের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলেন—তা কি ওই হতচ্ছাড়া ক্যাকটাসটার সঙ্গে বাতচিত?"

ঠিকই ধরেছ। বলে ঘুঘুমশাই কোণের দিকে আরামকেদারায় গিয়ে বসলেন। তারপর চুরুট ধরালেন।

পাশের ডিভানে বসে বললুম, না জেনে দোষ করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

কর্ণেল সস্নেহে হাসলেন। জয়ন্ত! তোমায় একটা বই দেব। 'দি সিক্রেটস অফ প্ল্যান্ট লাইফ।'। পড়লে বুঝতে পারবে। উদ্ভিদ কীভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। যাক্ গে, বসো। কফি-টফি খাও। ষষ্ঠীকে বলি।"

বলে তিনি ষষ্ঠীচরণকে হাঁক দেবার জন্য ঠোঁট ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণ ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। একগাল হেসে বলল, "কাগজের দাদাবাবু! প্রতাপগড়ের পেত্নীর খবরটা কি সত্যি গো?"

ষষ্ঠী ইদানিং আমায় কাগজের দাদাবাবু বলে সম্ভাষণ করে। তবে দুঃখের বিষয় কাগজেব লোক বলেই কাগজের খবরে আমার রুচি নেই। ময়রা কি সন্দেশ খেতে ভালবাসে? তাই বললুম, "ষষ্ঠী! পেত্নীর খবরের চেয়ে তোমার কর্তামশাইয়ের যে কীর্তি এইমাত্রে দেখলুম, সেটাই আজকের বড় খবর।"

ষষ্ঠীচরণ বেজার মুখে চলে গেল। কর্ণেল কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললেন, "হুম। ষষ্ঠীকে অবহেলা করো না ডার্লিং। আজকাল আমি বিবিধ বিষয়ে ওর পরামর্শ নিই। জয়ন্ত, ইনটুইশান বলে একটা ব্যাপার আছে—যা প্রকৃতি অনেক মানুষকে দিয়েছেন এবং এতে শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদাভেদ রাখেন নি। তাছাড়া তুমি তো জানো, প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন নাটক লিখে আগে তাঁর পরিচারিকাকে শোনাতেন।

বললুম, "আপনার ভাষণের লক্ষ্য কী কর্ণেল? প্রতাপগড়ের পেত্নী?"

কর্ণেল মুচকি হেসে বললেন "ষষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সেই সূক্ষ্ম বোধ আছে জয়ন্ত। আজ ওই খবরটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে বারবার। আমি ক্যাকটাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মন দিতে পারি নি। তবে আমার ধারণা, খবরটা নিশ্চয় সামান্য খবর নয়।

পাশে টেবিলে সেদিনের কয়েকটা কাগজ ছিল। আমাদের কাগজ দৈনিক সত্যসেবককে আমি তত গুরুত্ব দিই না। তাই অন্য একটি বাংলা দৈনিক তুলে নিলুম। প্রথম পাতার নিচের দিকে খবরটা দেখতে পেলুম।

ডাকুরাণী লছমীর প্রেতাত্মা

প্রতাপগড়, ১২ অক্টোবর—সম্প্রতি এ অঞ্চলে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি ডাকাতির খবর পাওয়া গেছে। শেষ ডাকাতি ঘটেছে একটি পেট্রল পাম্পে। গতকাল এই পাহাড়ী শহরের প্রান্তে জাতীয় সড়কের ধারে একটি পেট্রল পাম্পে রাত নটার সময় ডাকুরাণী লছমী আচমকা হাজির হয়। তাঁকে দেখামাত্র পাম্পের কর্মচারীরা

হতবাক হয়ে যায়। কারণ লছমী গতমাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ তার মৃতদেহ দেখেছে। অবিকল সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ জীবিত মানুষের মতো পেট্রল পাম্পে উপস্থিত হয়েছে এবং তার হাতে যথারীতি রিভলবারও রয়েছে দেখে কর্মচারীরা আতংকে কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কেউ দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। পাম্পের মালিক পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর ক্যাশে তখন সতের হাজার টাকা ছিল। সে-টাকা আর পাওয়া যায় নি। পুলিশের ধারণা, কেউ লছমী সেজে একাজ করে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্বে ঠিক এমনি ঘটনা আরও কয়েকটি ঘটেছে।

উল্লেখ করা যায়, এই পেট্রল পাম্পের মালিকের বাড়িতেও কদিন আগে মৃতা লছমী একইভাবে হানা দেয়। তখন তিনি তাঁর রাইফেল থেকে গুলি চালান। আশ্চর্য, লছমীর গায়ে একটা গুলিও লাগে নি। পুলিশ অবশ্য এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে যে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

কাগজটা মুড়ে রেখে দিলুম। কর্ণেল বললেন, তোমার ইনটুইশান কী বলে জয়ন্ত?

পুলিশ যা বলেছে।

অর্থাৎ কেউ লছমী সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হ্যাঁ। আবার কী?

কর্ণেল হাসতে হাসতে বললেন, ষষ্ঠীচরণের ইনটুইশন অন্য কথা বলেছে।

লছমীর পেত্নী ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

না। ওই খবরের কিছু গোলমেলে ব্যাপার সে ধরিয়ে দিয়েছে।

কর্ণেল মুখে সেই হাসি রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন : মুখে রহস্যের ভংগি—যা দেখে আমি বরাবর উত্তেজনা অনুভব করি। বললুম, সংস্কৃতে শ্লোক আছে—সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি। তা ষষ্ঠীচরণ আপনার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার সংসর্গে থেকে বুঝি পাতিগোয়েন্দা হয়ে উঠেছে? দেখুন কর্ণেল, খবরের কাগজের প্রত্যেকটা খবরে গোলমাল থাকবেই থাকবে। সেটাই নিয়ম। কারণ খবর যিনি পাঠান এবং যিনি তা অনুবাদ করেন........

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমার কথাটা আগে শোনো।

বলুন।

বরং এক কাজ করা যাক্। ষষ্ঠীচরণের মুখেই তার ধারণার কথা শোনা ভালো। বলে কর্ণেল ডাকলেন, ষষ্ঠী! ও ষষ্ঠী! এদিকে একবার আসবে কি?

ষষ্ঠীচরণ যেন ওৎ পেতেই ছিল। পর্দা তুলে গম্ভীর মুখে বলল, বলুন স্যার!

কর্ণেল বললেন, পেত্নীর খবরের কী যে খটকা আছে বলছিলে তখন?

অভিমান দেখিয়ে ষষ্ঠী বলল, আছে বৈকি। শুনলেন না তো।

এবার বলো, শুনব। তোমার কাগজের দাদাবাবুও শুনবেন।

ষষ্ঠী ফিক করে হাসল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, মজাটা দেখুন। প্রতাপগড় তো স্যারের সঙ্গে কতবার আমি গেছি। কাগজের দাদাবাবুও গেছেন। টাউনের শেষে বড় রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্প। কেমন তো? রাত নটায় সেই পাম্পে সতের হাজার নগদ টাকা মজুত রেখেছে মালিক। বিশ্বাস হয়, বলুন?

বললুম, চুরি-ডাকাতির পর লোকে পুলিশকে বাড়িয়েই বলে।

বলুক না! কিন্তু একই লোকের ওপর পেত্নী দুবার হামলা করল? সতের হাজার টাকা এবং গুলি গায়ে লাগে নি—দুটোতে খটকা বাধছে কাগজের দাদাবাবু।

কিসের খটকা বুঝলুম না ষষ্ঠী।

ষষ্ঠী ক্ষুব্ধভাবে বলল, বেশি লেখাপড়া জানিনে কাগজের দাদাবাবু! কিন্তু আমার মনে খটকা বেধেছে। মনে হচ্ছে, বড় কিছু ঘটবে, এগুলো তারই গোড়াপত্তন। তাছাড়া ডাকাতি শুধু একজনই করল? দলবল সঙ্গে নেই, একা? আর তার চেয়ে বড কথা, পেত্নী-ডাকাত? দেখবেন, নির্ঘাৎ বড় কিছু ঘটবেই।

ষষ্ঠীর হাবেভাবে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু বেচারাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয় ভেবে মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে বললুম, তুমি যা আঁচ করছ, সত্যি হতে পারে বৈকি।

আমার কথা শুনে সে কর্ণেলের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকাল। কর্ণেল সেটা টের পেয়ে বললেন, ক্যাকটাসটা নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে ব্যাপারটা দেখে আসা যেত। তাছাড়া এই শরতকালে প্রতাপগড়ের তুলনা হয় না। প্রকৃতি তাকে এ সময়টা দারুণ সাজিয়ে তোলে, না? হুম্ জয়ন্ত, রথদেখা কলাবেচার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল। অথচ আমার ঠাঁইনাড়া হবার যো নেই এখন।

বলে কর্ণেল হঠাৎ উঠে গিয়ে ফের ওপাশের টেবিলে ক্যাকটাসটার সামনে ঝুঁকে রইলেন। ষষ্ঠী হতাশভাবে ঘর থেকে কফির পেয়ালা দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ষষ্ঠীর কথাটা তখনও ভাবছিলুম। লেকাটার কপালে দুর্ভোগ আছে বোঝা যাচ্ছে। ওকে গোয়েন্দারোগে ধরেছে এবং সব তাতেই ওর খটকা লাগতে শুরু করেছে। প্রতাপগড়ের এক ভদ্রলোকের পেট্রল পাম্পে ও বাড়িতে দুবার ভূত সেজে কেউ ডাকাতি করেছে, তাই নিয়ে ও রীতিমত একটা গোয়েন্দাথিসিস খাড়া করে ফেলেছে।

বললুম, কর্ণেল! আপনার এই অনুচরটিকে সামলান। এর ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি।

কিন্তু কর্ণেল আমার কথার জবাব দিলেন না। চেয়ারে তখনকার মতো বসে হেডফোন জাতীয় যন্ত্রটা পরতে ব্যস্ত হয়েছেন।

গতিক দেখে আমি উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, আসি কর্নেল।

তবু কর্নেলের কোনো সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে গেলুম। ওঁর এমন অদ্ভুত আচরণ এতদিনে গা-সওয়া হয়ে গেছে। আজকাল আর একটুও গায়ে মাখিনে।

সেদিন কাগজের আফিসে আমার বিরতির দিন। দুপুরে ঘুমিয়ে গেছি খেয়েদেয়ে, একসময় ফোন বাজল। কানে তুলতেই চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —ডার্লিং জয়ন্ত! তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে? দিনদুপুরে ঘুমই বাঙালীর পতনের কারণ। তো শোন, কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা প্রতাপগড় রওনা হচ্ছি। তৈরি থেকো।

চমকে উঠছিলুম। ডাক এসেছে নাকি সেখান থেকে?

হুম্। ঠিকই ধরেছ।

পুলিশের ডাক বুঝি?

কখনো না, কখনো না। মোহনপ্রসাদ সিং—মানে যাঁর পাম্প লছমীরাণীর ভূত হামলা করেছিল, তিনিই আমাকে ডেকেছেন।

বলেন কী! যে কেউ ডাকলেই আজকাল বুঝি আপনি চাকরের মতো.......

না, না। মোহনজী আমার সুপরিচিত, জয়ন্ত। একবার ওঁর আতিথ্যে কাটিয়ে এসেছিলুম। অমায়িক সজ্জন মানুষ। সকালে তুমি চলে যাওয়ার পর উনি ট্রাঙ্ককল করেছিলেন।

তাহলে ষষ্ঠীচরণের গোয়েন্দাগিরি আর ঠেকানো গেল না।

না। হাসতে হাসতে কর্নেল বললেন, ঠিক আছে। তৈরি থেকো.....

দুই
রক্তাক্ত মৃতদেহ

মোহনপ্রসাদ সিং প্রতাপগড়ে একসময় নাকি খুব দামী মানুষ ছিলেন। কারণ তখন উনি রাজনীতি করতেন। পরে রাজনীতি ছেড়ে বাণিজ্যে মন দেন। খুব একটা বড় ব্যবসায়ী হতে পারেন নি। একটা পেট্রল পাম্প, একটা ট্রাক এবং একটা জিপগাড়ি, আর একটা কাঠগোলার মালিক হয়েছেন। মাইল পাঁচেক দূরে প্রতাপগড় রিজার্ভ ফরেস্ট। মরশুমে সেখানে সরকার কোনো এলাকার গাছ বিক্রি করেন। টেণ্ডার ডাকা হয়। মোহনজী তদ্বির করে টেণ্ডার যোগাড় করেন। তবে চোরাই কাঠ চালানকারীও কম নেই তল্লাটে। যারা কাঠগোলার ব্যবসা করে, তারা তাদের মা-বাবা।

মোহনজীর বাড়িতে থাকাটা ঠিক মনে করেন নি কর্নেল। আমরা উঠেছি সেচ-দফতরের বাংলোয়। মোহনজী তাঁর জিপটা আমাদের সেবায় দিয়েছেন। ড্রাইভারের নাম মহাবীর। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। লছমী ডাকুরাণীর অসংখ্য গল্প সে

জানে। কীভাবে লছমী নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়েছিল, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। লছমীর রক্তাক্ত লাসের একটা ভয়ংকর বিবরণ তার কাছে শুনেছি আমরা। তাছাড়া মোহনজীর পাম্পে ডাকাতির সময় সে ওখানে উপস্থিত ছিল। সেই রক্তাক্ত লাসকে জীবিত মানুষের মতো হানা দিতে দেখে আতংকে সে পালিয়ে গিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, যে রাতে মোহণজীর বাড়িতে লছমীর ভূত হামলা করে, সেই রাতেও সে খাটিয়া পেতে বারান্দায় শুয়েছিল। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে লছমীর আবির্ভাব হয়। মহাবীর কিরে কেটে বলেছে, সেই রক্তাক্ত মড়া হয়ে লছমী বাড়ি ঢুকেছিল। মোহণজীর রাইফেল আছে। মাঝে মাঝে কাঠ আণতে জঙ্গলে যান বলে রাইফেল কিনেছেন। তো লছমীর দিকে পরপর চারটে গুলি ছোঁড়েন, তবু লছমীর গায়ে আঁচড় লাগেনি। কিন্তু বাড়িসুদ্ধু লোক জেগে গেছে। হইহল্লা করেছে। তাই শেষপর্যন্ত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরদিন সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বসেছি, কর্ণেল সবে প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসেছেন, এমন সময় আমাদের পরিচিত পুলিশ অফিসার শর্মাজী এসে হাজির হলেন।

শর্মাজী হাসতে হাসতে বললেন, মোহনপ্রসাদ আমাদের অপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাই আপনাকে টেনে এনেছেন। তাতে অবশ্য আমি খুশিই।

কর্ণেল যেন অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললেন, না, না মিঃ শর্মা। আপনি তো বিলক্ষণ জানেন, প্রতাপগড় আমার কত প্রিয় জায়গা!

শর্মা চোখ নামিয়ে বললেন, লুকিয়ে লাভ নেই কর্ণেল। স্বয়ং মোহনজী কথাটা আমাকে জানিয়ে এসেছেন। ওঁকে তো জানেন, বড্ড খামখেয়ালী মানুষ। তবে একথা ঠিক, ইদানীং পরপর পাঁচটা এ ধরনের ডাকাতি হয়েছে প্রতাপগড়ে। পাঁচটাই লছমীর ভূতের কীর্তি বলে ভিকটিমরা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। সময় রাত নটা থেকে দশটা—শুধু একটি কেসে সন্ধ্যাবেলা। আমার ধারণা, কেউ লছমী সেজে এসব করছে। কিন্তু কোন সূত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে।

কর্ণেল বললেন, দুটো কেস তো মোহনজীর। বাকী তিনটে কোথায়, কোথায়, কী ভাবে ঘটল। বলবেন কি মিঃ শর্মা?

শর্মাজী বললেন, তিনটেই নেহাত পেটি কেস। একটা স্লাম এরিয়ায়। এক বুড়ির ওপর হামলা করে তার অল্পস্বল্প টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয়। বুড়ি বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে পয়সা জমিয়েছিল। আর একটা এই রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে। লোকজন বিশেষ ছিল না। তখন। রাত প্রায় দশটা। চা-ওলা ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছে, লছমীর ভূত হাজির।......বাকি কেসটা রাহাজানির মতো। এক দেহাতী ছোট ব্যবসায়ী

সাইকেলে চেপে সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাচ্ছিল। হাইওয়েতে হঠাৎ তার সামনে লছমীর ভূত এসে দাঁড়ায়। মজার কথা, দেহাতী লোকটির যে গ্রামে বাড়ি, লছমী সে গাঁয়েরই মেয়ে। লোকটি ভয়ে ভির্মি খায়। জ্ঞান হলে দেখে টাকাকড়ি সব খোয়া গেছে।

আরও কিছুক্ষণ একথা সেকথা নিয়ে আলোচনার পর শর্মাজী চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাকে মোহনজী এনেছেন বলে অবশ্যই আমি এতটকু ক্ষুব্ধ হইনি কর্ণেল। বরং আপনার সাহায্য আমিও চাই। প্রতাপগড়ে কয়েকটা কেসে আপনার সাহায্যের জন্য পুলিশ এখনও কৃতজ্ঞ। নতুন অফিসারেরা আপনার কথা জানেন না। আমি জানিয়ে দেব বরং।

শর্মাজী চলে গেলে কর্ণেল বললেন, মোহনপ্রসাদ পুলিশের কানে আমার আসার খবর তুলতে গেলেন কেন? অদ্ভুত লোক তো!

বললুম, আপনার প্রতি মোহনজীর প্রবল আস্থা। তাই আপনাকে নিয়ে পুলিশের কাছে বাজী ধরেছেন।

অর্থাৎ আমি ওঁর তুরুপের তাস। বলে কর্ণেল কী যেন ভাবতে থাকলেন।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নিচে নদী। তার ওপারে একটা টিলার মাথায় লাল রঙের একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়িটা আগে এসেও দেখেছি এবং কেন কে জানে, কেমন রহস্যের গন্ধ টের পেয়েছি। বাড়িটা একতলাটা দেখতে কতকটা দুর্গের মতো। বহুকালের পুরোনো দেওয়ালের ফাটলে আগাছা গজিয়ে রয়েছে। বাড়িটা নিশ্চয় হানাবাড়ি।

মহাবীর লনের ওপাশে মালীর সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, ওই বাড়িটায় কে থাকে? কার বাড়ি বলতে পারো?

মহাবীর বলল, বাড়িটা স্যার প্রতাপগড়ের এম. এল. এ. রঘুনন্দনজীর। ওঁর বাবা এক সায়েবের কাছে কিনেছিলেন শুনেছি। আজকাল ওখানে কেউ থাকে না। তাছাড়া ওখানে শঙ্খচূড় সাপ থাকে শুনেছি। তাই কেউ কাছে যেতেও ভয় পায়।

মহাবীরের সঙ্গে প্রতাপগড়ের হালচাল নিয়ে কথা বলছি, কর্ণেল বেরিয়ে এসে বললেন, জয়ন্ত! আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি বরং মহাবীরকে নিয়ে জিপে করে ঘুরে এস কোথাও।

মহাবীর বলল, আপনাকে পৌঁছে দিই স্যার, যেখানে যাবেন। তারপর ছোট সায়েবকে নিয়ে বেরুবে।

কর্ণেল বললেন, না না। দরকার হবে না। আমি বেশিদূরে যাব না। কর্ণেল আমাকে ফেলে যাওয়ায় মনে অভিমান জেগেছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেরুনোর ঝক্কি কী, মনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত খুশিই হলুম। কোথায় কোথায় টো টো ঘুরবেন কে জানে! তার চেয়ে চুপচাপ প্রকৃতি দেখা আনন্দজনক।

মহাবীর বলল, যাবেন নাকি স্যার কোথাও ঘুরতে?

বললুম, বরং এক কাজ করা যাক। চলো, ওই পোড়োবাড়িটা দেখে আসি।

আঁতকে উঠল মহাবীর। না স্যার ভুলেও ওখানে পা বাড়াবেন না। তাছাড়া জিপ যাওয়ার রাস্তা নেই ওদিকে। বরং চলুন, ওয়াটার ড্যাম দেখিয়ে আনি।

দেখেছি তোমাদের ওয়াটার ড্যাম। তুমি যাও মহাবীর, গল্প করো গে মালীর সঙ্গে। আমি পায়দল ঘুরে আসি।

আমার কথা শুনে মহাবীর টের পেল আমি রাগ করেছি। সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। ওখানে শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা। মালীকে জিগ্যেস করুন!

মালী শুনছিল। সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার। বড্ড সাপ ওখানে।

এরপর আর ওই হানাবাড়িতে যাবার সাহস হল না। অগত্যা ঘরে গিয়ে জানালার ধারে একটা বই নিয়ে বসলুম।

একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, হানাবাড়িটা নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে। আর তার ছাদে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ছাদের ওপর একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝুঁকে পড়ায় তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না। কর্নেলের বাইনোকুলারটা খুঁজলুম। সঙ্গে নিয়ে গেছেন যথারীতি। অগত্যা বারান্দায় গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলুম।

এবার অবাক হয়ে গেলুম। মূর্তিটা স্ত্রীলোকের।

ওই পোড়ো বাড়িতে সাপের ভয় তুচ্ছ করে কোনো স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এটা বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার। মহাবীরকে ডাকলুম। মহাবীর আমার কথা শুনে ঐদিকে তাকাল। তারপর দুহাতে চোখ ঢেকে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, স্যার স্যার! ওই সেই লছমী ডাকুনী!!

শোনা মাত্র আমার মাথায় জেদ চাপলো। দ্রুত ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে আমার ৩৮ ক্ষুদে রিভলবারটায় গুলি ভরে বেরিয়ে এলুম। ভাল করে দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু তখন আর মূর্তিটা নেই।

মহাবীর বলল, কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আসছি। বলে গেট পেরিয়ে ঢালু টিলার গা বেয়ে সোজা নেমে গেলুম। মহাবীর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নদীর কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তা থেকে বাঁদিকে নেমে বড় বড় পাথর আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই টিলার কাছে পৌঁছুলুম। এবার ভয় জাগল। সাপের ভয়। সাবধানে নজর রেখে টিলায় উঠতে শুরু করলুম।

বাড়িটা কোনক্রমে টিকে আছে। আগাছার জঙ্গলে ঘিরে ফেলেছে তাকে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকলুম। তারপর মনে হল, বাড়িতে যেন মানুষ থাকার গন্ধ পাচ্ছি। এটা বুঝিয়ে বলা কঠিন, ষষ্ঠীর মতো একটা ইনটুইশান হতে পারে— কোন স্পষ্ট চিহ্ন না থাকলেও মনে হচ্ছিল, এখানে মানুষ বাস করে।

ঘরগুলোর কপাটে মরচেধরা তালা আটকানো রয়েছে। বারান্দার শেষ প্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলুম। কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কালো ক্লিপ। চুল আঁটার মেয়েলি ক্লিপে। ক্লিপে চুল লেগে রয়েছে। শুঁকে সস্তার গন্ধতেলও টের পেলুম।

বাড়িটার আনাচে কানাচে তন্নতন্ন খুঁজেও সেই স্ত্রীলেকটিকে দেখতে পেলুম না। উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, দরজার তালা ভেঙে দেখব নাকি ভেতরে কী আছে, হঠাৎ আমার বাঁ-দিকে কয়েক গজ তফাতে আগাছার মধ্যে কী পড়ে আছে দেখতে পেলুম।

ঘাসে পা ফেলতে ভয় করছিল। শঙ্খচূড় থাকলে অবশ্য পায়ের শব্দে অনেক আগে ফণা তুলবে। লড়াই করার সময় পাব. অন্য বিষাক্ত সাপ থাকলে মুশকিল। গায়ে পা না পড়া পর্যন্ত অনেক বিষাক্ত সাপও ফোঁস করে না।

যা দেখলুম, আমার শরীরে রক্ত চলাচল থেমে গেল যেন।

একটি দেহাতী যুবতী চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার গলা, কপাল ও বুকের ক্ষতচিহ্নে টাটকা রক্ত দলা বেঁধে রয়েছে। কাপড় রক্তে মাখামাখি। নিস্পন্দ মৃতদেহ ছাড়া কিছু নয়। মুখটা অবশ্য তত বিকৃত নয়।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দেখে আর তাকাতে পারছিলুম না। এমন খুন-খারাপি দেখিনি, এমন নয়। কিন্তু একটু আগে এ বাড়ির ছাদে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেকেছি, সেই যে এইমাত্র খুন হয়েছে—আমি হয়তো যখন নদীর ব্রিজে ছিলুম তখনই—একথা ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। তার আর্তনাদ কেন শুনতে পাইনি, সেটাই আশ্চর্য!

এখন দরকার খবর দেওয়া। সাপের কথা ভুলে হনহন করে এগিয়ে গেলুম। ভাঙা ফটক পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছি, কর্নেলের টুপি দেখলুম ঝোপের আড়ালে। বুড়ো হাসিমুখে চাপা গলায় বললেন, জয়ন্ত যে!

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, শিগগির আসুন। ওখানে একটা খুন হয়েছে।

বুড়ো একটুও চামকালেন না। বললেন, তাই নাকি? চলো তো দেখি।

ভেতরে যেতে যেতে ব্যাপারটা বললুম। কর্ণেল কোনো মন্তব্য করলেন করলেন না। কিন্তু প্রাঙ্গণে সেই ঝোপের মধ্যে গিয়েই আমি আবার থ। লাসটা নেই।

বললুম, সর্বনাশ! এখনেই তো ছিল। গেল কোথায়?

কর্ণেল হাঁটু দুমড়ে ঘাসের ভেতর থেকে কী একটা তুলে নিলেন। চমকে উঠে দেখি, রক্তের দলা ঘাঁটছেন আঙুলে। । ছ্যা, ছ্যা। ঘেন্না হচ্ছে না একটুও?

তিন

সম্ভাব্য ছয় নম্বর

না বলে পারলুম আর, কর্ণেল। করছেন কী। ওই নোংরা রক্ত ঘাঁটছেন কেন?

কর্ণেল উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দুটো আগাছার পাতায় মুছতে মুছতে বললেন, জিনিসটা ততকিছু নোংরা নয়, ডার্লিং।

তারপর এগিয়ে গেলেন বারান্দার কোণায় সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন। পেছনে পেছনে গেলুম। কর্ণেল বাইনোকুলার চোখে রেখে এদিকে ওদিকে কী খুঁজছিলেন। একটু পরে একদিকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ডাকলেন. জয়ন্ত! ওই দেখ তোমার শ্রীমতীর মৃতদেহ স্নান করছেন। অর্থাৎ তেল-সিঁদুর ধুয়ে ফেলছেন।

বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রেখে দেখি, হ্যাঁ—সেই দেহাতী যুবতীই বটে। নদীর বাঁকে মস্তো পাথরের আড়ালে ডোবামতো জায়গায় রগড়ে রগড়ে রঙ ধুচ্ছে।

বললুম, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

কর্ণেল একটু হেসে বললেন, ব্যাপারটা যৎকিঞ্চিৎ। ওখানে একজন পুরুষমানুষও রয়েছে. যদি তুমি খুঁজে তাকে বের করতে পারো। সে আছে গাছের তলায় বসে।

দেখতে পেয়েছি কর্ণেল! উত্তেজিত ভাবে বললুম।

চিনতে পারছ তাকে?

আশ্চর্য! ওকে মহাবীর ড্রাইভার বলে মনে হচ্ছে।

দ্যাটস রাইট, ডার্লিং! এবারে চলে এস। কেটে পড়া যাক। সাবধান, আমরা এবার উল্টো দিকে বড় ব্রিজ পেরিয়ে বাংলোয় ফিরব।

কিছুক্ষণ পারে দুর্গম জায়গায় অশেষ কষ্ট করে হেঁটে হাইওয়ের বড় ব্রিজে পৌঁছলুম দুজনে। তারপর বললুম, আপনি ওখানে জুটলেন কী ভাবে?

কর্ণেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, আজ সকাল থেকে টোপ খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলোর উল্টোদিকে নদীর পারে রঘুনন্দনজীর ওই পোড়ো বাড়ির ছাদে আমাদের লছমীর প্রেতাত্মা দর্শনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল কেউ। প্রাতঃর্ভ্রমণে বেরিয়েই আমার নজরে পড়েছিল! কিন্তু আমল দিইনি। তখন সঙ্গে দূরদর্শনের যন্ত্রটা ছিল না। ফিরে এসে, তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, বস্তুটা চোখে রেখে দেখলুম—হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। তখন ঘুরপথে বেরিয়ে পড়লুম। এগোতে

যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, তুমি আসছ। বুঝতে পারলুম কেন আসছ অমন হন্তদন্ত হয়ে। তবে তুমি আমার সঙ্গী এবং কলকাতার লোক। ভূত বিশ্বাস করবে না এবং অনর্থ ঘটাবে জেনে মহাবীরের বউ....

অবাক হয়ে বললুম, মহাবীরের বউ? বলেন কী!

হ্যাঁ জয়ন্ত।

কাল মোহনজীর বাড়িতে মেয়েটিকে দেখেছি আমরা।

তাই বলুন! কিন্তু হঠাৎ অমন লাস হয়ে পড়েছিল কেন?

তোমাকে ধোঁকা দিতে। মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল প্রায়। হঠাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে ও লাস হয়ে পড়ে রইল। তুমি ধাঁধায় পড়ে গেলে। পুলিশকে খবর দিতে ছুটবে, এ তো জানা কথা! সেই ফাঁকে নিরাপদে পালাবার সুযোগ করে নিল।

তাহলে মহাবীরের বউ লছমীর ভূত সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হুম্। বলে কর্ণেল একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর ফের বললেন, তখন বললুম না? আমায় মোহনজী তুরুপের তাস করতে ডেকে এনেছেন!

ঠিক বুঝলুম না।

বুঝবে সময় মতো। এস, আপাতত আমরা কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।.........

দুপুরে আজ মোহনজীর বাড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বাংলো থেকে নিয়ে যেতে এলেন মোহনজী নিজে। মহাবীরকে আর দেখতে পাইনি ত্রিসীমানায়। মোহনজীকে সকালের ঘটনা জানাতে নিষেধ করেছিলেন কর্ণেল। বলেছিলেন, যা বলার আমি বলব। তাই চুপ করে থাকলুম।

মোহনজী বললেন, দেরী হয়ে গেল কর্ণেল সাব! অনুগ্রহ করে এবার আসুন!

কিন্তু কর্ণেল গোমড়ামুখে বললেন, ক্ষমা চাচ্ছি মোহনজী! রাত থেকে প্রচণ্ড পেটের অসুখে ভুগছি। ওষুধ খাচ্ছি। কিছু মুখে দেবার উপায় নেই! জয়ন্তকে নিয়ে যান!

মোহনজী অবাক হয়ে বললেন, সে কী! অতসব আয়োজন করেছি!

কর্ণেল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, উপায় নেই, মোহনজী! আমি মহাবীরকে দিয়ে বলে পাঠাব ভেবেছিলুম, কিন্তু ওকে খুঁজে পেলুম না।

মোহনজী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এটা কেমন কথা! আমি কত আশা করে......

বাধা দিয়ে কর্ণেল একটু হেসে বললেন. আপনার আশা না মেটাতে পারায় আমি দুঃখিত। আর মোহনজী, আমার এই এক বেয়াড়া স্বভাব—আমায় কেউ প্রতারণা করেছে জানতে পারলে তার ছায়া আমি মাড়াইনে।

মোহনপ্রসাদ চমকে উঠলেন। আমি আপনাকে প্রতারণা করেছি! কী বলছেন?

হ্যাঁ। কর্নেল দৃঢ় স্বরে বললেন। আপনার ড্রাইভার মহাবীরের বউকে আপনি লছমীর ভূত সাজিয়ে এত কাণ্ড করছেন। আবার সেই রহস্য ফাঁস করাতে আমাকে ডেকে এনেছেন। উদ্দেশ্যটা কী?

মোহন প্রসাদ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঝুট। বিলকুল ঝুট। এ আপনি কী বলছেন?

কর্নেল অন্যদিকে ঘুরে বললেন, যা বলার আমি বলেছি। এখন আপনি আসতে পারেন।

মোহনপ্রসাদ রাঙা মুখে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ওঁর জিপের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর আমি বললুম, ওঁকে খামোকা রাগিয়ে দিলেন কেন কর্নেল? ·

কর্নেল বললেন, সাবধান করার জন্য। জানিয়ে দিলুম, ওঁর চালাকি ধরে ফেলেছি। আশা করি তুমি আগাথা ক্রিস্টির এ বি সি মার্ডার পড়েছ। খুনীর উদ্দেশ্য সি-কে খুন করা। পুলিশকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সে এ এবং বি-কে খুন করেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে পাঁচটি কেস তো ডাকাতি। খুন নয়।

কর্নেল হাসলেন।...........প্রথম দুটো কেস মোহনপ্রসদের পাম্প এবং বাড়িতে হামলার। ওটা ওঁর সাজানো গল্প। বাকি তিনটে ঠিক। কিন্তু প্রথম দুটোর উদ্দেশ্য লছমীর ভূতের কথা প্রচার করা। বাকি তিনটে সেই প্রচারের ভিত্তি মজবুত কবতে। আমার ধারণা এবার ছ নম্বর কেস আমার উপস্থিতিতে করার প্ল্যান ছিল মোহনজীর। যেহেতু উনি আমাকে এনেছেন এই রহস্যের পর্দা তুলতে এবং সেকথা পুলিশকে জানিয়েও দিয়েছেন, সেই হেতু এই পরিকল্পিত এবং সম্ভাব্য ছ নম্বর কেসেও তাঁর প্রতি এতটুকু নজর পড়ার কথা নয় পুলিশের।

সেজন্য আপনি তুরুপের তাস কথাটা বারবার বলছিলেন?

ঠিক ধরেছ ডার্লিং।

ছ'নম্বর কেসে কী ঘটতে পারে ভেবেছিলেন?

একটা বড় কিছু। কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন। ষষ্ঠীর ইনটুইশান খুব খাঁটি। কিন্তু সেই বড়টা কী মাথায় আসছে না। তবে মুখের ওপর জানিয়ে দিলুম সব কথা। আশা করি আর উনি এগোবেন না।

বলে কর্নেল পায়চারি শুরু করলেন। বিড়বিড় করে বলতে শুনলুম, কী হতে পারত ছ'নম্বর ঘটনাটা? কী সেটা?

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জয়ন্ত। মনে হচ্ছে, এ বি সি মার্ডারের অন্তিম লক্ষ্যের মতো ওঁর যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওঁর জীবনে। পূর্বপ্রতিহিংসা চরিতার্থ করা—নাকি কোনো আর্থিক লাভালাভের ব্যাপার?

হাসতে হাসতে বললুম, যা ঘটেনি এবং আশা করি আর ঘটবে না—আপনি যেহেতু ওঁর কীর্তিকলাপ জেনে গেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এদিকে আমাদের খিদেও পেয়ে গিয়েছে। চলুন, কোনো হোটেলের দিকে পা বাড়াই।

কর্ণেল বললেন, হুঁ, ছ নম্বর ঘটনা আমি আটকে দিয়েছি। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে, কী ঘটতে যাচ্ছিল। সম্ভবত সেটা শুধু ডাকাতি নয়, খুন-খারাপি। হ্যাঁ, লছমীর ভূতের হাতে একটি মৃত্যু।

করুণ মুখে বললুম, কর্ণেল! আমার সত্যি খিদে পেয়েছে।

বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর বিচলিত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, চলো, চলো।.....

* * * *

প্রতাপগড় থেকে ফেরার দিন পনের পরে কর্ণেল একদিন ফোন করলেন। জয়ন্ত, প্রতাপগড়ের এম. এল. এ. রঘুনন্দন সিংয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে নদীর ধারে। লছমীর ভূতের হাতেই খুন হবার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি, স্রেফ খুন। শর্মাজী ট্রাংক কলে জানালেন এইমাত্র। রঘুনন্দনের কাছে টিট হয়ে মোহনজী রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। অবশ্য আমি শর্মাজীকে লছমীর ভূত রহস্য ফাঁস করে না এলে মোহনজীকে সন্দেহ করতেন না ওঁরা। যাই হোক, মোহনজীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লছমী আর মহাবীর তো আমরা চলে আসার পরই গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখনও পুলিশ তাদের খুঁজছে। তাহলে দেখলে তো? ছ'নম্বর শিকার কে ছিল? ষষ্ঠীচরণের মাইনে বাড়িয়ে দিলুম, জয়ন্ত। সময় করে চলে এসো।......

রাতের আলাপ

রাত দশটা বাজলেই আমাদের পাড়ায় লোডশেডিং হবেই হবে। কাজেই রাতের খাওয়া শেষ করে মাদুর আর বালিশ নিয়ে খোলা ছাদে গিয়ে শুই। ঘুমটা আরামেই হয়।

এ রাতে ছাদে শুতে গিয়ে চমকে উঠলুম। ছাদের কার্নিশের কাছে কালো এক মূর্তি। সারা পাড়া আঁধার কালো। নিশুতি রাতে সুনসান নিরিবিলি ছাদে কালো হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকাটা কাজেব কথা নয়, বাড়ির মালিক যখন আমি এবং এ ছাদও আইনত আমার।

অতএব চোর না হয়ে যায় না।

কিন্তু আজকালকার চোর আর সে গোবেচারা চোর নয়। তাদের কাছে নাকি ছুরি-বোমা-পিস্তলও থাকে। চ্যাচামেচি করলেই বিপদ। তাই ভয়ে-ভয়ে বললুম, "কে?"

"আমি।" চোর জবাব দিল মিনমিনে গলায়। তারপর কোঁত কোঁত করে দুবাব নাক ঝাড়ল।

এইতে আমার একটু সাহস হল। বললুম, "আমিটা কে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার?"

"তার মানে?"

"আমার নাম ধাম কিছু মনে পড়ছে না।"

আরও সাহস পেয়ে ধমক দিয়ে বললুম, "চালাকি হচ্ছে? অন্যের বাড়ির ছাদে উঠে—"

"দয়া করে কথাটা শুনুন আমার।"

"কোনো কথা শুনতে চাইনে। তুমি ছাদে উঠলে কী মতলবে?"

"আজ্ঞে বিশ্বাস করুন—"

"চো-ও-প!" চোরের হালচাল দেখে তখন আমার জোর বেড়ে গেছে। বললুম, "নিশ্চয় তুমি পাইপ বেয়ে ছাদে উঠেছ চুরির মতলবে। দাঁড়াও, আমি চ্যাচামেচি করে লোক জড়ো করছি।"

"স্যার! স্যার!" সে ভাঙাগলায় প্রায় কেঁদেই ফেলল। "বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করতে আসিনি। আমি কস্মিন্‌কালে চোর নই, চোরের মাসতুতো ভাইও নই। আমি একটা গণ্ডগোলে পড়ে গেছি স্যার!"

কান্নাকাটি শুনে বললুম, "সত্যি বলছ, তুমি চোর নও?"

"না সার।"

"তাহলে ছাদে উঠেছ কেন? কী ভাবে উঠেছ?"

ন্যাকা। বলে কি, নামধাম মনে পড়ছে না—অন্যের বাড়ির ছাদে কীভাবে উঠে এল, সেটাও নাকি মনে পড়ছে না। ওকে আঙুল তুলে শাসালুম। "এক মিনিট সময় দিচ্ছি—আসল কথা ফাঁস না করলে এইসা রামচ্যাঁচানি চেঁচাব যে পাড়াসুদ্ধু লোক লাঠিসোটা নিয়ে এসে তোমায় রামঠেঙানি ঠেঙাবে।"

লোকটা বেজায় ঘাবড়ে গেল এবার। ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, "ওরে বাবা! তাহলে যে আমি আবার মারা পড়ব!"

একটু খটকা লাগল। বললুম, "আবার মারা পড়বে মানে? কবার মারা পড়েছ হে? অ্যাঁ?

"আজ্ঞে, বেশি নয়। মোটে একবার।" লোকটা আবার কোঁত কোঁত করে নাক ঝাড়ল। "ওরে বাবা! ওই একবারই যে কষ্ট পেয়েছি। আবার মরতে হলে—ওঃ!"

"ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো বাপু?" ওর কান্নাকাটি দেখে এবং এই সন্দেহজনক কথাবার্তায় একটু ভড়কে গিয়েই বললুম।

"বুঝলেন না স্যার?"

"মোটেও না।"

"আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি সম্ভবত গাড়িচাপা পড়েছিলুম। আবছা মনে পড়ছে এটুকু।"

"বলো কী হে? তারপর? তারপর?"

"তারপর আর কী? মরে গেলুম।"

আকাশ থেকে পড়লুম একেবারে। "মরে গেলে? মরেই যদি গেলে তাহলে এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছ কী করে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার! এমনকী, আমি কে—"

"ওয়েট, ওয়েট! তুমি বলতে চাইছ যে তুমি ভূ-ভূ-ভূ-.........."

লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, "বলবেন না স্যার, বলবেন না। শুনলে ভয় করে। ওদের আমি ভীষণ ভয় পাই। তাছাড়া জানেন তো? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই।"

এতক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিল। আস্তে বললুম, "তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তুমি তো এখন ওদেরই একজন। অথচ তুমি ওদের ভয় পাচ্ছ। এতো ভারি বিদঘুটে কথা বাপু।"

"আমি যে সবে ওদের একজন হয়েছি। নতুনদের এলে যা হয়।"

আমার সন্দেহ ঘুচে গেল। তাহলে যা ভেবেছি, তাই। এখন মাথার ঠিক রাখা দরকার। চারদিকে আঁধারকালো নিশুতি নিঝুম। সাবধানে কথা বলা উচিত। বললুম, "দেখ ভাই, এক কাজ করো। তুমি বরং পাকাপাকি একটা আস্তানা করে নাও কোথাও।"

"আপনার ছাদটা মন্দ নয় স্যার। বেশ নিরিবিলি।"

"তোমার মাথা খরাপ? বরং ওই যে দেখছ চিনুবাবুদের চিলেকাঠা—দেখতে পাচ্ছ তো?"

"ওরে বাবা! হাসপাতালের মর্গ থেকে প্রথমে তো ওখানেই গিয়েছিলুম। ওখানে যে এক বড়োবাবুর আস্তানা। যেমন তুম্বো চেহারা, তেমনি গলার আওয়াজ। পিস্তল তুলে বলে, পাকড়ো! পাকড়ো!"

"বুঝেছি চিনুবাবুর বাবা। একসময় পুলিশের দারোগা ছিলেন।"

"তাই মনে হল দেখে। এজন্যই বলে, স্বভাব যায় না মলে। পিস্তলটারও।"

"তোমারও যায় নি মনে হচ্ছে। তুমি কি ছিলে বলো তো?"

"আজ্ঞে, সেটাই তো মনে পড়ছে না।"

"বাঃ! ট্যাক্সিচাপা পড়াটা মনে পড়ছে, চিনুবাবুদের চিলেকাঠায় যাওয়াটা মনে পড়ছে—আর এই আসল কথাটা মনে পড়ছে না?"

"কিছু কিছু মনে পড়ছে, কিছু-কিছু পড়ছে না। বুঝলেন না? সদ্য-সদ্য মরেছি কি না! সব গণ্ডগোল হয়ে তালগোল পকিয়ে যাচ্ছে।"

"বেশ। এখন কী করতে চাও, তাই বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"আপনি শোন্ না স্যার। শুয়ে পড়ুন।"

"আর তুমি?"

"বসে ভাবি। ভেবে দেখি, আমি কে। তারপর একটা ঠিক করা যাবে।"

আপত্তি করে বললুম, "সেটা কাজের হল না। তুমি বরং অন্য কোথাও গিয়ে ভাবো।"

"আমাকে কি ভয় পাচ্ছেন স্যার?"

"পাচ্ছি বৈকি।"

"ভয় পাবেন না দয়া করে। কারণ আমার নিজেকেই নিজের ভয় করছে।"

"কেন? কেন?"

"বুঝলেন না? টাটকা মরেছি। এখনও ধাতস্থ হয়নি কিছু। দেখতে পাচ্ছেন না স্যার—এখনও অশরীরী পর্যন্ত হতে পারছি না! শরীরটাকে যতবার ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি, তত এসে পেয়ে বসছে। সেই দুঃখেই তো কাঁদছিলুম তখন।"

"চেষ্টা করে দ্যাখো!" হাই তুলে বললুম। তারপর মাদুর বিছিয়ে বসলুম এতক্ষণে। যার নিজেকে ভয় করছে, তাকে আমার ভয় পাওয়ার কোনো মানে হয় না।

লোকটা বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন। দেখি কী করা যায়।"

অগত্যা আমি শুয়েই পড়লুম। কিন্তু কাত হয়ে একটা চোখ রাখলুম ওর দিকে। লোকটা একটু পরে হঠাৎ জিমন্যাস্টিক শুরু করল। ছোটাছুটি, ডিগবাজি, শূন্যে চরকির মতো পাক খেয়ে হরেক কসরত করে একসময় থামল। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে থাকল ক্লান্ত হয়ে। বললাম "ও কী করছ হে?"

আজ্ঞে, অদৃশ্য হবার চেষ্টা করছি। পারছি না।"

"পারবে, পারবে। আবার শুরু করো!"

"করব। কিন্তু গলা যে শুকিয়ে গেল। বড্ড তেষ্টা। দয়া করে এক গ্লাস জল খাওয়াবেন স্যার?"

"খাওয়াব। কিন্তু কথা দাও, অশরীরী মানে অদৃশ্য হতে পারলে এ ছাদ ছেড়ে চলে যাবে।"

"দিচ্ছি স্যার। চলে যাব কোথাও;"

"শুধু দিচ্ছি বললে হবে না। দিব্যি করো।"

"কার নামে করব?"

একটু ভেবে বললুম, "বাবা মহাদেবের নামে! উনিই তোমাদের দেবতা, জানো না?"

লোকটা বাবা মহাদেবের নামে দিব্যি করলে আমি জল আনতে গেলুম।........

এক গেলাস জল নিয়ে ছাদে ডাকলুম, "কৈ হে! জল নাও।" কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে বুঝলুম, ওর চেষ্টা সফল হয়েছে। তখন জলটা নিজেই খেয়ে শুয়ে পড়লুম নিশ্চিন্তে। কিন্তু লোকটা কে?

অবশ্য সকালের কাগজে দুর্ঘটনার খবরে লোকটার নাম পেয়ে যেতেও পারি।...............

অদল বদল

রোজ ভোরবেলা পার্কে কিছুক্ষণ বেড়ানো হরিপদবাবুর অনেককালের অভ্যাস। পার্কটা বেশ বড়। কিন্তু হাঁটাচলার পর একটুখানি যে বসবেন কোথাও, তার উপায় নেই। এখানে-ওখানে যত বেঞ্চ আছে, কখন সবগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। ঘাসে বসারও বিপদ আছে। ছেলেপুলেদের যা পাঁয়তারা, কে কখন ঘাড়ে এসে পড়ে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে বড় বিপদ ওদের ফুটবল। যেন কামানের গোলা।

তিতিবিরক্ত হরিপদ অগত্যা নিরিবিলি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বকুল গাছটার দিকে যান। বকুলতলায় এক টুকরো কালো পাথর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, কখন পাথরটাও দখল হয়ে গেছে। হোঁতকা-মোটা, মাথায় টাক আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখ নিয়ে একটা লোক আরামে বসে আছে।

যেদিনই যান, দেখেন তাঁর যাওয়ার আগে কখন লোকটা বকুলতলার আসনটা দখল করে ফেলেছে।

জায়গাটা যে এমন কিছু সুন্দর তাও নয়। একটু নিরিবিলি এই যা। ওদিকটায় বলের ঘা খাওয়ার রিস্কও নেই। তবে ওখানে বসে আর কিছু না হোক, রেলগাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। রেলগাড়ি দেখতে ভালই লাগে হরিপদবাবুর। মনে-মনে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যাওয়া যায়। কু-ঝিক-ঝিক.....কু-ঝিক-ঝিক। কখনও রেলগাড়ির চাকা ছড়া বলে, টিকিটবাবুর কত টাকা। টিকিট বাবুর কত টাকা। টিকিট বাবুর কত টাকা। ছেলেবেলার কত কথা মনে পড়ে যায়।

শেষে জেদ চড়ে গেল হরিপদবাবুর। আগেভাগে গিয়ে পার্কের বকুলতলার পাথুরে আসনটা তাঁর দখল করা চাই-ই। সেদিন ভোরের আগে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিকঠিক চারটে। আবছা আঁধার লেগে আছে ঘরবাড়ির গায়ে। পার্কে কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় কদাচিৎ চাপা গরগর শব্দে চলে যাচ্ছে একটা করে মোটরগাড়ি—তখনও হেডলাইট জ্বলছে। হরিপদবাবু পার্কে ঢুকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। বকুলতলা ঝুপসি হয়ে আছে আঁধারে-কুয়াসায়। ঘাসে শিশির চকচক করছে। পাথরটা খালি পড়ে আছে। হরিপদবাবু সিংহাসন দখল করার আনন্দে বসে পড়লেন তার ওপর। পাথরটা ঠাণ্ডা বটে, তাতে কিছু আসে যায় না। হরিপদবাবু খুশিতে বসে দুই পা দোলাতে থাকলেন। এমন-কী গুনগুন করে গানও গাইতে লাগলেন।

আস্তে আস্তে কালচে রঙ ধূসর হতে থাকল। তারপর সাদা হল। একজন দুজন করে লোক এসে পার্কে ভিড় করল। কেউ ধুকুর-ধুকুর দৌড়ুচ্ছে। কেউ যোগব্যায়ামেও বসে গেছে। কেউ কুকুর নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেঞ্চগুলোতে বুড়োরা এসে বসে পড়েছে। তারপর ছেলেপুলেদের পাঁয়তারা শুরু হয়েছে ফুটবল নিয়ে। হরিপদবাবু তেমনি নিরিবিলি বকুলতলায় গুনগুন করছেন আর ঠ্যাঙ দোলাচ্ছেন।

কতক্ষণ পরে আনমনে মাথায় হাত বুলোতে গিয়েই চমকে উঠলেন। এ কী! তাঁর মাথাভর্তি একরাশ পাকা চুল ছিল। চুল কোথায় গেল?

বারবার হাত ঘষেও চুলের পাত্তা পেলেন না। চামড়ায় হাত ঠেকছে। তার মানে, হঠাৎ তাঁর মাথায় টাক পড়ে গেল নাকি. অবাক হয়ে মাথায় আঙুল ঠুকলেন। আরও চমকে গেলেন। সর্বনাশ! তাঁর মাথা ভর্তি টাক যে!

তারপর হাত গালে ঘষে ঘাবড়ে গেলেন। প্রতিদিন দাড়ি কাটা অভ্যাস। পার্ক থেকে ফিরেই দাড়ি কাটেন। কালও কেটেছেন। চব্বিশ ঘন্টায় এত দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল গজানো অসম্ভব। অথচ গজিয়েছে।

প্রচণ্ড আঁতকে উঠে হরিপদবাবু টের পেলেন, তাঁর গায়ের ঢিলেঢালা পান্‌জাবি আঁটো হয়ে গেছে। চটিজুতোয় পা দুটো আর ঢুকছে না। এ তো ভারী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! আঙুল ফুলে কলাগাছ ব্যাপার কি একেই বলে?

হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন হরিপদবাবু। এমন সময় লাঠি ঠুকঠুক করে এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "ভোম্বলবাবু যে! আছেন কেমন? বহুদিন তো দেখাশোনাও নেই। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?"

হরিপদবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "ভোম্বলবাবু কে মশাই? আমি হরিপদ তালুকদার।"

ভদ্রলোক খিকখিক করে হাসলেন। "চিরকাল থিয়েটারে অ্যাকটিং করে অভ্যাসটা এখনও ছাড়েননি দেখছি ভোম্বলবাবু! তা ইয়ে, আপনার জামাইবাবাজির খবর কী? শুনেছিলুম, পুলিশে নাকি............"

হরিপদ তেড়ে উঠে বললেন, "কী যা তা বলছেন মশাই? আমার মেয়েই নেই তো জামাই।"

"আহা, ওতে লজ্জার কী আছে ভোম্বলবাবু?" ভদ্রলোক বললেন। "পুলিশ কাউকে ধরলেই তো সে চোর হয়ে যায় না। আদালত আছে কী করতে?"

হরিপদবাবু আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর জামাই নেই। যদি দৈবাৎ থাকতও, তাকে চুরির দায়ে পুলিশ ধরত—ভাবতেও মাথায় খুন চড়ে যায়। কথা

না বাড়িয়ে তক্ষুনি হন্তদন্ত হয়ে কেটে পড়লেন। ভদ্রলোক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পার্ক থেকে বেরুবার মুখে আরেক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, "আরে ভোম্বলদা যে!"

হরিপদবাবু কটমট করে তাকিয়ে জোরে হাঁটতে থাকলেন। পেছনে ভদ্রলোক তখন বলছেন, "হল কী ভোম্বলদা? আরে শোনো শোনো!"

কোনদিকে না তাকিয়ে হরিপদবাবু গলিরাস্তায় পৌঁছুলেন। তারপর নিজের বাড়ির দরজায় কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। ততক্ষণে আরও টের পেয়েছেন, তাঁর গায়ে প্রচণ্ড জোরও এসে গেছে। কিন্তু বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে কাঁপছে। একটা দারুণ গণ্ডগোল নিশ্চয় ঘটে গেছে।

দরজা খুলে তাঁর প্রিয় চাকর-কাম-রাঁধুনি হরু গম্ভীরমুখে বলল, "কাকে চাই?"

হরিপদবাবু গর্জে উঠলেন এবার। "কাকে চাই কী রে ব্যাটাচ্ছেলে? ভাঙ খেয়েছ সাতসকালে?" তারপর হারুকে ঠেলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

হারু হৈ-চৈ করে উঠল। "আচ্ছা ভদ্রলোক তো মশাই আপনি! গায়ের জোরে পরের বাড়ি ঢুকে পড়লেন যে বড়? আবে! ও কী! কোথায় যাচ্ছেন?"

হরিপদ সটান নিজের শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আঁতকে দেখলেন, রোজ পার্কের বকুলতলায় পাথরটার ওপর যে লোকটাকে বসে থাকতে দেখেছেন সেই লোকটাই বটে। হরিপদবাবু তার শরীরটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন! কিন্তু তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল, সেটাই সমস্যা। আর ছ্যা-ছ্যা, এমন বিচ্ছিরি নাক থাকতে আছে মানুষের?

হরু ততক্ষণে পাড়া মাথায় করে চেঁচাচ্ছে, "ডাকাত! ডাকাত পড়েছে!" এমন জোর করে শোবার ঘরে ঢোকে যে, সে নিশ্চয় ডাকাত। হরিপদবাবু আয়নার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। পার্কে বেড়াতে গেলেন হরিপদবাবু হয়ে, ফিরে এলেন কোন হতচ্ছাড়া ভোম্বলবাবুটি হয়ে—যিনি নাকি একসময় থিয়েটারে অ্যাকটিং করতেন এবং যাঁর জামাই লোকটা চোর না হয়ে যায় না। এ কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা!

কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে চলেছে, ঠাহর হল পাড়ায় লোকের হট্টগোলে। বাড়ির দরজায় ওরা চেচাচ্ছে, "কই ডাকাত? কোথায় ডাকাত? ধর্ ব্যাটাকে! মার্ মার্! কেউ বলছে, "যাস্‌নে, যাস্‌নে। ভোজালি আছে। পুলিশ ডাক!" তার মধ্যে হরু এন্তার চেঁচাচ্ছে, "সব লুঠ হয়ে গেল যে! ওরে বাবা! এতক্ষণে সব লুঠ করে ফেললে রে!"

সাহসী ছেলেরা লাঠিসোটা নিয়ে বাড়ি ঢুকছে টের পেয়েই হরিপদবাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। দড়াম করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন। দরজার বাইরে ছেলেগুলো হল্লা করছে। কেউ ধাক্কাও দিচ্ছে দরজায়। হরিপদবাবু ভেতর থেকে শাসিয়ে বললেন, "সাবধান! আমার কাছে বোমা আছে। উড়িয়ে দেব।"

ছেলেগুলো ভয় পেয়ে গেল। বয়স্করা বললেন, "ওরে! সরে আয়! সরে আয়! পুলিশে খবর গেছে।"

পুলিশের কথা শুনে হরিপদবাবুর বুকের ভেতর কাঁপুনি বেড়ে গেল। তখন ঘরের ভেতর থেকে করুণ স্বরে ডাকলেন, "হরু! ওরে বাবা হারাধন! আমি তোর মনিব হরিপদ তালুকদার। সত্যি বলছি।"

হরু বলল, "চালাকি হচ্ছে? আমার মনিবকে আমি চিনিনে? ওই রকম চেহারা নাকি ওনার? ওইরকম হেঁড়ে গলা নাকি? ছ্যা-ছ্যা, যেন নিমতলার আস্ত পিচেশ।

গণ্ডগোল একটু থেবেছে। সবাই পুলিশের প্রতীক্ষা করছে। হরিপদবাবুর গলা আবার শোনা গেল ভেতর থেকে, "সত্যি বলছি আমি হরিপদ তালুকদার। দোহাই তোমাদের, এখন পুলিশ-টুলিশ ডেকো না! ও বাবা হারাধন! ওদের বুঝিয়ে বল্ না একটু। আমিই তোব কর্তাবাবু রে।"

হারু তেড়েমেড়ে বলল, "বলবটা কী মশাই! হরিপদবাবুর বাড়ি সেই এতটুকুন বাচ্চা বয়েস থেকে কাজ করছি। আমি কর্তাবাবুকে চিচিনে? থামুন, দারোগাবাবুকে আসতে দিন!"

বলতে বলতে এসে গেলেন দারোগাবাবু। পেল্লায় গোঁফের ডগায় পাক খাইয়ে বললেন, "কই? কোথায় ডাকাত?"

সবাই একগলায় বলে উঠল, "ওই ঘরেব ভেতর স্যার।"

দারোগাবাবু হাঁক মেরে বললেন, "গিরধর সিং! দরওয়াজা তোড়ো। জলদি তোড়ো!"

শুনেই হরিপদবাবু হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে যাচ্ছেন, টাকে খাটের একটা ধার জোরে লাগল। উঃ করে ককিয়ে উঠলেন।

তারপর দেখলেন, প্রচণ্ড অবাক হয়েই দেখলেন, পড়ে গেছেন শিশিরভেজা ঘাসে এবং বকুলতলার সেই পাথরটাতে ঠোকর লেগেছে মাথায়। বেশ জোরেই লেগেছে।

এই সময় কেউ বলে উঠল, "আহা! লাগল নাকি।"

তাকিয়ে দেখে অবাক হরিপদ তালুকদার। সেই টাকওয়ালা লোকটা, মুখে

দাড়িগোঁফের জঙ্গল—রোজ যে এই পাথরের আসনটা দখল করে বসে থাকে এবং যে কিছুক্ষণ আগে তাঁকে সর্বনাশের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, "ওখানে বসলেই কিন্তু ঘুম পায়। বুঝলেন?"

হরিপদবাবু মনে মনে বললেন, বুঝেছি। তার মানে পাথরটা দখল করার জন্য রাত চারটেয় শেষ ঘুম বরবাদ করার শাস্তিটা ভালই পেয়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মশায়ের নাম কি ভোম্বলবাবু?"

"আজ্ঞে না। আমার নাম হরিপদ চাকলাদার।"

শুনেই হরিপদবাবু হন-হন করে কেটে পড়লেন। আর কক্ষণো এ ভূতুড়ে পার্কে আর এত ভোরে বেড়াতে আসবেন না। বাড়ির কাছাকাছি হতে হঠাৎ মনে হল, নামটা কি হরিপদ চাকলাদার বলল, না তালুকদার বলল? চাকলাদার না তালুকদার? তালুকদার না চাকলাদার?

তালুকদার হলে বেটাচ্ছেলে আমার মতোই বিপদে পড়তে পারে। এই ভেবে হরিপদ শেষে খিকখিক করে হেসে উঠলেন।

কর্নেলের জার্নাল থেকে - ৩

আমার ছাদের বাগানটিকে বন্ধুরা ঠাট্টা করে 'শূন্যোদ্যান' বলে থাকেন। সকাল-বিকেল দু'বেলা গিয়ে পরিচর্যা করি। ক'দিন আগে এক বিশেষজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শে ফিলোক্যাকটাসের টবটিকে নামিয়ে এনে ড্রয়িং রুমের জানালায় রেখেছিলুম। এই প্রজাতিকে বলা হয় এপিফাইলাম হাইব্রিডাম। অবিশ্বাস্য সুন্দর ফুল উপহার দিয়েছে। দু'থাক উজ্জ্বল লাল লম্বাটে পাপড়ি। মধ্যিখানে একগুচ্ছ শিষের মতো পরাগ। আবার পরাগের মাথায় খুদে তারার মতো ফুল। ভাবা যায় না। ফুলের ভেতর ফুল।

সকালে শূন্যোদ্যান থেকে নেমে কফি খেয়ে জানালার ধারে ফুলটিকে দেখতে গেলুম। সেই সময় চোখে পড়ল. নীচের রাস্তার ওধারে ফুটপাত থেকে একটি যুবক তেতলায় আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়তেই সে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল। কাতর চাহনি। তারপর সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করতে থাকল। কেমন একটা ছটফটানি লক্ষ করছিলুম। পরনে যেমন-তেমন হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট। পায়ে রবারের স্যান্ডেল। বুঝতে পারলুম, দরোয়ান তাকে এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকতে দেয়নি। ষষ্ঠীকে ডেকে বললুম, "ওকে নিয়ে আয়।"

ষষ্ঠী উঁকি মেরে দেখে গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখে কেমন যেন লাগছে, বাবামশাই! আজকাল যাকে-তাকে ঘরে ঢোকালেই ডেঞ্জার।"

চোখ কটমটিয়ে তাকালে সে বেরিয়ে গেল। ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ টেনে নিলুম। কাগজের খবর আজকাল আর পড়তে ইচ্ছে করে না। রাজনীতি নিয়ে সেই কচকচানি খাড়া-বড়ি-থোড় থোড়-বড়ি-খাড়া। তাই বিজ্ঞাপন পড়ি। সত্যি বলতে কী, বিজ্ঞাপনের মতো মজাদার জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ করে 'নিরুদ্দিষ্ট' কলমটি চকমপ্রদ। কোনও ফোটোগ্রাফের তলায় 'খোকা ফিরে এসো মা শয্যাশায়ী।' কোনওটার তলায় নাম-ধাম, নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার তারিখ, 'ছিটগ্রস্ত' বা 'মানসিক ভারসাম্যহীন'........

'এর নাম সুরঞ্জন দাশ। আলফা ট্রেডিং কম্পানির আড়াই লাখ টাকা তছরুপ করে পালিয়ে গিয়েছে। কেউ কোথাও একে দেখলে নিকটবর্তী থানায় অথবা কম্পানির অফিসে জানান। ধরে দিলে পুরস্কৃত করা হবে। অনুমত্যানুসারে—শিবকুমার মান্না, ম্যাঃ অঃ টেঃ কোং, ২৭০/৫ বি জঃ নেঃ রোড, কল-১৭।'.

সুন্দর স্মার্ট চেহারা। চোখে চশমা। বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। বয়স-তিরিশ—বত্রিশের বেশি নয় মনে হচ্ছে। টাকা তছরুপ করে পালায় যারা, তাদের অবশ্য এমন সভ্যভব্য মার্জিত চেহারা হবে না তার মানে নেই। এ পর্যন্ত যত অপরাধী দেখেছি, তাদের অনেকেরই চেহারা বেশ সভ্যভব্য। তবে আমার হাতে ধরা-পড়া অপরাধীরা উঁচুতলার মানুষ, এই যা!

কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিলুম। আজকাল আর অপরাধ-সংক্রান্ত-রহস্য আমাকে টানে না। প্রকৃতি-রহস্য নিয়েই আছি। চুরুট নিভে গিয়েছিল। জ্বেলে নিয়ে আবার ফুলটার কাছে গেলুম। ষষ্ঠী এত দেরি করছে কেন? বড্ড ফোঁপরদালাল হয়ে গেছে দেখছি।

প্রায় দশ মিনিট পরে ষষ্ঠী সেই যুবকটিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বললুম, "এতক্ষণ কী করছিলি হতভাগা?"

ষষ্ঠী বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল, "জিজ্ঞেসা—টিজ্ঞেসা না করে যাকে-তাকে হুট করে ঘরে আনা যায়? আপনিই কতবার বকেছেন আমাকে।"

যুবকটি আমার পা জড়িয়ে ধরতে এল। সেইসঙ্গে হাঁউমাউ করে কান্না। "আমাকে বাঁচান স্যার। আমি বড্ড বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

ষষ্ঠীকে চলে যেতে ইশারা করলুম। তারপর যুবকটিকে বললুম, "হইচই কান্নাকাটি এসব আমি পছন্দ করিনা। তুমি আগে বসো। তারপর বলো, কী হয়েছে।"

চোখের জল মুছে একটু শান্ত হয়ে সে যা বলল, শুনে চমকে উঠলুম।

তার নাম তপনকুমার ঘড়াই। বাড়ি মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রামে। খুব গরিব ঘরের ছেলে সে। মাধ্যমিক পাশ করে টাকার অভাবে পড়াশোনা এগোয়নি। কিছুদিন আগে 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখে সে চিঠি লিখেছিল। বিজ্ঞাপনে বক্স নম্বর দিয়ে 'কাজের লোক' চাওয়া হয়েছিল। বেকারির জ্বালা বড় জ্বালা। তাই মাসে দুশো টাকা মাইনের এই তুচ্ছ চাকরি তার কাছে যথেষ্ট। ২৭ নং নকুড়বাবু লেনে তার মনিব ভদ্রলোকের বাস। ছাদের একটি ঘরে তিনি থাকতেন। কাজে যোগ দেওয়ার পর মনিব তাকে অগ্রিম মাইনে দিয়ে দেন। তার কোনও বাক্স-প্যাঁটরা নেই দেখে তিনি একটি বড় ট্রাঙ্ক কিনে দেন। দিন সাতেক পরে মনিব সি আর সেন তাকে আরও কিছু টাকা দিয়ে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে আসতে বলেন। সে বাড়ি গিয়েছিল। গতকাল বিকেলের ট্রেনে সে ফিরে আসে। হাওড়া স্টেশনে নেমে সে দেখে, ভিড় করে একদল পুলিশ প্ল্যাটফর্মে একটি বাক্স ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকের কাছে জানা যায়, ওর ভেতর একটি মৃতদেহ টুকরো-টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেছে। সে কৌতূহলবশত উঁকি মেরে দেখেই চমকে ওঠে।

এ তো তারই সেই ট্রাঙ্ক। মনিব ট্রাঙ্কের ওপর তার নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মনিবের বাসায় আসে। কিন্তু মনিবের ঘরে অন্য এক ভাড়াটে। বাড়ির মালিক বলেন, সি আর সেন বাসা বদলেছেন। তবে ঠিকানা দিয়ে যাননি।

তপন বুঝতে পারে, এবার পুলিশ তাকে খুঁজবে। কারণ ট্রাঙ্কের ওপর তারই নাম-ঠিকানা লেখা। সে কী করবে বুঝতে পারে না। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় আমার অসংখ্য কীর্তিকলাপ সে পড়েছে। আমার স্নেহভাজন তরুণ সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা রোমাঞ্চকর সব রিপোর্ট। জয়ন্ত এখন কাশ্মিরের হাঙ্গামার খবর আনতে গিয়েছে। তখন আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে জয়ন্তের ঠিকানা পত্রিকার অফিসে জোগাড় করেছে। এর পর জয়ন্তের বাড়ির লোকের কাছে আমার ঠিকানা জোগাড় করতে তার অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এবাড়ির দরোয়ান তাকে ঢুকতে দেয়নি।—

শোনার পর তপনকে বললুম "সি আর সেনের পুরো নাম কী?"

তপন বলল, "জানি না সার। মাত্র এক সপ্তাহ ওঁর কাছে ছিলুম। সায়েবসুবোর মতো কেতা। ঘরখানা বেশ সাজানো-গোছানো। তবে ফার্নিচার বেশি ছিল না। সেনসায়েব কেরোসিনকুকারে নিজেই রান্না-বান্না করতেন। আমি সাহায্য করতুম। বাজার করে এনে দিতুম। টুকরো-টাকরা ফাইফরমাশ খাটতুম। খুব অমায়িক মানুষ মনে হত।"

"কোনও লোক আসত না ওঁর ঘরে?"

"না সার! রোজ সকাল সাড়ে ন'টায় খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যা ছ'টা-সাড়ে ছ'টায়। ঘরে থাকতে বলতেন। কারও সঙ্গে মিশতে বারণ কবতেন।"

"সেনসায়েবের চেহারার বর্ণনা দাও।"

"আন্দাজ বত্রিশ-ছত্রিশের মধ্যে বয়স। আমাব চেয়ে ময়লা গায়ের রং। মাথায়ও উঁচু। শক্তসমর্থ গড়ন। কোঁকড়া একরাশ চুল ছিল মাথায়। কেতাদুরস্ত গোঁফ-দাড়ি ছিল মুখে। নাকের গড়ন প্যাঁচার ঠোঁটের মতো সাব।"

তপনের কণ্ঠস্বরে তিক্ততার ভাব। তবে তার বর্ণনা শুনে ধারণা হল ছেলেটি বুদ্ধিমান এবং পর্যবেক্ষণক্ষমতা আছে। বললুম, "সেনসায়েব কবে বাসা ছেড়ে গেছেন, বাড়ির মালিক বলেননি?"

"বললেন গত পরশু সকালে। সেদিন রোববার ছিল। আগের রাত্তিরে ওঁকে বলে রেখেছিলেন সেনসায়েব।"

"তুমি কবে দেশে গিয়েছিলে?"

"গত শুক্রুবার।"

"সেনসায়েবের অফিস কোথায় ছিল জানো?"

"না সার! জিজ্ঞেস করিনি। তা ছাড়া মাত্র এক সপ্তাহ ছিলুম। সুযোগ পাইনি জানার।"

চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলুম। ট্রাঙ্কের বডিটা সেনসায়েবের নয় তো? তপনই তাকে খুন করে বাঁচার জন্যে গল্প ফাঁদতে আসেনি তো? টাকাপয়সার লোভে কাজের লোকেরা আজকাল এ-ধরনের কাজ করছে। প্রায়ই কাগজে খবর বেরোয়। এমন তো হতেই পারে, তড়িঘড়ি নিজের নাম লেখা ট্রাঙ্কে মনিবের বডি পাচার করে পরে খেয়াল হয়েছে ট্রাঙ্কে তার নাম লেখা আছে।

চোখ খুলে বললুম, "টেলিফোন ছিল তোমার সায়েবের?"

তপন বলল, না সার! দোতলায় বাড়িওয়ালা থাকেন। তাঁর ফোন আছে। মাঝে—মাঝে সেনসায়েবের ফোন আসত। বাড়িওয়ালা খবর পাঠাতেন। সেনসায়েব ঘরে না থাকার সময় বারকতক ফোন আমিও গিয়ে ধরেছি। বলেছি, সায়েব নেই। কিছু বলতে হবে? জবাব এসেছে, বলবেন ঘোষবাবু ফোন করেছিলেন। প্রত্যেকবার সার ঘোষবাবুর ফোন। সেনসায়েবকে বললে উনি বলেছেন, ঠিক আছে।"

"বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের নাম কি? ফোন নম্বরটা জানো?"

"আসল নাম জানি না। ঘেঁটুবাবু বলতে শুনেছি। ফোন নম্বর তো লক্ষ করিনি সার।"

"ঠিকানা ২৭ নং নকুড়বাবু লেন বললে। কোথায় সেটা?"

"শ্যামবাজার এরিয়ায়। ঘিঞ্জি গলি একটা।"

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "চলো। বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।"

তপনের মুখ অমনই বিবর্ণ হয়ে গেল। হাত জোড় করে বলল, "আপনার পায়ে পড়ি সার! আমাকে ওখানে নিয়ে যাবেন না। এতক্ষণ হয়তো পুলিশ..."

তাকে থামিয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বললুম, "পুলিশের জানার কথা নয় তুমি ও-বাড়িতে কাজ করতে।"

সে হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "কিছু বলা যায় না সার! আমকে ফাঁসানোর জন্য সেনসাহেব হয়তো..."

"ঠিক আছে। তুমি আমাকে গলিটা চিনিয়ে দেবে শুধু। চলো।"

তপন অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে উঠে দাঁড়াল। মনে হল যেন তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তপনের নির্দেশ মতো একটা গলির মুখে আমার গাড়ি পৌঁছলে বললুম,

"তুমি গাড়িতে বসে থাকো। আমি আসছি।" আসলে গলিটা বড্ড বেশি ঘিঞ্জি। গাড়ি ঢোকানোর অসুবিধে আছে। রিকশ ঠেলা মানুষজনের গিজগিজে ভিড়। এঞ্জিন বন্ধ করে চাবি এঁটে নেমে গেলুম। তপন ভয়-পাওয়া মুখে কুঁকড়ে বসে রইল।

২৭ নং বাড়িটা আসলে পুরনো দোতলা। ছাদে একটা নতুন ঘর করা হয়েছে। বাড়িওয়ালা আমাকে দেখে একটু ভড়কে গেলেন যেন। এজন্য আমার সাদা দাড়ি, টুপি, 'ক্রিসমাসের সান্তাক্লস' চেহারা (জয়ন্তের ভাষায়) এবং কিঞ্চিত বিদেশী ছাপ (এ-ও জয়ন্তের মতামত) হয়তো দায়ী। নমস্কার করে বললেম, "বলুন সার।"

"আমি সেনসায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"উনি তো গত রোববার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। নতুন বাসার ঠিকানা দিয়ে যাননি।" বাড়িওয়ালা একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "অদ্ভুত মানুষ সার। শনিবার সন্ধ্যায় বললেন ঘর ছেড়ে দেবেন শিগগির। চুক্তি অনুসারে অ্যাডভান্স ফেরত পাবেন না। যাই হোক, রোববার সকালে ছাদে গিয়ে দেখি, ঘর হাট করে খোলা। ভেতরে কিচ্ছু নেই। ভোরবেলা কখন চলে গেছেন। টেরও পাইনি।"

"নীচের সদর দরজায় তালা দেওয়া ছিল না ভেতর থেকে?"

"না সার। দরকার হয় না তালা দেওয়ার। সিঁড়িটা সোজা ছাদে উঠে গেছে। এখানে আমার দরজা। এটা বন্ধ থাকলেই আমার সেফটি। এই যে দেখছেন কোলাপসিবল গেট।"

"সেনসায়েব কি একা থাকতেন?"

"হ্যাঁ, একা। তবে কিছুদিন একজন সারভেন্ট রেখেছিলেন। কী যেন নামট া— তপু না তপন। গতকাল সন্ধ্যায় সে দেশ থেকে ফিরে এসে অবাক। ছুটিতে গিয়েছিল। আমাকে তার সায়েবের ঠিকানা চাইল। তো..."

"আপনি জানেন সে ছুটিতে গিয়েছিল?"

"অত কিছু জানি না সার! তবে দু-তিনদিন তার সাড়া পাইনি। গতকাল সন্ধ্যায় সে এসে বলল, ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, সেনসায়েব নাকি তাকেও কিছু জানাননি।" বাড়িওয়ালা এবার সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"শনিবার রাতে ছাদে কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?"

বাড়িওয়ালা ভড়কে গিয়ে বললেন, "না তো। আপনি—আপনি কে সার?"

অগত্যা আমার নেম-কার্ডটি ওঁকে দিলুম। উনি খুঁটিয়ে পড়ার পর আরও ভড়কে গিয়ে বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি মিলিটারি অফিসার। কর্নেল। কিন্তু..."

"আমি অবশ্য রিটায়ার্ড কর্নেল। তবে আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই।" বলে রাশভারী চালে হাসলুম। "আমি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর পক্ষ থেকে একটা কেসের তদন্তে এসেছি।"

ভদ্রলোক আরও ভড়কে গেলেন। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "আমি কিছু জানি না সার। বিশ্বাস করুন।"

"আপনি ঘোষবাবুকে চেনেন?"

"ঘোষবাবু? ঘোষবাবু...ও! হ্যাঁ সার! তাঁকে দেখিনি কখনও। তবে প্রায় সেনসায়েবকে ফোন করতেন। বলতেন, সেনসায়েবকে ডেকে দিন। নাম জিজ্ঞেস করলে বলতেন, বলুন, ঘোষবাবু ডাকছেন।"

"কী কথাবার্তা হত ফোনে? মানে, কী নিয়ে কথাবার্তা হত বলে আপনার ধারণা?"

একটু ভেবে নিয়ে ঘেঁটুবাবু বললেন, "আমার অনুমান, টাকাকড়ির দেনা-পাওনা নিয়ে। কারণ সেনসায়েব বলতেন, পার্টি সামনের সপ্তায় পুরোটাই মিটিয়ে দেবে। ইনস্টলমেন্টের প্রশ্ন নেই।"

"ইনস্টলমেন্ট?"

"হ্যাঁ সার! ফ্ল্যাট কথাটাও শুনেছি মনে পড়েছে। আমার ধারণা, ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে কথা হত। সেনসায়েবকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলুম। উনি বলেছিলেন, ওঁর এক বন্ধু ফ্ল্যাট কিনতে চান। একজন বিশ্বাসী প্রোমোটার দেখে দিতে বলেছেন। ওঁর কথায় মনে হয়েছিল, ওই ঘোষবাবুই প্রোমোটার কিংবা প্রোমোটারের লোক।"

"শনিবার সন্ধ্যায় বা রাতে সেনসায়েবের ঘরে কেউ এসেছিল কি না লক্ষ্য করেছিলেন?"

ঘেঁটুবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি আর আমার গিন্নি হরিসভায় গিয়েছিলুম সন্ধ্যাবেলা। কাজের মেয়েটিকে বাড়ি যেতে বলে এই দরজায় তালা এঁটে বেরিয়েছিলুম। বাড়িতে আর কেউ থাকে না। একমাত্র ছেলে খড়গপুরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। সে মাসে কদাচিৎ একবার আসে। তো ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা হয়েছিল। নীচের দরজায় কলিং বেল আছে। সেনসায়েব দরজা খুলে দিয়েছিলেন।"

"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

ঘেঁটুবাবু বিব্রতভাবে বললেন, গিন্নি সার আজ সকালে বেহালা গেছে বোনের বাড়ি।"

"ঠিকানা দিন।"

"ঠি—ঠিকানা তো জানি না সার। আমি ওদের বাড়ি কখনও যাইনি। আপনি বরং ও-বেলা ফোনে জেনে নেবেন ফিরেছে কি না। আমার ফোন নম্বর লিখে নিন।"

ফোন নম্বর লিখে নিয়ে চলে এলুম। ভদ্রলোক কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

গাড়ির দিকে যেতে-যেতে এবার সন্দেহের কাঁটা ঘেঁটুবাবুর দিকে ঘুরল। সেনসায়েব কি নিজের জন্যই ফ্ল্যাট কিনেছিলেন এবং টাকা সংগ্রহ করেছিলেন? টের পেয়ে ঘেঁটুবাবুই কি তাঁকে...

কিচ্ছু অসম্ভব নয়। ভদ্রলোকের চেহারা শক্তসমর্থ। কথাবার্তায় কেমন যেন তৈরী-করা ছাঁদ। তা ছাড়া অমন ভড়কে যাওয়া আমাকে দেখামাত্রই! কেন?

গাড়ির কাছে এসে দেখি, গাড়িতে তপন নেই। এদিকে-ওদিকে তাকে খুঁজলুম। কোথাও দেখতে পেলুম না। একটা জটিল রহস্যে জড়িয়ে পড়লুম দেখছি। তপনের হঠাৎ গা-ঢাকা দেওয়ার কারণ কী?...

বাড়ি ফিরে ডি সি ডি ডি অর্থাৎ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার আমার বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু অরিজিৎ লাহিড়িকে রিং করলুম। অরিজিৎ বলল, হাই ওল্ড বস! এখনই আপনার কথা ভাবছিলুম।"

"ভাবার কি কোনও বিশেষ কারণ আছে, ডার্লিং?"

"বেলা এগারোটায় আপনার রিং করাব কোনও কারণ থাকলে আমারও আছে।"

হাসতে হাসতে বললুম, "তা হলে তোমারটা আগে শুনি।"

"নাহ্। আপনিই যখন রিং করেছেন, তখন..."

"গতকাল সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে ট্রাঙ্কে একটা বডি পাওয়া গেছে।"

"মাই গড! দ্যাটস দ্য পয়েন্ট। জেরবার হয়ে গেছি একেবারে তাই ভাবছিলুম দাড়িওয়ালা মুশকিল আসানের কাছে যাবো নাকি। এনিওয়ে, বলুন।"

"বডি শনাক্ত করা গেছে?"

"গেছে বলেই তো দায়টা এসে পড়েছে কলকাতা পুলিশের ঘাড়ে। থুড়ি তাড়াহুড়ো করেছিল বড্ড। বডির বুকপকেটে রক্তমাখা কয়েকটা নেম-কার্ড পাওয়া গেছে। মর্গের রিপোর্ট বলছে পটাসিয়াম সাইনায়েডে মৃত্যু। তারপর বডি টুকরো-টুকরো করে ট্রাঙ্কে ঢোকানো হয়। ট্রাঙ্কের ওপর নাম লেখা আছে..."

"তপনকুমার ঘড়াই।"

অরিজিতের অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল, "স্ট্রোকে মারা পড়ব। প্লি-ই-জ কর্নেল।"

"আশা করি তপনের ঠিকানায় পুলিশ রওনা দিয়েছে?"

"অফ কোর্স। কিন্তু আপনি আমায় অগাধ জলে ফেলে দিয়েছেন।"

"বডি কি সি আর সেন নামে কারও?"

অরিজিতের হাসি ভেসে এল। "এবার কিন্তু হেরে গেলেন। ডেডবডি সুরঞ্জন দাশ নামে এক ভদ্রলোকের।"

এবার আমার চমকাবার পালা। "অরিজিৎ। আজই কাগজে তাঁর ছবি বেরিয়েছে। আড়াই লক্ষ টাকা তছরুপ করে পালিয়েছিলেন কম্পানি থেকে।"

"ইয়া। ইউ আর ড্যাম রাইট, কর্নেল। আমার থিওরি, টাকাগুলো চোরের ওপর বাটপাড়ি করে নিয়ে কেউ ওঁকে খুন করেছে। যাই হোক, সি আর সেন কে?"

"তপনের মনিব। হু, পুরোটা আগে তোমার শোনা দরকার।" সংক্ষেপে সব বললুম। তারপর বললুম, "তুমি এখনই ২৭ নং নকুড়বাবু লেনে বাড়িওয়ালা ঘেঁটুবাবুর কাছে যাও। জেরা করো। মনে হচ্ছে, উনি কিছু গোপন করেছেন আমাকে। ওখান থেকে সোজা আমার কাছে চলে আসবে।"

এলোমেলো চিন্তায় সময় কাটছিল। লাঞ্চের জন্য তৈরী হচ্ছি, অরিজিৎ এল। বলল, "ঘেঁটুবাবু জেরার চোটে স্বীকার করেছেন, রবিবার সকালে ছাদে গিয়ে ঘরের দরজা ভেজানো দেখেছিলেন। নেহাত একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে খোলেন। ঘর খালি। মেঝেয় চাপ-চাপ জমাট রক্ত। খুনখারাপিতে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে ঘর ধুয়ে সাফ করেন। আজকাল ভাড়াটের অভাব হয় না। সোমবার বিকেলের মধ্যে পাড়ার এক মুদি ভদ্রলোককে ঘরটি ভাড়া দিয়েছেন। খুনের প্রমাণ লোপও অপরাধ। কাজেই ঘেঁটুবাবু হাজতে। তাঁর স্ত্রীর খোঁজেও পুলিশ গেছে। গ্রেফতার করা হবে।"

"তোমাকে ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে ডার্লিং। এস, লাঞ্চে বসা যাক।"

অরিজিৎ হাসল। "ভাগে কম পড়বে, বস।"

ষষ্ঠীচরণ একগাল হেসে বলল, আজ্ঞে না। বাবামশাই আপনার কথা বলে রেখেছিলেন।"

খেতে বসে বললুম, "তপন পালিয়ে গেল কেন, এ একটা রহস্য। না কি সে কোনও বিপদে পড়ল?"

অরিজিৎ বলল, আপনার তপনচন্দ্রই মার্ডারার। নিজের দোষ ঢাকতে আপনার কাছে এসেছিল। পাছে ঘেঁটুবাবু দৈবাৎ ওকে শনিবার সন্ধ্যায় দেখে থাকতে পারেন, এই ভেবে সে গা-ঢাকা দিয়েছে।"

"অরিজিৎ, ঘেঁটুবাবুকে কাগজে ছাপানো সুরঞ্জনবাবুর ছবিটি দেখানো

উচিত। এমনও তো হতে পারে, তিনিই সি আর সেন নামে ওঁর ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। ফ্ল্যাট কেনার জন্যই টাকা চুরি করেছিলেন কম্পানি থেকে। সেই টাকাই ওঁর মৃত্যুর কারণ—খুনি যেই হোক?"

"সুরঞ্জনের ছবি ঘেঁটুবাবুকে দেখানো উচিত, এটুকু বুদ্ধি আমার আছে, কর্নেল। আপনার কাছে সব কথা শোনার পর স্বভাবত এমন একটা পয়েন্ট মাথায় আসতে বাধ্য। ঘেঁটুবাবু বললেন, না। ইনি সি আর সেন নন। এঁকে উনি কখনও দেখেননি বা চেনেন না।"

একটু ভেবে বললুম, "তা হলে সি আর সেন সুরঞ্জন দাশকে চিনত, এতে কোনও ভুল নেই।"

অরিজিৎ সায় দিয়ে বলল, "দ্যাটস রাইট। এখন কথা হল, কে এই সি আর সেন? তাই না?"

"তুমি ওই কম্পানিতে গিয়ে খোঁজ নাও, সি আর সেন নামে কোনও কর্মচারী আছেন কিনা।"

"ওঃ কর্নেল! আমি শিশু নই। খোঁজ অলরেডি নিয়েছি। কম্পানিতে ও-নামে কেউ নেই।"

খাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ আলোচনা হল। তারপর অরিজিৎ চলে গেল।...

চুরুট টানতে-টানতে মাথায় একটা আইডিয়া এল। খবরের কাগজে আলফা ট্রেডিং কম্পানির ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। ফোনে সাড়া এলে বললুম, "মিঃ শিবকুমার মান্নাকে চাই।" একটু পরে কেউ ভরাট গলায় বলল, "বলুন।"

"মিঃ মান্না?"

"ইয়া।"

"আচ্ছা, মিঃ মান্না, আপনার কম্পানিতে সি আর সেন নামে..."

"সরি। ও নামে কেউ নেই। কে বলছেন আপনি?"

"সে কী! ঘোষবাবু যে আমাকে বললেন..."

"কী বলছেন ঘোষবাবু?"

গলার স্বর বদলে গেছে এবার। চমক চাপা রেখে বললুম, "সেনসায়েব যে-ফ্ল্যাটটা কিনেছেন, তা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে। ঘোষবাবু সেনসায়েবকে খবর দিতে বললেন আমাকে।"

প্রায় আধ মিনিট পরে মিঃ মান্না বললেন, "কী ঝামেলা?"

"জমিটা নাকি অন্য লোকের। সেই ভদ্রলোক কেস করবেন বলে শাসিয়েছিলেন।"

"আই সি। ঠিক আছে।"

লাইন কেটে গেল। তখনই অরিজিৎ লাহিড়িকে রিং করে জানিয়ে দিলুম, আমি যাচ্ছি। ঘেঁটুবাবুকে নিয়ে এক জায়গায় যেতে হবে। খুব জরুরি ব্যাপার। সে যেন তৈরি থাকে।

লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে অরিজিৎ, কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবল এবং হাজত থেকে প্রায় আধমরা ঘেঁটুবাবুকে নিয়ে আলফা ট্রেডিং কম্পানিতে পৌঁছলুম। ২৭০/৫/বি চৌরঙ্গি রোডের একটি গলির ভেতর পুরনো বাড়ি। তিন তলায় কম্পানির অফিস।

পুলিশবাহিনী করিডোরে রইল। অরিজিৎ, ঘেঁটুবাবু এবং আমি অফিসে ঢুকে ম্যানেজারের খোঁজ করলুম। ঘরসুদ্ধু লোক ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে রইল। একজন কর্মচারী ম্যানেজারের চেম্বার দেখিয়ে দিল। আমরা ঢুকলে ম্যানেজার শিবকুমার মান্না ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু তপনের বর্ণনার সঙ্গে তত মিলছে না তো। চুল কোঁকড়া নয়। টাক আছে। গোঁফ-দাড়ি নেই। তবে নাকটা বাঁকা এবং ঘোরালো। গায়ের রং ময়লাই বটে। বললুম, "দেখুন তো ঘেঁটুবাবু, এঁকে চেনেন নাকি?"

ঘেঁটুবাবু দেখতে দেখতে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, "চিনতে পেরেছি। মাথার চুল দেখে গিন্নি ঠিকই সন্দেহ করত, সেনসায়েব পরচুলো পরে থাকে।"

শিবকুমার মান্না এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে তর্জন-গর্জন জুড়ে দিলেন। "কী বলছেন মশাই?"

অমনই ঘেঁটুবাবু আরও চ্যাঁচামেচি করে বললেন, "সেনসায়েবের গলা। সেনসায়েবের গলা।"

শিবকুমার মান্না ওরফে সি আর সেনকে গ্রেফতার করা হল। কম্পানির মালিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তাঁকে বললুম, "আপনার ম্যানেজারই আড়াই লাখ টাকা চুরি করেন গত শনিবার। সুরঞ্জনবাবুর কাঁধে দোষ চাপানোর জন্যে তাঁকে সেই রাত্রে খেতে নেমন্তন্ন করেন। বিষ খাইয়ে মেরে ট্রাঙ্কে তাঁর বডি পাচার করেন। রবিবার ছুটি ছিল। সোমবার চুরিটা ধরা পড়ে। সুরঞ্জন অনুপস্থিত। কাজেই তার কাঁধে দোষ চাপাতে কাগজে বিজ্ঞাপন দেন মান্নাসায়েব। কারণ তিনিই জানেন, সুরঞ্জন যে টাকা মেরে পালাননি, তা জানাতে ফিরে আসার কোনও চান্স নেই। তিনি মৃত। অতএব তাঁর কাঁধে চুরির দায় বহাল রইল অনন্তকাল। আর দৈবাৎ বডি শনাক্ত হলে খুনের দায় যাতে তাঁর কাজের লোকের ঘাড়ে পড়ে, সে-ব্যবস্থা আগে থাকতে করে রেখেছিলেন মান্নাসায়েব। একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্যে এই কুকীর্তি।"

ঘেঁটুবাবু উঃ আঃ করে কপাল চাপড়াতে থাকলেন। অরিজিৎ বলল, অসাধারণ মোডাস অপারেন্ডি এবং অসাধারণ আপনার রহস্যভেদপদ্ধতি, কর্নেল।"

বললুম, "রহস্যের চাবিকাঠিটি কিন্তু একটি কথা; 'ঘোষবাবু'। মোডাস অপারেন্ডিটা মাথায় রেখে মান্না সায়েবকে রিং করলুম। ব্যস, কাজে লেগে গেল। কিন্তু তপনের অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা এখনও হল না।"

অরিজিৎ বলল, "দেখা যাক। খুঁজে বের করে ফেলব দেখবেন।"

তপনের জন্যে উদ্বেগ রয়ে গেল। পরদিন সকালের কাগজে খবরটা বড় আকারে বেরোল। শূন্যোদ্যান থেকে নেমে জানালার ধারে ফিলোক্যাকটাসটিকে দেখতে গিয়ে লক্ষ করলুম, নীচের ফুটপাতে তপন। চোখে চোখ পড়লে কালকের মতো ভঙ্গি করল। ষষ্ঠীকে ডাকতে পাঠালুম।

তপন এসে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, পালিয়েছিলুম সার। আপনি চলে যাওয়ার পর পুলিশের একটা গাড়ি এসে আপনার গাড়ির কাছে যেই থেমেছে, আমি ভাবলাম..."

"তুমি ভাবলে তোমাকে ধরতে এসেছে! বোকা কোথাকার!" বলে ষষ্ঠীকে ডাকলুম। "একে কিছু খাইয়ে দে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, পেটে কিছু পড়েনি।"

ছেলেটির চোখ কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠল।

রাতের মানুষ

ঝুলনপূর্ণিমার রাতে গঞ্জের মেলায় ছোটমামার সঙ্গে কলকাতার যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি পড়ছিল। ফেরার সময় দেখি আকাশ ফাঁকা। ঝলমলে চাঁদ কাত হয়ে বাদবাকি জ্যোৎস্না ঢেলে নিজেকে খালি করে দিচ্ছে। রাস্তা সুনসান ফাঁকা। মানুষজন মেলায় রাত কাটাতেই আসে। কিন্তু ছোটমামা খুঁতখুঁতে মানুষ। 'ঘুম পাচ্ছে বলেই যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়তে হবে নাকি? মোটে তো পাঁচ কিমি রাস্তা। চলে আয় পুঁটু।'

ঘুম-ঘুম চোখে রাস্তা হাঁটা বেশ কষ্টকর। তা ছাড়া ছোটমামার চেয়ে আমার পাদুটো বড্ড বেশি ছোট। বারবার পিছিয়ে পড়ছি আর ধমক খাচ্ছি।

হঠাৎ রাস্তার বাঁকের মুখে গঞ্জের শেষদিকটায় একটা সাইকেল-রিকশ দেখা গেল। রিকশটা দাঁড়িয়েই ছিল। তবু ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রোখকে! রোখকে!'

রিকশওয়ালা হেসে অস্থির। 'রুখেই তো আছি বাবুমশাই! যাওয়া হবে কোথায়?'

আমারও হাসি পাচ্ছিল। ছোটমামার সবকিছুই অদ্ভুত। তো আমরা ঝাঁপুইহাটি যাব শুনে রিকশওয়ালা খুশি হল। বলল, 'চলুন। আমি কাছাকাছিই থাকি। ওদিককার প্যাসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। খালি খালি রিকশ নিয়ে বাড়ি ফেরা পোষায় না।'

রিকশতে উঠে বসে ঘুমটা আমাকে বাগে পেয়েছিল। কিন্তু ছোটমামার বারবার ধমক এবং 'পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার' হুমকি ক্রমশ ঘুমটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কিছুদূর চলার পর রিকশওয়ালা রিকশ থামাল। ছোটমামা বললেন, 'কী হল? চেন খুলে গেল নাকি?' রিকশওয়ালা সিট থেকে নেমে বলল, আজ্ঞে না। চক্কোত্তিমশাই হজমিগুলি আনতে দিয়েছিলেন। দিয়ে আসি।'

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখানে কোথায় তোমার চক্কোত্তিমশাই?'

রিকশওয়ালা কান করল না। রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় গিয়ে ডাকল, 'চক্কোত্তিমশাই! ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

গাছের ভেতর থেকে খ্যানখ্যানে গলায় কেউ বলল, 'ঘুমোব কী রে বাবা! পেট আইঢাই। এত দেরি করলি কেন রে?'

'প্যাসেঞ্জার পেলে তবে তো আসব। এই নিন হজমিগুলি।'

'এনেছিস? কই, দে দে। শিগগির দে।'

রিকশওয়ালা কাকে হজমিগুলি দিয়ে এসে সিটে উঠল। প্যাডেলে চাপ দিল। রিকশর চাকা গড়াল। ছোটমামা বললেন,, 'ব্যাপার কী হে রিকশওয়ালা? তোমার চকোত্তিমশাই কি গাছে থাকেন নাকি?'

'আজ্ঞে।'

'অ্যাঁ? গাছে থাকেন কেন?'

'ওটাই তো তেনার ডেরা।'

'তার মানে?'

'মানে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী বাবুমশাই? ঝাঁপুইহাটি যাবেন। পৌঁছে দেব। ব্যস্!' ছোটমামা রেগে গেলেন।

'অদ্ভুত তো তোমার কথাবার্তা! রাতবিরেতে গাছের ওপর—'

রিকশওয়ালা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'চুপ! চুপ! চক্কোত্তিমশাইয়ের কানে গেলেই কেলেংকারি।' আমার কাছ থেকে ততক্ষণ ঘুমটা কেটে পড়েছে। বরাবর দেখে আসছি, ছোটমামার সঙ্গে কোথাও রাতবিরেতে বেরোলেই গোলমেলে সব ঘটনা ঘটে। বুঝতে পারি না, রাত এলেই পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে যায়? না কি ছোটমামার ভুলেই রাতটা গোলমেলে হয়ে যায়? কিন্তু তারপর তো ছোটমামা 'চলে আয় পুঁটে' বলে শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে যান। ধাক্কাটা সামলাতে হয় আমাকেই। এবার কতদূর গড়াবে কে জানে! বুক টিপটিপ করতে লাগল।

একটু পরে আবার রিকশ দাঁড়াল এবং রিকশওলা তড়াক করে নেমে গিয়ে ডাক দিল 'ঠাকরুণদিদি! অ ঠাকরুণদিদি!'

একটা শুকনো গাছের ডাল থেকে নেমে সাদা কাপড় পরা কেউ এদিকে এগিয়ে এল। 'ভুতু এলি? কখন থেকে পথ তাকিয়ে চোখে ব্যথা ধরে গেল। দোক্তা এনেছিস তো?'

'না আনলে ডাকছি কেন? এই নিন।'

দোক্তা নিয়ে ঠাকরুণদিদি ন্যাড়া গাছটার দিকে চলে গেল। ছোটমামা গুম হয়ে বসে ছিলেন। বললেন, 'কোন মানে হয়?'

রিকশওলা আবার চুপচাপ রিকশ চালাতে শুরু করল। কিছুদূর গেছি, হঠাৎ কোত্থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় ডাকল, ভুতু! অ ভুতু! অ্যাই ভুতো!'

ছোটমামা চাপা স্বরে বললেন, 'থেম না যে-ই ডাকুক!'

একটা কালো বেঁটে লোক ধমক দিল, 'অ্যাই ব্যাটাচ্ছেলে! কথা কানে যায় না?'

রিকশওয়ালা বলল, 'রোজ-রোজ বাকিতে জিনিস দেবে নাকি?'

'দেবে না মানে? ওর বাপ দেবে। ওখনও তেষট্টি টাকা সাতষট্টি পয়সা জমা আছে খাতায়।'

'সে আপনি মামলা করে আদায় করুন গে।'

লোকটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। 'বাজে কথা বলিসনে। আসলে তুই যাসনি দত্তর দোকানে।'

'কী ঝামেলা করছেন বাবু? গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আছে দেখছেন না?'

লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল। 'এখন আমি ঘুমোব কী করে? একগুলি আফিং আমাকে এত রাত্তিরে কে দেবে?

রিকশওয়ালা পরামর্শ দিল, 'শ্মশানতলায় চলে যান। দারোগাবাবুর কাছে একগুলি পেতেও পারেন।'

'ওরে বাবা। মৌতাত ভাঙলে লকআপে ঢোকাবে।'

'তা হলে বরঞ্চ পাঁচুর কাছে যান।'

'সে ব্যাটা তো চোর।'

'চোর বলেই তো বলছি। দারোগাবাবুর কৌটো থেকে দু-একটা গুলি সে-ই হাতাতে পারবে।' লোকটা কিন্তু কিন্তু করে বলল, 'তা পাঁচুকে পাচ্ছি কোথায়? ও তো ফেরারি আসামি।'

রিকশওয়ালা চাপা স্বরে বলল, 'সন্ধেবেলা পাঁচুকে একপলক দেখেছি। মোড়ল-মশাইয়ের তালগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল। মোড়লমশাই গঞ্জের মেলায় গেছেন। কাজেই পাঁচু নিশ্চয় তেনার ডেরায় ঘুমিয়ে নিচ্ছে।'

বেঁটে কালো ছায়ামূর্তিটি তখনই উধাও হয়ে গেল। রিকশওয়ালা প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, 'রোজ রাত্তিরে আসার এই এক জ্বালা বাবুমশাই। রাজ্যের লোকের হাজার ফরমাশ।'

ছোটমামা গুম হয়ে বসে আছেন। আমি ভাবছি, হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে না যান। বড্ড বেশি গোলমেলে ঘটনা ঘটছে। কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তা বাঁক নিল। এবার দুধারে ঘন জঙ্গল। রাস্তায় চকরাবকরা জ্যোৎস্না পড়েছে।

রিকশওয়ালা বলল, 'আর এক জায়গায় একটুখানি থামতে হবে। সিঙ্গি মশাইয়ের নস্যির কৌটোটা দিয়েই আমার ছুটি।'

একখানে জঙ্গলটা কিছু ফাঁকা। রিকশ সেখানে থামল। রিকশওয়ালা সিট থেকে নেমে রাস্তার ধারে গিয়ে চেঁচাতে থাকল, 'সিঙ্গিমশাই। সিঙ্গিমশাই!'

তারপর সাড়া না পেয়ে এগিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলাম না। ভয়ে-ভয়ে ডাকলাম, 'ছোটমামা!'

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'চুপচাপ বসে থাক। আমাদের বাড়ি পৌঁছনো নিয়ে কথা।'

এইসময় কাছাকাছি একটা গাছ থেকে কেউ বলল, কারা এখানে?'

ছোটমামা ভারিক্কি চালে বললেন, 'আমরা.'

'আমরা মানে? নাম কী? বাড়ি কোথায়?'

ছোটমামা রেগেই ছিলেন। বললেন, তা জেনে তোমার কাজ কী? কে তুমি? গাছে কী করছ?'

'অ্যাঁ। বলে কী! গাছে কী করছি! হি হি হি হি। ন্যাকা!'

'খবর্দার! বাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।'

'এটা বাজে কথা হল? জানো না গাছে কী করছি?'

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, না। জানি না। আমরা মানুষ। আমরা তোমাদের মত রাত-বিরেতে গাছে কাটাই না।'

'হি হি হি! প্রথম-প্রথম এই ভুলটা হয়।'

'কী ভুল হয়?'

'মানুষ-মানুষ ভুল।'

'কী অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত তো বটেই। অদ্দুটুকু বাদ যেতে কয়েকটা দিন দেরি, এই যা। তা তোমরা কি ডেরা খুঁজে বেড়াচ্ছ? বোকা আর কাকে বলে? ভুতোর রিকশতে চেপে—হি হি হি হি! ভুতোটা এক নম্বরের ধড়িবাজ। সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু!'

ছোটমামা রিকশ থেকে নেমে ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়ালেন। 'কে হে তুমি! গাছ থেকে নেমে এস তো দেখি।'

আমিও নামতে দেরি করলাম না। ছোটমামার মারামারি করার অভ্যাস আছে। কিন্তু রাতবিরেতে গাছের লোকটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ। রিকশওয়ালাও আসছে না। মারামারি বাধলে থামাবে কে, এটাই আমার ভাবনা।

ছোটমামা ঘুষি বাগিয়ে এবার হুঙ্কার দিলেন, 'কাম অন! কাম অন!'

গাছের লোকটা এবার বিদঘুটে হাসল। 'হি হি হি হি। ইংরেজির কী ছিরি। কাম অন কী হে ছোকরা? গেট ডাউন। কিন্তু গেট ডাউন করি কী করে? একটা ঠ্যাংই যে নেই। থাকলে পরে এতক্ষণে নেমে কানটি ধরে স্ট্যান্ড আপ অন দা বেঞ্চ করিয়ে দিতাম।'

পাশের একটা গাছ থেকে কেউ বলল, কী হে পণ্ডিতমশাই? ছাত্র জোটাতে পারলেন নাকি?'

'নাহ্। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না।'

ছোটমামা আর সহ্য করতে পারলেন না। রাস্তার ধারে পাথর-কুচির স্তূপ থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে শুরু করলেন। আমাকেও বললেন, হাত লাগা পুঁটু। আমাকে গাধা বলছে! আমাকে ইংরেজি শেখাচ্ছে পাঠশালার পণ্ডিত?'

ওদিকে পণ্ডিতমশাইয়ের চেঁচামেচিতে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে হৈ হৈ রৈ রৈ করতে করতে কালো-কালো কারা সব গাছ থেকে ঝুপঝাপ করে নেমে আসছিল। আমি ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেললাম, 'ছোটমামা। ছোটমামা।' এবার ছোটমামার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তারপর যা ভেবেছিলাম এবং বরাবর যা ঘটে আসছে তা-ই হল। ছোটমামা 'চলে আয় পুঁটু' বলে রিকশওয়ালা যে দিকে গিয়েছিল, সেইদিকে দৌড়লেন। আমিও দৌড়লাম।

কিন্তু ভাগ্যিস ছোটমামা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই সঙ্গ পাওয়া গেল। জ্যোৎস্নায় একটা ভাঙাচোরা দালানবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির দরজায় ছোটমামা ধাক্কা দিতে লাগলেন। একটু পরে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

ছোটমামা ব্যস্তভাবে বললেন, 'আমরা খুব বিপদে পড়েছি। দয়া করে দরজা খুলুন।'

'কী বিপদ?'

'কারা আমাদের তাড়া করেছে।'

'তারা কারা?'

'গাছে-গাছে যারা থাকে।'

'গাছে থাকে ভূত বনে থাকে বাঘ
জলে থাকে মাছ মনে থাকে রাগ।'

'কী বিপদ! আপনি পদ্য বলছেন নাকি?'

'ঠিক ধরেছ। কেমন হয়েছে পদ্যটা বল?'

'খুব ভাল। দয়া করে এবার দরজা খুলুন। ওরা আসছে।'

'ঘোড়ায় যদি পাড়ে ডিম
জলে যদি জ্বলে পিদিম
বলো তবে অতঃ কিম?'

ছোটমামার পদ্য লেখার বাতিক ছিল। বলে দিলেন, 'জাম গাছে ফলবে শিম।'

'খাসা! খাসা! স্বাগত! সুস্বাগত!'

দরজা খুলে গেল। ছোটমামা বললেন, 'আলো নেই কেন? আলো জ্বালুন।'

'যতবড় কবি তুই হোস্‌না
যদি না বাসিস ভালো জোস্‌না
থেকে যাবে কত আফসোস না।
তাই বলি চুপ করে বোস্‌ না।'

ভদ্রলোক বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালা গলিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল। আবছা দেখা যাচ্ছিল ওঁকে। ঢ্যাঙা, বড় বড় চুল, পরনে পাঞ্জাবী পাজামা। হাতে একটা বই বা মোটা খাতা। পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'এই পদ্যটা আরও ভাল।'

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল
সারসপাখি লম্বা ঠোঁটে হাড় তুলিয়া দিল
পুরস্কার চাইলে পরে বাঘ রাগিয়া কহে,
মুন্ডখানা ফেরত পেলি তা-ই যথেষ্ট নহে?'

পাশের ঘর থেকে কেউ বিটকেল গলায় ডাকল, ঘোঁত্‌না! অ্যাই ঘোঁত্‌না! কাকে পদ্য শোনাচ্ছিস?'

'মানুষকে।'

'কয় জন মানুষ?'

'দেড়জন।'

'ধুস্‌! পোষাবে না।'

ছোটমামা বললেন, 'কে উনি?'

কবি ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার দাদার ওই এক স্বভাব। খালি খাই খাই।'

'খাই খাই মানে?'

'দাদার খুব খিদে আর কী! যাক্‌ গে। এই পদ্যটা পড়ি।...'

সেই সময় বাইরে ডাকাডাকি শোনা গেল, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু! ছোটবাবু!'

কবি খাপ্পা হয়ে দরজা খুলে বললেন, 'কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন রে ভুতো?'

'আমার প্যাসেঞ্জার হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'কয় জন?'

'আজ্ঞে দেড়জন।'

ছোটমামা আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন। 'চলে আয় পুঁটু!'

রিকশওয়ালা আমাদের দেখেই বলে উঠল, 'সর্বনাশ! কোথায় ঢুকেছিলেন আপনারা? চলে আসুন। চলে আসুন। এ বাড়ির বড়বাবুর বেজায় খিদে।'

আমরা তিনজনে দৌড়চ্ছি। পেছনে কবির করুন আর্তনাদ কানে আসছে, 'অত ভাল পদ্যখানা শুনে গেল না। আমার যে আবার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে গো। ও হো হো হো...'

ছোটমামা রাস্তার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওহে রিকশওয়ালা! ওরা সব নেই তো?'

রিকশওয়ালা হাসল। 'নাহ্! ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন না?'

ছোটমামা কান করে শুনে বললেন, 'হুঁঃ!'

আমি তেমন কোন শব্দ পেলুম না। তবে বাতাসে গাছপালা খুব নড়ছে। নানারকম শব্দও হচ্ছে বটে। কিন্তু ভোঁস ভোঁস নয়। শোঁ শোঁ শন শন সর সর খড় খড়। কে জানে বাবা কী।...

এবার আর কোনও গন্ডগোল হল না। আমাদের গাঁয়ের মোড়ে পৌঁছে দিয়ে রিকশওয়ালা ভাড়া মিটিয়ে নিল!

ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন গাছে থাক হে?'

রিকশওয়ালা বেজায় হেসে বলল, 'আমি কেন গাছে থাকতে যাব বাবুমশাই? আমার কি ঘরদোর নেই? নামটাই না হয় ভুতো। রাতবিরেতে রিকশ চালাই বলেই তেনাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে।'

ছোটমামা সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'তুমি মানুষ?'

'আজ্ঞে, ষোলআনা মানুষ।' বলে সে শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় রিকশ চালিয়ে কালো হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল।

প্রান্তিক

দেশ বিভাগের অল্প কিছুদিন পরের ঘটনা। তখনও এদেশ-ওদেশ যাওয়া আসায় পাসপোর্টের ব্যাপার বা কোন কড়াকড়ি ছিল না। খুলনা থেকে ছোটমামা লিখেছিলেন——রুনুকে অবশ্য করে পাঠাবে একবার। ওতো বেশ কয়েকবার এসেছে এখানে। পথঘাট ভালোই চেনে। ও এলে তবে ওর সঙ্গে আমার যাওয়া সম্ভব হবে। সঙ্গে মোটঘাট অল্প কিছু থাকবে। বুড়ো মানুষ—একা সব সামলাতে পারব না।

ছোটমামা পুনশ্চ দিয়ে ফের লিখেছিলেন—আমি এ বয়সে আর এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকবার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। তোমরা সবাই চলে গেলে; কেবল আমি পড়ে রইলুম। অবশ্য এর জন্য তোমরা দায়ী নও। ভেবেছিলুম, পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটে ত্যাগ করে কোথাও যাবো না। কিন্তু এখন বড় একা লাগে। মনে জোর পাই না। সুতরাং...

চিঠি পেয়ে বাবা খুব একচোট হাসলেন। মাকে বললেন—তোমার দাদাটি যে বেজায় ফাঁপরে পড়েছেন। এবার উদ্ধার করে নিয়ে এসো গে।

মা বললেন—তুমি তো হাসবেই। তখন অমন করে বললুম, তুমি নিজে একবার যাও—ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে কে দেখে। বৌদি বেঁচে থাকলে কি এ বয়সে ওঁর এত কষ্ট হ'ত, না তোমাকে লিখতেন?

বাবা রেগে গেলেন তৎক্ষণাৎ।—বাঃ, ধনসম্পত্তির মায়া ক টিয়ে উনিই তো আসতে চাননি এতদিন! আমার দোষ দিচ্ছ কেন? রুনুকে কতবার পাঠালুম—উনি তো আসতেই চাইলেন না।

কথা কাটাকাটি আরও কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু আমি হইচই বাধিয়ে বসলুম। বললুম, বাবা, আমি চললুম।

বাবা চোখ পাকিয়ে বললেন—চললুম মানে? রামপাল কি এখানে? সুন্দরবনের কাছে। চললুম বললেই হল? আমাকে ভাবতে দে। ছেলে মানুষ—পথেঘাটে আজকাল কত আপদ বিপদ ঘটছে...

মা জোর পেয়ে বললেন—রুনু তো তোমার মত আলসে ঘরকুনো নয়। বেশ, তুমি যদি ওকে না পাঠাও, আমি পাঠাচ্ছি। এই রুনু, শোন্—এদিকে আয়।

বাবা ধমকালেন—খবরদার রুনু, যেতে হয় আমি যাবো। তুই থাম্।

মা এসে হাত ধরলেন—না, রুনু যাবে।

দোটানায় পড়ে ঘামতে লাগলুম। জানতুম, বাবা এইবার বলবেন—পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় চৌদ্দ-বছর বনবাসে গিয়েছিলেন। আর তুই কুপুত্র রুনু—

কিন্তু শেষ অব্দি দেখা গেল, উনি আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে বললেন—শীতের সময়। জামাকাপড় ঠিকমতো যা যা লাগে সঙ্গে নিবি। ও তো কলকাতার শীত নয়, সুন্দরবনের নদীর আশেপাশে যে শীত পড়ে—তাতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারগুলো বন ছেড়ে গেরস্থবাড়ির উনুনে আগুন পোয়াতে আসে। সাবধান।

মা যে আমাকে ছোট মামার নেওটা হয়ে থাকতে বলেন, তার কারণ আমি জানতুম। ছোট মামার প্রচুর ধনসম্পত্তি। একা মানুষ। তাতে পরম বৈষ্ণব। স্বপাকে আহার করেন। অহরহ মন্ত্র জপ আর হরিনাম শুনে ক্রন্দনও কম করেন না। বাবা ঘোর শাক্ত। ছোট শ্যালক তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। তবু দেখেছি—তাঁকে সামনাসামনি "ফোঁটা তেলকধারী বিড়াল তপস্বী" বলতেও মুখে বাধে না। তাই, স্পষ্ট বুঝতে পারতুম—বাবাকে এড়িয়ে বাবার পুত্র অর্থাৎ এই রুনুকেই বেশ আমল দিতে চাইতেন ছোট মামা। দরকার হলে আমাকেই যেতে লিখতেন।

খুলনার দক্ষিণে সুন্দরবন। রামপাল সেখান থেকে মোটে তিন মাইল দূরে। মুংলী নদীর ধারে বেশ ছোটখাটো বাজার জায়গা। নদীটাও বড়। মাইলটাক গিয়ে আরও চওড়া একটা নদী "পশরের" সঙ্গে মিশেছে। পশরের ওপারই আসলে সুন্দরবনের আরম্ভ। আর বিশেষ করে শীতের সময় দিগন্ত জোড়া অথৈ জলের উপর নৌকায় বসে কী অদ্ভুত নেশা ধরে যায় চোখে, তা যে না দেখেছে, সে বুঝবে না। যেদিকে তাকাই শুধু শান্ত জল—তাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নীলাভ কুয়াশা উড়ছে। দূরে—অনেক দূরে কোথাও কালো রেখার মত গাছ পালার আভাস। কাছে গেলে মনে হয় কুয়াশার টুপি চাদর পরে একদল বুড়োমানুষ রোদ পোহাচ্ছে। অজস্র নৌকা আসা যাওয়া করছে ওই পথে। জেলে যাচ্ছে মাছ ধরতে। কাঠের সন্ধানে চলেছে গ্রাম্য কাঠুরিয়ারা। গ্রীষ্মে মৌমাছির মধু সংগ্রহে যায় বাওয়ালীরা। সব মিলিয়ে একটা প্রাণচঞ্চলতা আছে। কিন্তু অথৈ জলের জগতে কুয়াশার ধূসরতা আর রোদের ইন্দ্রজালে যে অপরূপ প্রশান্তি—তাতে কোন শব্দই শব্দ বলে মনে হয় না। আকাশে পাখির ঝাঁক ওড়ে। পাখি ডাকে। আমার মনও তাদের সঙ্গে ডানা মেলে দিয়েছে।

একটা স্বপ্নের মত সেই মধুর স্মৃতি আমকে আচ্ছন্ন করত। তাই ফের যাবার সুযোগ এলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম একেবারে।

আমাকে দেখে তো ছোটমামা আনন্দে-আবেগে হেসে-কেঁদে অস্থির। বারবার ছুঁয়ে দেখেন আর বলেন—সত্যি তো, না স্বপ্ন দেখছিরে রুনু?

আমি বললুম,—হ্যাঁ ছোটমামা। সত্যি আমি।

ছোটমাম পরদিনই আমার সঙ্গে চলে আসবার সাজগোজ শুরু করে দিলেন। জমিজমা ইতিমধ্যে বিক্রি করে ফেলেছেন। ধানচালের ব্যবসাও গুটিয়ে দিয়েছেন। শুধু বাস্তু-ভিটেটার কিনারা করতে পারেননি তখনও। দামে পোষায়নি। বললেন—আর একবার এসে ব্যবস্থা করা যাবে। একজন বিশ্বাসী লোককে দেখাশোনার ভার দিয়ে যাচ্ছি।

বেশ বুঝলুম, ছোটমামার সঙ্গে অনেক টাকা রয়েছে। আমার একটু ভয় করছিল। এদেশে জলপথে প্রায়ই ডাকাতি হয়। পথে কোন বিপদ ঘটবে কিনা কে জানে। কিন্তু দেখলুম, ছোটমামা সেটা আমার চেয়ে বিলক্ষণ বেশীই জানেন। চাপা গলায় বললেন—এখান থেকে সরাসরি খুলনা অব্দি গহনা-নৌকো যায়। ওতে বিপদের ভয় আছে। ডাকাতরা অনেক সময় যাত্রী সেজে আগাম চেপে বসে থাকে।

আমি বললুম—তাহলে যাবেন কিসে?

ছোটমামা ফিক করে হেসে বললেন—সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিছু ভাবিসনে।

ব্যবস্থাটা পরে দেখে মনে মনে ছোটমামার বুদ্ধির প্রশংসা করলুম। স্থানীয় কাঠগোলার এক মুসলমান ব্যবসায়ী মামার বন্ধু। তার একটি সুন্দর তিন কামরার পানসি নৌকো আছে। ভদ্রলোক তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খুলনা শহরে কোন আত্মীয়-বাড়ি যাচ্ছেন বেড়াতে। ছেলে দুটি আমারই সমবয়সী প্রায়। ফরিদ ও শহীদ তাদের নাম। দুজনেই বাগেরহাট কলেজে পড়ে। একজন ফার্স্ট ইয়ার, অন্যজন সেকেন্ড ইয়ার। শহীদ বড়, ফরিদ তার বছর খানেকের ছোট। কিন্তু দুটিতে বেশ ভাব। আমার সঙ্গেও ভাব হতে দেরী হল না অবশ্য। বিকেলে আমরা ছোট নৌকোয় অনেক দূরে ঘুরে এলুম। ওরা সুন্দরবনের অনেক গল্প শোনাল। ফরিদ বলল—একবার পানসীর ছাদ থেকে খালের পাশে একটা বাঘ দেখেছিল, তার মাথাটা ঢাকের মতো বড়। শহীদ বলল—গত বছর একটা সাপ মেরেছিলাম বন্দুকে। দশ ফুট লম্বা, চওড়া ঢেঁকির মতো। গাছের ডালে বেড় দিয়েছিল।

বললুম—বা রে! তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পারো বুঝি?

শহীদ বলল—হ্যাঁ। আমাদের বন্দুক আছে। আজই দেখতে পাবে সেটা। তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পারো না?

বললুম—না। তবে দেখিয়ে দিলে শিখতে কতক্ষণ?

শহীদ বলল—ঠিক আছে। পথে যেতে যেতে শিখিয়ে দেব। দেখবে কী মজা।

এ অঞ্চলের নদীতে দু-বেলা জোয়ার ভাঁটা বয়। সকালে দেখি, নদীর জল বেড়ে কানায় কানায় ভরতি। কদিন থেকে উত্তরে স্রোত বইছে। দুপুরে আবার দেখি, সেই জল নদীর বুকে নেমে গেছে। দু-দিকে পচা পাঁক থক থক করছে। আর জলের স্রোত একেবারে উল্টো—উত্তর থেকে দক্ষিণে। কী তীব্র স্রোত। তবে সাঁতার কাটা যাবে না কিন্তু। নদীতে কুমীর আর কামট মাছের ভীষণ উপদ্রব। কামট হাঙরের গড়নে একরকম মাছই বটে। কিন্তু দাঁত করাতের চেয়েও ধারালো। নিঃশব্দে জলের নীচে কট্ করে হাঁটু থেকে কেটে নিতে ওস্তাদ। ভয়ে কেউ নদীতে নামে না।

সন্ধ্যার জোয়ারে আমাদের যাত্রা হল শুরু।

নৌকোটা বেশ বড়। সাদা রঙ। শ্বেত ময়ূরপঙ্খী যাকে বলে। ছোটমামা হালের দিকে অর্থাৎ পেছনের ছোট কামরাটা বেছে নিলেন। ধার্মিক মানুষ, তার ছোঁয়াছুঁয়ির বড্ড বাতিক। তবে কামরাটা এত ছোট যে, মাথা ঠেকে যায় বসে থাকলেও। কোন রকমে শোয়া যায় মাত্র। দু'পাশে দুটি গরাদবিহীন জানালা। শীতের ভয়ে ঠেসে বন্ধ করা। ছোটমামার মাথায় পুরু পশমী হনুমানটুপি, গায়ে একটা তেমনি মস্ত ওভারকোট। তার উপর একটা ভারী র‍্যাগও চড়ানো। পায়ে গরম মোজা, হাতে দস্তানাও পরেছেন। ওই অবস্থায় গায়ে লেপ চাপালে ছোটমামাকে মনে হল যেন আত্মগোপন করার জন্যে পাতাল-প্রবেশ করলেন। আমি অনুমান করেছিলুম, টাকাপয়সাগুলো কোথায় রাখতে পারেন ছোটমামা—নাকি পেটের মধ্যে আত্মসাৎ করেছেন? ছোট দুহাত লম্বা দরজাটা আমিই টেনে বন্ধ করে দিলুম। ছোটমামা শুয়ে শুয়ে মন্ত্র জপ করতে থাকলেন সম্ভবত।

মধ্যের কামরাটা কিছু লম্বা চওড়া। তবে পাটাতন নেই। দু-পাশে দুটি চওড়া বেঞ্চ, মধ্যিখানটা একেবারে নৌকোর খোলের মধ্যে নেমে গেছে। অবশ্য সেখানে দুখানা তক্তা পাটাতনের কাজ করছিল। আমাদের শোবার সমস্যা সমাধান করতে হল। একপাশের বেঞ্চে শুলো শহীদ, অন্য পাশটায় আমি। ফরিদ মোটাসোটা গোলগাল আলুর পুতুলটি। সে বলল—আমি তোমাদের মাঝখানে বিছানা পাতলুম।

দাঁড়ের দিকের ঘরখানায় ফরিদের বাবা রয়েছেন। সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র। তাঁর কাছেই বন্দুকটা রয়েছে। বললেন—ঘুমিয়ে পড় সব। সকালে পৌঁছে যাব।

নৌকোয় তিনজন মাঝি। দুজন দাঁড়ে, একজন হালে। হালের লোকটি বসে বসে হুঁকো খাচ্ছিল। তার একটানা গুড় গুড় শব্দ কানে আসছিল। বাইরে চাঁদের আলো। কুয়াশা জমেছে নদীর আকাশে। সব একাকার হয়ে গেছে কুয়াশায়। আর অমন হাঁড় কাঁপানো শীত আমি জীবনেও টের পাইনি। গল্পগুজব করতে করতে

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তারপর। ঘুমের ঘোরে কানে আসছিল দূরে কোন নৌকায় মাঝি ভাটিয়ালি গান ধরেছে শীতের রাতে। ভারী সুন্দর লাগে। জোয়ারের স্রোতে নৌকো নিঃশব্দে চলেছে। কেবল একটানা শোঁ শোঁ শব্দ শুধু।.....

কী একটা স্বপ্ন দেখছিলুম যেন। শহীদ একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার মেরেছে। সেই বাঘটা হঠাৎ জীবন্ত হয়ে দৌড়ে আসছে। সর্বনাশ, বড় বড় লাল ভাঁটাব মত চোখ...

...উঃ, গেছি রে বাবা!

এই রকম একটা আচমকা আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে কী ঘটল বুঝতে পারলুম না। পরক্ষণেই গোঁ গোঁ করে কে গোঙিয়ে উঠল, তারপর ধুড়মুড় করে অস্পষ্ট জাপটা-জাপটি করছে কারা, নৌকোটা বেজায় দুলছে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়েছি নীচে। আর তক্ষুণি গাঁক করে আওয়াজ। তারপর...ওরে বাপ রে মেরে ফেললে রে...

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে আচমকা। সে হট্টগোলেব তুলনা নেই। মাঝিরা একসঙ্গে বিকট চেঁচাচ্ছে বাইরে। শহীদের বাবা বন্দুক ছুঁড়ছেন গুডুম গুডুম করে। তিনিও চেঁচাচ্ছেন—মার, মার কখনও বলছেন—বাঁচাও, বাঁচাও। ফের বন্দুকের শব্দ।

নীচে খোলের মধ্যেই পড়েছি তাহলে। মুট্‌কা ফরিদ বেচারীর পেটের ওপর একেবারে। আলোটাও ছাই কখন নিভে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে আমরা যেন মল্লযুদ্ধ করছি পরস্পর। লেপে কম্বলে জড়িয়ে গেছি ফরিদের সঙ্গে। ফরিদ গোঁ গোঁ করে চেঁচাচ্ছে আর আরও জোরে জাপটে ধরছে আমাকে। তখন আমিও চেঁচাচ্ছি। শহীদের গলাও শুনতে পাচ্ছি মধ্যে মধ্যে।—ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে!

মাত্র এক মিনিট সময় লাগল এটুকু ঘটতে। বীভৎস চেঁচামেচি আর্তনাদ হৈ-হল্লা। তারপর হড়াম করে দরজা খুলে টর্চ জ্বালল কে। অমনি আমরা চুপ। সে-আলোয় দেখলুম আমরা তিনটিতে পরস্পরকে জাপটে ধরে বসে রয়েছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছি।

টর্চের আলো ফেলেছিলেন শহীদের বাবা। বললেন—ব্যাপার কী?

শহীদও বিড়বিড় করে বলল—কী জানি!

আলো জ্বালা হল। মাঝিরাও থেমেছে ওদিকে। তারাও এতক্ষণে পরস্পর প্রশ্ন করছে—ব্যাপার কী?

ব্যাপার তারপরই বোঝা গেল। নাঃ, ডাকাত পড়েনি। আসলে ঘুমের ঘোরে একটা মজার হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেছে। বোধ করি নৌকোটা পার ঘেসে যেতে যেতে

ছক্কা মিয়ার টমটম

এ মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কামিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড় বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশমাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড় বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে এক চিলতে টিমটিকে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর এগিয়ে আসবে মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং... টং লং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি—তেরপলের চৌকো একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়ানো এক টাট্টু!

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল চালিয়ে চৌকা টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবার টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম—টং লং...টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম' থেকে— যে গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেতো। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কামিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটা কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিঙটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রঙ রোদপোড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড়জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না। কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কা মিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে বেড়ায়। রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।..

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না—আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কা মিয়ার টমটম আছে। বাপ্‌স্‌!'

ওই টমটমে কখনও চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে তাই না ছোটমামা?'

ছোটমামা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মজা হবে। বুঝবে ঠ্যালাটা'খন।'

ঠ্যালাটা কিসের বুঝলাম না আগেভাগে। দেখলাম, ছোটমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড়বৃষ্টি হবে। কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলাম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না। ছ্যা ছ্যা, আমার কী আক্কেল!'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড়বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটমামা টমটমের পেছনদিকে তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী? উঠে আয়। এখুনি একগাদা লোক এসে ভাল জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটমামা পর্দাটা ফাঁকা করে রাখলেন। একটু পরে আরও জনাদুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরেই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম। হল তো?'

ছক্কা মিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা! এবার রওনা দিই।' তার ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চি হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলাম কেন ছোটমামা 'বাপ্‌স্‌' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপ্‌স্‌'। হাড়গোড় মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে যাবার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কামিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজী হয়ে উঠছে। একটু পরেই দড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টোপরের তেরপলে পড়তে শুরু করল। ছোটমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেল লাইন পেরুলে দুধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়বৃষ্টিটা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলছে। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ টং লং ..টং লং... টং লং। কখনও ছক্কা মিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁ হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তাবিক্ষ করে' আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষি-রাজের বাচ্চা!'

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামা-কাপড়। একসময় ছোটমামা বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন,'আঃ! হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?'

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমাব ওপর পড়লেন?'

'কী বাজে কথা বলছেন? আমায় ঠাণ্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?'

'আমি বরফ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠান্ডা! হাড় অব্দি জমে গেল দেখছেন না!'

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিকখিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, 'ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিযম। খিক্ খিক্ খিক্ খিক্।'

এমন বিদঘুটে হাসি কখনও শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাসপ্রশ্বাসও যে বরফের মতো হিম। বললুম, 'ইস। একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠাণ্ডা করে যে!'

লোকটা ভারি অদ্ভুত! সে ওই বিদঘুটে খিক্ খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছোটমামা। ছোটমামা!'

কিন্তু ছোটমামার কোন সাড়া পেলাম না। টোপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, ছোটমামা! কোথায় তুমি?

লোকটা সেই খিক্ খিক্ হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটমামা বড়মামা। মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটমামাকে খুঁজলুম। স্যুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু ছোটমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকছে। আমি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললাম, 'ছক্কা মিয়া। ছক্কা মিয়া। গাড়ি থামাও। গাড়ি থামাও।'

পেছনের সওয়ারী ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও গাড়ি থামাও বলছি!'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই?'

'ছোটমামা পড়ে গেছেন কোথায়।'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই ষাট! পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না।'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কিনা বলো!'

'সামনে একটা মন্দির আছে। সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক নেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে-সেখানে থামলে ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই। বুঝলেন না? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলাম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লাম। বুদ্ধি করে ছোটমামার সুটকেস আর আমার কিটব্যাগটাও দুহাতে নিয়েছিলাম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়তে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া!

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট শার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কি!

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে কে?'

ছোটমামার সাড়া এল। 'অন্তু নাকি রে?'

আমি কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ! তোমার কী হয়েছিল ছোটমামা? ছোটমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার। যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনো ছক্কামিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটমামা আমার কাছে সুটকেস দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?'

হাসলেন ছোটমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনও? ওটা কি লোক নাকি?'

'তবে কে?'

'বুঝলিনে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। থাকগে, এখন রাতবিরেতে ও নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কি জানিস অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু-একজন সওয়ারি ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়েছি।'

'তারপর? তারপর ছোটমামা?'

'তারপর আর কী? ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা সব এ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুঁড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোন বাজ পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে।' ছোটমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিঙড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঘন্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিঙড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা মুছে ফেল। বাপ্‌স্!

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়, সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল? অন্য লোকটার মতো?

আমার মুখ দিয়ে ছোটমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপ্‌স্!.'

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম, লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিঃঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চা-ওলা সবে ঝাঁপ ফেলার যোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই তাহলে যাবেন কিসে গদাইতলা?'

'কিসে আর যাব? বরং দেখি যদি ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটানো যায়।'

চাওলা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। সেবার ঝড়বৃষ্টি ছিল কম। ছোটমামা বড় গপ্পে মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরী। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে একটুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটমে চড়তে বলল।

আজ আর কোনো সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি ভড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমন-কী ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায়নি। আর সে অদ্ভুত ঘন্টার শব্দ, টংলং...টংলং...টংলং!

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়সড় হয়ে কোণা ঘেঁসে রইলুম। সামনেকার মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশামাখানো জ্যোৎস্নায় ঝিমধরা মাঠঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাছতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে; আর মাথায় পড়েছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তালগাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো!' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমতো সামনে দু'ঠ্যাং তুলে একখানা চিঁ-হি ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনলুম। 'দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম।'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টোপরেব ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'কে? কে?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা। সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখিনি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল। তাই দেখেন নি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?'

বঙ্কুবিহারী রায়।'

'আসামী ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?' ওঁকে খুশি করার জন্যেই বললুম।

বংকু দারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম! ব্যাটা এক দাগী বেগুন চোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুনক্ষেতে দুজন সেপাই নিয়ে ওত পেতেছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তালগাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না। তখন সেপাই দুজনকে তালগাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগী বেগুন চোর এই শীতকালে সারারাত তালগাছের ডগায় বসে আছে! কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দুজনের কথা ভেবে আমার উদ্বেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা'।

'আহা মানে?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বঙ্কু দারোগা বললেন, 'হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এতরাতে চাপলেন যে! আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটেনা বলে ছক্কা মিয়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে!'

'বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে...' কথা কেড়ে বঙ্কু দারোগা বললেন, 'হয়তো জেনেশুনেই চেপেছেন। কিচ্ছু বলা যায় না।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিপসে বাসি মড়ার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না কি না।'

এবার আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই!'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত!'

বঙ্কু দারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপ্‌স্! এযে বেজায় ঠাণ্ডা!'

'ঠাণ্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?'

'না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সিঁদেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠাণ্ডা ছিল না।'

'কী? আমায় সিঁদেল চোর বললেন!'

বঙ্কু দারোগা গলার ভেতর বললেন, 'সিঁদেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে চেঁচালুম, 'পুলিস হোন, আর যাই হোন,

আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।'

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন, 'উঁ হুঁ হুঁ। বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন। সরে বসুন বলছি।'

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই বা সহ্য হয়। 'টর্চ নেভান' বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধ হয় ভুল হল। আর বন্ধু দারোগা বিকট গলায় 'ভূত। ভূত!' বলে চিক্কুর ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টোপরের একপাশের জরাজীর্ণ তেরপলের ওপব কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। পলকের জন্যে দেখলুম কুয়াশা-ভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে চলে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টং লং.. টং লং .টং লং..।

ভাগ্যিস, রোডস দফতবের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেবিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওবা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, 'কী বলছেন বাবু? ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে! ভাগ্যিস, টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ধারে গিযেছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিযে ভালয় ভালয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।'

বন্ধু দারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কি ঘটল কে জানে! আহা বেচারা!

কি ঘটল, তা পরদিন শুনলুম। বন্ধুবাবু তখন হাসপাতালে। লোকে বলছে, আসামী ধবতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙ্গেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশন বাজারের সেই ধড়িবাজ চা-ওলা। কেমন হেসে বলেছিল 'ছক্কামিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।' সব জেনে শুনেও কী অদ্ভুত বসিকতা।

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন?' 'আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ!'.....

জ্যোৎস্নারাতের আপদ-বিপদ

ছোটমামার সঙ্গে পাশের গ্রামে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম। যাত্রার আসর ভাঙল, তখন অনেক রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ছোটমামা বললেন, "এত রাতে আর বাস পাওয়া যাবে না। আয়, বরং হাঁটাপথে শর্টকাট করি।"

পিচের রাস্তা থেকে ছোটমামার পিছন-পিছন মাঠে নেমে বললুম, "পথ কোথায় ছোটমামা? আপনি যে হাঁটাপথ বলছেন?"

ছোটমামা সবে গুনগুন করে কী গান ধরেছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, "দিলি তো মুডটা নষ্ট করে। হাঁটাপথ বুঝিসনে? যেখান দিয়ে তুই হাঁটবি, সেটাই হাঁটাপথ। চুপচাপ চলে আয়।"

নির্জন মাঠে হুহু করে বাতাস বইছে। এদিকে-ওদিকে দু-একটা গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শনশন শব্দে ডালপালা দুলছে। ছোটমামার গানের মুডটা ফিরে এসেছে। এবার গলা ছেড়ে গান ধরেছেন। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সুরটা চেনা ঠেকছিল। ছোটমামা তা হলে যাত্রার আসরে শোনা বিবেকের গানই গাইছেন। একটু পরে আমরা একটা দিঘির পাড়ে পৌঁছলুম। অনেকগুলো তালগাছ সেখানে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলো অদ্ভুত শব্দে নড়ছে। হঠাৎ কে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "কী হে ছোকরা, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে?"

কেমন খ্যানখেনে গলার স্বর। ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "অদ্ভুত তো! ঘর ছেড়ে দিঘির পাড়ে ঘুমোতে এসেছ। কে হে তুমি?"

"আবার তুমি বলা হচ্ছে? ভারী বেয়াদপ ছোকরা দেখছি।"

ছোটমামা একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, "আপনি কোথায় ঘুমোচ্ছেন?"

"তালগাছের ডগায়।"

এতক্ষণে টের পেলুম, সামনে একটা তালগাছের মাথা থেকে কেউ কথা বলছে। ছোটমামা হাসতে-হাসতে বললেন, "তালগাছের ডগা কি ঘুমোনোর জায়গা?" ঘুম পেলে বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।"

"এটাই তো আমার বাড়ি।"

"তার মানে?"

"মানে আবার কী? যাও, বিরক্ত কোরো না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

বিকট হাই তোলার শব্দ শোনা গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ছোটমামা গোঁ ধরে বললেন, "এর একটা এস্পার-ওস্পার না করে যাব না।

তালগাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে বলে তো শুনিনি। গাছের তলায় অবশ্যি অনেক মানুষকে ঘুমোতে দেখেছি। ও মশাই? শুনছেন?"

"জ্বালাতন! শোনা হে ছোকরা, এখনই কেটে না পড়লে বিপদ হবে বলে দিচ্ছি।"

ছোটমামার হাত ধরে টেনে বললুম, "আমার বড্ড ভয় করছে। চলুন ছোটমামা।"

ছোটমামা রেগে গিয়ে বললেন, "তুই বড্ড ভিতু ছেলে দেখছি। ব্যাপারটা তোর গোলমেলে মনে হচ্ছে না? তালগাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে? লোকটা নিশ্চয় চোর। পুলিশের ভয়ে ওখানে লুকিয়ে আছে।"

এবার ওপর থেকে হুঙ্কার শোনা গেল। "কী বললে! কী বললে? আমি চোর? আমি পুলিশের দারোগা বঙ্কুবিহারী ধাড়া। আমাকে চোর বলা হচ্ছে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা।"

তালগাছের ডগায় পাতাগুলো প্রচণ্ড নড়তে থাকল। এবার ছোটমামা হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। চাপা স্বরে বললেন, "দরকার হলে দৌড়তে হবে। রেডি হয়ে থাক।"

দৌড়নোর দরকার হল না। বঙ্কুবিহারী ধাড়ার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না আর। কিছুটা চলার পর ছোটমামা বললেন, "ব্যাপারটা বড্ড রহস্যজনক। বুঝলি পুঁটু? আমাব ধারণা, দারোগাবাবু কোনও চোরকে ধরার জন্যে ওখানে লুকিয়ে আছেন।"

ছোটমামার কথা শেষ হওয়া মাত্র কে চাপা স্বরে বলে উঠল, "কোথায় লুকিয়ে আছেন দারোগাবাবু?"

চমকে উঠে দেখি, সামনে একটু তফাতে কেউ সদ্য উঠে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় চেহারাটা আবছা কালো। ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "কে, কে?"

"আজ্ঞে আমি।"

"আমি মানে কী? তোমার নাম?"

"নাম শুনে কী হবে? দারোগাবাবু কোথায় লুকিয়ে আছেন বলুন।"

ছোটমামা কিছু বলার আগে আমি বলে দিলুম, "দিঘির পাড়ে একটা তালগাছের ডগায়।"

অমনি ছায়া-কালো লোকটা বলে উঠল, "ওরে বাবা! আমি তো ওখানেই ঘুমোতে যাচ্ছিলুম। সর্বনাশ!"

বলেই সে উধাও হয়ে গেল। ছোটমামা হেসে ফেললেন। "এই লোকটাই

চোর। বুঝলি তো পুঁটু? একে ধরার জন্যই দারোগাবাবু ওখানে ওত পেতেছেন।"

বললুম, "কিন্তু উনি তো ঘুমোচ্ছেন বললেন! নিজের বাড়িও বললেন!"

"ধুর বোকা! পুলিশের কথা ওইরকমই। আসল কথাটা বললে চলে? চোর সাবধান হয়ে যাবে না?"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোর সাবধান হয়ে গেল তো?"

ছোটমামা গুম হয়ে বললেন. "আমার কী দোষ? চোর যে এখানে লুকিয়ে আছে, জানতুম নাকি?"

আবার দুজনে হাঁটতে থাকলুম। ছোটমামার গানের মুডটা চলে গেছে মনে হচ্ছিল। চুপচাপ হাঁটছেন আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। বরাবর দেখেছি, ছোটমামার সঙ্গে রাতবিরেতে বেরোলে বড্ড গোলমেলে কাণ্ড হয়। আমার গা ছমছম করছিল। ছোটমামাকে এদিক-ওদিকে তাকাতে এবং কখনও হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে কান করে কিছু শুনতে দেখছিলুম। জিজ্ঞেস করলে জবাব দিচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পবে ফের উনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "শোন পুঁটু! কথাটা মনে আছে তো? দরকাব হলে দৌড়ুনোর জন্য রেডি থাকতে হবে।"

ভয়ে ভয়ে বললুম, "আবার দৌড়ুতে হবে কেন ছোটমামা?"

"কিছু বলা যায় না! সামনে কালোমতো যে গাছটা দেখছিস, ওটা জটাবাবার থান। একবার এমনি রাত্তিরে ওখানে জটাবাবার পাল্লায় পড়েছিলুম। ওঃ! সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড।"

আরও ভয় পেয়ে বললুম. "তা হলে ওখান দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না ছোটমামা।"

ছোটমামা পা বাড়িয়ে বললেন, "আয় না দেখি কী হয়। সেবার আমি একা ছিলুম। এবার দু'জনে আছি। জটাবাবা আমাদের ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।"

"জটাবাবা কে, ছোটমামা?"

"একটা বুড়োমতো লোক। মাথায় প্রচুর জটা।"

"সে ওখানে কী করে?"

"বললুম না ওখানে ওর থান আছে? দিনের বেলা লোকেরা এসে ওখানে মানত করে। ঢাকঢোল বাজিয়ে জটাবাবার পুজোও দেয়। তবে দিনের বেলা জটাবাবা কাকেও দেখা দেয় না।"

"দিনের বেলা জটাবাবা কোথায় থাকে?"

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "চুপচাপ আয় তো। জটাবাবা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি।"

গাছটা প্রকাণ্ড। তলায় ঘন ছায়া। বাতাসে ডালপালা কেমন অদ্ভুত শব্দ

করছিল। ছোটমামা আবার একটুখানি দাঁড়িয়ে গাছটাকে দেখে নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "রেডি, স্টেডি, গো-ও!"

ছোটমামার পিছন-পিছন গাছটার তলায় যেই গেছি, আমার মাথায় কী একটা ঠেকল। চমকে উঠে হাত তুলে দেখি, একটা পা। বারণ ভুলে চেঁচিয়ে উঠলুম "ছোটমামা! ছোটমামা!"

"ধ্যাত্তেরি! চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? বললুম চুপচাপ চলে আয়।"

"একটা পা। বড্ড ঠাণ্ডা, ছোটমামা।"

"চলে আয় না হতভাগা।"

"আমাকে যেতে দিচ্ছে না যে।" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম। বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা পা আমার গলা আঁকড়ে ধরে আছে। দু'হাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলুম দম আটকে যাচ্ছিল।

ছোটমামা কাছে এসে বললেন, "কই, কোথায় পা?"

"আমার গলায়।"

ছোটমামা সেই ঠাণ্ডা ঝুলন্ত পা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। খুব জোরে পায়ে চিমটি কেটে দিলুম। অমনি পাটা গলা থেকে সড়ে গেল আর কে ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল. "উহুহুহু! গেছি গেছি! কী বিচ্ছু ছেলে রে বাবা!"

আমিও সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম. "ছোটমামা। টানুন। দু'জনে টেনে নামাই জটাবাবাকে।"

ছোটমামাও তৎক্ষণে সাহসী হয়ে উঠেছেন। দু'জনে ঠাণ্ডা পা ধরে টানতে থাকলুম। জটাবাবা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ডালে বসে থাকার বিপদ ... র পেল এতক্ষণে কাকুতিমিনতি করে বলতে থাকল, "ঘাট হয়েছে বাবারা। ছেড়ে দে। উহুহুহু, বড্ড ব্যথা করছে রে!"

ছোটমামা পা ছেড়ে দিলেন। আমিও ছেড়ে দিলুম। তারপর ছোটমামা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, "কী জটাবাবা? সেবার তো আমাকে একা পেয়ে খুব ভয় দেখিয়েছিলে? এবার আর ভয় পাচ্ছি না। কই, নেমে এসো। দেখি তোমার কত বুজরুকি।"

গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। ওপরের ডালে জটাবাবাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। পায়ে হাত বুলিয়ে "আহা-উহু" করছে। মাথার প্রকাণ্ড জটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে। ছোটমামার চ্যালেঞ্জ শুনে কোনও জবাব দিল না। চিমটিটা খুব জোর হয়ে গেছে—তা হলে।

বললুম, "আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। চলুন ছোটমামা।"

ছোটমামা বীরদর্পে হাঁটতে থাকলেন। বললেন, "তোর বুদ্ধি আছে পুঁটু। খুব জব্দ হয়ে গেছে জটাবাবা।"

"জটাবাবার পা অত ঠাণ্ডা কেন ছোটমামা?"

"ঠাণ্ডা হবে না? জটাবাবাকে তুই জ্যান্ত মানুষ ভেবেছিস নাকি?"

চমকে উঠে বললুম, "জ্যান্ত মানুষ নয়? তা হলে কী?"

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "বাড়ি ফিরে বলবখন। রাতবিরেতে নিরিবিলি জায়গায় ওসব কথা বলতে নেই।"

এবার ছোটমামার মনে সাহস জেগেছে। তাই যাত্রাদলের বিবেকের সেই গানটা গাইতে শুরু করলেন। কিছুটা চলার পর হঠাৎ গান থামিয়ে বললেন, "ভুল হয়ে গেছে। বুঝলি পুঁটু?"

"কী ভুল ছোটমামা?"

ডান দিকে আঙুল তুলে ছোটমামা বললেন, "ভুল করে কংকালিতলার ঝিলের ধারে এসে পড়েছি। এখানে কোথায় একটা শ্মশান আছে যেন। বড্ড বিপদে পড়া গেল দেখছি।"

একটু ভেবে নিয়ে ঝিলের ধারে-ধারে হাঁটতে শুরু করলেন। ঝিলের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা চলার পর কারা কথা বলছে শোনা গেল। ছোটমামা বললেন, "মনে হচ্ছে, জেলেরা ঝিলে মাছ ধরতে এসেছে। আয় তো! ওদের কাছে রাস্তাটা জেনে নিই।"

ঝোপঝাড়ের পর একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা ঝুপসিকালো গাছ। তার তলায় কারা বসে চাপাস্বরে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু যেই আমরা সেখানে গেছি, লোকগুলো "ওরে বাবা! এরা আবার কারা" বলে চ্যাঁচামেচি করে দৌড়ে উধাও হয়ে গেল।

ছোটমামা বললেন, "যা বাব্বা! আমাদের দেখে ওরা ভয় পেল কেন? আমরা মানুষ না ভূত?"

গাছটার তলায় গিয়ে দেখি, কে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "সর্বনাশ! এখানেই তো তা হলে কংকালিতলার শ্মশান। ওরা একটা মড়া পোড়াতে এসেছিল।"

মড়াটা দেখে গা ছমছম করছিল। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোটমামা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে পা বাড়িয়েছেন, সেই সময় খাটিয়া থেকে মড়াটা বলে উঠল, "চিতা সাজানো হয়েছে?"

ছোটমামা বললেন, "ওরে বাবা! এ যে দেখছি জ্যান্ত মড়া! পালিয়ে আয় পুঁটু!"

মড়াটা তড়াক করে উঠে বসে বলল, "পালিয়ে যাবেন না, পালিয়ে যাবেন না। একা থাকতে আমার বড্ড ভয় করবে।"

"পুঁটু! রেডি স্টেডি গো!" বলে ছোটমামা দৌড়ুতে শুরু করলেন।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছোটমামার পিছনে ছুটতে থাকলুম। কিন্তু বড্ড বিচ্ছিরি ঝোপঝাড়। কোথাও চষা খেতের মাটি গাদা হয়ে আছে। তার ওপর দৌড়নো কঠিন। বারতিনেক আছাড় খেলুম। ছোটমামা একবার থেমে পিছনে তাকিয়ে বললেন, "সর্বনাশ! মড়াটা ছুটে আসছে যে!"

মড়াটার আর্তনাদ শুনতে পেলুম, "দাদা! আমাকে ফেলে যাবেন না!"

আবার আমাদের দৌড়নো শুরু হল। এবার এসে পৌঁছলুম গাছপালা ঘেরা একটা বাড়ির কাছে। ছোটমামা বললেন, "আবার ভুল হয়ে গেছে রে পুঁটু! অন্য একটা গ্রামে চলে এসেছি মনে হচ্ছে! আয় তো এদের ডাকি!"

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা খুলে কে একজন বলল, "কাকে চাই?"

ছোটমামা বললেন, "দেখুন, আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি। তাই..."

"বিপদটা কি আগে শুনি?"

"কংকালিতলার শ্মশানের ওখানে একটা মড়া ছিল। হঠাৎ সে..."

লোকটা ঝটপট বলল, "থাকারই কথা। আমাদের ছোটকর্তার মড়া। তা এখনও চিতেয় ওঠেননি বুঝি?"

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "আমাদের ফলো করে আসছিলেন ভদ্রলোক বলছিলেন, শ্মশানে ওঁর একা থাকতে বড্ড ভয় করবে।"

"মলোচ্ছাই! আমাদের লোকগুলো কোথায় গেল? তারা ছিল না?"

"ছিল তো! আমাদের হঠাৎ ওখানে দেখে ওরা কেন যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল!"

লোকটা খিখি করে হেসে বলল, "তা ভয় পাবারই কথা। রাতবিরেতে কাকেও চেনা কঠিন। এই তো আপনাদের দেখেও আমি দিব্যি ভয় পাচ্ছি।"

ছোটমামা জোরে হাত নেড়ে বললেন, "আমরা মানুষ! আমরা মানুষ! আমাদের ভয় পাবেন কেন?"

"কিছু বলা যায় না মশাই! দিনকাল যা পড়েছে। কে জানে কে কোন রূপ ধরে ঘোরে।"

ছোটমামা তার দিকে এক পা এগিয়ে বললেন, "আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। আমরা মানুষ। এই ছেলেটা আমার ভাগনে। আমি ওর মামা। আমরা যাত্রা দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তা ভুল করে এই অবস্থা। এই নিন, আমার হাতটা ঠান্ডা না গরম দেখুন। আমরা ভূত হলে হাতটা বরফের মত ঠাণ্ডা হবে।"

ছোটমামা হাত বাড়িয়ে আর এক পা এগোতেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "হাত সরান। হাত সরান। ওরে বাবা! হাত বাড়িয়ে ঘাড়টি ধরে মটকাবার মতলব? বড়কর্তা! বড়কর্তা! একবার আসুন তো!"

হেঁড়ে গলায় বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বলল, "কী হল রে ভুতু?"

লোকটা বলল, "কারা এসে গণ্ডগোল বাধাচ্ছে।"

"দরজা বন্ধ করে দে।"

আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোটমামা বললেন, "কোনও মানে হয়?"

বললুম, "চলুন ছোটমামা! অন্য কোনও বাড়ির লোক ডেকে জিজ্ঞেস করে নিই।"

দু'জনে হাঁটতে থাকলুম। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। ঝোপজঙ্গল আর উঁচু-নিচু সব গাছ বাতাসে দুলছে। একটু পরে আর একটা বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোটমামার ডাকাডাকিতে বাড়ির ভেতর থেকে কে ঘুমজড়ানো গলায় সাড়া দিল, "কী হয়েছে?"

ছোটমামা বললেন, "দয়া করে একটু বাইরে আসবেন?"

"না বাইরে যাবার সময় নেই। আমি ঘুমুচ্ছি।"

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কোথায় ঘুমুচ্ছেন? এই তো দিব্যি কথা বলছেন।"

"ঘুমুতে—ঘুমুতে কথা বলা আমার অভ্যেস।"

"কী অদ্ভুত! আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘুমুতে-ঘুমুতে বলুন, আমরা কনকপুর যাব কোন্ রাস্তায়?"

"কনকপুর? সে আবার কোথায়?"

"কনকপুর চেনেন না? বাসরাস্তার ধারে অত বড় গ্রাম।"

"বাসরাস্তার ধারে তো কত বড়-বড় গ্রাম আছে।"

ছোটমামা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, "ভারী বিপদে পড়া গেল দেখছি। আচ্ছা, এ-গ্রামের নাম কী?"

জবাব এল তেমনি ঘুমজড়ানো গলায়, "নাম একটা ছিল যেন। মনে পড়ছে না।"

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আপনি দেখছি ভারী অদ্ভুত লোক। নাম মানে কী?"

এবার জোরালো নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। ছোটমামা এবার খুব রেগে গেছেন। দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে শুরু করলেন। কপাট ভেঙে পড়ল মড়মড়

করে। আমার ভয় করছিল। ছোটমামার কাণ্ড দেখে। পাশের বাড়ির লোকেরা জেগে গিয়ে হইচই বাধায় যদি? রাতদুপুরে কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকা কি ঠিক হচ্ছে?

কিন্তু ছোটমামা একেবারে মরীয়া। ভেতরে পা বাড়িয়ে বললেন, "আয় পুঁটু! লোকটাকে ঘুম থেকে জাগানো দরকার। ঘুমের ঘোরে মাথামুণ্ডু কী সব বলছে।"

ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলুম, একটা লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার নাক ডাকছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমুতে পারে মানুষ? উঠোনে সাদা হয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। লোকটার নাক থেকে ঘড়র-ঘড়র শব্দ হচ্ছে। ছোটমামা তার গায়ে ধাক্কা দিয়েই পিছিয়ে এলেন। বললুম, "কী হল ছোটমামা?"

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না, পুঁটু! লোকটার গা বরফের মতো ঠাণ্ডা!"

আঁতকে উঠে বললুম, "চলে আসুন ছোটমামা!"

ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে রে। বরং এক কাজ করি আয়। ওই বারান্দায় দু'জনে শুয়ে পড়ি। ভোরবেলা নিশ্চয় মানুষজনের দেখা পাব। তখন জিজ্ঞেস করে নেব।"

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ঘুমন্ত লোক, যার গা নাকি বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং এই বাড়িটাও তার। এখানে ঘুমনো কি ঠিক হবে? কিন্তু ছোটমামা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়লুম শানবাঁধানো বারান্দায়। দু'জনেই ক্লান্ত।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ঘুম ভাঙল ছোটমামার ডাকাডাকিতে। চোখ খুলে উঠে বসলুম। তারপর খুব অবাক হয়ে গেলুম। এ কোথায় শুয়েছিলুম আমরা? ভোরের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বটগাছের তলায় শুকনো ন্যাড়া মাটিতে মামা-ভাগনে খুব ঘুমিয়েছি। কোথাও ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। শুধু জঙ্গল।

ছোটমামা বললেন, "হাঁ করে কী দেখছিস? রাতবিরেতে বেরুলে একটু গণ্ডগোল হয়েই থাকে। চল, বাড়ি ফিরি।"

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, "রাস্তা চিনতে পারবেন তো ছোটমামা?"

ছোটমামা করুণ হেসে বললেন, "দিনের বেলা আর ভুল হবে না আমরা কোথায় চলে এসেছিলুম জানিস? কংকালিতলার জঙ্গলে। প্রবলেম হল, রাতবিরেতে কিছু চেনা যায় না। চেনা জায়গাও অচেনা হয়ে যায়।"

৬ শর্মার বকলমে

সত্যি বলতে কী বংশীধর অধিকারীর জ্বালায় আমাকে মীর্জাপুরের অত ভাল মেসটা ছাড়তে হয়েছিল। যেই কাগজ কলম নিয়ে একটা গল্প লিখব বলে বসেছি, ভদ্রলোক এসে একগাল হেসে বলতেন, কী লিখলেন একটু পড়ুন না শুনি!

এখনও লেখা হয় নি বললেও রেহাই ছিল না। খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলতেন, "কী লিখবেন ভাবছেন, তাই বলুন না শুনি।"

দিনের পর দিন এরকম জ্বালাতন। মনে মনে যাচ্ছে-তাই বিরক্ত হলেও চেপে থাকতুম ভদ্রতার খাতিরে। বংশীধরবাবু কিন্তু অতি অমায়িক মানুষ। মাথায় টাক ছিল। গোল গোল মুখ। হাসিটি ছিল ভারি মিঠে! নাদুস-নুদুস বেঁটে শরীর নিয়ে ধুপ ধুপ শব্দ করে মেসবাড়ির এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়াতেন। সবাব সুখ দুঃখের খোঁজ খবর নিতেন। গায়ে পড়ে উপকার কবতে চাইতেন।

কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছিল না ওঁকে। তিনমাস লেগে যেত একটা ছোট গল্প লিখতে। আর আশ্চর্য ব্যাপার কীভাবে যেন টের পেয়ে যেতেন, আমি লিখতে বসেছি। অমনি চলে আসতেন আমার কাছে। পাশে বসে মুন্ডু বাড়িয়ে বলতেন, "কৈ একটু পড়ুন না শুনি!..."

বর্ষানাগাদ নকুড় মল্লিক লেনে তিনতলা বাড়ির ছাদে একটা চিলে কোঠা গোছেব ঘর খুঁজে বের করলুম। বাড়ির মালিক এককথাতেই ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, "ভাড়া যা দেবার দেবেন খুশিমতো। ও নিয়ে দরাদরি করব না। আপনি মশাই লেখক মানুষ। আমি আপনার লেখার ভক্ত।"

কলকাতা শহরে কোনো বাড়িওলা এমন কথা বললে কোন লেখকের না মন আনন্দে থই থই নেচে ওঠে। তবু ভাড়ার ব্যাপারটা ঠিক কবাই ভাল। অনেক বলেকয়ে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলুম। বাড়িওলা ভদ্রলোক তাও নেবেন না। বলেন, "বরং তিরিশ দেবেন। ওরে বাবা! আপনি একজন লেখক বলে কথা!"

মেস থেকে পাঁততাড়ি গুটিয়ে যখন ওবাড়িতে চলে যাচ্ছি, বংশীধর খুব বাধা দিয়েছিলেন। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। একটু কষ্ট হয়েছিল বৈকি, অতকাল একসঙ্গে বাস করেছি।

নকুড় মল্লিক লেনের বাড়িতে গিয়ে মহানন্দে গল্প লেখা শুরু করলুম। কেউ

বাধা দেবার নেই। নিরিবিলি তিনতলার ওপর ছোট ঘর। এত বড় ফাঁকা ছাদ। প্রাণভরে আকাশ দেখা যায়। আর আমায় পায় কে? আকাশ না দেখতে পেলে কি মাথায় কিছু বড় বড় ভাব আসে?

প্রথম রাতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কাগজ-কলম নিয়ে বসলুম। বসামাত্র প্লট এসে গেল। প্লটটা এই ঃ

এক শিকারী বনের মধ্যে পথ হারিয়ে অবশেষে একটা পুরনো ভাঙাচোরা দুর্গে পৌঁছেছেন। খুঁজে-খুঁজে একটা অক্ষত ঘরে ঢুকে রাত কাটানোর কথা ভাবছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা অদ্ভুত চেহারার লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—দরজা দিয়ে নয়, দেয়াল থেকে। তাব মানে দেয়ালে টাঙানো একটা ছেঁড়া ছবি থেকে। শিকারীর বন্দুকে আর গুলি নেই। এদিকে ছবির লোকটা তাঁর গলা টিপতে আসছে।

শিকারীকে না বাঁচালে গল্প হবে না। কীভাবে বাঁচাব তখনও ভাবিনি। লখাটাতো শুরু করা যাক্।

সবে দু'লাইন লিখেছি, আমার কাঁধের ওপর কার নিঃশ্বাস পড়ল। চমকে উঠে দেখি কী আশ্চয—কী অসম্ভব ব্যাপার, মীর্জাপুরের মেসের সেই বংশীধর অধিকারী পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। একগাল হেসে ঠিক তেমনি চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'কী লিখলেন, পড়ুন না শুনি!'

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। ঘরের দরজা কী বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম? নিশ্চয় মীর্জাপুর থেকে ভদ্রলোক এই বৃষ্টির মধ্যে নকুব মল্লিক লেনে হাজির হয়েছেন।

কিন্তু আমার এ ঠিকানা তো ওখানে কাউকে জানিয়ে আসিনি! উনি টের পেলেন কেমন করে?

মনের কথা চেপে ভদ্রতা করে বললুম, "আরে আসুন বংশীধববাবু! বসুন।"

বংশীধরবাবু বললেন, "কৈ একটু পড়ুন না শুনি।"

"পড়ছি, পড়ছি, সবে তো দু'লাইন লিখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি এই বৃষ্টির মধ্যে...." বলতে বলতে থেমে গেলুম। বংশীধরবাবু হঠাৎ আঁতকে উঠে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "ওরে বাবা! এ ব্যাটা আবার কে?" বলেই আবছায়া হয়ে গেলেন। তারপর বেমালুম অদৃশ্য।

তারপর দেখি ঢ্যাঙা রোগা এক গুঁফো ভদ্রলোক ঘরের কোণা থেকে এগিয়ে আসছেন। এঁকে দেখেই বুঝি বংশীধরবাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন?

গুঁফো ভদ্রলোক চোখ কটমট করে বললেন, "কে হে ছোকরা? কী লিখলে পড়ে শোনাও তো।"

খুব রাগ হল এবার। নিশ্চয় দরজা বন্ধ করতে ভুলেছি। দরজার দিকটা ছায়ার মধ্যে বলে বোঝা যাচ্ছে না। বললুম, "আপনি কে মশাই বলা কওয়া নেই ঘরের মধ্যে হুট করে ঢুকে পড়লেন যে?"

গুঁফো ভদ্রলোক হি হি করে হাসলেন। "ইস। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। ভারি দু'লাইন ছাইপাঁশ লিখেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা হচ্ছে! জানো আমি কে? আমি বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক হলধর শর্মা।"

শুনেই বড় লজ্জায় পড়ে গেলুম। হেঁট হয়ে পা ছোঁবার চেষ্টা করে বললুম, "ক্ষমা করবেন। আপনার কত বই আমি ছেলেবেলায় পড়েছি। তা আপনি বুঝি এ বাড়িতেই থাকেন?"

"এ বাড়িতে কি বলছ হে? তার আগে পড়ো কী লিখলে শুনি।"

হলধর শর্মা দুপা এগিয়ে এলেন। অগত্যা পড়তেই হল। লাইনদুটো শোনার পর শর্মা মশাই বললেন, "হুঁ শুরুটা ভালোই। তবে শিকারীকে একটা ঘোড়া দাও। বন্দুকের বদলে দাও তীর ধনুক। জমবে ভালো।"

"গল্পটা যে একালের শর্মা মশাই।"

"গল্পের আবার কাল? যা বললুম লেখ। এই আমি বসলুম। পুরো লিখে ফেলো। শুনে তবে যাব।"

বেগতিক দেখে বললুম, "বাইরের লোকের সামনে আমার লেখা আসে না শর্মামশাই।"

শর্মা চটে বললেন, "বাইরের লোক মানে? আমি তো এ ঘরেই থাকি বললুম না?"

"এঘরে আপনি থাকেন মানে?" অবাক হয়ে বললুম। "এঘর তো খালি পড়েছিল। আমি বাড়িওলার কাছে ভাড়া নিয়ে আজ বিকেলে এঘরে এসেছি।"

"ট্রেসপাস করেছ বাপু। পরের ঘরে এসে থাকা কি ভাল? একসময় এইঘরেই আমি থাকতুম। তবে নেহাত এসেই গেছ যখন আপত্তি করব না। বিশেষ করে তুমি নতুন লেখক। তোমায় উপদেশ দেওয়া এবং সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। কৈ লিখতে শুরু করো। আটকালে বলবে। আমি বলে দেব।"

কাঁচুমাচু মুখে বললুম, "সেটা কি ঠিক হবে?"

হলধর শর্মা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আলবাৎ ঠিক হবে। নাও—আমি ডিকটেশান দিচ্ছি, লিখে যাও।"

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিকের কথা অমান্য করি কোন্ মুখে? অগত্যা ডিকটেশান

নিতে শুরু করলুম। গোড়ায় যে দুলাইন লিখেছিলুম, তা কেটে দিতেও হল ওঁর নির্দেশে। তারপর লিখতে লিখতে টের পেলুম, সত্যি—এই হল পাকা হাতের রচনা। কী জমাট এই গল্পটা! ছাপা হলে হইচই পড়ে যাবে এবার।

লেখা শেষ হবার পর হলধর শর্মা বললেন, "আর তোমায় কষ্ট দেব না। এবার আমার প্রাতঃভ্রমণের সময় হল। তুমি বিশ্রাম করো। আবার কাল রাতে যথাসময়ে দেখা হবে।"

কাগজগুলো গোছাচ্ছিলুম। গোছানো শেষ করে ঘুরে দেখি শর্মামশাই নেই। বুঝলুম, তাহলে এই বাড়িতেই কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন। আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলেন। কিংবা হয়তো লেখার জন্য ঘরটাও ভাড়া নিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর বুকটা ধড়াস করে উঠল, যখন দরজার কাছে গেলুম তখন। এ কী! দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। হ্যাঁ—আমিই বন্ধ করেছিলুম, মনে পড়েছে! তাহলে?

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

ঘুম হবার কথা নয়। একটু বেলা হলে বেরিয়ে দেখি ছাদের কোণায় দোতলার মধুবাবু ডন দিচ্ছেন। কাল বিকেলেই আলাপ হয়েছে। ডন শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নমস্কার স্যার। আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে?"

বললাম, "মোটেও না মধুবাবু! সারারাত [illegible]"

মধুবাবু চাপা হেসে বললেন, "শর্মামশাই খুব জ্বালিয়েছেন বুঝি? আপনাকে বলেই বলি স্যার, এঘরে কেউ একরাত্তিরের বেশি বাস করেন না। তাই এ [illegible] খালি পড়েছিল। আপনাকে কালই আভাস দেব ভেবেছিলুম, রাগ করবেন বলে সাহস পাইনি।"

'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

মধুবাবু অবাক হয়ে বললেন, '[illegible] স্যার [illegible] নিজে [illegible] শিশুসাহিত্যিক হলধর শর্মা কবে গত হয়েছেন। সেকি [illegible] সাতেক তো হবেই। তখন আমি স্কুলের ছাত্র।

কী করে জানব? আমি গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছি মাস কয়েক [illegible] সাহিত্যিকদের কে জীবিত, কে মৃত, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। গল্প লিখি আর কাগজে পাঠাই। কোনো কোনো লেখা ছাপাও হয়।

চুপ করে আছি দেখে মধুবাবু বললেন, "জ্বালাতন বলতে ওই এক— ডিকটেশন

ানতে হবে। তা নিজেও যখন লেখেন, তখন আর অসুবিধেটা কী? দেখবেন সয়ে যাবে ক্রমশ।"

শর্মারহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিন্তু বংশীধর অধিকারী? তাঁর আবির্ভাব দরজা আঁটা ঘরে।

মেসে খোঁজ নিয়ে জানলাম যেদিন আমি মেস ছেড়ে আসি, সেদিনই সন্ধ্যায় হার্টফেল করে মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল ষাট।

তবে সুখের কথা হল শর্মার ভয়ে বংশীধর আর আমায় জ্বালাতে যাননি। এদিকে শর্মা রোজ রাতে ডিকটেশান দিতে দিতে বলেন, শিগগির এবার তুমি নিজেই ভাল গল্প লিখতে পারবে। এটাই শেষপর্যন্ত আমার পক্ষে আশার কথা।

বাঁচা-মরা

অনেক বছর পরে গ্রামে যাচ্ছি। ট্রেন লেট করেছিল। স্টেশনে নেমে দেখি শেষ বাস চলে গেছে রাত নটায়। এখন বাজছে প্রায় দশটা। গ্রাম ছয় মাইল দূরে। কী করব ভেবে পেলুম না।

কয়েকটা সাইকেল রিকশো দাঁড়িয়েছিল। তাদের সাধাসাধি করলুম। এত রাতে কেউ অত দূরে যেতে রাজি হল না। তখন হতাশ হয়ে একটা চায়ের দোকানে গেলুম চা খেতে।

এমন সময় রোগা হাড়গিলে চেহারার হাফপেন্টুল আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা লোক এসে হঠাৎ বলল—স্যার কি রিকশো খুঁজছিলেন? কোথায় যাবেন?

—হ্যাঁ। যাব দোমোহানী।

—আসুন তবে। লিয়ে যাই। চণ্ডীতলার একজন পেসেঞ্জার পেয়েছি। পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। ঐ দেখুন আমার রিকশো।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলুম, একটু তফাতে গাছতলায় একটা রিকশো দাঁড়িয়ে আছে। তাতে একজন লোক গুটিসুটি বসে আছে। গাছের পাতার ফাঁকে কুচিকুচি আলো পড়েছে মাছের আঁশের মতো। পাঞ্জাবি-ধুতিপরা লোকটাকে প্রৌঢ় বলে মনে হল। কোলে একটা ব্যাগও আছে। চুপচাপ বসে আছে।

—শিগগির চা খেয়ে আসুন। বলে রিকশোওলা চলে গেল। ভাড়ার কথা তোলার ইচ্ছে হল না। যা চায় দেব। এমন বিশ্রি অবস্থায় কখনও পড়িনি। আর স্টেশনটা এমন অখাদ্য জায়গায়, বাজার বা বসতি মাইলটাক দূরে। সেখানে গিয়েও যে রাতের আশ্রয় পাব, ভরসা নেই।

চা-ওলা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে বলল—স্যার, ওহিদের রিকশোয় যাবেন না। বরং ঐ সিংহবাহিনীর মন্দিরে যান। ধর্মশালা আছে।

আমি জানি, হিন্দু মন্দিরে অথবা ধর্মশালায় আমাকে থাকতে হলে জাত ভাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সে মিথ্যাচারিতা সম্ভব নয়। তাই বললুম—থাক। কিন্তু ওর রিকশোয় গেলে ক্ষতি কি বলুন তো?

চা-ওলা চাপা গলায় বলল—আপনি নতুন লোক বলেই বলছি। ওহিদ ওর রিকশোয় মড়া বয়।

হেসে বললুম—মড়া বয়? আমি ভাবলাম বুঝি চোর ডাকাত।

—না না। লোক খুব ভাল। তবে দোষের মধ্যে ব্যাটা রিকশোয় মড়া বয়।
তাই চেনা জানা কেউ ওর রিকশোয় চাপে না। চা-ওলা ফের ষড়যন্ত্রসংকুল গলায় বলল—রাত বিরেতে মড়াবওয়া রিকশোয় চাপতে নেই। আমি একবার ভারি বিপদে পড়েছিলুম জানেন? আসছিলুম মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সেই হরেকেষ্টপুর থেকে। বেয়ানের সঙ্গে একটুখানি কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তাই....

ওহিদ রিকশোওলা এসে তাড়া লাগালো—আসুন স্যার। রাত বেড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি উঠে পড়লুম। চা-ওলা খুব জমিয়ে নিশ্চয় ভূতের গল্প বলতে চাইছিল। বাধা পেয়ে গোমড়ামুখে বসে রইল।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোক চোখ বুজে বসে আছে। মনে হল. ঘুমোচ্ছেন। অনেকের এ অভ্যাস থাকে। তাছাড়া যেচে পড়ে কারও সঙ্গে আলাপ করার স্বভাব আমার নেই। রিকশো আস্তে সুস্থে চলেছে। ওহিদ রিকশোওলা তেমন শক্তসমর্থ জোয়ান নয়, তা ওর গঠন দেখেই টের পেয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ পক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠল। হালকা জ্যোৎস্না ছড়ালো পৃথিবীতে। এসব সময়ে এই নির্জন রাতের পথে স্বভাবত ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা এসে যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সজাগ রাখা দরকার। না. ভূতের ভয় দেখিয়েছে বলে নয়. নেহাৎ চোর ডাকাতের ভয়েই। ভাবলুম, রিকশোওলার সঙ্গে গল্প করা যাক। তাই বললুম—ওহে, তোমার নাম বুঝি ওহিদ?

রিকশোওলা জবাব দিল—হ্যাঁ, স্যার।

—তুমি থাকো কোথায়?

—আজ্ঞে, হরিণমারা-গোপপাড়ায়। ইস্টিশনের ওপাশেই আমাদের গাঁ. বলে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাঁ করে দম নিল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদ দেখে ফিরে বলল—বড় গাঁ, স্যার। ইস্কুল পোস্টাপিস থানা হাসপাত সবই আছে।

এরপর সে তার গ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবরণ দিতে থাকল। লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গেল।

এই করে প্রায় মাইলটাক আসা গেল। তারপর বেমক্কা হাসতে হাসতে বলে বসলুম—হ্যাঁ, তুমি নাকি এই রিকশোয় মড়া বও?

ওহিদ প্যাডেল থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে ফ্যাঁচ করে অদ্ভুত হেসে বলল—নেত্যদা বলল বুঝি? নেত্যদাটা ভারি দুষ্টু। আমার প্যাসেঞ্জারকে ভাঙচি দেয় খালি। কি আর বলব বলুন? এক জায়গায় আড্ডা দিই। তাসটা আরটা খেলি। বলতে গেলে বন্ধু মানুষ। তা স্যার, ইচ্ছে হলে চলুন আমার গাড়িতে। না ইচ্ছে হলে নেমে যান। ভেবে দেখুন এখনও।

সর্বনাশ। বলে কী? ব্যস্তভাবে বললুম—না, না। মড়া বও তাতে কী হয়েছে

ওহিদ প্যাডেলে আস্তে চাপ দিযে বলল—ইষ্টিশনেব পেছনে মা গঙ্গা। শ্মশান। জাযগাব মডা যায সেখানে। আমি মডা বই। দোষ কী বলুন? তিনগুণ ভাডা পাই। বইব না কেন? জ্যান্ত প্যাসেঞ্জাব কি আমায স্বগ্গে নিযে যাবে?

—ঠিকই তো। ববং মডা বইলে অনেক পুণ্যি। মডাবা তো স্বর্গেব পথেই পাডি জমায। আগে থেকে চেনা জানা থাকা ভাল। নেহাৎ পাপ কবে থাকলে তাদে কেউ কেউ স্বর্গে ঢুকতে পায না। নবকে বেঁধে নিযে যায।

ওহিদ আমাব কথায খুশি হল।—তাহলেই দেখুন। তবে আসল কথা ক জানেন স্যাব? মডা বওযা সহজ কাজ নয। সবাই এটা পাবে না। ইষ্টিশনেব • বিকশোওলা আছে, কাকব কি এ সাধ্যি হত? হ্যাঁ পাবলে তো সবাই বইত। তিন গু বেশী পযসা পেত। কিন্তু মুবোদে কুলোয না বলেই হিংসে কবে আমায।

-তাই বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মডা পেসেঞ্জাব নিযে বিকশোব প্যাডেল ঘোবানো সোজা নয। শালাবা কি ভেতবে ভেতবে চেষ্টা কবেনি কেউ? সব জানি বাবা। পাবেই নি একবাব গোবর্দ্ধন বাতেব বেলায চুপি চুপি মডা চাপিযেছিল পবদিন সবাই দেখে বিকশো নযনাজুলিব জলে উল্টে পডে আছে মডা সুদ্ধ। সে এক কেলেঙ্কারি

ওহিদ খুব হাসতে লাগল। আমি বললুম —গোবর্ধনেব কী হল?

বেগতিক বুঝে বিকশাব সিট থেকে লাফ দিযে পালিযেছিল সেই থেকে সে মডা দেখলে সবে যায তফাতে।

• ওহে ওহিদ. তুমি বিসেব জোবে মডা বইতে পাবো বলো তো শুনি

ওহিদ হঠাৎ গম্ভীব হযে গেল একটু পবে বলল -আমি নিজেই এক

১৩

তাব মানে?

মডা বকি। কাবণ, আমাকে একবাব জানঘবে দিযেছিল।

জানঘব। সে আবাব কী?

বলতে গেলে সে বড্ড দুঃখেব কথা স্যাব। আমাব পেটে শূলেব ব্যামো হযেছিল। সদব হাসপাতালে ভর্তি হলুম। দেখে থাকবেন। হাসপাতালেব একধাবে একটা আলাদা ঘব থাকে। রুগী মাবা যাবে টেব পলে কিংবা মাবা গেলে সেই ঘবে বেখে আসে। তাকে বলে জানঘব। তো আমাকে সেই জানঘবে বেখে এসেছিল ডাক্তাববাবু।

—বলো কী? তাবপব?

—ডাক্তারবাবু আমার নাড়ি খুঁজে পায় নি। খাবি খেতে খেতে মারা পড়েছিলুম।

—এ্যাঁ! সর্বনাশ!

—আজ্ঞে খোদার কসম। তো রোজ সকালে বউ খোঁজ নিতে যায় আর আমায় গালমন্দ করে আসে। এভাবে হাসপাতালে পড়ে থাকলে সংসারী লোকের চলে? ছেলেপুলে উপোস করে মরছে যে! বউ ভারি চটে গিয়েছিল। রোজ এসে বলত—মিনসের সব চালাকি! রিকশো টানতে আলস্যি। তাই হাসপাতালে এসে মিছিমিছি পড়ে আছে। টাইমে টাইমে দিব্যি পেটপুরে খেতে পাচ্ছে। বউ রোজ গিয়ে গালাগালি করত। আমায় জানঘরে দেওয়া শুনে বউ আরো চটে গেল। বাড়ি থেকে একটা মুড়ো ঝাঁটা এনে জানঘরের দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলল—ন্যাকামির আর জায়গা পাওনি? ওঠ, ওঠ বলছি। পড়ে আছ আর এখানে আমরা উপোস করে মরছি। না ওঠ তো, পিঠের চামড়া ঝাঁঝড়া করে দেব। এই বলে যেই ঝাঁটা তুলেছে. আমি স্যার তড়াক করে উঠে পড়েছি।

—সর্বনাশ!

—সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! আমার বউকে তো স্যার দেখেননি।

—তারপর কী হল?

—দেখতেই পাচ্ছেন। রিকশোয় প্যাডেল ঘোরাচ্ছি। সে হাঁ করে দম নিয়ে ফের চাঁদটা দেখার পর বলল—আমি জানঘর থেকে পালিয়ে আসা মড়া, স্যার। আমি কেন মড়াব ভয় পাব বলুন?

সে ফ্যাঁচ করে অদ্ভুত হাসল এবার। এতক্ষণে তার মুখের একটা পাশ, একটা চোখ অব্দি দেখতে পেলুম ফিকে জ্যোৎস্নায়। নীল ঝকঝকে ঐ চোখ কি জ্যান্ত মানুষের? আমার গা ছমছম করল।

এই সময় হঠাৎ দেখি, আমার সঙ্গী যাত্রীটিও এতক্ষণে একটু নড়লেন এবং গলার ভেতর খিকখিক করে হেসে উঠলেন। চোখও খুললেন।

ভয়ে ভয়ে বললুম—কি হল মশাই? হাসছেন কেন?

ভদ্রলোক ভারি গলায় বললেন—কে জ্যান্ত কে মড়া বোঝা ভারি কঠিন। এই আমায় দেখছেন, বলুন তো আমি জ্যান্ত না মড়া?

—মড়ারা কথা বলে না। আপনি তো দিব্যি কথা বলছেন?

—বলে মশাই, বলে। আপনি জানেন না, সে আলাদা কথা। বলে ভদ্রলোক ফের খিকখিক করে হাসতে থাকলেন।

পাগল নাকি? বললুম—নিজেকে বুঝি আপনি মড়া ভাবেন?

—ভাবব কি মশাই? আমি যে সত্যি সত্যি মড়া।

—বলেন কী?

—হুঁউ! ঐ যে ওহিদ বলল, সে জানঘর থেকে পালিয়ে এসেছিল বউয়ের ঝাঁটার ভয়ে। আমিও আজ জানঘর থেকে পালিয়ে এসেছি জানেন?

—আপনিও কি বউয়ের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন?

ভদ্রলোক জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন—নাঃ! আমার মশাই বউটউ নেই।

—তাহলে?

—ডাক্তারবাবুর ভয়ে। মশাই সবে মারা গেছি—ডাক্তারবাবু কিনা ইয়াবড় ছুরি বাগিয়ে আমাকে টুকরো-টুকরো করে কাটার ফন্দি এঁটেছেন।

—পোষ্টমর্টেম বলুন।

—ঠিক বলেছেন। তো যেই ছুরিটা আমার বুকের দিকে এনেছেন, অমনি একলাফে উঠে ডাক্তারবাবুকে ধাক্কা মেরে হটালুম। কারা চেঁচাল, ধর ধর। পালাচ্ছে, মড়া পালাচ্ছে! আমি ততক্ষণে পগার পার। বাপস্, আর ভুলেও হাসপাতালে নয়।

ভদ্রলোক খিকখিক করে ফের হাসলেন। ওহিদ সায় দিয়ে বলল—কখনো নয়। ভাগ্যিস, মারা গিয়েছিলুম বলেই না উচিত শিক্ষেটা হল।

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে বললেন—যাকগে। এবার আপনারটা শোনা যাক।

—আমার কী?

—লজ্জা কিসের মশাই? লুকোছাপা করে আর কি লাভ বলুন? এখানে তো কোনও জ্যান্ত মানুষ নেই। প্রাণ খুলে বলে ফেলুন. আপনি কিভাবে...

—কি মুশকিল! আমি হাসপাতালেও যাইনি। আপনাদের সেই জানঘর কিংবা লাসকাটা ঘরেও আমায় ঢোকানো হয়নি। আমি যাচ্ছি অনেক বছর পরে জন্মভূমি দেখতে।

ভদ্রলোক ধমক দিলেন—চালাকি হচ্ছে? আমরা মড়া চিনি না? কী রে ওহিদ, বল্, না বাবা!

ওহিদ ফ্যাঁচ করে হাসল।—স্যারকে দেখেই চিনেছিলুম। নৈলে কেনই বা নিজে গিয়ে সাধব?

রেগে গিয়ে বললুম—আমি মড়া নই, জ্যান্ত মানুষ। নাড়িটা টিপে দেখুন না।

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন—হ্যাঁরে ওহিদ, তাহলে কি ভুল করেছিস বাবা?

ওহিদ জোর গলায় বলল—আমার ভুল হতেই পারে না। এতকাল মড়া ঘাঁটছি।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি, আপনার নাড়ি দেখি। বলে খপ্ করে আমার হাতের কব্জি ধরে ফেলতেই টের পেলুম, কী ঠাণ্ডা বরফের মতো ওঁর হাতটা! আর চোখের ঐ দৃষ্টি—আবছা জ্যোৎস্নায় জ্বলজলে নীল দুই চোখের দৃষ্টি!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলন্ত রিকশো থেকে লাফ দিলুম। আছাড় খেয়েই উঠে পড়লুম! তারপর দিগ্বিদিক না দেখে দৌড় দৌড়। পেছনে ওরা চেঁচাতে থাকল—ধর ধর। পালাল পালাল।

স্টেশনের আলো লক্ষ্য করে দৌড়চ্ছিলুম। হাঁফাতে হাঁফাতে যখন সেই চায়ের দোকানে পৌঁছলুম, বিজ্ঞ চা-ওলা হেসে বলল—জানতুম। তখন নিষেধ করলুম, শুনলেন না। সোজা ধর্মশালায় চলে যান। সকালে রওনা হবেন।

রাজকুমারী এবং এক মরা কাকিনীর গল্প

শেষ মাঘে যখন কাঁটালিয়া ঘাটের মাথায় শিমূল ফোটার ঝলমলানি তখনই, দশরথেব মেয়ে রাজকুমারীর বিয়ের শুভদিন ঠিক করা হয়েছিল। বরের বাড়ি গঙ্গাব ওপারে একেবারে চোখ বরাবর। পাড়ের ওপর একতলা নতুন দালানবাড়ি গাছপালার ফাঁকে ঝকমক করে। দশরথের চোখে মেখে গিয়েছিল আঠায় সাঁটা ছবির মতন। আর সে শিমূলতলার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেই অবিকল দেখতে পেত, তাব মেয়ে রাজকুমারী সেই চালচিত্রে এক প্রতিমা। প্রতিমাই বটে তো এ মেয়ে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। বাবুবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে চেহারা চলন-বলনে ফারাক নেই। দশরথ সাব সম্প্রদায়ের মোড়ল মাতব্বব মানুষ। পাড়াসুদ্ধ দিন গুনছিল কবে ডুমড়ুমিয়ে বেজে উঠবে প্রথাসিদ্ধ ঢোলক। বহু বহুড়িরা এসে হলুদবাটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। রঙ খেলবে দাশুমোড়লেব উঠোনে। কাবুলির সঙ দেবে

সব আশা আব ইজ্জতের ওপর ছাই ছড়িয়ে রাজকুমারী শুভদিনেব আগেই হঠাৎ নিপাত্তা। কাঁটালিয়া জুড়ে ছি ছি ছি ছি। গঙ্গাব ওপারেও বাঁকা হাসি, গুজগুজ, ফিসফিস। বব নির্মলকুমার কলেজে পাশ দিয়ে প্রাইমারি টিচার! তাব বাবাও কালুডহব গাঁয়ের এক মোড়ল মানুষ। দশরথের মতো নিবক্ষর, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধিতে বাবুদের কান কাটে এবং পঞ্চায়েতেব ইলেকশানে জেতা পার্টিনেতা। দশরথেব মতো ভুঁইক্ষেতে খাটে না। ঠাকুরতলার মাচায় বসে সিগারেট টানে। ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, ‘ছোড় বে! নির্মলা কা বহু আবে টাউনসে। হাঁ—মরদকা বাত, হাত্থিকা দাঁত।’

আর তখন দশবথ কাকতাড়ুয়া হয়ে তার বেগুনক্ষেতে দাঁড়িয়ে। চোখে সাঁটা মান্যবর মোড়লের দালানটি ঘষে মুছতে গিয়ে ঝরঝর করে কাঁদে। যার লিখাপড়া জানা বেটি ভেগে যায়, যে কাঁটালিয়ার এক মাতব্বর মানুষ, তাব গোপনে বসে কান্নাকাটি আর শাপমন্যি করা ছাড়া আপাতত কিছু করার নেই।

কিন্তু কার সঙ্গে ভাগল রাজকুমারী? দশরথের বিধবা দিদি সরবতিয়াব সন্দেহ, এ নিশ্চয় জঙ্গিপুর টাউনের সেই ছোকরার কাজ.....সেই ম্যাজিকওয়ালা ছোকরা গাকুয়া পদ্মা-জলঙ্গী সীমান্তে জুয়াড়িদের মেলায়-মেলায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায় যে, তার ‘মুরখ বুদ্ধু’ ভাই--দশরথ যাকে খাল কেটে ঘরে কুমির আনার মতো ঠাঁই দিত যখন-তখন।

সরবতিয়া আবার ঐ তল্লাটের বদ্যিমা। ঝাড়ফুক্ তুকতাকে ওস্তাদনী। ক্ষেতের ফলমাকড়ে কেন ফলন নেই, কেমিকেল সার ঢেলেই বা কেন বিয়োচ্ছে না বেগুনগাছগুলো, লাউলতারই বা বেয়াড়াপনা কেন, তার জন্য শ্মশান টুঁড়ে রাতবিরেতে সেই এনে দেবে হাড্ডি বা খুলি। মন্ত্রপুত সেইসব জিনিস ক্ষেতের দোষ নষ্ট করবে। আজকাল লিখাপড়ার এত চলন, এত পার্টিবাজি আর পঞ্চায়েতি হইচই, তবু, প্রাগৈতিহাসিক অবচেতনা দুর্মর।

দশরথ যখন মুখদেখানোর লজ্জায় গোপনে নির্জনে কেঁদে বেড়াচ্ছে কিংবা চকিতে লোক দেখলেই মুখ তুম্বো করে ক্ষেতের ফসলে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ছে, তখন তার বদ্যিদিদি সরবতিয়া উঠোনের কোণে লম্বা লগি খুঁজছে। লগির ডগায় বাঁধা এক মরা কাক। কাকটা সে গঙ্গার পাড়ে কাঁটাবনে দৈবাৎ পেয়ে গিয়েছিল। হয়েছিল কী, কাকটা ডিমপাড়ার জন্য বাসা বাঁধতে শুকনো ডাল সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল। কাঁটাবনে ঢুকে হতভাগিনী আর বেরুতে পারেনি। শয়ে-শয়ে কাক এসে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতবিক্ষত কাকিনী মারা পড়ে।

সরবতিয়া মন্তর পড়ে মরা কাকিনীকে ঝুলিয়ে আশা করছিল, এই কাকিনী যখন ডেকে উঠবে, তখনই রাজকুমারী যেখানেই থাক, বাড়ির জন্যে আনচান করে ছুটে আসবেই আসবে। তারপর সরবতিয়া দাওয়ায় বসে সুর ধরে তাব মরা স্বামীর উদ্দেশে মাসান্তিক কান্নার ছলে ভাইঝির জন্যে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।

গঙ্গার পাড়ে কালীপুজোয় মেলা বসানো বাবু ও মোড়লদের বহুকালের একটি কীর্তি। সেই মেলা চলে দশরথদের সম্প্রদায়ের ছট পরব অব্দি। সদর শহর বহরমপুর থেকে পিচের সড়ক এসে গেছে। ঘাটের মাথায় বাসস্ট্যান্ড, বাজার। হাইস্কুলও হয়েছে ইদানীং। কাঁটালিয়া ঘাট জমকালো গঞ্জ হয়ে উঠেছে। মেলার সময় সার্কাস আসে। ম্যাজিক আসে। মাইক বাজে। কুলকুল করে লোকজন। ছোকরা ম্যাজিকওয়ালা প্রোফেসর গাব্বুর তাঁবুটি ছোট হলেও হরেক মজাদার খেলার জন্যে ভিড় হত প্রচণ্ড। সেই প্রোফেসর গাব্বুর সঙ্গে দশরথের প্রায় কুটুম্বিতা হয়ে গিয়েছিল। এ পাড়ার ছেলে ছোকরারা ছট পরব উপলক্ষে মোটারকমের চাঁদার দাবি করেছিল। প্রোফেসর গাব্বু কারুর পরামর্শে দশরথের কাছে আসে এবং তাকে দেখামাত্র দশরথের মনে কী একটা ঘটে গিয়েছিল। তারপর যখনই গাব্বু ম্যাজিক নিয়ে এসেছে, দশরথের বাড়িতে তার অবরে-সবরে আনাগোনা চলেছে। খাওয়া-দাওয়া তো বটেই। আর রাজকুমারী তো গাব্বুদা এলেই চঞ্চল, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাব্বুর তাঁবুর গ্রিনরুমে রাজকুমারীর অবাধ গতিবিধি ছিল। ফিরে এসে সরবতিয়া বুড়িকে হাসতে হাসতে বলত, 'পিসি গে, একদম তেরি মাফিক—স্রিফ বুদ্ধু বানা দেতা গাব্বুদা! তুভি ম্যাজিকওয়ালি গে পিসি!'

সরবতিয়া রেগে যেত। থামরি লিখ্‌খাপঢ়াওয়ালি? তু বহুত সমঝদারনি। কখনও ফিক করে হেসে বদ্যিবুড়ি বলত, 'ছোকড়াকো হামি এইসা খেল দেখলাবে, উওভি সমঝাওলবে কেত্তা ধানমে কেত্তা চাল!'

গাব্বু বলত, 'রাজকুমারী, তোমরা ও ভাষায় কথা বলো কেন বলো তো?'

রাজকুমারী বলত, 'বাঃ! এটাই তো আমাদের মাদারটাং! আমাদের কমিউনিটি কোনো আমলে বিহার থেকে এসেছিল শুনেছি। তাই মৈথিলি আর বাংলা মিশিয়ে কথা বলে।'

ওরা যখন ইংরেজি মেশানো বাংলায় কথা বলত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভাইবোন প্রশংসার চোখে তাকিয়ে কান খাড়া করে শুনত। দশরথ তো গর্ববোধই করত, তার মেয়ে ইংরেজি বুলি বলে—ইতনা লিখাপঢ়া! সেই মেয়ে এমন করে ভেগে গেল কেন, তার মাথায় আসে না। নির্মলকুমারও ইংরেজী বুলি বলে। কলেজে পাশ ছোকরা। তবে গাব্বুর সঙ্গে ভেগেছে বলে তার বিশ্বাস হয় না। গাব্বু তাকে 'মুরখ' হলেও কী সম্মান করত! আর গাব্বু কিনা বামুনের ছেলে! সরবতিয়াদিদি বরাবর উল্টাপাল্টা বাত করে।

পাড়ার লোকেরা ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। মাতব্বররাও বলেছে, থানায় খবর দাও। কুছ বুরাভি হোনে সক্‌তা—দিনকাল যা চলেছে, কিছু বলা যায় না। তবু দশরথ গোঁ ধরে আছে। লোকেরা শেষে শাসিয়েও গেল, জাতের এই অসম্মান তারা বরদাস্ত করবে না। দশরথ মোড়ল বলেও রেহাই পাবে না। জরিমানা দিতে হবে দশের কাছে।

তবু দশরথ চুপ।...

কদিন পরে ঘাটের মাথায় বাসস্ট্যান্ডের কাছে নির্মলকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দশরথের। তাকে সবাই নিমাই মাস্টার বলে ডাকে। নৌকোয় সাইকেলসুদ্ধ পেরিয়ে রোজ তাকে এপারের তিন কিলোমিটার পিচরাস্তা ঠেঙিয়ে মামুদপুর প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতে যেতে হয়। নির্মলকুমার সবে প্যাডেলে পা তুলেছে দশরথকে দেখে পা নামাল।

হতে পারত-শ্বশুর হতে-পারত-জামাই-বাবাজীর মুখোমুখি পড়ে গিয়ে একেবারে পাথর। কিন্তু নির্মলকুমার একালের ছেলে। স্মার্ট এবং ফিটফাট। মুখে বরাবরকার হাসি। এই সকালেই ঘাটের বাজারে বাস-ট্রাক-টেম্পো-সাইকেল রিকশো আর মানুষজনের ভিড়ভাট্টা মিলে দৈনন্দিন তুলকালাম অবস্থা। তাদের দিকে আলাদা করে নজর রাখার মতো কেউ ছিল না। নির্মলকুমার আগের মতোই 'কাকা' বলে সম্ভাষণ করে এগিয়ে এবং দশরথকে অবাক করে বলে উঠল, 'কুছ্ খবর মিলা, কাকা!'

দশরথ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'নাহিক!'

নির্মলকুমার চাপাগলায় বলল, 'কালীতলাবর্ডারিমে যাকে দেখো, কাকা। হুঁয়া হামরে এক বন্ধু ছে। উসকা নাম ছে শরৎ। খোকাবাবু নাম বোলনেসে ঘর দেখা দেগা। হামরে খোকা খবর ভেজলবা কাল রোজ হুঁয়া মিলামে দেখা তোঁহার বেটিয়াকো।'

দশরথ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আস্তে বলল, 'ঝুট।'

'কাহে?' নির্মলকুমার খুব অবাক হয়ে গেল। 'খোকা ঝুটবোলনেবালা নাহিক গে কাকা!'

দশরথ গলার ভেতর থেকে শব্দ করে বলল. 'হামরে বেটিযা মর গেয়া।' তারপর বেঁটে মোটাসোটা দশরথ থপথপিয়ে চলে গেল। ভিড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

নির্মলকুমার গুম হয়ে সাইকেলে চাপল। সে বুঝতে পেরেছে, দশরথ তার মেয়েকে মন থেকে ত্যাগ করেছে।

কিন্তু পারছে না নির্মলকুমার। রাজকুমারী যেন তারই মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে পালিয়ে গেছে। কাঁটালিয়া স্কুলে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। কত ছোটবেলা থেকে রাজকুমারীকে সে দেখে আসছে। সেই ফ্রকপরা বয়সে সরস্বতী পুজোর দিন ক্লাস ফাইভের ছাত্রীটি কেন হঠাৎ ক্লাস নাইনের ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে কেমন হেসেছিল এবং কেনই বা হেসেছিল, আজও বুঝতে পারে না নির্মলকুমার। কিন্তু তারপর থেকে রাজকুমারীর নাগাল পেতে চাইত নির্মলকুমার। কথাবার্তা যে একেবারেই হত না, তা নয়। কিন্তু ওই বয়সে মনে যে স্বপ্ন-কল্পনা-সাধ জীবনটাকে অস্থির করে রাখে, তা প্রেমভালবাসা না হলেও এমন একটা জিনিস, বুকের ভেতর যেন স্থায়ী দাগ কেটে দেয় একটা ক্ষতচিহ্নের মতো। এতদিন পরে সেই ক্ষত হঠাৎ আবার রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল মেয়েটা।

তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, চেনাজানা লোকেরা তাকে দেখে যেন মুচকি হাসছে- কি না, মান্যবর মোড়লের বেটার বহুই যেন ভেগে গেছে। পৌরুষে ঘা বেজেছে নির্মলকুমারের। ইচ্ছে করলে কি সে একেবারে টাউনের কোনও বাবুর বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে পারত না! কলেজ জীবনে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। ইচ্ছে করলেই প্রেমভালবাসাও করে নিতে পারত না কি? আসলে এমন এক সম্প্রদায়ের ঘরে তার জন্ম, অবচেতনায় জাতপাতের ভয়টা ছিল সবসময় বাসা বেঁধে। তাই সংকোচ হত। শহরের কত মেয়েকে তো সে নিজের জাতপাতের পরিচয় দিতেও পারেনি।

এখন পঁচিশ বছর বয়সের গ্র্যাজুয়েট এবং প্রাইমারি শিক্ষক নিমাই মাস্টার সে। স্কুলে গিয়েও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে, পাছে অন্য মাস্টারমশাইরা তাকে ব্যাপারটা জিগ্যেস করে বসে! তার আত্মীয়কুটুম্ব তার বাবা-মা সবাই বলছে, 'বাঁচ

গেইলি বেটা! বহুত বাঁচ গেইলি তু। ওই খারাপ চরিত্রের মেয়েকে বিয়ে করলে তো যা হবার হত, আমাদের মানইজ্জত থাকত না এতটুকু!

তা ঠিক। তবু মনের মধ্যে দগদগে ঘা চাগিয়ে উঠেছে নির্মলকুমারের। হারামজাদি মেয়ে ভাগলি তো ভাগলি ঐ ম্যাজিক-ওয়ালার সঙ্গে। মাতাল, নচ্ছার এক বাউন্ডুলে। চালচুলো নেই। পৈতে ঝুলিয়ে রাখতে দেখা গেছে বুকে, কিন্তু ওটা তো মিথ্যা হতেই পারে।

নির্মলকুমার মাঝপথ থেকে ফিরে আসছিল। আজ সে স্কুলে যাবে না। তকিপুরের চৌমাথায় এসে ডাইনের পিচরাস্তায় পড়তেই টের পেল বুকে ধাক্কা মারছে শেষ মাঘেব উত্তুরে হাওয়া। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। বাধা ঠেলে লড়াই করার ভঙ্গিতে সে সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল।

কপিলেশ্বরের ঘাটে গঙ্গা নৌকোয় পেবিয়ে নির্মলকুমাব ঈশানকোণে কাঁচা বাস্তায় যখন চলেছে, তখন তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত ঠেকেছে। দিনটা দুপুরের দিকে আরও মেঘলা হয়ে গেছে। বারো কিলোমিটাব নাকববাবব কাঁচা বাস্তার ধুলোয় তার সাইকেল যেমন, তেমনি সেও ভূত হয়ে উঠেছে। কালাতলা বর্ডারে পৌঁছনোব আগেই নির্মলকুমাব পদ্মা দেখতে পাচ্ছিল। পদ্মার বিশালতা দেখামাত্র হঠাৎ যেন তার শরীরটা নেতিয়ে গেল। ওই বিশালতা শূন্যতাব মতো তাব চোখে আটকে গেল। কোথায় এমন করে চলেছে সে, কেন চলেছে, সেটা আব যেন খুঁজেই পাচ্ছিল না, মান্যবর মোড়লেব ছেলে, মামুদপর প্রাইমারি স্কুলেব শিক্ষক নির্মলকুমাব সরকার।..

শরৎ, যাব নাম খোকা, সে কায়েতবাড়িব ছেলে। শহরেব ক[illegible] সহপাঠী ছিল নির্মলকুমারেব। কিন্তু প্রথম বছরেব পরই পড়াশুনো ছেড়ে ব্যবসা করতে যায়। তাব বাবা মস্ত আড়তদাব। একসময় নাকি স্রেফ ছাতুর ব্যবসা করেই বড়লোক হয়েছেন। তাই এলাকায় তাঁব নাম ছাতু কায়েত। বয়স হয়েছে বলে ছেলেদের গদিতে বসিয়েছেন। খোকা বলত, 'কালীতলা বর্ডারেব বাজারে প্রত্যেকটা আড়ত হল গিয়ে স্মাগলিংয়েব ঘাঁটি।' খোকা চোখ তুলে বলত, 'বল না কী ফবেন জিনিস চাই তোর? ঘড়ি না কলম? ট্রান্‌জিস্টাব না টেপরেকর্ডাব। যে ফবেন প্যান্টপিস টাউনে একশো টাকায় কিনবি, আমি তোকে পঁযত্রিশ টাকায় এনে দেব।' নির্মলকুমাব সাদাসিদে থাকতে শিখেছে ছেলেবেলা থেকে। শৌখিনতা তাব পছন্দ নয়। এখনও সে ধুতি আব তাঁতের কাপড়ের পাঞ্জাবি পরে ঘোরে। বাবা মান্যবরেব মতো পার্টিবাজিতে নেই। আবার বাবাব মতো সিগারেটও টানে না। ভাইদেব মতো প্যান্টশার্ট বকমারি ফরেন জ্যাকেট কিংবা টেপরেকর্ডারেও আসক্তি নেই তাব।

আড়তে খোকা গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট টানছিল। নির্মলকুমারকে দেখে একমুখ হেসে বলল, 'আয়! তোর কথাই ভাবছিলাম একটু আগে। যশোদা তাহলে খবর দিয়েছে?'

নির্মলকুমার একটু হাসল মাত্র।

গদিতে কিছু ব্যাপারী আর চাষাভুষো লোকের ভিড়। বাইরে তারাজুতে খন্দ ওজন হচ্ছে। কয়াল হাঁকছে, 'পাঁচ পাঁচ— পাঁচো পাঁচ। ছে ছে- -ছয়ো ছেই ' বাজার জুড়ে মানুষজন. ব্যাপারী, ট্রাক, টেম্পো, গরুমোষের গাড়ি আর শহরের রাস্তার ধারে যেমন থাকে, তেমনি ফরেন প্যান্টের স্তূপ।

খোকা উঠে এল গদি থেকে। নির্মলকুমারের সাইকেলটা এক কর্মচারীর জিম্মায় দিয়ে সে বলল, 'আয় নিমাই!'

কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে, বুঝতে পারছিল না নির্মলকুমার। বাজার ছাড়িয়ে পদ্মার পাড়ে বটতলায় বেদী আর ত্রিশূল পোঁতা। সেই বটের পেছনকার শেকড় নেমে গেছে শান্ত নীল পদ্মার গহন গলে! সেখানে বসে খোকা বলল, 'যশোদার মুখেই সব শুনেছিলাম। তবে তোর ওই রাজকুমারীকে আমি চিনি না। দেখিনি কখনও। যশোদা বলল, আগের রাতে জুয়াড়িদের মেলায় ম্যাজিকের তাঁবুতে একটি মেয়েকে দেখেছে। ওই যে ইলেকট্রিক গার্ল বলে খেলা দেখায়, জানিস তো? সারা গায়ে ইলেকট্রিক জ্বলে ওঠে আর মেয়েটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। তো যশোদাই বলল, প্রোফেসর গাব্বু এবার যে মেয়েটিকে নিয়ে এ খেলা দেখাচ্ছে তাকে রাজকুমারী বলেই মনে হয়েছে। হ্যাঁ—মিসটেক হতেও পারে। জানিস তো? যশোদা কি মাল?'

খোকা দম ফেলে বলল, 'তো আমার একটু ইন্টারেস্ট জাগল। কাল সকালে গেলাম ওদের তাঁবুতে। গিয়ে দেখি, মেয়েটার সিঁথেয় সিঁদুর। হাতে শাঁখা- -নোয়া। উনুনে কেটলি চাপিয়ে পাখার হাওয়া দিচ্ছে। আর ম্যাজিসিয়ান ব্যাটাচ্ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আমার সঙ্গে চেনা নেই। বললাম, কী মশাই? কেমন চলছে খেলা? ব্যাটা কি মাল মাইরি! ভীষণ খাতির-টাতির করে বসাল। তারপর বললাম, আপনার মিসেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? তখন ব্যাটা মেয়েটাকে ডেকে বলল, 'রাজু, এস- -আলাপ করিয়ে দিই।'

নির্মলকুমার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল শুধু।

[illegible]কা ফিক করে হেসে বলল, 'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো বললাম, [illegible] মিসেসের নাম বুঝি রাজকুমারী? অমনি দুজনেই চমকে উঠল। তারপর [illegible] নার্ভাস মুখে বলল, না—ওর নাম রঞ্জিতা। তাই রাজু বলে ডাকি। [illegible]আমার চোখ বাবা! সোজা বললাম, কেন মশাই হেজিটেট করছেন? [illegible]সের বাবার বাড়ি কাঁটালিয়া ঘাটে। আমি সবই জানি। তখন প্রোফেসর [illegible]ত ধরে কি পা ধরে, এই অবস্থা।'

নির্মলকুমাব এতক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাসের [illegible], [illegible]

খোকা বলল, 'কথা দিতে হল, চেপে থাকব! [illegible] ফিরে এসে [illegible] সব বলে পাঠিয়ে দিলাম তোদের গাঁয়ে। এদিকে হয়েছে কি, [illegible] তাব গুটিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে হাওয়া। চল, জায়গাটা দেখাচ্ছি ওই আমবাগানের [illegible] মেলা বসেছে। প্রোয়োসব [illegible] [illegible] ছিল, [illegible] চুলোব ছাই, খুঁটি পোতাব গর্ত, পেঁয়াজের খোসা ' [illegible] হাসতে [illegible] খোকা। শেষে বলল, 'মনে হচ্ছে পদ্মা পেরিয়ে চলে [illegible]। বাজশাহীব [illegible] ঘাট আছে – ওই যে ধু ধু দেখছিস দ্যাখ্।'

নির্মলকুমাব সেদিকে তাকালো। বিশাল নীল জল আব ধুসব বালিব ওপব চডাব ওধাবে দিগন্তবেখাব দিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে গেল। তাবপব বলল, 'একটু চা খেতে ইচ্ছে কবছে বে।'

সন্ধ্যায় হঠাৎ তুমুল ঝড আব শিলাবৃষ্টি। দশবথ খাটিযায় বসে শণেব দডি পাকাচ্ছিল। সববতিযা শাপমন্যি কবছিল হাবামজাদী ভাইঝির নামে। আব ম্যাজিকওয়ালা ছোকবাকে বাণ মাববে কি মাববে না, মারলে বোকা ছোকবিটা যে বিধবা হযেও যাবে সেই সমস্যাব কথা বোঝাতে চেষ্টা করছিল ভাইকে কিন্তু [illegible] ঝডেব হাঁকডানি, চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ, শিলা ও বৃষ্টি, এই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক উপদ্রবে তাব কথা ছেঁডা পাতাব মতো উডে কোথায় ভে[illegible]ল।

ভোবে উঠে শান্ত আব ভিজে পৃথিবীতে পা বাড়িয়ে [illegible]দেখতে গেল বদিবুডি তাব কাকিনীব দশা। [illegible] লগিটা বেঁকে গেছে। আর [illegible] ছিঁড়ে পড়ে আছে উঠোনেব অন্য কোণায়। সববতিযা থমকে দাঁড়াল [illegible]লে বেরিয়ে এল বুক থেকে ঠেলে এল চাপচাপ কান্না।

সেই সময দশবথেব দবজাব ঘন্টি বাজল[illegible] ওপাবেব মোডল মান্যবেবে ছেলে অর্থাৎ তার [illegible] নির্মলকুমাব বাড়ি ঢুকে বলল, '[illegible]

দশবথ তাকাল।

আব নির্মলকুমার হঠাৎ কি এক অবচেতন টানে দৃষ্টি ফেলল বুডি সববতিযাব দিকে। সে চমকে উঠল। তাব খালি বুকেব ভেতব পা ফেলে হেঁটে যাবাব মতো কবে গুনিন বুড়ি পা বাডিযেছে, আব তাব হাতে ঝডে দডি ছিঁডে পড়ে থাকা মবা কাকিনী।

বদ্যিবুডি সববতিয়া সুব ধবে কাঁদতে কাঁদতে কাউকে শাপমন্যি কবতে কবতে মবা কাকিনীকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চলল। নির্মলকুমাব, পাবলে এই শ্মশানযাত্রাব অনুগামী হত। কিন্তু সেও তো একটা ব্যর্থতা।

আড়তে খোকা গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট টানছিল। নির্মলকুমারকে দেখে একমুখ হেসে বলল, 'আয়। তোর কথাই ভাবছিলাম একটু আগে। যশোদা তাহলে খবর দিয়েছে?'

নির্মলকুমার একটু হাসল মাত্র।

গদিতে কিছু ব্যাপারী আর চাষাভুষো লোকের ভিড়। বাইরে তারাজুতে খন্দ ওজন হচ্ছে। কয়াল হাঁকছে, 'পাঁচ পাঁচ—পাঁচো পাঁচ! ছে ছে—ছয়ো ছেই...' বাজার জুড়ে মানুষজন, ব্যাপারী, ট্রাক, টেম্পো, গরুমোষের গাড়ি আর শহরের রাস্তার ধারে যেমন থাকে, তেমনি ফরেন প্যান্টের স্তূপ।

খোকা উঠে এল গদি থেকে। নির্মলকুমারের সাইকেলটা এক কর্মচারীর জিম্মায় দিয়ে সে বলল, 'আয় নিমাই!'

কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে, বুঝতে পারছিল না নির্মলকুমার। বাজার ছাড়িয়ে পদ্মার পাড়ে বটতলায় বেদী আর ত্রিশূল পোঁতা। সেই বটের পেছনকার শেকড় নেমে গেছে শান্ত নীল পদ্মার গহন গলে। সেখান বসে খোকা বলল, 'যশোদার মুখেই সব শুনেছিলাম। তবে তোর ওই রাজকুমারীকে আমি চিনি না। দেখিনি কখনও। যশোদা বলল, আগের রাতে জুয়াড়িদের মেলায় ম্যাজিকের তাঁবুতে একটি মেয়েকে দেখেছে। ওই যে ইলেকট্রিক গার্ল বলে খেলা দেখায়; জানিস তো? সারা গায়ে ইলেকট্রিক জ্বলে ওঠে আর মেয়েটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। তো যশোদাই বলল, প্রোফেসর গাব্বু এবার যে মেয়েটিকে নিয়ে এ খেলা দেখাচ্ছে তাকে রাজকুমারী বলেই মনে হয়েছে। হ্যাঁ—মিসটেক হতেও পারে। জানিস তো? যশোদা কি মাল?'

খোকা দম ফেলে বলল, 'তো আমার একটু ইন্টারেস্ট জাগল। কাল সকালে গেলাম ওদের তাঁবুতে। গিয়ে দেখি, মেয়েটার সিঁথেয় সিঁদুর। হাতে শাঁখা—নোয়া। উনুনে কেটলি চাপিয়ে পাখার হাওয়া দিচ্ছে। আর ম্যাজিসিয়ান ব্যাটাচ্ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আমার সঙ্গে চেনা নেই। বললাম, কী মশাই? কেমন চলছে খেলা? ব্যাটা কি মাল মাইরি: ভীষণ খাতির-টাতির করে বসাল। তারপর বললাম, আপনার মিসেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? তখন ব্যাটা মেয়েটাকে ডেকে বলল, 'রাজু, এস—আলাপ করিয়ে দিই।'

নির্মলকুমার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল শুধু।

খোকা ফিক করে হেসে বলল, 'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো বললাম, আপনার মিসেসের নাম বুঝি রাজকুমারী? অমনি দুজনেই চমকে উঠল। তারপর ব্যাটাচ্ছেলে নার্ভাস মুখে বলল, না—ওর নাম রঞ্জিতা। তাই রাজু বলে ডাকি। যাই হোক, আমার চোখ বাবা। সোজা বললাম, কেন মশাই হেজিটেট করছেন? আপনার মিসেসের বাবার বাড়ি কাটালিয়া ঘাটে। আমি সবই জানি। তখন প্রোফেসর গাব্বু আমার হাত ধরে কি পা ধরে, এই অবস্থা।'

নির্মলকুমার এতক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'তারপর?'

খোকা বলল, 'কথা দিতে হল, চেপে থাকব। কিন্তু ফিরে এসে যশোদাকে সব বলে পাঠিয়ে দিলাম তোদের গাঁয়ে। এদিকে হয়েছে কি, রাতারাতি তাঁবু-টাবু গুটিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে হাওয়া! চল, জায়গাটা দেখাচ্ছি। ওই আমবাগানের ভেতরে মেলা বসেছে। প্রোফেসর গাব্বুর তাঁবু যেখানে ছিল, সেখানে ভোঁ ভাঁ অবস্থা। চুলোর ছাই, খুঁটি পোতার গর্ত, পেঁয়াজের খোসা...' খি খি করে হাসতে লাগল খোকা। শেষে বলল, 'মনে হচ্ছে পদ্মা পেরিয়ে চলে গেছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ি ঘাট আছে—ওই যে ধু ধু দেখছিস—দ্যাখ্!'

নির্মলকুমার সেদিকে তাকালো। বিশাল নীল জল আর ধুসর বালির ওপর চড়ার ওধারে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে গেল। তারপর বলল, 'একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে রে!...'

সন্ধ্যায় হঠাৎ তুমুল ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। দশরথ খাটিয়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল। সরবতিয়া শাপমন্যি করছিল হারামজাদী ভাইঝির নামে। আর ম্যাজিকওয়ালা ছোকরাকে বাণ মারবে কি মারবে না, মারলে বোকা ছোকরিটা যে বিধবা হয়েও যাবে, সেই সমস্যার কথা বোঝাতে চেষ্টা করছিল ভাইকে। কিন্তু বাজের হাঁকড়ানি, চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ, শিলা ও বৃষ্টি, এই প্রচন্ড প্রাকৃতিক উপদ্রবে তার কথা ছেঁড়া পাতার মতো উড়ে কোথায় ভেসে যাচ্ছিল।

ভোরে উঠে শান্ত আর ভিজে পৃথিবীতে পা বাড়িয়ে প্রথমেই দেখতে পেল বদ্যিবুড়ি তার কাকিনীর দশা। লগিটা বেঁকে গেছে। আর কাকিনী দড়ি ছিঁড়ে পড়ে আছে উঠোনের অন্য কোণায়। সরবতিয়া থমকে দাঁড়াল। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। বুক থেকে ঠেলে এল চাপচাপ কান্না।

সেই সময় দশরথের দরজার ঘন্টি বাজলে দশরথ দরজা খুলে অবাক! ওপারের মোড়ল মান্যবরের ছেলে অর্থাৎ তার হতে-না-পারা জামাই এসে হাজির। নির্মলকুমার বাড়ি ঢুকে বলল, 'খবর মিলা কাকা! হামরে কালীতলা বর্ডারিমে ভী...'

দশরথ তাকাল।

আর নির্মলকুমার হঠাৎ কি এক অবচেতন টানে দৃষ্টি ফেলল বুড়ি সরবতিয়ার দিকে। সে চমকে উঠল। তার খালি বুকের ভেতর পা ফেলে হেঁটে যাবার মতো করে গুনিন বুড়ি পা বাড়িয়েছে, আর তার হাতে ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে-থাকা মরা কাকিনী।

বদ্যিবুড়ি সরবতিয়া সুর ধরে কাঁদতে কাঁদতে কাউকে শাপমন্যি করতে করতে মরা কাকিনীকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চলল। নির্মলকুমার, পারলে এই শ্মশানযাত্রার অনুগামী হত। কিন্তু সেও তো একটা ব্যর্থতা।.....

গেছোবাবার বৃত্তান্ত

ঝিলের ধারে বসে ছোটমামা মুগ্ধ চোখে চাঁদ দেখতে দেখতে বলেছিলেন, "আচ্ছা পুটু, সত্যি করে বল তো, ওই চাঁদে আমেরিকানরা হেঁটেছে, বিশ্বাস হয়? অসম্ভব পুটু, অসম্ভব। কবি লিখেছেন, এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো সে-মরণ স্বরগসমান..."

ঠিক এই সময়ই বাঁ দিকে কোথাও আবছা খসখস-মচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। ভাঙা শিবমন্দির ফুঁড়ে মস্ত বটগাছ। হাওয়া-বাতাস বন্ধ। সন্দেহজনক শব্দটা সেই গাছের ভেতর থেকে ভেসে এল।

গা ছমছম করতে থাকল। সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। ছোটমামাকে ইদানীং পদ্যে পেয়েছে। চাঁদ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি নিয়ে শ'খানেক পদ্য লিখে ফেলেছেন। কিন্তু নিছক লিখেও যেন ওঁর তৃপ্তি নেই, জিনিসগুলো অর্থাৎ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি নেড়ে-ঘেঁটে দেখতে বেজায় তৎপর। এদিনই সকালে একটা প্রজাপতির পেছনে যেভাবে ছুটোছুটি করছিলেন। যাই হোক, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানিতেই আমি অস্থির। নিরিবিলি সুনসান ঝিলের ধারে ভাঙা মন্দির নিয়ে কত ভূতের গল্প চালু আছে । দিনদুপুরেই সেদিকটাতে পারতপক্ষে কেউ পা বাড়ায় না। এখন তো সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় চারদিকে যেন একশো ভূত। তার ওপর হঠাৎ বটগাছটা থেকে ওইসব শব্দ।

ভয়ে-ভয়ে বললুম, "ছোটমামা, এবার বাড়ি ফেরা যাক।"

ছোটমামা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছিলেন। একটু রেগে গিয়ে বললেন, "দিলি তো পদ্যটা নষ্ট করে। বেশ একটা লাইন এসেছিল!"

তখনই ধুপ করে শব্দ হল এবং চমকে উঠে দেখলুম, বটতলার চকরা-বকরা আলোছায়ায় কালো কী একটা পড়ল। তারপর সেটা চার পায়ে হেঁটে ফাঁকা জায়গায় গেল, সেখানে ঝলমলে জ্যোৎস্না। হনুমানই হবে তা হলে।

কিন্তু হঠাৎ প্রাণীটা দু'পায়ে সিধে হল এবং সোজা আমাদের দিকে হেঁটে এল। ছোটমামাকে আঁকড়ে ধরেছিলুম সঙ্গে-সঙ্গে। ছোটমামা "পুঁটে" বলে হাঁক ছেড়েই চুপ করে গেলেন। এবার তিনিও প্রাণীটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

প্রাণীটি আমাদের অবাক করে বলে উঠল, "কী রে? ভয় পেয়েছিস নাকি? পাসনে। আমি সেই গেছোবাবা।"

মানুষের গলায় কথা শুনে ছোটমামার সাহস ফিরে তো এলই, পদ্যের লাইনে

বাধা পড়ায় ভেতর-ভেতর খাপ্পা হয়েও ছিলেন। তেড়েমেরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "গেছোবাবা মানে?"

গেছোবাবা খিখি করে হেসে বলল, "সে কী রে? আমার কথা শুনিসনি? আমি গেছোবাবা, গাছে-গাছে থাকি। গাছেই আমার বসবাস। তবে তোরা আজকালকার ছেলে, আমায় চিনবিই বা কী করে? চিনত তোদের ঠাকুরদা, তাদের ঠাকুরদা, তস্য-তস্য ঠাকুরদা! ওরে, বয়সটা তো কম হল না। সেই যেবার লর্ড ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধে জিতে তোদের এই টাউনে ঢুকল..."

"ওয়েট! ওয়েট!" ছোটমামা থামিয়ে দিলেন। "পলাশির যুদ্ধ? মানে...সেভেনটিন ফিফটি সেভেন! তার মানে তুমি বলতে চাও, তোমার বয়স... পুঁটে হিসাব কর তো।"

গেছোবাবা বলল, "খামোকা ছেলেটাকে আঁক কষিয়ে হবেটা কী? তোরা এই যে আমার দর্শন পেলি, সেই তোদের বাপের ভাগ্যি। গড় কর এক্ষুনি। গড় কর!"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গড় করতে যাচ্ছি, ছোটমামা আমার চুল খামচে ধরে আটকালেন। বললেন, "ওয়েট, ওয়েট। যাচাই করে নিই। ওহে গেছোবাবা, তুমি এতকাল বেঁচে আছো বলতে চাও? ফ্রম এইটিন্‌থ সেঞ্চুরি! অমৃত খেয়েছিলে নাকি?"

ছোটমামার বাঁকা হাসি শুনে গেছোবাবা বলল, "খেলেও খেয়েছি, না খেলেও খেয়েছি।"

ছোটমামা চার্জ করলেন, "হেঁয়ালি ছাড়ো। কে তুমি? নাম কী?"

"নাম একটা ছিল বটে! ভুলে গেছি।" গেছোবাবা মাথা চুলকে বললেন, "গাছে বসত করতে গিয়ে গেছোবাবা নাম পেয়েছিলুম। তখনকার লোকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। যে-গাছে থাকতুম, তার তলায় খাবার রেখে যেত। আজকাল কী যে হয়েছে। লোকে আমাকে ভুলেই গেছে রে! বড় দুঃখ হয়।"

ছোটমামা গেছোবাবার গলার নরম স্বর শুনে বোধহয় একটু নরম হলেন। বললেন, "তা আজকাল তুমি খাও কি শুনি?"

"লতাপাতা খাই। কখনও ফলমাকড়টা খাই।" এই বলে গেছোবাবা পাশের একটা ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে চিবোতে শুরু করল। চিবোতে চিবোতে বলল, "এগুলো একটু তিতকুটে। তবে মোটের ওপর মন্দ না। তোরাও খা না! খেয়ে দ্যাখ!"

ছোটমামা কয়েক পা এগিয়ে গেলেন! বুঝলুম, গেছোবাবা সত্যিসত্যি পাতা খাচ্ছে কিনা দেখতে গেলেন। আমি অবাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

ছোটমামা বললেন, "কী অদ্ভুত! তুমি যে দেখছি সত্যিই পাতা খাচ্ছ। ওহে গেছোবাবা, এগুলো খেয়ে তোমার বদহজম হয় না?"

"হলে হয়, না হলেও না হয়" গেছোবাবা ঢেকুর তুলে বলল। "তা অত কথায় কাজ কী তোদের? বড় ভাগ্যে দর্শন পেলি। এবার গড় করে চলে যা। নইলে অমঙ্গল হবে।"

ছোটমামা ফের চার্জ করলেন, "কী অমঙ্গল হবে, শুনি?"

গেছোবাবা বলল, "পুলিশে ধরবে। জানিস তো? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পুলিশে ছুঁলে আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ। নে, গড় কর। গড় কর!"

গেছোবাবা নিজের পা দেখাতে থাকল লম্বা হাতে। চেহারাও লম্বা। জ্যোৎস্নায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সন্ন্যেসিদের মতো ঝাকড়-মাকড় চুলদাড়ি, খালি গা, পরনে কৌপীন। ছোটমামা একটু দোনোমনো করে বললেন, "খামোকা পুলিশে আমাদের ধরবে কেন? আমরা চোর না ডাকাত?"

গেছোবাবা হিঁহিঁ শব্দ করে ভূতুড়ে হাসল। "পাঁচুকে জিজ্ঞেস কবিস সে-সব কথা। পাঁচুকে দর্শন দিয়েছিলুম। ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে গড় করেনি। তাবপব আর কি ছ'মাস ঘানি টানতে হয়েছিল জেলে। এক মাস পাথর ভেঙে-ভেঙে হাত দু'খানায় কড়া পড়ে সে এক অবস্থা! গড কব, গড় কর!"

কথাগুলো শুনতে শুনতে কী এক ভয়ে ঝটপট গড় করে ফেললুম। ছোটমামা একটু তফাতে, বাধা দেবার সুযোগই পেলেন না। গেছোবাবা আশীর্বাদ কবলেন হাত তুলে, "জিতা রহো বেটা!" আব ছোটমামার কী হল, জেদ ধবে দাঁড়িয়ে বইলেন।

গেছোবাবা যেন বাগ কবেই আগের মতো চার পা হল এবং ঠিক হনুমানের মতো দৌড়তে দৌড়তে বটগাছের দিকে নিপাত্তা হয়ে গেল।

এবার ছোটমামা আরও অবাক হয়ে বললেন, "কী অদ্ভুত! মানুষ না হনুমান?" তারপর আমার দিকে তেড়ে এলেন, "তুই ওই হনুমানটাকে গড় করলি? রামায়ণের হনুমানজি হলেও কথা ছিল। তুই কী রে পুঁটু?"

এইসময় পেছন দিক থেকে টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপব। তারপর মাটি কাঁপিয়ে ধুপধাপ শব্দ করে কেউ এগিয়ে আসতে-আসতে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "কারা ওখানে? কী হচ্ছে রাতবিরেতে, অ্যাঁ?"

ছোটমামা সঙ্গে-সঙ্গে কেঁচো হয়ে গেলেন, বললেন, "বড়বাবু নাকি? নমস্কার, নমস্কার!"

থানার দারোগা বঙ্কুবাবুর এমন অতর্কিতআবির্ভাবে আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল। গেছোবাবার কথাটা তা হলে হাতেনাতে ফলতে চলেছে।

লোকে বলাবলি করে, এমন ডাকসাইটে দুঁদে পুলিশ অফিসার নাকি কেউ কখনও দেখেনি। চোরডাকাত তল্লাট ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমাদের ছোট্ট শহরে আজকাল প্রচুর শান্তি।

বঙ্কুবাবু প্রকাণ্ড মানুষ। টর্চ নিভিয়ে বললেন, "হুম! আপনারা এখানে কী করছেন?"

ছোটমামা কাঁচুমাচু হেসে বললেন, "চাঁদ দেখছিলুম স্যার। দেখুন না, কেমন সুন্দর চাঁদ—ফুল-মুন। এমন নিরিবিলি জায়গায় চাঁদ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। তাই....."

বঙ্কুবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, "চাঁদ! চাঁদের কী দেখার আছে? অ্যাঁ? নিরেট পাথর। বাতাস নেই। প্রাণ নেই। শ্মশান। চালাকি ছাড়ুন!"

ছোটমামা বলে উঠলেন, "আমি যে কবি, স্যার! পোয়েট!"

"পদ্য লেখেন?" বঙ্কুদারোগা অট্টহাসি হাসলেন, যেন ভূমিকম্প হতে থাকল। "পদ্য লিখেই বাঙালি জাতটা উচ্ছন্নে গেছে। কখনও পদ্য লিখবেন না। আর, একটু আধটু যদি-বা লেখেন, চাঁদ-টাঁদ নয়। চাঁদে আছেটা কী মশাই?" বলে আমার ওপর টর্চের আলো ফেললেন। "এটি কে?"

"আমার ভাগনে স্যার! পুঁটু।"

"একেও লাইন ধরিয়েছেন দেখছি! অ্যাই খোকা, কোন্ ক্লাসে পড়ো?"

ঢোক গিলে বললুম, "ক্লাস এইট।"

"পড়াশোনা নেই?" বঙ্কুবাবু ধমক দিলেন। "কতগুলো পদ্য লিখেছ অঙ্কের খাতায়? আমার ভাগনে পুঁচকে অঙ্কের খাতায় পদ্য লিখেছিল। তাকে কি করেছিলুম জানো?"

ভয় পেয়ে বললুম, "আমি পদ্য লিখিনে। ছোটমামা বললেন, বেড়াতে যাচ্ছি, তাই সঙ্গে এলুম। এসেই গেছোবাবাকে দেখে—"

ছোটমামার চিমটি খেয়ে থেমে গিয়েছিলুম। বঙ্কুবাবু বললেন, "কী বললে, কী বললে? গেছোবাবা না কী যেন?"

"আমি বলছি স্যাব।" ছোটমামা বললেন, "একটা অদ্ভুত লোক স্যার। একটু আগে একটা লোক—জাস্ট একটা হনুমান সার! গাছেই নাকি থাকে। সেভেনটিন ফিফটি সেভেন—"

এরপর কীভাবে এবং কেন কী ঘটল গুছিয়ে বলতে পারব না। বঙ্কুবাবু হুইস্‌ল বাজিয়ে দিলেন। আর ধুপধুপ শব্দে একদঙ্গল কনস্টেবল এসে পড়ল কোত্থেকে। বঙ্কুবাবু ছোটমামাকে দেখিয়ে বললেন, "পাকড়ো ইসকো। খোকাবাবুকো নেহি। ঔর রামধারি! তুম্ খোকাবাবুকো ঘর পঁহুচা দো।—"

বাবা আমার মুখে তাঁর শ্যালকের খবর পেয়েই থানায় দৌড়েছিলেন। আমাকে ঘিরে ভিড় ঘরের ভেতরই। মা, পিসিমা, দিদি, ঠাকুমা এবং শেষে ঠাকুরদা ও পিসেমশাইও চারদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে জেরবার করছিলেন। ছোটমামাকে কেন পুলিশে ধরল? চাঁদ দেখা কি বেআইনি? গেছোবাবার দর্শনও কি বেআইনি?

গেছোবাবার কথা বলতেই ঠাকুমা চমকে উঠে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। কপালে ঠেকানো জোড়হাত, চোখ বন্ধ, ঠোঁট কাঁপছিল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ঠাকুরদার দিকে তাকালেন। ঠাকুরদা আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠাকুমা আমাকে কাছে টেনে বললেন, "আমি জানতুম। ঠিক জানতুম, বাবা ঝিলের ধারে শিবতলা তল্লাটেই আছেন। কেউ আমাকে পাত্তা দিত না।"

পিসেমশাই বললেন, "এই গেছোবাবা ব্যাপারটা ঠিক মাথায় আসছে না। এটার সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন—"

পিসিমা চোখ কটমট করে বললেন, "তুমি তো নাস্তিক। তোমার মাথায় অনেক কিছু আসে না। সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন—সবখানেই সায়েন্স খাটে না। ও মা, বলো না!"

উনি ঠাকুরমার দিকে তাকালে ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে একটু করুণ হাসলেন। "তখন তোদের জন্মই হয়নি। ঝিলের ওদিকটায় সে কী জঙ্গল! দিনদুপুরে বাঘ বেরোত। সেই সময়কার কথা। তো প্রথম দর্শন পেয়েছিল রামু ধোপার বাবা রঘু। ঝিলে কাপড় কাচতে যেত সে। দিনমান ঘাসের ওপর কাপড়গুলো শুকোতে দিত। শিবতলার ছায়ায় গিয়ে বসে থাকত। তারপর..."

দিদি বিরক্ত হয়ে বলল, "আহা। আসল কথাটা বলো।"

"রঘুই প্রথম দর্শন পায়।" ঠাকুমা ভক্তিতে গদ গদ হয়ে বললেন, "ধুপ করে গাছ থেকে পড়লেন। রঘুকে বললেন, 'কী চাস বল?' রঘুটা ছিল বড্ড বোকা। বলল কী, টাউনের সব কাপড় যেন কাচতে পাই!"

ঘর জুড়ে হাসি ফুটল। পিসিমা বললেন, "তাই বলল রঘু? কী বুদ্ধি!"

ঠাকুমা বললেন, "তবে বাবার মাহাত্ম্য রে। রঘু যে-কাপড়ই কাচত, তাই একেবারে ঝকমকে হয়ে উঠত। শেষে সোডা না, সাবান না, শুধু জলে চুবোলেই ময়লা কাপড় সাফ। এদিকে গেছোবাবার খবর রটে গেছে। টাউনসুদ্ধু লোক ঝিলের জঙ্গলে যায়। শিবতলায় যায়। কেউ দর্শন পায়। কেউ পায় না। বাবা থাকেন গাছে। গাছেই তপতুপ করেন।" বলে ঠাকুরদার দিকে ঘুরলেন। "বলো না, কীভাবে দর্শন পেয়েছিলে?"

ঠাকুরদা গম্ভীর মুখে বললেন, "আমার ছিল শিকারের নেশা। সেবার ঝিলের

জঙ্গলে একটা বাঘ বড় বেশি উপদ্রব করছিল। বন্দুক নিয়ে বাঘটা মারতে গেছি, হঠাৎ একটা গাছ থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। চমকে উঠে দেখি, গাছের ডালে এক সাধুবাবা। বললেন, খবরদার বাঘ মারবিনে। বাঘটা আমার এক চেলা। তারপর কথাটা বলেই এক গাছ থেকে আর-এক গাছে, ঠিক যেন...”

দিদি বলে উঠল, ‘টারজানের মতো! টারজানের মতো!”

ঠাকুরদা তাঁর গল্পে বাধা পড়ায় খাপ্পা হয়ে ধমক দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাবা তাঁর ছোটশ্যালককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাবার মুখে হাসি। ছোটমামার তুম্বোমুখ।

বাবা বললেন, “বঙ্কুবাবুর কাণ্ড! আর ইনিও এমন বুদ্ধু যে নিজের পরিচয়ও দেননি!” ছোটমামার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন বাবা। “বলবি তো আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক? বঙ্কুদারোগা আমার চেনা লোক।”

পিসেমশাই বললেন, “কিন্তু ওকে হঠাৎ অ্যারেস্ট করল কেন?”

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, “পাঁচু-চোরের ব্যাপার আর কী?”

ঘরসুদ্ধু সবাই অবাক হয়ে একগলায় প্রশ্ন করলেন, “তার মানে? তার মানে?”

“কী আশ্চর্য!” বাবা একটু রেগে গেলেন, “ক'মাস আগে পাঁচু আমাদের রান্নাঘরে চুরি করতে ঢুকেছিল। হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। ভুলে গেলে?”

ঘরসুদ্ধু হাসলেন সব্বাই। “সেই পাঁচু! ভাত-চোর পাঁচু!”

“সেই পাঁচু।” বাবা বললেন, “বঙ্কুবাবুর হাতে খবর আছে, ফেরারি আসামি পাঁচু নাকি ঝিলের ওদিকে গাছে লুকিয়ে আছে। গাছে ডেরা বেঁধেছে। দৈবাৎ কেউ দেখে ফেললে বলে, “আমি সেই গেছোবাবা।”

মা ফোঁস করে উঠলেন, “তা নান্টুর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?”

বাবা ছোটমামার দিকে তাকিয়ে এবার মুচকি হাসলেন, “বঙ্কুবাবু ভেবেছিলেন, নান্টু পাঁচুর কাছে হয়তো চোরাইমাল কিনতে ঝিলের ধারে ঘাপটি পেতে ছিল।”

ছোটমামা রাগ করে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খুব হাসাহাসি চলতে থাকল। এক ফাঁকে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। তারপর বাগানের দিকে ঘরটাতে গিয়ে দেখি, ছোটমামা তুম্বো-মুখে বসে আছেন। এই ঘরটাতে ছোটমামা আর আমি থাকি। বললুম, “ছোটমামা! পুলিশ আপনাকে মারেনি তো?”

ছোটমামা ভেঙচি-কাটার ভঙ্গিতে বললেন, “অত সোজা? আমার গায়ে হাত তুললে কী হত জানিস?”

“কী হত ছোটমামা?”

ছোটমামা ভরাট গলায় বললেন, "আমি কবি। কবির গায়ে পুলিশ হাত তুললে কী হত, তুই-ই ভাব। বাহাত্তর লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার কবি হইহই মিছিল করে এসে... হুঁ এত সোজা?"

কথাটা মনে ধরল। বললুম, "আচ্ছা ছোটমামা, গেছোবাবা কি সত্যিই পাঁচু-চোর?"

"হ্যাঁ," ছোটমামা বাঁকা হাসলেন। "তুই তো হাঁদারাম। তাই একটা চোরের পায়ে গড় করলি। আমি ঠিকই টের পেয়েছিলুম বলে গড় করিনি।"

কথাটা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া গেছোবাবা বলেছিল, তাকে গড় না করলে পুলিশে ধরে। ছোটমামাকে তার একটু পরেই পুলিশে ধরল। কিন্তু ছোটমামার এখন যা মুড, সে-কথা বলা যাবে না। এও বলা যাবে না যে, গেছোবাবা যদি সত্যিই পাঁচু-চোর হয়, তা হলে গাছের পাতা কচমচিয়ে খায় কী করে? তার চেয়ে বড় কথা, গেছোবাবা নিজেই বলেছিল, পাঁচু তাকে গড় করেনি বলে তাকে জেলে ঘানি টানতে আর পাথর ভাঙতে হয়েছিল।

তা ছাড়া একজন ছিঁচকে চোর পলাশির যুদ্ধ আর লর্ড ক্লাইভের কথা জানবে কী করে? চোরেরা কি ইতিহাস-বই পড়তে পারে? বড় চোর হলেও কথা ছিল, পাঁচু তো নেহাত ছিঁচকে চোর। উঁহু, তাও না—স্রেফ ভাত-চোর।...

ছোটমামার এ রাতে মন খারাপ। দিদি কতবার খেতে ডাকতে এল। বললেন, "খিদে নেই।" শেষে মা এলেন। সাধাসাধি করার পর ছোটমামা বললেন, "পরে খাব'খন!"

মা রাগ করে বললেন, "রাত দশটা বাজে। আর কতক্ষণ হেঁসেল পাহারা দেব?"

তখন ছোটমামা বললেন, "ঠিক আছে। টেবিলে রেখে যাও। সময়মতো খাব।"

বাড়ির কাজের লোক ভুতো ছোটমামার রাতের খাবার নিয়ে এল। টেবিলে ঢাকা দিয়ে সে চলে যাচ্ছে, ছোটমামা ডাকলেন, "ভুতো, শোনো।"

ভুতো বিনীতভাবে বলল, "মন খারাপ করতে নেই দাদাবাবু। নতুন দারোগাবাবু লোকটা ওই রকমই। যাকে-তাকে চোর বলে ধরে হাজতে ঢোকাচ্ছেন। পাঁচু কি কম দুঃখে..." বলেই সে থেমে গেল। ছোটমামা গলা চেপে বললেন, "পাঁচুকে তুমি চেনো?"

"খুব চিনি," বলে ভুতো ফিক করে হাসল। "এ টাউনে ওকে কে না চেনে?"

"পাঁচু গাছে চড়তে পারে?"

"হুঁ।"

"হনুমানের মতো চার পায়ে দৌড়তে পারে?"

"হুঁ।"

ছোটমামা ভেংচি কাটলেন। "হুঁ। খালি হুঁ। তুমি দেখেছ কখনও?"

ভুতো গেছোবাবার ভঙ্গিতে বলল, "আজ্ঞে, দেখলেও দেখেছি, না দেখলেও না দেখেছি।"

এইতেই ভীষণ চটে গিয়ে ছোটমামা বললেন, "তুমিও দেখছি গেছোবাবার এক চেলা!"

ভুতো তক্ষুনি কপালে দু'হাত জোড় করে ঠেকিয়ে বলল, "রাতবিরেতে ও নাম মুখে আনবেন না দাদাবাবু! আবার ঝামেলায় পড়বেন।"

"খুব হয়েছে, যাও!" ছোটমামা গম্ভীর মুখে বসে পা দোলাতে থাকলেন।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়ব ভাবছি, হঠাৎ ছোটমামা আস্তে ডাকলেন, "পুঁটে!" দেখি, ছোটমামা মিটিমিটি হাসছেন। ফিসফিস করে বললেন, "চল, বেরিয়ে পড়া যাক। গেছোবাবা-ধরা ফাঁদ পাতব, বুঝলি? সেজন্যই চালাকি করে আমার খাবারটা এ-ঘরে আনিয়ে রাখলুম। ওঠ, দেরি করা ঠিক নয়।"

এমন একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের লোভ সামলানো কঠিন। চুপিচুপি দু'জনে বাগানের দিকের খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লুম। ছোটমামার হাতে তাঁর খাবারের থালা। ঝিলের কাছাকাছি গিয়ে বললেন, "ফাঁদটা বুঝতে পারছিস তো? না পারিস তো কথা নেই। চুপচাপ দেখবি, কী করি!"

জ্যোৎস্নাটা এখন আরও ঝলমলে। ঝিলের ধারে শিবতলার পর নবাবি আমলের ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আর ঘন জঙ্গল। গা ছমছম করছিল। একখানে খানিকটা খোলা ঘাসজমিতে পৌঁছে ছোটমামা দাঁড়ালেন। একটু কাসলেন। তারপর ডাকলেন, "গেছোবাবা, আছ নাকি? ও গেছোবাবা!"

কিন্তু কোনো সাড়া এল না। ছোটমামা একটু গলা চড়িয়ে বললেন, "গেছোবাবা! তখন গড় করিনি তোমায়। তাই সত্যিই পুলিশে ধরেছিল। এবার দর্শন দাও গড় করি। ও গেছোবাবা তোমার জন্যে খাবারদাবার এনেছি! কাম ডাউন গেছোবাবা, কাম ডাউন!"

এতক্ষণে গাছপালার ভেতর গাঢ় ছায়ায় ধুপ করে শব্দ হল। তারপর সত্যিই গেছোবাবা চারপেয়ে প্রাণীর মতো বেরোল। খোলা জায়গায় দু'পেয়ে হয়ে প্রথমে অদ্ভুত হিঁ হিঁ হাসি হাসল। তারপর বলল, "খাবার এনেছিস? দে, দে, খাই। পরে গড় করিস। ওঃ কতকাল পরে মানুষের খাবার খাব রে!"

বলেই ছোটমামার হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিয়ে খুব শব্দ করে খেতে থাকল। ছোটমামা বললেন, "এবার গড় করি?"

"তা করলেও করতে পারিস, না করলেও না পারিস।"

ছোটমামা গড় করে বললেন, "আচ্ছা গেছোবাবা, তুমিই কি পাঁচু?"

"তা বললেও বলতে পারিস, না বললেও পারিস।"

"তুমি গাছে বসত করলে কেন পাঁচু—সরি গেছোবাবা?"

"বঙ্কুদারোগার ভয়ে।" গেছোবাবা ফোঁস করে নাক ঝাড়ল খেতে খেতে। "পেটের বড় জ্বালা রে, বুঝলি তো?"

"বুঝলুম। কিন্তু চুরিচামারি না করে কারও বাড়ি কাজকর্ম করলেই তো..."

গেছোবাবা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল, "কাজ দিলে তো করব? একবার পেটের দায়ে একটা বদনাম রটে গেলেই কেলেঙ্কারি না? তার ওপর জেল খাটলে তো কথাই নেই।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। গেছোবাবা থালা চেটেপুটে শেষ করে চার-পা হল। ঝিলের ধারে চলে গেল। ছোটমামা আর আমিও তার পিছু পিছু দৌড়ে গেলুম। জল খেয়ে থালা রগড়ে ধুয়ে ঢেকুর তুলে গেছোবাবা বলল, "বেঁচেবত্তে থাক বাবারা! এই নে তোর থালা। বাড়ি চলে যা। নইলে নতুন দারোগাবাবুর পাল্লায় পড়ে ঝামেলা হবে।"

ছোটমামা বললেন, "যাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো মানুষ পাঁচু, সরি, গেছোবাবা! তুমি এমন হনুমানের মতো দৌড়তে আর গাছে গাছে বেড়াতে পার কি করে?"

"অভ্যেস রে, অভ্যেস! সার্কাস দেখিসনি? তা ছাড়া কথায় বলে, ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে চড়ে না। আমি তো মানুষ।"

"বুঝলুম। কিন্তু গাছের পাতা খাও কেন?"

"সেও অভ্যেস। টাউনে ঢুকতে না পেলে কী করব? গাছে-গাছে ঘুরি, গাছের পাতা খাই।" বলে গেছোবাবা হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। "তোদের মনে বড় দয়া বাবারা? তোদের ভাল হবে। আমি যাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আহা! কতকাল মানুষের খাবার খাইনি রে! খাওয়ামাত্র ঢুলুনি চেপেছে।"

বলে ফের একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে গেছোবাবা চার-পা হল। জ্যোৎস্না পেরিয়ে গাঢ় ছায়ায় সে অদৃশ্য হয়ে গেলে ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কী বুঝলি?"

বললুম, "কিছু না।"

"তুই একটা হাঁদারাম! আয়, বাড়ি ফিরি।" বলে ছোটমামা হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে কেন যেন ধরা গলায় ফের বললেন, "বড় হ। তখন সব বুঝবি। তবে বুঝলি পুঁটু, বঙ্কুবাবু তখন হয়তো ঠিকই বলেছিলেন। চাঁদ-টাদ বোগাস! কী আছে চাঁদে? নিরেট পাথর। প্রাণ নেই। বাতাস নেই। শ্মশান।"

ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদটার দিকে একবার তাকালুম। অবিকল গেছোবাবার ভঙ্গিতে বলতে ইচ্ছে করছিল, তা হলেও হতে পারে, না হলেও না হতে পারে।...

তিন আঙুলে দাদা

বেচারাম এসে ঠাকুমাকে গড় করে বলল, "এবার একটা কিছু করুন দিদিঠাকরুণ। ব্যাটাচ্ছেলে বড্ড বেশি জ্বালাচ্ছে। আমি যে এর পর ফতুর হয়ে যাব।"

আমি বারান্দায় শতরঞ্জিতে বসে ভন্তুমাস্টারের ধমক খাচ্ছিলাম। ঠাকুমা কাছাকাছি থাকলেই দেখেছি ওঁর তর্জনগর্জন বেড়ে যায়। কিন্তু এই সাতসকালে বিস্কুটওয়ালা বেচারামের হঠাৎ মুখ চুন করে এসে ঠাকুমাকে গড় এবং ওই নালিশ! ভন্তুমাস্টার আমাকে ভুলে গিয়ে চোখ টেরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠাকুমা ফুলবাগানের সেবাযত্ন করছিলেন। হাতে একটা খুরপি। বললেন, "নাক কাটা না তিন আঙুলে?"

বেচারাম করুণ মুখে বলল, "আজ্ঞে তিন আঙুলে। নাক কাটা তো মানুষজনের সাড়া পেলেই লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তিন আঙুলে মহা ধড়িবাজ। গাছের ডালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তলা দিয়ে কেউ গেলেই হয় চুল টেনে দেয়, নয়তো কানে খিমচি কাটে। মিত্তিরমশাইয়ের জামাইয়ের কানে—"

ঠাকুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ক'খানা বিস্কুট নিয়েছে তা-ই বল।"

"তিনখানা খাস্তা, একখানা কিরিমকেক, আড়াইখানা নিমকি।" বেচারাম ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ফের বলল, "এখনও পুরো হিসেব করে দেখিনি। মাথার ঝাঁকায় পেলাস্টিক মোড়া ছিল। সেই পেলাস্টিক তুলে, কীরকম হাতসাফাই ভাবুন!"

ঠাকুমা গম্ভীরমুখে বললেন, "প্লাস্টিক তুললেই তো শব্দ হবে। তোর ভুল হচ্ছে না তো বেচু?"

বেচারাম জোরে মাথা নেড়ে বলল, "তিন আঙুলে কে ছিল মনে নেই দিদিঠাকরুণ?"

"হুঁ। শুনেছি পকেটমার ছিল। বাবুগঞ্জের হাটে ধরা পড়ে নাকি ওই অবস্থা।"

ভন্তুমাস্টার বলে উঠলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম মাসিমা। মারের চোটে একখানা হাত ভেঙে গিয়েছিল। অন্য হাতের আঙুলের দুটো হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে সেই হাতখানা আর অন্য হাতের দুটো আঙুল কেটে বাদ দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবুরা। সেইজন্যই তো তিন আঙুলে নাম হয়েছিল।"

ঠাকুমা চোখ কটমটিয়ে বললেন, "ভন্তু, পুঁটুকে আঁক কষাও। হাফইয়ারলিতে আঁকে গোল্লা পেয়েছে।"

ভন্তুমাস্টার ঘুরে গর্জন করলেন, "একটা বানর ছয় ফুট উচ্চ খুঁটিতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মিনিটে ছয় ইঞ্চি উঠিয়া দুই ইঞ্চি নামিয়া যাইতেছে। এইরূপে ছয় ফুট উঠিতে তাহার কতক্ষণ সময় লাগিবে?"

আমার কান ঠাকুমা এবং বেচারামের দিকে। বেচারাম বলল, "মাথার ঝাঁকায় যে টান পড়েছিল দিদিঠাকরুণ!"

ঠাকুমা বললেন, "তুই ওকে দেখতে পেলি?"

"নাই। ঘুরঘুটে আঁধার। তার ওপর টিপটিপিয়ে বিষ্টি। ষষ্ঠীতলা কেমন জায়গা তা তো জানেন।"

"তুই এখন আয় বেচু। অমি দেখছি কী করা যায়।" বলে ঠাকুমা একটা কুলগাছের মাটিতে খুরপির কোপ বসালেন। বেচারাম তুম্বোমুখে চলে গেল।

বানরটাকে খুঁটির ডগায় ভন্তুমাস্টার চড়াতে পারলেও আমি পারলাম না। ষষ্ঠীতলার পর একটা খাল আছে। খালের ওপর কাঠের সাঁকো। ওই পথেই আমাকে রোজ স্কুল যেতে-আসতে হয়। ছুটির পর স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরতে আঁধার ঘনিয়ে আসে। খালটা গ্রামের শেষদিকটায়। এ পাড়ায় আমার স্কুলের সঙ্গী বলতে কেতো আর টোটো। টোটো ব্যাকে খেলে। কেতো গোলে। আমি কোন-কোনদিন হাফব্যাকে চান্স পাই। কিন্তু টোটো যতই গোঁয়ার হোক, ওর ওপর ভরসা রাখা কঠিন। খুব দৌড়বাজ যে! বেগতিক দেখলেই উধাও হয়ে যায়।

আর কেতোর স্বভাব হল ভয় পেলেই আমাকে জাপটে ধরা। ভাবনায় পড়ে গেলাম।

আমাদের গাঁয়ে অনেকরকম ভূত আছে জানতাম। কিন্তু কখনও তাদের সামনাসামনি দেখতে পাইনি। একজনের নাম ছিল 'কাঁদুনে'। সে নাকি খালের ধারে কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়। একজনের নাম 'হাসুনে'। সে রাতবিরেতে খালি হেসে বেড়ায় হি হি করে। 'কাতুকুতু' নামে এক বেজায় দুষ্টু ভূতছিল। সে একলা দোকলা মানুষজন পেলেই তাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করত। 'হেঁচো ভূত' আমাদের বাগানে এসে নাকি খুব হাঁচত। আর রামবাবুদের বাঁশবনে ছিল এক 'বেহালা-বাজিয়ে' ভূত। দিনদুপুরেও তার বাজনা শোনা যেত। একবার কেতোর সঙ্গে কঞ্চি কাটতে ঢুকে তার বেহালা শুনে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। তার বাজনার সুর বড় বিচ্ছিরি।

কিন্তু 'নাক্ কাটা' আর 'তিন আঙুলে'-র কথা সেই প্রথম শুনলাম।

বোঝা গেল এক পকেটমার মরে তিন আঙুলে হয়েছে। কিন্তু নাক কাটাটা কে? ভন্তুমাস্টার চলে যাওয়ার পর ঠাকুমার কাছে জেনে নেব ভাবছি, এমন সময় বেচারামের দাদা কেনারাম এসে গড় করল। ঠাকুমা বললেন, "তোর আবার কী হল রে কিনু? দুধে জল মিশিয়ে সিঙ্গিমশাইয়ের চাঁটি খেয়েছিস নাকি?"

কেনারাম কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "না দিদিঠাকরুন। সর্বনাশ হয়ে গেছে। নাক কাটা আমার এক হাঁড়ি দুধ নাক দিয়ে টেনে নিয়েছে। কাল সন্ধ্যেবেলা দুধটা জ্বাল দিয়ে রেখেছিলাম। সকালে দেখি একটি ফোঁটাও নেই।"

"তুই কী করে জানলি নাক কাটাই দুধ খেয়েছে?"

"আজ্ঞে, আমার মেয়ে ইমলি দেখেছে। আমি গিয়েছিলাম রামবাবুদের গোরু দুইতে। ইমলির মা পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়েছিল। ইমলি একা ছিল। বলল কী, একটা রোগাটে কালো কুচকুচে লোক পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছিল। তার নাক নেই। ইমলি তা-ই দেখে তো ভয়ে কাঠ। লোকটা দুধের হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে চোঁ-চোঁ করে সব শুষে নিয়ে পালিয়ে গেল।"

ঠাকুমা গুম হয়ে বললেন, "হুঁ। দেখছি।"

কেনাবাম কাকুতিমিনতি করে বলল, "দেখছি নয় দিদিঠাকরুন। এর একটা পিতিকার আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। শুনলাম কাল সন্ধ্যেবেলা বেচুরও সর্বনাশ হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না দিদিঠাকরুন, নাক কাটা আর তিন আঙুলো সবাইকে ছেড়ে আমাদের দু'ভাইয়ের পেছনে লাগল কেন? আমরা দু'ভাই কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমরা ওদের কী করেছি?"

ঠাকুমা একটু ভেবে বললেন, "হ্যাঁ রে কিনু, পাঁচুকে তুই তো দেখেছিস?"

কেনারাম ভুরু কুঁচকে বলল, "পাঁচু, মানে ঝাপুইহাটির সেই পাঁচু চোর?"

"আবার কে?" ঠাকুমা একটু কষ্টমাখা হাসি ফোটালেন মুখে। "পঞ্চগ্রামী বিচারে পাঁচুর নাক কেটে দিয়েছিল। তা পাঁচুর বিরুদ্ধে তুই সাক্ষী দিসনি তো?"

কেনারাম প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর আস্তে বলল, "সে তো অনেকদিনের কথা। সাক্ষী দিইনি, তবে পঞ্চগেরামীর সময় বারোয়ারিতলায় ছিলাম বটে। সবাই পাঁচুর নাককাটার বিচারে হইচই করে সায় দিল। তখন আমিও দিয়ে থাকব। কিন্তু কথা হচ্ছে, নাক কেটেছিল তো নোলে। তার কোনও ক্ষতি আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে তো শুনিনি দিদিঠাকরুন!"

ঠাকুমা কেমন রহস্যময় হাসলেন এবার। "হবে কী করে? হলেও বা জানবি কী করে? নোলেও তো কবে মরে গেছে শুনেছি!"

কেনারাম আবার ঠাকুমাকে প্রতিকারের নালিশ জানিয়ে চলে গেল। আমার এতক্ষণে অবাক লাগল। আজ বেচারাম-কেনারাম ঠাকুমার কাছে নালিশ জানাতে এল। সেদিন মিত্তিরমশাই তাঁর জামাইয়ের কানে কে চিমটি কেটেছে বলতে এসেছিলেন। কাল ভেঁটুবাবুও ক্রাচে ভর করে ঠাকুমার কাছে কী যেন বলতে এসেছিলেন। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি এবং 'হাঁচি' কথাটাও কানে এসেছিল। কিন্তু সবাই ঠাকুমার কাছে ভূতের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে আসছে কেন?

না বলে পারলাম না, "ঠাকুমা, তুমি বুঝি ভূত জব্দ করতে পারো?"

ঠাকুমা চোখ কটমটিয়ে বললেন, "স্কুলের সময় হয়ে এল। চান করতে যাও।"

সেদিনই স্কুলের ছুটির পর ফুটবল খেলে কেতো আর টোটোর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে কেনারাম-বেচারামের গল্প শোনাচ্ছিলাম। খালের সাঁকোর কাছে এসে টোটো বলল, "আজ এসপার-ওসপার করে তবে বাড়ি যাব। পুঁটু, আমার বই খাতা ধর। কেতো, সেদিনকার মতো পুঁটুকে জাপটে ধরবিনে বলে দিচ্ছি। এক কিকে তোকে মাঠে ফেরত পাঠাব, হ্যাঁ!"

কেতো ভয়ে-ভয়ে বলল, "তোর প্ল্যানটা কি?"

টোটো চাপা গলায় বলল, "তোরা ওই শিবমন্দিরের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবি। আমি ষষ্ঠীতলার গাছে উঠে ওত পাতব। মনে হচ্ছে, তিন আঙুলে বেচুদার বিস্কুটের লোভে ওই গাছে উঠবে। বেচুদা তো ওখান দিয়েই যাবে। ক্লিয়ার?"

কেতো বলল, "টোটো, তিন আঙুলে যদি তোকে গাছ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়?"

টোটো ঘুসি দেখিয়ে বলল, "একখানা আপারকাট অ্যায়সা মারব যে, তিন আঙুলে এসে খালের জলে পড়বে।"

বেলা পড়ে এসেছে। নিবিবিলি খালের দু'ধারে গাছপালা কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাখিদের হল্লা কমে যাচ্ছে। ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে কেতোর সঙ্গে চলে গেলাম। ষষ্ঠীতলায় একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। টোটো গাছে উঠে গেল। তারপর আর সময় কাটতে চায় না। আঁধারে সব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বুক ঢিপঢিপ করছে অজানা ভয়ে। গোঁয়ার টোটোর পাল্লায় পড়ে কী বিপদ কোন্‌দিক থেকে এসে যাবে, কে জানে! পোকামাকড়ের ডাক বেড়ে গেল এতক্ষণে। জোনাকি জ্বলতে দেখছিলাম এখানে-ওখানে। কেতো ফিসফিস করে বলল, "পুঁটু, বেচুদা এখনও ফিরছে না কেন রে?"

সেই সময় ষষ্ঠীতলার গাছের ওপর টোটোর চেঁচানি শোনা গেল। "অ্যাই! কী হচ্ছে? হি হি হি হি.....আবার?.....হি হি হি হি...আরে, মরে যাব!...হি হি হি.. ওরে বাবা! হি হি হি হি....."

তারপর ধঁপাস শব্দ। চেঁচিয়ে উঠলাম, "টোটো। টোটো!"

"হি হি হি হি...মরে যাব। সত্যি। হি হি হি হি.....ওরে বাবা! হি হি হি হি..."

বললাম, "কেতো। আয় তো দেখি!"

কেতো পাছে আমাকে জাপটে ধরে, তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে দৌড়ে গেলাম।

গিয়ে দেখি, টোটো হি হি হি হি করে হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেতো বলল, "সর্বনাশ! টোটো কাতুকুতুর পাল্লায় পড়েছে! পালিয়ে আয় পুটু!'

কেতো পালানোর আগেই গাছ থেকে পাতা খসে পড়ার মতো কেউ পড়ল এবং কেমন বিচ্ছিরি গলায় বলে উঠল, "চোখ গেলে দেব। কান মলে দেব। ছাড় হতভাগা!"

টোটোর হাসি থেমে গেল। সে ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর সটান উধাও হয়ে গেল। কেতো আমাকে জাপটে ধরে বলল, "পুটু, এবার কী হবে?"

গাছ থেকে সদ্য লাফিয়ে পড়া ছায়ামূর্তি তেমনই বিদঘুটে গলায় বলল, "তিনআঙুলে থাকতে ভয় কী খোঁকাবাবুরা? কাতুকুতু ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে দেখেই পিঠটান দিয়েছে।"

কেতো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "তু-তুমি তি-তিনআঙুলে?"

ছায়ামূর্তি একটা হাত তুলল। আঁধারে স্পষ্ট দেখলাম তার হাতে মোটে তিনটে আঙুল। সে সেই তিনটে আঙুল নেড়ে বলল, "শিগগির কেটে পড়ো তোমরা, বেচারাম আসছে। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

খালের দিকে টর্চের আলোর ঝলক। কেতো বলল, "পুটু, চলে আয়। বেচুদা জব্দ হোক। ও বিস্কুটের ডবল দাম নেয়, তা জানিস? তিনআঙুলে দাদা, আজ ওর ঝাঁকাসুদ্ধ তুলে নিয়ো।"

"তা আর বলতে?" বলে তিনআঙুলে তড়াক করে গাছে উঠে গেল।

আমরা হনহন করে হাঁটতে থাকলাম। বাড়ির আশেপাশে কাতুকুতু গিয়ে লুকিয়ে থাকলে কী করব, সে একটা ভাবনা। তবে সে কাতুকুতু দিলেই ঠাকুমাকে চেঁচিয়ে ডাকব। নয়তো তিনআঙুলে দাদা তো আছেই।

কেতো চাপা গলায় বলল, "তিনআঙুলে দাদা কিন্তু খুব ভাল। তাই না রে? টোটোকে কাতুকুতুর হাত থেকে না বাঁচালে কী হত বল?"

সায় দিতে যাচ্ছি, কাছাকাছি কেউ হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে উঠল। তারপর আর সেই হাঁচি থামতে চায় না। চেঁচিয়ে ডাকলাম, "ঠাকুমা, ঠাকুমা!"

অমনই হাঁচি থেমে গেল। ঠাকুমাকে ওরা এত ভয় পায় কেন?

পরদিন সকালে পড়তে বসেছি, এমন সময় দেখি, কেনারাম-বেচারাম দুই ভাই এক আলখাল্লাধারী ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। ঠাকুমা হাসিমুখে ডাকলেন, "এসো। বাবা এসো। তোমার জন্য কতদিন থেকে পথ তাকিয়ে বসে আছি। আসছ না দেখে কিনু আর বেচুকে পাঠিয়েছিলাম।"

বেচারাম বলল, "তিনআঙুলে কাল সন্ধ্যায় আমার ঝাঁকাসুদ্ধু তুলে নিয়েছে। আগে ওই ব্যাটাচ্ছেলেকে জব্দ করুন ফকিরবাবা।"

কেনারাম বলল, "না। আগে নাককাটাকে।"

ফকিরবাবা বিড়বিড় করে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে বাগানের মাটিতে বসলেন। তারপর একটু হেসে ঠাকুমাকে বললেন, "বেটি, সেবার তোকে বলেছিলাম শয়তানদের এই ঝুলিতে ভরে পদ্মার ওপারে ফেলে দিয়ে আসি। তুই বললি, না, না, গঙ্গা পার করে দিলেই যথেষ্ট। এখন দ্যাখ্ বেটি, ওরা গঙ্গা পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছে। পদ্মাপারে দেশের বর্ডার। বর্ডার পেরনোর ঝক্কি আছে। বুঝলি কিছু? পাসপোর্ট-ভিসার হাঙ্গামা আছে না?"

ঠাকুমা হাসলেন। "বুঝেছি বাবা, খুব বুঝেছি। এবার তুমি ওদের পদ্মাপার করেই দিয়ে এসো।"

মুচকি হেসে ফকিরবাবা বললেন, "আগে দই-চিঁড়ে-কলা দে বেটি। ফলার করি। তারপর হচ্ছে।"

ভন্তুমাস্টার বললেন, "কিন্তু ফকিরবাবা, শুনেছি বর্ডারে ঘুষ দিলে নাকি পেরনো যায়।"

ঠাকুমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "ভন্তু, পুঁটুকে আঁক কষাও।"

ভন্তুমাস্টার গর্জন করলেন, "একটি চৌবাচ্চায় দশ গ্যালন জল ধরে। সেই চৌবাচ্চায় একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্র দিয়া—"

ফকিরবাবার খবর ততক্ষণে রটে গেছে। একজন-দু'জন করে লোকের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কলার পাতায় ফলার সেরে ফকিরবাবা যখন ভূত ধরতে বেরোলেন, তখন তাঁর পেছনে বিশাল মিছিল। ভন্তুমাস্টারকে খুঁজে পেলাম না আর। সেই ফাঁকে আমিও দৌড়ে গিয়ে মিছিলে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম কেতো আর টোটোও এসে গেছে কখন।

ষষ্ঠীতলার কিছু আগে রাস্তায় ফকিরবাবা তাঁর প্রকাণ্ড লোহার চিমটে দিয়ে দাগ এঁকে বললেন, "খবর্দার, খবর্দার, এই দাগ পেরিয়ে কেউ যেন আসবে না। দাগ পেরিয়েছ কি মরেছ। খবর্দার, খবর্দার!"

ফকিরবাবা ষষ্ঠীতলার পেছনের জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলেন। সবাই চুপ করে আছে। শুনলাম, মিত্তির মশাই মুচকি হেসে চুপিচুপি ভেঁটুবাবুকে বলছেন, "রামবাবুর বাঁশবনের বেহালাদারকে পেলে হয়। মহা ধূর্ত। খাল পেরিয়ে হয়তো সিঙ্গিমশাইয়ের বাঁশবনে গিয়ে ঢুকে পড়েছে।"

সিঙ্গিমশাই পেছনেই ছিলেন। বলে উঠলেন, "বাজে কথা বলো না মিত্তির। আমার বাঁশবনে কে আছে তা জানো?"

তর্কাতর্কি বেধে গেল। অন্যেরা 'চুপ! চুপ!' বলে থামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সিঙ্গিমশাইকে থামানো শক্ত। শেষপর্যন্ত ফকিরবাবাকে ষষ্ঠীতলায় ফিরতে দেখে তর্কাতর্কি থেমে গেল। ফকিরবাবার কাঁধের তাপ্পিমারা রঙবেরঙের ঝুলিটি এখন প্রায় পুঁটুলি হয়ে উঠেছে। সামনে এসে তিনি বললেন, "চললাম এবার পদ্মাপারে। ফিরে এসে আবার ফলার খাব।"

মুখে ঝলমলে হাসি। প্রকাণ্ড পুঁটুলি হয়ে ওঠা ঝুলিটি খুব নড়ছিল। মিছিল করে গাঁয়ের লোকেরা ওঁর পেছন-পেছন চলল। গাঁয়ের শেষে মল্লিকদের আমবাগানের ধারে পিচরাস্তা। ফকিরবাবা পিচরাস্তায় উঠলে আমার চোখে পড়ল, ওঁর পিঠের দিকে তাপ্পিমারা ঝুলি ফুঁড়ে কালো কুচকুচে তিনটে আঙুল বেরিয়ে আছে। খুব নড়ছে আঙুল তিনটে। 'টা টা বাই বাই' করছে কি তিন আঙুলে দাদা?

দেখে কষ্ট হল। বেশ তো ছিল তিনআঙুলে। বেচারামকে জব্দ করেছিল। কাতুকুতুকে জব্দ করেছিলেন ঠাকুমা। ঠাকুমা কী যে করেন! ভ্যাট!

কিছুদিন পরে এক সকালে ভস্তুমাস্টার আমাকে আঁক কষাচ্ছেন। ঠাকুমা ফুলগাছের সেবাযত্ন করছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাই হতচ্ছাড়া! ভাল হবে না বলছি! রেখে যা। রেখে যা।"

ভস্তুমাস্টার বললেন, "কী হল মাসিমা?"

ঠাকুমা বাগানের বেড়ার দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। "অ্যাই বাঁদর! খুরপি দিয়ে যা। নইলে আবার ফকিরবাবাকে খবর পাঠাব।"

ভস্তুমাস্টার আবার বললেন, "কী হল মাসিমা?"

ঠাকুমা ঘুরে প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, "ও ভস্তু, ও পুঁটে, আমার খুরপি নিয়ে পালাচ্ছে। ধর্‌, ধর্‌!"

"কে খুরপি নিয়ে পালাচ্ছে মাসিমা?"

"তিন আঙুলে। শিগগির ওকে ধর।"

ভস্তুমাস্টার দৌড়ে গেলেন। আমিও দৌড়লাম। বাগানের বাইরে খুরপিটা পড়ে থাকতে দেখা গেল। ভস্তুমাস্টার খুরপিটা কুড়োতে গিয়েই "উঁহু হু হু" করে পিছিয়ে এলেন। তারপর কানে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "উঁহু হু হু, বড্ড জ্বালা করছে যে। ও পুঁটু, আমার কানটা আছে না নেই দ্যাখ তো বাবা!"

হাসি চেপে বললাম, "আছে মাস্টারমশাই!"

ভস্তুমাস্টার কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, "কোবরেজমশাইয়ের কাছে মলম লাগিয়ে আনি। উঁহু হু হু!" তারপর টাট্টুঘোড়ার মতো উধাও হয়ে গেলেন।

তিনআঙুলে ফকিরবাবার ঝুলি ফুঁড়ে পালিয়ে এসেছে জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। বললাম, "তিনআঙুলে দাদা! ঠাকুমার খুরপিটা আমি কুড়োচ্ছি। আমার কান মুলে দেবে না তো?"

না। তিনআঙুলে আমার কান মলে দিল না। খুরপিটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঠাকুমাকে দিলাম। ঠাকুমা খুশি হয়ে বললেন, "তিনআঙুলে ফিরে এসেছে যখন, তখন থাক। গাঁ-গেরামে দু-একটা ভূত না থাকলে চলে? তবে নাক কাটাটা বড্ড বোকা। সেও পালিয়ে আসতে পারত। তাই না পুঁটু?"

জুতো রহস্য

ভদ্রলোক দরজার পরদার ফাঁকে উঁকি মেরে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "জুতোপায়ে ঢুকতে পারি সার?"

"নিশ্চয় পারেন। তবে খুলে রেখে এলেও আপনার নতুন জুতো যে চুরি যাবে না, সে-গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।"

"অ্যাই! তা হলে যথাস্থানেই এসেছি।" বলে ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। "আমার ভাগ্নে গোকুল, সার, আপনি চেনেন ওকে—বাবুগঞ্জ ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার। আপনার ঠিকানা দিয়ে বলল, এর কিনারা করতে আপনিই পারবেন।"

জুতো চুরির?

"আজ্ঞে।"

"ক'জোড়া চুরি গেছে এ-পর্যন্ত?"

"তিন জোড়া।" ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন, "এ-বাজারে এক জোড়া চামড়ার জুতোর দাম চিন্তা করুন সার। এক সপ্তায় তিন-তিন জোড়া জুতো লোপাট। গত রোববার থেকে শুরু। রোববার সন্ধ্যেবেলায়। তারপর বিস্যুতবার ঠিক সেই সন্ধ্যেবেলায় আবার লোপাট। শুক্কুরবার ফের কিনলাম। ফের সেদিনই সন্ধ্যেবেলা লোপাট হয়ে গেল। এ কেমন চোর সার? সবার জুতো ঠিক ঠাক পড়ে থাকে, আর আমার জুতোই ব্যাটাচ্ছেলে নিয়ে পালায়? নতুন জুতো তো আরও কত লোকে পরে যায়। তাদের জুতো ভুলেও ছোঁয় না। খালি আমার জুতো!"

"ঠাকুরবাড়ির দরজা থেকে?"

"ঠিক ধরেছেন সার। রাজাদের ঠাকুরবাড়ি। কবে ওঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন। দালান-কোঠা সবই ধসে পড়েছে। শুধু ঠাকুরবাড়িটাই কোন রকমে ঠিকে ছিল। পোড়ো খাঁ-খাঁ অবস্থা। দেবতার নামে জমি আছে! কিন্তু পুজোআচ্চা বন্ধ ছিল। সেবায়েত থাকলে কী হবে? পায়ে বাত। চলাফেরা করতে পারে না। নিজের ঘরে শুয়েই নমোনমো। বুঝলেন তো সার?"

"বুঝলাম। তারপর কোনও সাধুসন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল ঠাকুরবাড়িতে?"

"অ্যাই!" ভদ্রলোক নড়ে বসলেন। "গোকুল যা বলছিল ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।"

"তিনি আসার পর রোজ সন্ধে থেকে শাস্ত্রপাঠ-কথকতা-কীর্তনের আসর বসছিল?"

"আজ্ঞে।" ভদ্রলোক আবার নড়ে বসলেন। "গোকুল যা বলছিল—"

"আপনার নাম কী?"

"পাঁচুগোপাল সিংহ।"

"আপনার বাবার নাম?"

"আজ্ঞে যদুগোপাল সিংহ। তিনি আমার ছোটবেলায়—"

"আপনার ঠাকুর্দার নাম?"

"জয়গোপাল সিংহ।"

তিনি কী করতেন?"

"তিনি রাজবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন।"

"খাজাঞ্চি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খাজাঞ্চি মানে ক্যাশিয়ার সার! আজকাল খাজাঞ্চি বললে – "

"আপনার বাবা কি করতেন?"

"রাজবাড়ির সেরেস্তাদার—মানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন।"

"আপনি কী করেন?"

"রেলে টিকিট চেকার ছিলাম। গত মাসে রিটায়ার করে পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। আমার বিধবা দিদি—গোকুলের মা সার। দিদিই আমাদের বাড়িতে থাকত। আমি আসার পর সে গোকুলের সরকারি কোয়ার্টারে চলে গেছে। অত করে বললাম। থাকল না। বলে কী, আর এ বাড়িতে ভূতের অত্যাচার সইতে পারবে না।"

"ভূতের অত্যাচার?"

"আজ্ঞে!" ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, "বাতবিবেতে কী সব অদ্ভুত শব্দ। কুকুর চেঁচালেই থেমে যেত। তবে প্রথম-প্রথম গা করিনি। শেষে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করালাম। তাতেও কাজ হল না। এমন সময়—"

"সাধুবাবার আবির্ভাব। কাজেই তাঁর শরণাপন্ন হলেন?"

"হলাম। কিন্তু সাধুবাবার কৃপায় ভূতের অত্যাচার যদি-বা বন্ধ হল, হঠাৎ এই আরেক উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। জুতো-চুরি! তিন-তিন জোড়া জুতো সার।"

"সাধুবাবা কোনও আস্কারা করতে পারলেন না?"

ভদ্রলোকের মুখে এতক্ষণে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। "আস্কারা করতে গিয়েই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড সার। কাল শনিবার সকালে ঠাকুরবাড়ির যে ঘরটায়

সাধুবাবা থাকতেন, সেই ঘরের বারান্দায় চাপ-চাপ রক্ত দেখা গেল। সারা বাবুগঞ্জ হুলুস্থুলু। পুলিশ এল। রক্তের ছাপ পেছনকার দরজার ঘাটেও পাওয়া গেল। নীচে গঙ্গা। পুলিশ বলল, 'বডি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।' আমি এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। শেষে গোপনে গোকুলকে সব বললাম। তখন গোকুল—"

"আপনার বাড়িতে আর কে থাকে?"

"কেউ না সার! আমি একা থাকি। স্বপাক খাই। বরাবর নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস আছে।"

"আপনি যে রোজ সন্ধেয় বাড়ি থেকে সাধুবাবার আসরে যেতেন—"

"কাছেই সার। খুব কাছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কি মনে হত না বাড়িতে চোর ঢুকতে পারে?"

ভদ্রলোক হাসার চেষ্টা করে বললেন, "ভুলো, সার! ভুলোর চ্যাঁচানি যে একবার শুনেছে, সে-ই কানে আঙুল গুঁজে পালাবে।"

"ভুলো কোনও কুকুরের নাম?"

"আজ্ঞে। ঠিক ধরেছেন। গোকুল যা-যা বলছিল—"

"ভুলোকে আপনি কোথায় পেলেন?"

"দিদির পোষা দিশি কুকুর। দিদি চলে গেলেও ভুলো চলে যায়নি।"

"তা হলে ভুলো এখন আপনার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে?"

"অ্যাঁ?" ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। "তাই তো! ওর কথা কাল থেকে আমার খেয়ালই নেই। ভুলোকে আমি কাল থেকে দেখেছি, না দেখিনি? হুঁ, দেখিনি। কী আশ্চর্য! ভুলো কি তা হলে দিদির কাছে চলে গেছে? অকৃতজ্ঞের কাণ্ড দেখেছেন?'

"আপনি ফিরে গিয়ে ওর খোঁজ নিন। দেরি করবেন না।"

পাঁচুগোপালবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আর একটি কথাও না বলে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।...

এতক্ষণ চুপচাপ বসে এইসব কথা শুনছিলাম। এবার দেখলাম আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ এবং রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। চওড়া টাক বড্ড বেশি চকচক করছে। একটু হেসে বললাম, "আশ্চর্য কর্নেল! আপনি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়েন এবং দিব্যি সেই ঢিল লক্ষ্যভেদও করে।"

কর্নেল চোখ খুলে জোরে মাথা দোলালেন। "অন্ধকারে? নাহ্ জয়ন্ত! আমি আলোতেই ঢিল ছুঁড়েছি।"

"জুতো-চুরির কথা আপনি জানতেন তা হলে?"

"নাহ্। ভদ্রলোককে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে গঙ্গার ধারে

ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার গোকুলবাবুকে চিনি। গতএপ্রিলে বাবুগঞ্জে উনি আমাকে কয়েকটা অর্কিডের খোঁজ দিয়েছিলেন।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা যত্ন করে ধরিয়ে বললেন, "জুতোর ব্যাপারটা তুমিও আঁচ করতে পারতে, যদি ওঁর কথাগুলো লক্ষ করতে। তাক বুঝে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর বেরিয়ে আসে।"

"কিন্তু সাধুবাবার ব্যাপারটা?"

"ডার্লিং! বরাবর দেখে আসছি, কাগজের লোক হয়েও তুমি কাগজ খুঁটিয়ে পড়ো না। তোমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকাতেই বাবুগঞ্জের সাধুবাবা নিখোঁজ এবং রক্তের খবরটা বেরিয়েছে।"

"বেশ। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারটা?"

"পাঁচুগোপালবাবুর মুখেই শুনেছ, কুকুর চেঁচালে ভূতুড়ে শব্দ থেমে যেত। কাজেই একটা কুকুর থাকার চান্স ছিল।"

"তা হলে ভূত আসলে জুতো-চুরি করতেই আসত।"

"বাহ্!" কর্নেল হাসলেন। "ক্রমশ তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে।"

"রীতিমত রহস্যজনক ঘটনা। কুকুরটাও নিপাত্তা হয়ে গেল সাধুবাবাব মতো?"

"এবং তিন জোড়া জুতোও নিপাত্তা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু কুকুরের জন্য ভদ্রলোক প্রায় গুলতির বেগে বেবিয়ে গেলেন কেন বলুন তো?"

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। আবার চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন এবং চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে ওঁকে আপনমনে বিড়বিড় করতে শুনলাম। "খাজাঞ্চি! আগের দিনের রাজা খেতাবধারী বড় জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। ট্রেজারি! খাজাঞ্চি ঠিক ক্যাশিয়ার নয়, ট্রেজারাব। সে আসলে খুব সম্মানজনক পদ। তবে খুব আস্থাভাজন লোক হওয়া চাই। আস্থা! খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটা—আস্থা।"

ষষ্ঠীচরণ আর-এক প্রস্থ কফি রেখে গেল। বললাম, "কর্নেল! কফি।"

"হ্যাঁ। কফি খেয়েই আমরা বেরোব।" কর্নেল চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমরাও গুলতির বেগে বেরিয়ে যাব। বাসে মাত্র ঘন্টা তিনেকের জার্নি। পৌঁছেই লাঞ্চ খাওয়া যাবে।"

বাবুগঞ্জ গঙ্গার ধারে বেশ জমকালো শহর। টেলিফোন এক্সচেঞ্জও আছে। সরকারি ডাকবাংলো শহরের শেষ প্রান্তে। গাছপালা-ঘেরা নিঝুম নিরিবিলি পরিবেশ। কেয়ারটেকার গোকুলবাবু যেন জানতেন কর্নেল তাঁর মামাবাবুর কাছে

খবর পেয়েই ছুটে আসবেন। তাই সুস্বাদু ইলিশ সহযোগে চমৎকার একখানা মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খাওয়ার পরে উনি ইনিয়েবিনিয়ে রাজমন্দিরে এক সাধুবাবার আকস্মিক আবির্ভাব এবং রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, "মামাবাবুর মাথায় ছিট আছে। মা এতকাল দাদামশাইয়ের ভিটে আগলে রেখেছিলেন। এত বলেও আমার কোয়ার্টারে আনতে পারিনি। তারপর মামাবাবু রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলেন। অমনই নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হল। আসলে ভূতটুত, জুতো-চুরি বোগাস। মামাবাবুর পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়েই মা অগত্যা আমার কাছে চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে মামাবাবু আপনার কাছ থেকে ফিরে আবার এক পাগলামি করতে এসেছিলেন। খামোকা ঝগড়াঝাটি!"

কর্নেল বললেন, "ভুলোর জন্যে?"

"আপনি শুনেছেন?" গোকুলবাবু হাসলেন। "ভুলো মায়ের পোষা দিশি কুকুর। কিন্তু আমি থাকি সরকারি কোয়ার্টারের দোতলায়। ভুলো বিলিতি হলে কথা ছিল। তা ছাড়া যা বিচ্ছিরি চেঁচায়। মামাবাবুর ধারণা, ভুলো মায়ের কাছে পালিয়ে এসেছে। এলেও এই এরিয়ায় ঢুকবে কেমন করে? এক এরিয়ার কুকুর অন্য এরিয়ায় গেলে কুকুরগুলো তাকে ঢুকতে দেবে?"

চলে যাওয়ার আগে গোকুলবাবু জানিয়ে গেলেন, তাঁর মামাবাবুর জুতো চুরির ব্যাপারটা নয়, সাধুবাবার হত্যা রহস্যের ব্যাপারে তাঁর খটকা লেগেছিল। সেইজন্যই ওঁকে কর্নেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

বাসজার্নির ধকল এবং লাঞ্চের পর ভাতঘুমের অভ্যাস আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। কর্নেলের ডাকে উঠে বসলাম। গঙ্গার ওপারে সূর্য সবে অদৃশ্য হয়েছে। দিনের আলো কমে গেছে। চারদিকে পাখিরা তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। কর্নেল পিঠ থেকে কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রেখেছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছিলেন, না কি অর্কিডের খোঁজে?"

"নাহ্। জুতোর খোঁজে।"

হেসে ফেললাম। "আপনি কি ভেবেছিলেন চোর আপনাকে পাঁচুগোপাল-বাবুর জুতো ফেরত দেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আছে?"

"কতকটা তা-ই।" কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন। "তবে এভাবে ফেরত দেবে ভাবিনি।"

"অবাক হয়ে বললাম, "কীভাবে?"

"জুতো মেরে।" কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বিষণ্ণভাবে বললেন, "হ্যাঁ। জুতো মারা আর কাকে বলে? ছ'পাটি ছেঁড়া পামশু আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা। একপাটি আমার টাকে পড়তে যাচ্ছিল। মাথা না সরালে পেরেকে রক্তারক্তি হয়ে যেত। সোল ওপড়ালে সব জুতোরই পেরেক বেরিয়ে থাকে। এসব একটা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে মুখ তুলেছি, অমনই টুপিটা পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে জুতো ছুঁড়েছে!"

"বলেন কী! কোথায়?"

"রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভেতর। চিন্তা করো জয়ন্ত, সোল-ওপড়ানো পেরেক-বেরনো জুতো।"

"সোল ওপড়ানো জুতো?" আরও অবাক হয়ে বললাম, "তা হলে কি পাঁচুগোপালবাবুর জুতোর ভেতর কিছু লুকোনো ছিল?"

"পর-পর তিনজোড়া জুতো চুরি যাওয়ার কথা শুনেই সেটা তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল। বিশেষ করে সেকালের এক জমিদারবাড়ির ট্রেজারারের পৌত্রের জুতো।"

এই সময় উর্দিপরা একটা লোক ট্রেতে কফি নিয়ে এল। সে সেলাম দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল ডাকলেন, "রামহরি!" সে কাছে এলে কর্নেল বললেন, "তুমি তো এখানকার লোক। রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে কে-কে আছে এখন?"

রামহরি বলল, "ঠাকুরমশাইয়ের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে নেই। এখন শুধু গিন্নিঠাকরুন আছেন। ঠাকুরমশাই তো বাতের অসুখে বিছানায় পড়ে আছেন।"

"ঠাকুরমশাইয়ের কোনও ভাই বা জ্ঞাতি নেই?"

"এক ভাই ছিল। বনিবনা হত না। ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল। সে প্রায় তিন-চার বছর আগের কথা সার। শুনেছি সে জেলখানায় আছে। চুরি-ডাকাতি করে বেড়াত। সেই নিয়েই তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া।"

"ঠিক আছে। তুমি এস রামহরি।"

রামহরি চলে গেলে কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, "চলো। ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি যাই।"

বিদ্যুতের আলোয় বাবুগঞ্জ ঝলমল করছিল। বড় রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল একটা সাইকেল রিকশ নিলেন। সন্ধেরাতেও প্রচণ্ড ভিড়। রিকশওয়ালা অনেক ঘিঞ্জি গলি পেরিয়ে একখানে থেমে বলল, "আর যাওয়া যাবে না সার। পায়ে হেঁটে চলে যান। আমি বলেই এলাম। অন্য কেউ কিছুতেই আসবে না।"

কর্ণেল বললেন, "কেন হে? ভূতের ভয়ে নাকি?"

রিক্শাওয়ালা কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, "ঠাট্টাতামাশার কথা নয় সার! এই তল্লাটে দিনদুপুরে কেউ পা বাড়ায় না আজকাল। যাচ্ছেন যান। তবে সাবধানে যাবেন।"

সে রিকশ ঘুরিয়ে উধাও হয়ে গেল। এদিকটায় বিদ্যুৎ নেই। কর্ণেল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। একফালি আঁকাবাঁকা পথ। সামনে মিটমিটে আলো জ্বলছিল। কর্নেলের টর্চের আলোয় একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি দেখা গেল। কাছে গিয়ে উনি ডাকলেন, "ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?"

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে কর্ণেলকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "কোত্থেকে আসছেন আপনারা?"

কর্ণেল বললেন, "কলকাতা থেকে আসছি। একটা কথা বলেই চলে যাব।"

"উনি তো অসুস্থ।"

নাহ্। কথাটা আপনার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে? কি কথা?"

"আপনি কি ঠাকুরবাড়িতে সাধুবাবার আসরে যেতেন?"

ভদ্রমহিলা আবার চমকে উঠেই সামলে নিলেন। "কেন সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন বাবা? আপনারা কী পুলিশের লোক? আমরা কোনও সাতেপাঁচে থাকি না।"

"আমার কথার জবাব দিলে খুশি হব। ঠিক জবাব না পেলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন।"

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, "আমরা তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি বাবা!"

"আপনি কি সাধুবাবার আসরে যেতেন?"

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী আস্তে বললেন, "একদিন গিয়েছিলাম।"

"শুক্রবার সন্ধেয়?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কতক্ষণ ছিলেন আসরে?"

"যতক্ষণ ভাগবতপাঠ হল, ততক্ষণ ছিলাম।"

"সবাই চলে গেলে আপনি কি চুপিচুপি সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?"

ভদ্রমহিলা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ। তা—"

"আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেন?"

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী চুপ করে থাকলেন।

"বলুন। তা না হলে ঝামেলায় পড়বেন কিন্তু!"

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে খ্যানখেনে গলায় কে বলে উঠল, "বলে দাও না, এত ভয় কিসের? ভুতো নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে। একদিন-না-একদিন সে খুন হতই। হয়েছে পুলিশকে বলে দাও সব কথা।"

কর্ণেল একটু হেসে বললেন, "সাধুবাবাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন। তাই না? সেইজন্য চুপিচুপি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কী বলেছিলেন আপনি তখন আপনার ভুতোঠাকুরপোকে?"

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। "ওকে বললাম, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি আর কিছুদিন থাকলে আরও অনেকে চিনে ফেলবে। তুমি শিগগির পালিয়ে যাও ঠাকুরপো। হঠাৎ সেই রাত্তিরে ঠাকুরপো খুন হয়ে গেল। চাপ-চাপ রক্ত।"

কর্ণেল বললেন, "আপনার ঠাকুরপো ভূতনাথের নামে পুলিশের হুলিয়া জারি করা আছে। এলাকায় কয়েকটা ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে।"

"জানি। সেইজন্যই তো—"

"হ্যাঁ। তাই তাকে চিরদিনের জন্য বেঁচে যাওয়ার একটা ফন্দি দিয়েছিলেন। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।"

কথাটা বলেই কর্ণেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। আমি হতবাক হয়ে ওকে অনুসরণ করলাম।...

বাংলোয় ফিরে দেখি, পাঁচুগোপালবাবু অপেক্ষা করছেন। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। কর্ণেলকে দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, "অনেক খুঁজে পেয়ে গেছি সার। আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই।"

কর্ণেল বললেন, "জুতো?"

"আজ্ঞে।" বলে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগে হাত ঢোকালেন।

'এখানে নয়। আমার ঘরে চলুন।"

ঘরে ঢুকে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগ থেকে দু'পাটি পামশু বের করলেন। জীর্ণ বেরঙা ছেঁড়া বেঢপ জুতো। বললেন, "ঠাকুরদার সিন্দুকের তলায় লুকনো ছিল সার। ঠাকুরদার জুতোই মনে হচ্ছে। ইস্! কী বিচ্ছিরি গন্ধ।'

কর্ণেল জুতোজোড়া নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে টেবিলে রাখলেন। বললেন, "এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। রাজবাড়ির ওদিকটায় এতক্ষণে ঘন অন্ধকার। আপনি সেখানে গিয়ে এই গানটা গাইবেন—"

"গা-গান? আমি সার গান গাইতে পারি না যে!"

"চেষ্টা করবেন। নিন, মুখস্থ করুন ঃ

"চলে আয় ওরে ভুতো
পায়ে দিবি রাঙা জুতো।"

পাঁচুগোপালবাবু অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে আওড়ালেন। তারপর করুণমুখ করে বললেন, "কে-কেন গান গাইতে হবে সার? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না!"

"আপনার জুতো-চোর ভূতটাকে ধরতে হবে না? তিন-তিনজোড়া জুতো চুরি করেছে সে। তাকে ধরা উচিত নয় কি?"

এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, "বডি পাওয়া গেছে কর্ণেলসায়েব! শকুনে প্রায় সাবাড় করেছে। তবে স্কেলিটনটা আছে। বেশি দূরে ভেসে যায়নি। মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে একটা খাড়িতে ভাসছিল। মুণ্ডু-কাটা বডি।"

পাঁচুগোপালবাবু লাফিয়ে উঠলেন। "সাধুবাবার বডি?"

কর্ণেল বললেন, "নাহ্। আপনার ভুলোর।"

পাঁচুগোপালবাবু আর্তনাদ করলেন, "হায়, হায়। ভুলোকে কে মারল?"

"ভুতো।" বলে কর্ণেল উঠলেন। "আপনার ঠাকুরদার জুতোজোড়া নিন। চলুন, ভুতোকে ফাঁদে ফেলা যাক।"

পুলিশ জিপ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার কর্ণেলের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করে চলে গেলেন। কর্ণেল পাঁচুগোপালবাবুকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে চললেন।

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার এলাকা। এবার কর্ণেল টর্চ জ্বালছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে একটা কালো ঢিবির পাশে গুঁড়ি মেরে বসলেন। তারপর পাঁচুগোপালবাবুকে চাপাস্বরে বললেন, "সামনে দাঁড়িয়ে জোরে গানটা শুরু করুন।"

ভদ্রলোক কেসে গলা সাফ করে হেঁড়ে গলায় সুর ধরে আওড়ালেন ঃ

"চলে আয় ওরে ভুতো
পায়ে দিবি রাঙা জুতো।"

বারকতক গাওয়ার পরে কালো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল ওঁর সামনে। খোনা গলায় বলে উঠল, "এঁনেছিস? দেঁ! দেঁ!"

পাঁচুগোপালবাবু চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আতঙ্কে। "ওরে বাবা! এ যে দেখছি সত্যিই ভূ-ভূ-ভূত!"

অমনই এদিক-ওদিক থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। একটা সাধুবাবার চেহারার লোক পালানোর জন্য লাফ দিতেই কর্ণেল গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। দুজন কনস্টেবলকে দেখলাম লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। কর্ণেল তার দাড়ি-জটা উপড়ে নিয়ে বললেন, "ছদ্মবেশী সাধুবাবাকে চিনতে পারছেন না পাঁচুগোপালবাবু? রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর ছোট ভাই ভূতনাথ। আপনার ভুলোর মুণ্ডু কেটে রক্ত ছড়িয়ে আত্মগোপন করেছিল। আপনার ঠাকুরদার দু'পাটি জুতোর সোলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দশটা সোনার মোহরের খবর বহুদিন আগে ভূতনাথ পেয়েছিল আপনার দিদির কাছে। আপনার দিদি কথায়-কথায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন ওকে। পরে বুদ্ধি করে বলেছিলেন, সেই মোহর আপনার জুতোর সোলে লুকনো আছে। তখন আপনি রেলের চাকরি করেন। ট্রেনে-ট্রেনে ঘোরেন। ভূতনাথ তাই সুযোগ পায়নি। আপনি রিটায়ার করে বাড়ি ফেরার পর তাই সে আপনার জুতো চুরির ধান্দা করেছিল। যাই হোক, চলুন। বাংলোয় ফেরা যাক।"

হংচং লং রহস্য

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা ইনল্যান্ড লেটার পড়ছিলেন। জ্বলন্ত চুরুট থেকে একটুকরো ছাই সাদা দাড়িতে পড়ল। এটা নতুন কোনও দৃশ্য নয়। কিন্তু উনি বাঁ হাত তুলে এমনভাবে মসৃণ টাকে হাত বুলো থাকলেন, যেন ছাইয়ের টুকরোটা মাথাতেই পড়েছে। হাসি চেপে বললাম, "ছাই কিন্তু আপনার দাড়িতে পড়েছে।"

আমার রসিকতায় কান দিলেন না কর্নেল। চিঠিটা ভাঁজ করে বললেন, "হং চং লং!"

অবাক হয়ে বললাম, "কী বললেন?"

"হং চং লং।"

"তার মানে?"

কর্নেল চিঠিটা আমাকে দিয়ে বললেন, "দেখ। মানে উদ্ধার কবতে পারো নাকি।"

খুলে দেখি, লেখা আছে ঃ

মহাশয়.

আপনার কীর্তি সুবিদিত। তাই আপনাব শবণাপন্ন হইলাম। আমার প্রাণনাশের চক্রান্ত চলিতেছে। অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র আসিযা আমা: প্রাণ রক্ষা করুন এবং চক্রান্তকারীদের যথোচিত শাস্তি দিন। হং চং লং। ইতি –

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সিংহবায

শান্তি কুটিব, বাবুগঞ্জ (নিমতিতার সন্নিকটে),

জেলা মুর্শিদাবাদ।

চিঠিটা খুঁটিযে পড়ার পর বললাম. "হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে বয়স্ক মানুষ। মাথায় গণ্ডগোল আছে।"

"কিসে বুঝলে?"

"হঠাৎ হং চং লং কেন? সবই তো খোলাখুলি লিখেছিলেন।"

কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললেন, "এমনও হতে পারে, আমি পৌঁছনোর আগে যদি সত্যিই ওঁর বরাতে কিছু ঘটে যায়, হং চং লং থেকে আমি কোনো সূত্র পেয়ে যাব। এই ভেবে—"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "সূত্র আগাম জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে তা-ও খোলাখুলি লিখতে পারতেন। হিং টিং ছট কেন?"

"হিং টিং ছট নয়। হং চং লং!"

"একই কথা। তবে আমার মনে হচ্ছে, শান্তি কুটির আসলে একটা উন্মাদাশ্রম।"

কর্নেল আমার কথাটা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, "জয়ন্ত! তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্যে বাবুগঞ্জে একটা চমকপ্রদ স্টোরি অপেক্ষা করছে।"

"আপনি কী সত্যিই চিঠিটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন?"

"দিচ্ছি। কারণ ওই হং চং লং।"

"আশ্চর্য! জেনেশুনেও আপনি এক পাগলের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছেন?"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "তুমি কিন্তু খালি হাতে ফিরবে না, এ আশ্বাস আমি দিতে পারি। বাবুগঞ্জে আমি একবার গিয়েছিলাম। সীমান্ত এলাকা। অন্তত স্মাগলিং নিয়েও একটা রোমাঞ্চকর স্টোরি দাঁড় করাতে পারবে। আমিও অবশ্য খালি হাতে ফিরব না। এই শীতের মরসুমে পদ্মায় অসংখ্য বিদেশি জলচর পাখি আসে। চিয়ার আপ জয়ন্ত! হং চং লং।"

বুঝলাম, হং চং লং-এর হাত থেকে আমারও নিষ্কৃতি নেই।....

বাবুগঞ্জ পদ্মাতীরে একটা পুরনো বাণিজ্যকেন্দ্র। রেলস্টেশন থেকে ক'বছর আগেও দূরত্ব ছিল প্রায় ছ' কিলোমিটার। পদ্মার ভাঙনে ক্রমশ সরে এসেছে। উত্তর দিকটায় মাটি কিছুটা উঁচু। তাই সেখানে সাবেক গঞ্জের কয়েকটা বাড়ি এখনও টিকে আছে। কিন্তু বাড়িগুলোর চেহারা জরাজীর্ণ। দেখে মনে হয় না ওসব বাড়িতে মানুষ বাস করে।

আমরা উঠেছিলাম নতুন বসতি এলাকায়, সরকারি ডাকবাংলোয়। চৌকিদার বনবিহারী কর্নেলের চেনা লোক। কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "একসময় খুব দাপট ছিল এলাকায়। এখন বয়স হয়েছে। বাড়ি থেকে আর বেরোতে দেখিনা।"

কর্নেল বললেন, "কীসের দাপট ছিল?"

বনবিহারী চাপা গলায় বলল, "বর্ডার এরিয়া সার! বুঝতেই পারছেন। যত স্মাগলার, খুনে আর ডাকাত ছিল কেষ্টবাবুর চেলা। এখন চেলারা অন্য গুরু ধরেছে।"

কর্নেল হাসলেন। "অন্য গুরুর নাম কী?"

"আজ্ঞে, সে কেষ্টবাবুরই খুড়তুতো ভাই। আসল নাম জানি না। সবাই ডাকে গঞ্জুবাবু বলে।"

"গঞ্জুবাবু থাকে কোথায়?"

"তার থাকার কোনও ঠিকঠিকানা নেই সার। আগে থাকত কেষ্টবাবুর কাছে। শুনেছি ওঁর সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। তারপর থেকে সে ও-বাড়ি ছেড়েছে।" বনবিহারী শ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি সার এখানকার কোনও সাতে-পাঁচে থাকি না।"

বাংলো থেকে বেরিয়ে কর্নেল একটা সাইকেল-রিকশা ভাড়া করলেন। রিকশাওলাকে বললেন, "কেষ্টবাবুর বাড়ি চেনো?"

রিকশাওলা বলল, "কেষ্টবাবুর বাড়ি অব্দি রিকশা যাবে না। আপনাদের খানিকটা পায়ে হাঁটতে হবে।"

"ঠিক আছে। তুমি বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবে। বখশিস পাবে।"

নতুন বসতি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে জঙ্গল এবং ঢালু জমি। রাস্তাটা হঠাৎ সেখানে শেষ হয়ে গেছে। জঙ্গল এবং ঢালু জমিটা পেরিয়ে উঁচু মাটির ওপর সাবেক গঞ্জের সেই পুরনো বাড়িগুলো দেখা গেল। রিকশওলা বলল, "আমি আর যাব না সার! রিকশা চুরি যাবে। ওই যে গেটটা দেখছেন, ওটাই কেষ্টবাবুর বাড়ি। তবে একটা কথা বলি সার! সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন। জায়গাটা ভাল না। প্রায়ই ছিনতাই হয়।"

সে কথাগুলো বলেই গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কর্নেল উঁচু জায়গায় উঠেই বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, "অপূর্ব! কেষ্টবাবু—আমাদের কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায় অনুমতি দিলে ওঁর বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাব। পদ্মার সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না।"

বললাম, "ওঁর খুড়তুতো ভাই গঞ্জুবাবু আপনাকে থাকতে দেবে বলে মনে হয় না।"

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "কেন বলো তো?"

"এখন মনে হচ্ছে কেষ্টবাবুর ভয়েই আপনাকে চিঠিটা লিখেছেন।"

"হুঁ। হং চং লং!"

বিরক্ত হয়ে আর কোনও কথা বললাম না। দোতলা বাড়িটার চারদিকে টুটাফাটা পাঁচিল। গেটে একটা ফলকে লেখা আছে। 'শান্তি কুটির'। গেটটার অবস্থাও শোচনীয়। আমরা গেটের সামনে যেতেই একজন মধ্যবয়সী লোক প্রাঙ্গণ থেকে এগিয়ে এল। মাথার চুল সাদা। কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ গড়ন। পরনে খাটো ধুতি,

গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, "কাকে চাই?"

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড বের করে লোকটাকে দিলেন। বললেন, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি। সিংহরায় মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব।"

সে কার্ডটা হাতে নিয়ে চলে গেল। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, গেটে ভেতর থেকে তালা আটকানো। একটু পরে লোকটা ফিরে এল। তারপর তালাটা খুলে বলল, "আসুন।" তারপর আমরা ভেতরে ঢুকলে ফের তালা আটকে দিল।

বসার ঘরটা দেখে মনে হল বাড়ির মালিকদের একসময় অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। লোকটা আমাদের সোজা দোতলায় নিয়ে গেল। বাড়িতে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। কেন যেন গা ছমছম করছিল। একটা ঘরের ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় কেউ বলে উঠল, "আসুন।"

সেই ঘরে ঢুকে দেখি, খাটে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আলোয়ান-মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। আমরা বসলে তিনি কর্নেলের কার্ডটা দেখতে-দেখতে বললেন, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আপনি মিলিটারির লোক?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, "আপনি কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায়?"

"হ্যাঁ। তা আপনাদের আসার উদ্দেশ্য?"

"আপনিই আমাকে আসতে লিখেছিলেন।"

"আমি? আমি কস্মিন্‌কালে আপনাকে চিনি না।"

"আপনি আমাকে কোনও চিঠি লেখেননি?"

"কক্ষনো না। আপনাকে কেন চিঠি লিখতে যাব?"

"হং চং লং!"

কেষ্টবাবু হঠাৎ খাপ্পা হয়ে গেলেন, "কী বলছেন মশাই? হং চং লং মানে?"

"মানে তো আপনারই জানার কথা।"

কেষ্টবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "অ্যাই ভাঁটু! এদের গেট পার করে দিয়ে আয়। তোকে পইপই করে বলেছি, যাকে-তাকে হুট করে বাড়ি ঢোকাবি না।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও কেটে পড়ার তালে ছিলাম। দু'জনে নীচে নেমে আসার পর ভাঁটু তুম্বো মুখে আমাদের অনুসরণ করল। গেটের কাছে পৌঁছে সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "কিছু মনে করবেন না সার! বাবুর মেজাজ আজকাল কেমন হয়ে গেছে।".....

বাংলোয় ফিরে কর্নেল মুখ খুললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

হাসতে-হাসতে বললাম, "আপনাকে বলেছিলাম, ভদ্রলোকের মাথায় গণ্ডগোল আছে।"

"কোনও অদ্ভুত ব্যাপার তুমি লক্ষ করোনি?"

"না তো! অবশ্য অদ্ভুত ব্যাপার বলতে হুং চং লং শুনে উনি হঠাৎ কেন যেন খাপ্পা হয়ে উঠলেন।"

"আর কিছু?"

"বড্ড চ্যাঁচামেচি করে কথা বলছিলেন।"

কর্নেল সায় দিলেন। "ঠিক ধরেছ। ওঁর কণ্ঠস্বর বড্ড বেশি চড়া।"

"আচ্ছা কর্নেল! এমন তো হতে পারে, পাশের ঘরে বা আশেপাশে কোথাও ওঁর সন্দেহভাজন চক্রান্তকারীরা ছিল। তাই তাদের শুনিয়ে ওভাবে কথা বলছিলেন।"

"হ্যাঁ। তোমার কথায় যুক্তি আছে।" কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, "তবে চিঠিটা ওঁর দেখতে চাওয়া উচিত ছিল। তোমার যুক্তি অনুসারেই বলছি, চক্রান্তকারীদের শুনিয়েই চিঠিটা দাবী করতে পারতেন। করলেন না।"

বনবিহারী কফি আনল। কর্নেল চুপচাপ কফি খেলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি বিশ্রাম করো! আমি আসছি।"

কিছু জিজ্ঞেস করার সময়ও পেলাম না, কর্নেল এমন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় ঠাণ্ডাটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। পদ্মার দিক থেকে হিম হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঘরে ঢুকে সতর্কতার দরুন দরজা এঁটে কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও ট্রেনজার্নির ধকল সামলাতে পারিনি।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল ফিরলেন ভেবে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তারপর হকচকিয়ে গেলাম। কর্নেল নন, শান্তি কুটিরের সেই কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহরায় ওরফে কেষ্টবাবু! পরনে গলাবন্ধ কোট, মাথায় হনুমান টুপি। তা সত্ত্বেও চিনতে ভুল হল না। ঘরে ঢুকেই চাপা স্বরে বললেন, "কর্নেলসায়েব কোথায়?"

ব্যস্তভাবে বললাম, "আপনি একটু বসুন। কর্নেল এসে পড়বেন।"

"বসার সময় নেই। ওঁকে বলবেন, শিগগির যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। আজ রাত্রেই।"

কথাটা বলেই কেষ্টবাবু বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক লনের পাশে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছেন। বনবিহারী কিচেনে কয়লার উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে খুন্তি নাড়ছে। তা হলে যা ভেবেছি, তাই ঠিক। আমরা এমন সময় দেখা করতে গিয়েছিলাম, যখন

চক্রান্তকারীরা ওঁর বাড়িতে ছিল।

কিন্তু তাঁরা কারা? ওঁর আত্মীয়স্বজন? বাড়ির ভেতরে তো আর কারও সাড়াশব্দ পাইনি।

কর্ণেল ফিরলেন প্রায় ঘন্টাদুই পরে। আমি ব্যস্তভাবে বললাম, "কেষ্টবাবু এসেছিলেন।"

"জানি। ওঁর বাড়ির কাছে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বললেন, আমার খোঁজে বাংলোয় গিয়েছিলেন।"

"ব্যাপারটা তা হলে সত্যি?"

"ব্যাপারটা একেবারে হং চং লং।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "আবার সেই হং চং লং। একটু খুলে বলবেন তো?"

কর্ণেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি খুললেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "বছর তিনেক আগে এখানে এসেছিলাম। কলকাতার জাদুঘর থেকে চুরি যাওয়া একটা প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি এখান থেকে পাচার হওয়ার মুখেই উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। তবে তার জন্য কোনও কৃতিত্ব দাবী করছি না। কারণ স্বয়ং পদ্মা আমাকে একটা বড় পুরস্কার দিয়েছিল। এক ঝাঁক দুর্লভ প্রজাতির সাইবেরিয়ান হাঁস। চিন্তা করো জয়ন্ত, পদ্মার জলে সাইবেরিয়ান হাঁস।"

"কেষ্টবাবুর সঙ্গে কী কথা হল বলুন?"

"সাইবেরিয়ান হাঁস নিয়ে। কারণ, সেবার এই হাঁসের খবর কেষ্টবাবুই দিয়েছিলেন। তবে পদ্মার ধারে হঠাৎ দেখা এবং দু চারটে কথা বলার ফাঁকেও মনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু ওই হং চং লং! আজ বিকেলে শান্তি কুটিরে যাওয়ার সময় মনে পড়ে গিয়েছিল, আরে তাই তো। হাঁসের খবর দিয়ে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, কী হাঁস জানি না মশাই! খালি হং চং লং আর হং চং লং। হাঁসের অমন বিদঘুটে হাঁকডাক জীবনে কখনও শুনিনি। ভদ্রলোককে আমার নেমকার্ড দিয়েছিলাম।"

"ধুস! হং চং লং তা হলে কেষ্টবাবুর ভাষায় হাঁসের ডাক?"

কর্ণেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। চিঠিতে হং চং লং লেখার কারণ আশা করি এবার বুঝতে পারছ। পূর্বপরিচয় মনে পড়িয়ে দেওয়া। এবং সেইসঙ্গে সাইবেরিয়ান হাঁসের লোভ দেখানো, যাতে আমি চিঠি পেয়েই ছুটে আসি।"

"বুঝলাম। কিন্তু ওঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত কারা করেছে?"

"সে নিয়ে কোনও কথা হয়নি।"

"কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যের কী আছে? সন্ধ্যাবেলায় অমন নিরিবিলি জায়গায় ওসব কথা বলার রিস্ক ছিল। ওঁর শত্রুপক্ষ ওত পেতে বেড়াচ্ছে। তাই হাঁস নিয়েই কথা হল। তেমনই চড়া গলায় আলোচনা। শেষে বললেন, "রাত দশটা নাগাদ আমি যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করি। হাঁসের খবর দেবেন।"

বাংলো থেকে যখন দুজনে বেরোলাম, তখন গঞ্জের রাস্তাঘাট একেবারে খাঁ-খাঁ নিঝুম। কোথাও গাঢ় কুয়াশার মধ্যে ভুতুড়ে আলো। আমার গা ছমছম করছিল। কর্ণেল খুদে টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেলে হন্তদন্ত হাঁটছিলেন। নতুন বসতি এলাকার পর সেই জঙ্গল আর ঢালু জমির কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার দিক থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উঁচু জমির ঢাল বেয়ে ওঠার পর শান্তি কুটিরের গেট দেখা গেল। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর ছটা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আসতে-আসতে অন্ধকারের পায়ের তলায় নেতিয়ে পড়েছে। হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। কর্ণেল বললেন, "ভাঁটু নাকি?"

"হ্যাঁ সার! আসুন। গেট খোলা আছে।"

আমরা ভেতরে ঢুকলে সে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে গেটের কাছে এল এবং গেটে তালা আটকে দিল। কে জানে কেন, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভাঁটু পেছন থেকে বলল, "আপনারা ওপরে চলে যান। বাবু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

দোতলার সেই ঘরে কেষ্টবাবু খাটের ওপর তেমনই আলোয়ান-মুড়ি দিয়ে এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। মাথায় হনুমান-টুপি। এবার আর চড়া গলায় না, আস্তে আস্তে বললেন, "বসুন।"

আমরা বসলাম। তারপর কর্ণেল বললেন, "হাঁসের খবর বলুন!"

"বলছি। আগে সেই চিঠিটা দেখি।"

"চিঠিটা তো বাংলোয় রেখে এসেছি।"

"এই ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিন। চিঠিটা নিয়ে আসবেন।"

"চিঠিটা নিয়ে কী করবেন?"

"ওটা পুড়িয়ে ফেলা দরকার।"

"আপনি খুব সাবধানী লোক গঞ্জুবাবু!"

"কী বললেন?"

কর্ণেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গঞ্জুবাবু! একটুও নড়বেন না। পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখেছে। আপনার চেলারা পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় এতক্ষণ ফাঁদে পড়ে গেছে। ওই শুনুন। সিঁড়িতে পুলিশের জুতোর শব্দ।"

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সদলবলে একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, "বাঃ! একেবারে কেষ্টবাবু দেখছি। কেষ্টবাবুর আলোয়ান আর মাঙ্কি ক্যাপ। একই ছাঁটের গোঁফ। একই ভঙ্গিতে বসে আছে ব্যাটাচ্ছেলে!"

দুজন কনস্টেবল গিয়ে গঞ্জুবাবুকে খাট থেকে চ্যাংদোলা করে নামাল এবং হাতকড়া পরিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। কর্ণেল বললেন, "ভাঁটু কেটে পড়েনি তো কল্যাণবাবু?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "পাঁচিল থেকে ঠ্যাং ধরে টেনে নামানো হয়েছে।"

"বাড়িটা সার্চ করে ফেলুন। কেষ্টবাবুর ডেড বডি খুঁজে বের করা দরকার। আমার ধারণা, ডেডবডি এখনও পদ্মায় ফেলার সুযোগ পায়নি। কারণ, বিকেলে বাইনোকুলারে দেখছিলাম পদ্মায় বি এস এফের খুব আনাগোনা চলেছে। আপনিও বলছিলেন, একটা চর নিয়ে ক'দিন থেকে দু'দেশের মধ্যে ঝামেলা বেধেছে। রোজ ফ্ল্যাগমিটিং হচ্ছে। কাজেই ডেডবডি বাড়ির ভেতর কোথাও পোঁতা আছে।"

বলে কর্ণেল আমার কাঁধে হাত রাখলেন। "চলো জয়ন্ত। বাংলোয় ফেরা যাক। এখানে শীতটা বড্ড বেশি হুং চং লং করছে।"...

শনির দৃষ্টি লাগলে

অনেকদিন পরে নান্টুমামা এলেন। আমরা তো সবাই হইহই করে উঠলুম। চারদিক থেকে ওঁকে ঘিরে মহানন্দে বনবন করে পাক খেতে লাগলুম। চেঁচামেচিও কম করছিলুম না—এ্যাদ্দিন কোথাও ছিলে মামা...কী করছিলে মামা... কেমন আছো মামা.....

নান্টুমামা চোখ পাকিয়ে এবং দুহাত তুলে কড়া ধমক দিলেন, হল্ট্।

আমরা থামলুম। মামা মুখ ভেংচে এবার বললেন, কী, হয়েছেটা কী? শনির চাকার মতো পাক খাচ্ছিলি কেন তোরা? আমায় কী শনি ভেবেছিস নাকি?

মা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, নান্টু! তা এসেই আবার একটা কুলক্ষুনে কথা না বললে চলত না বুঝি?

নান্টুমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, কুলক্ষুনে মানে?

মা একটু হেসে বললেন, কেন—ওই সব শনিটনি কী বলছিলি যে!

মামাকে গম্ভীর দেখাল। নাক চুলকে বললেন, বলি কি সাধে? এদিকে আমায় শনিতে পেয়ে বসেছে—সে নিয়ে এক জ্বালায় দিনরাত্তির জ্বলছি, তার ওপর ঘরে ঢোকা মাত্র এই ক্ষুদে পালবংশের অনাচ্ছিষ্টি!...

এই বলে উনি আমাদের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে চাপা মন্তব্য করেও ফেললেন, হুঁ, বাংলার পালবংশ! এখন হিস্ট্রি খুঁজে গোপালকে এনে রাজা করে দাও, ব্যস!

মা হেসে উঠলেন। এবং কিছু না বুঝে আমরাও হাসলুম।

মামা কিন্তু আরও রেগে বললেন, হেসো না। মুণ্ডু উড়ে যাবে। তখন কিন্তু গণেশের মতো হাতি-ফাতির মুণ্ডুও আর মিলবে না ঘাড়ে বসানোর জন্যে। আসামে আজকাল হাতি মেলে না। যা দু-চারটে আছে, তাও রেশনিং কনট্রোলারের দপ্তরে ফাইল চাপা পড়ে রয়েছে। লালফিতের ফাঁস কি জিনিস টের তো পাওনি। একটা হাতি পেতে পুরো এক বছর লাইন দিতে হবে।

মা তাঁর ছোট ন্যাওটো ভাইটিকে কথায় না পেরে বললেন, খুব হয়েছে। বোস্ এখন। চা-ফা খা।

মা চলে গেলেন কিচেনে। মামা ধুপ করে বসলেন। তাঁকে কেমন হতাশ আর ক্লান্ত দেখচ্ছিল। আমি বললুম, মামা শনিতে পেয়েছে বললে! কী ব্যাপার?

নান্টুমামা বরাবর 'ভাগ্নেভাগ্নীদের মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তাঁর মতে দলের মধ্যে আমিই একমাত্র বুদ্ধিমান, বাকি সব বুদ্ধু। সম্ভবত সে কারণেই একটি লম্বা প্রশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাই ডিয়ার বয়, সত্যি এ একটা দারুণ ডেনজারাস ব্যাপার। প্রথম প্রথম মোটেও টের পাইনি যে কী ঘটছে। পরে দেখলুম, মাই গড! নির্ঘাত এ হচ্ছে শনির কাণ্ড। তা না হলে এসব কেমন করে সম্ভব?

রুদ্ধশ্বাসে বললুম, কী, কী মামা?

মামা বললেন, আচ্ছা বল তো খোকা—মানুষের চোখ চশমা পরে, না চশমা মানুষের চোখ পরে? কিংবা ধর, আমার কথাই বলি। আমি, আমাব গলায় এই টাইটা পরে আছি, না টাইটা আমার গলা পরে আছে? আমার পা জুতোমোজা পরেছে, না জুতোমোজা আমার পা দুটোকে পরেছে? এবাব পরপর এভাবে হিসেব করে যা। প্যান্ট শার্ট ঘড়ি কলম আংটি — কোন্‌টা এ কম্মো করছে না বল? উরে ব্বাস! একি সাংঘাতিক কাণ্ড! আমার চোখ দুটো যেন ক্রমশঃ উল্টো দেখতে শুরু করেছে সব। ভেবে দ্যাখ, তাহলে মানুষের কী বিপজ্জনক অবস্থা। তার কোন স্বাধীনতা নেই?

মামা হাঁফাতে হাঁফাতে ফের বললেন, সব চেয়ে গুরুতব ব্যাপার ঘটল গতকাল বিকেলে। শখ করে একটা ছড়ি কিনেছিলুম চৌবঙ্গীব একটা কিউবিও শপে। খুব পুরনো ছড়ি। মেড ইন ফিফটিনথ সেনচুরি বি সি—তার মানে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের জিনিস। ব্যাবিলনের রাজা বাবোব্বাসের এক মহামাত্যের হাতের ছড়ি। সেই ছড়ি কিনে মনেব আনন্দে তো বেড়াতে বেরোলুম লেকের ধারে। হঠাৎ দেখি, কিমাশ্চর্যম্! ছড়িটা নিয়ে আমি হাঁটছি না—ছড়িটাই আমাকে নিয়ে হাঁটছে। ওঃ! সে এক মাবাত্মক অভিজ্ঞতা রে...'

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছি। বুক কাঁপছে। প্রত্যেকেই সন্দেহেব চোখে নিজের নিজের জামা-প্যান্ট-জুতোর দিকে তাকাচ্ছি।

সেই সময় হঠাৎ মামা বলে উঠলেন, আমরা বন্দী, আমবা বন্দী। আহা, ওই সব পাখিটাখিগুলো কেমন সুখেই-না আছে! পশুগুলোও অনেকে তাই। স্বাধীন হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিকলু বয়সে সবার ছোট। সে বলল, মামা, তাহলে আমি জামা-প্যান্ট ট্যান্ট সব খুলে ফেলে দিই। এবং সে সত্যি সত্যি হাফপ্যান্টেব বোতাম খুলতে শুরু করল।

এবার যেন আমরা লজ্জা পেয়েই চেঁচামেচি শুরু করলুম।.. ছ্যা, ছ্যা, এই

পিকলু! লিলি দৌড়ে কিচেনে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, মা, মা। ওরা সব নাগাসন্নেসী হচ্ছে।

মা চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে ধমক দিলেন। ...থাম্ তো সব। যেন কুরুক্ষেত্র চলছে ঘরের মধ্যিখানে।

নান্টুমামা চায়ের কাপ প্লেট হাতে নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ থামলেন। মুখ তুলে বললেন, দিদি, আমার ভয় করছে। এ কী হল বলো তো? আমি চা খাচ্ছি, না চা আমায় খাচ্ছে?

মা গম্ভীরমুখে কয়েক মুহূর্ত ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নান্টু সত্যি তোর শনির দৃষ্টি লেগেছে মনে হচ্ছে। চ' খেয়ে সোজা গলির মোড়ে চলে যা। দেখবি ওখানে শনিপূজো হচ্ছে। কিছু প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে আয়।

মামা আশ্বস্ত হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, রাইট, রাইট! তাই যাচ্ছি দিদি।.

কেকরাডিহির বৃত্তান্ত

ট্রেন যদি প্রচণ্ড লেট করে রাতদুপুরে কোন নিঝুম ছোট্ট স্টেশনে পৌঁছয় এবং সেই স্টেশনের নাম যদি হয় কেকরাডিহি, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়ায় সেটা হয়তো ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। তক্ষুনি সব বৃত্তান্ত আঁচ করা চলে।

কেকরাডিহিতে আমার এক পিসতুতো দাদা সেচ দফতরের ইঞ্জিনীয়ার। কাজেই তাঁর একটি সরকারী জিপ গাড়িও আছে। কিন্তু আগে থেকে খবর দিয়ে কোথাও যাওয়া আমার অভ্যাসে নেই। পূজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেকরাডিহির কথা মনে পড়েছিল এবং তক্ষুণি বেরিয়ে পড়েছিলুম কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ভেবেছিলুম, হঠাৎ গিয়ে পড়ে গেনুদাকে চমকে দেব।

কিন্তু উল্টে আমি নিজেই ভীষণ চমকে গেলুম, যখন স্টেশনমাস্টার বললেন, কেকরাডিহি এই স্টেশনের নাম বটে, তবে লোকালিটি এখান থেকে কমপক্ষে মাইল তিনেক দূরে।

স্টেশনমাস্টার মুচকি হেসে আরও বললেন, দিব্যি তো জ্যোৎস্না ফুটে আছে। তাকিয়ে দেখুন না চারপাশে, কোথায় আছেন। একেবারে নির্বাসনে।

চারদিকে আর কোনও বাড়িঘর নেই। জ্যোৎস্নায় দেখলুম কাছে ও দূরে কয়েকটা তালগাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম বিশাল এক মাঠের মাঝখানে এই স্টেশন।

বললুম, তাহলে তো ভারি বিপদে পড়া গেল।

তা বলতে পারেন বটে। স্টেশনমাস্টার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বিপদ আপনার যেমন, তেমনি আমারও কম নয়।

অবাক হয়ে বললুম, আপনার কী বিপদ?

স্টেশনমাস্টার একচোখো রেল লণ্ঠনের দম একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বিপদ বৈকি। কোয়ার্টারে গিয়ে যে শুয়ে পড়ব, তার উপায় নেই, জ্বালিয়ে মারবে। তাই স্টেশনেই রাত কাটাতে হয় আমাকে।

—জ্বালিয়ে মারবে? কে?

এত কথায় আপনার কাজ কী মশাই?—বলে স্টেশনমাস্টার স্টেশনঘরে ঢুকে গেলেন।

তারপর ভেতর থেকে দরজা আটকে দিলেন। এগিয়ে গিয়ে বললাম. শুনুন, শুনুন।

ভেতর থেকে বিরক্ত স্টেশনমাস্টার বললেন, শোনাশুনির সময় নেই মশাই। এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে। ঘুমুতে দেবে না। স্টেশনে থেকেও রেহাই নেই।

এতক্ষণে খালাসি বা পয়েন্টসম্যান যেই হোক, খুকখুক করে কাশতে কাশতে ঘরের বারান্দায় এল। তার হাতেও একটা রেললণ্ঠন। লণ্ঠনটার দম কমিয়ে বারান্দায় একটা সিন্দুকের ওপর পা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

স্টেশনমাস্টারের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভড়কে গিয়েছিলুম। লোকটাকে ডাকলুম, এই যে দাদা, শুনছেন?

তার নাকডাকা শুরু হয়ে গেল। কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। কেকরাডিহি স্টেশনে দেখছি সবই অদ্ভুত।

কিন্তু তার চেয়ে বিরক্তির মশা। মশার কামড়ে অস্থির হয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানেও ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আমাকে ছিঁড়ে খেতে থাকল। তখন মরিয়া হয়ে ঠিক করলুম, তিন মাইল রাস্তা হেঁটে কেকরাডিহি চলে যাব। জ্যোৎস্নার রাতে হাঁটতে অসুবিধে হবে না।

স্টেশনের নিচের চত্বর পেরিয়ে পিচের রাস্তা পাওয়া গেল। তারপর দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে সে ঘুরে বলল, কে?

বললুম, আমি কলকাতা থেকে আসছি। কেকরাডিহিতে আমার পিসতুতো দাদা ইরিগেশন ইঞ্জিনীয়ার। ট্রেন লেট করে পৌঁছে বড্ড গিপদে পড়ে গেছি। তাই—

লোকটি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বুঝেছি। আমারও একই অবস্থা। আমিও কলকাতা থেকে আসছি।

খুব খুশি হয়ে বললুম, তাহলে চলুন না। দুজনে গল্প করতে করতে হাঁটি।

হাঁটবার দরকারটা কী?—লোকটি খড়ঘড় করে অদ্ভুত হাসল। একটু অপেক্ষা করুন না। এক্ষুণি আব্দুলের রিকশো এসে যাবে।

আরও খুশি হয়ে বললুম, বাঃ। তাহলে তো ভালই।

—হ্যাঁ, ভালো। তবে একটু-আধটু মন্দও বলতে পারেন।

—কেন বলুন তো?

—আব্দুল তার রিকশোয় মড়া বয়ে শ্মশানে পৌঁছে দেয়।

—তাতে কী? আমরা তো মড়ার সঙ্গে এক রিকশোয় যাচ্ছি নে!

—কিছু বলা যায় না। লেকটি চাপা স্বরে বলে উঠল, এই যে আপনি আব্দুলের রিকশোয় যাবেন—আপনি মড়া নন, তার গ্যারান্টি দিচ্ছে কে?

লোকটি তো বেজায়' রসিক। হাসতে হাসতে বললুম, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। আমি একেবারে জ্যান্ত মানুষ। জলজ্যান্ত বলতে পারেন।

আমার গ্যারান্টি আমি কিন্তু দিতে পারছি না. মশাই!

তার মানে আপনি মড়া? হেসে অস্থির হয়ে বললুম, মড়া কখনও কথা বলে? মড়া কি এমনি দাঁড়িয়ে রিকশোর জন্য অপেক্ষা করে?

লোকটি গম্ভীর স্বরেই বলল, কেকরাডিহিতে মড়ারাও জ্যান্ত মানুষের মত ফারাক নেই। একটু আগে আব্দুল একটা মড়া শ্বশানে নিয়ে গেল। মড়াটা আমাকে দেখে বলে গেল, ভাল তো দাদা? তাহলেই বুঝুন।

লোকটি সত্যিই তুখোড় রসিক। নিজে একটু হাসছে না। অথচ এমন সব কথা বলছে, যা শুনে না হেসে পারা যায় না। বললুম, একটু আগে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক বলেছিলেন. কোয়ার্টারে রাত-বিরেতে শুতে গেলে কারা নাকি জ্বালায়। মড়ারাই জ্যান্ত মানুষের মত ওঁর পেছনে লাগে তাহলে.

ঠিক ধরেছেন। স্টেশনের ওপাশেই তো শ্মশান। লোকটা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল ফের, যাকগে। আব্দুল এতক্ষণে আসছে। বাঁচা গেল।

জ্যোৎস্নায় কালো হয়ে একটা সাইকেল রিকশো এগিযে আসছিল। কোন আলো নেই। একবার চাপা ভেঁপু বাজল শুধু। কাছাকাছি এলে লোকটি বলল, আয় ভাই আব্দুল! এই দ্যাখ, আরেকজন প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলি কেমন। তোর পুষিয়ে যাবে এবারে।

আব্দুল রিকশো থামিযে আমার উদ্দেশে বলল, পাঁচ টাকা লাগবে বাবু।

রাজি হয়ে গেলুম। দুজনে রিকশোয় উঠে বসলে আব্দুল প্যাডেলে চাপ দিল। রিকশোর চাকা গড়াতে থাকল। আমার সঙ্গী বলল, মড়াটা কাদের রে আব্দুল?

আব্দুল বলল, রায়পুরের পাঁচু। আন্ত্রিক হয়েছিল। ওদিকে আন্ত্রিকের যা অবস্থা, রোজ একটা দুটো করে যাচ্ছে, মুকুজ্জেমশাই!

আমার সঙ্গী তাহলে এক মুখুজ্জেমশাই! বেশ রসিক মানুষ বটে। খি খি করে হেসে বললেন, তুইও তো গিয়েছিলি বাবা।

আজ্ঞে—আব্দুল রিকশোওলা সায় দিল। তা আপনার কী অবস্থা বলুন শুনি।

মুখেজ্জেমশাই বললেন, আমার আর কী বলব? জামাই মেডিকেলের ডাক্তার। অনেক চেষ্টাচরিত্র করল। কিন্তু কাজ হল না।

—সবই কপালের লেখন, মুকুজ্জেমশাই!

বুঝতে না পেরে বললুম, কি হয়েছিল আপনার?

আবার কি? ওই আন্ত্রিক। মুখুজ্জেমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন আপনার কী হয়েছিল?

অবাক হয়ে বললুম, আমার কী হবে?

—আহা! কিছু না হলে তো এই তাজা তরুণ বয়সে টেঁসে গেলেন কী করে?

—টেঁসে গেলুম মানে?

মুখুজ্জেমশাই খি খি করে অদ্ভুত হেসে বললেন, ও আব্দুল! কথা শোন। এখনও লুকোছাপা করছে দেখছিস!

আব্দুল বলল, নতুন টাঁসা তো। তাই বলতে একটু লজ্জা হচ্ছে। পরে ঠিকই বলবেন।

হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না তো?

দুজনেই খি খি খ্যা খ্যা হাসতে থাকল। রাস্তার দুধারে কালো হয়ে আছে ধানের ক্ষেত। দূরে ঘন কুয়াশা। কোথাও তালগাছের সারি। চাঁদটা জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে সমানে। তারপর কোথায় শেয়াল ডাকতে লাগল। এতক্ষণে কেমন একটু ভয় ভয় আচ্ছন্নতা চেপে ধরল।

মুখুজ্জেমশাই হঠাৎ বললেন, রোখকে, রোখকে! আব্দুল, এখানেই নামিয়ে দে!

আব্দুল রিকশো থামিয়ে বলল, এখানে নামবেন কেন?

মুখুজ্জেমশাই নেমে বললেন, এই ছাতিমগাছটা দেখছিস। এটা আমার বরাবর খুব পছন্দ। এখানেই ডেরা করা যাক।

সে কী। তখন বললেন কুঠিবাড়ির জঙ্গলে কেটা ভাল গাছ দেখে রেখেছেন।

না রে, থাক—থাক—মুখুজ্জেমশাই নরম গলায় বললেন, শ্যাওড়াগাছে বড্ড পেঁচার জ্বালাতন, সারা রাত্তির ক্যাঁও ক্যাঁও করে জ্বালিয়ে মারে। বরং ছাতিম-গাছটা...........

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারের ছাতিমগাছের ভেতর থেকে কে বলে উঠল, এখানে হবে না। এখানে হবে না। আগে গিয়ে দ্যাখ।

মুখুজ্জেমশাই গর্জে উঠলেন, কোন্ ব্যাটা রে? বাপৃতি সম্পত্তি পেয়েছিস? ওটা আমার দেখে রাখা গাছ, তা জানিস? নাম্ বলছি হতভাগা।

ছাতিমগাছের দিকে উনি দৌড়ে গেলেন। তারপর ধস্তাধস্তি হইচই বেধে গেল। গাছের ডালপালা বেজায় নড়তে থাকল। আব্দুল জোরে রিকশো চালিয়ে দিল। তফাতে গিয়ে বলল, [illegible] ঝামেলা করে। চলুন স্যার, আপনাকে বরং কুঠিবাড়ির ওখানে নিরিবিলি [illegible]ছের কাছে পৌঁছে দিই। মনের সুখে থাকবেন। জ্যোছনা রাত্তিরে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে গান গাইবেন। বাধা দেবার কেউ নেই।

এতক্ষণে সব বুঝে গেছি। কিন্তু কী করব সেটাই বুঝতে পারছি না।

আব্দুলের রিকশো এবার খুব বেগে চলেছে। একটু পরে মরিয়া হয়ে ডাকলুম, আব্দুল! আব্দুল!

—বলুন স্যার!

—দেখ ভাই আব্দুল, তোমাদের বড্ড ভুল হয়েছে।

—কী ভুল স্যার?

—আমি—মানে আমি একজন জ্যান্ত মানুষ।

হাসির চোটে আব্দুলের রিকশোর গতি কমল। সে বলল, সে তো আমারও মনে হয়, স্যার! আসলে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি লাগে কি না।

যেমন, এই দেখুন না আমার ব্যাপারটা। আন্ত্রিক হয়ে হেলথ সেন্টারে ভর্তি হলাম। তারপর কী হল, বুঝতেই পারলাম না, ডাক্তারবাবুরা জানঘরে ফেলে রাখল আমাকে।

—জানঘর! সে আবার কী?

—আজ্ঞে, রুগী টেঁসে গেলে যে ঘরে রাখে

—সে তো মর্গ! কী সর্বনাশ!

আব্দুল হাসল ফের—তা সর্বনাশ বৈকি! বউ এসে জানঘরে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে খুব তম্বি করতে লাগল। বলে কী, শুয়ে থাকলে সংসার চলবে? রিকশো না ঠেললে খাওয়া জুটবে কী করে? তাই শুনে জানঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। রিকশো ঠেলার কপাল করে জন্মেছিলুম স্যার! মরেও নিস্তার পাচ্ছি না!

—আব্দুল, আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও!

আব্দুল রিকশো থামিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর বলল, বাবুর চোখ আছে বটে! ভাল গাছ পছন্দ করেছেন। গাছটা এখনও খালি আছে বলেই মনে হচ্ছে।

বুঝলুম যে রাস্তার ধারে শুকনো প্রকাণ্ড একটা গাছের কঙ্কালের কথাই বলছে। চাঁদটা সেই নিষ্পত্র গাছের একটা ডালে যেন আটকে আছে ঘুড়ির মত। লাফ দিয়ে রিকশো থেকে নেমেই দৌড় দিলুম। আব্দুল পেছনে চ্যাঁচাচ্ছিল, টাকা বাবুমশাই! ভাড়ার টাকা দিয়ে যান!

জলকাদা ধানক্ষেত ভেঙে দৌড়ুচ্ছিলুম। অনেকটা গিয়ে শুকনো পোড়ো জমি পাওয়া গেল। সেখানে একটা আলো জুগজুগ করছিল। আলোর কাছে গিয়ে দেখি,জনা চার-পাঁচ লোক বসে আছে এবং তাদের সামনে একটা মড়ার খাটুলি!

আবার মড়ার পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকগুলো আমাকে দেখামাত্র কেন কে জানে ওরে বাবা রে বলে দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে

পালিয়ে গেল। ভড়কে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ খাটুলি থেকে মড়াটা আড়ামোড়া খেয়ে উঠে বসল। তারপর হাই তুলে হাত বাড়িয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, একটা সিগারেট হবে নাকি, দাদা?

মাথা ঘুরে উঠল। মনে হল অতল খাদের শূন্যতায় পড়ে যাচ্ছি।..........

জ্ঞান ফিরেছিল আমার পিসতুতো দাদার কোয়ার্টারে। কীভাবে উদ্ধার পাওয়া গিয়েছিল, সেটা আলাদা গল্প। গেনুদা বলেছিলেন, আগে খবর না দিয়ে কেকরাডিহি আসা কতটা বিপজ্জনক, এবার বুঝলে তো?

বুঝেছিলুম বলেই আর ভুলেও কেকরাডিহির নাম পর্যন্ত মুখে আনি না।

কেকরাডিহির দণ্ডীবাবা

কেবলরাম বলল, 'যখন-তখন গেলেই হল না মাঠান। বারবেলা তিথি নক্ষত্র বলে কথা আছে না? ঠিক সময় গেলে তবে দর্শন পাবেন।'

রাঙা পিসিমা মুখ ভার করে বললেন, 'যখনই বলি, তোর খালি ওই এক কথা। এদিকে রোগ বাড়তে বাড়তে মাথায় ঠেকেছে। কখন একটা কিছু সর্বনাশ হয়ে গেলেই হল। বাড়ির লোকের আর কী? আমার মরার পথ তাকিয়েই আছে সবাই। হাড় জুড়ুবে সব্বাইকার!'

এমন কথা শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না। বললুম, 'ও কী বলছেন পিসিমা। চলুন, আজই আপনাকে নিয়ে বেরুব।'

কেবলরাম মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখ বেজার করে বেরিয়ে গেল। পিসিমা আশ্বস্ত হয়ে লাঠি ঠুক ঠুক করে নিজের ঘরে গেলেন। কোণার দিকে চেয়ারে বসে ভবভূতি চুরুট টানছিলেন আর পুরোন কাগজ পড়ছিলেন। এবার বললেন, 'কারও অসুখ-বিসুখ করেছে মনে হচ্ছে?'

বললুম, 'আবার কার? রাঙা পিসিমার

'কী অসুখ?'

'বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।'

'ধুস! লক্ষণ-টক্ষণগুলো কী?'

'এই ধরুন, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না। যেটুকু হয়, সেটুকু নাকি ভয়ঙ্কর স্বপ্নে ভরা। কখনও দেখেন, রাক্ষস আসছে হাঁ করে তেড়ে। কখনও দেখেন, সাতটা ভালুক এসে দাঁত বের করে বেজায় ঝগড়াঝাঁটি করছে। এইসব আর কী!'

ভবভূতি একটু হেসে বললেন, 'ও কিছু না। বদহজম। হজমী ওষুধ খাইয়ে দিও।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'হজমী ওষুধ! গিয়ে দেখুন না ঘরভর্তি খালি নানারকম হজমী ওষুধের শিশি।'

ভবভূতি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তোমর পিসিমার বয়স হয়েছে তো! এ বয়সে অমন হয়েই থাকে। আমার বারাসতের মাসীমার অবস্থা দেখলে তো চমকে উঠতে। বেশ বসে আছেন। হেসে কথা বলছেন। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন, কী রে বংশীবদন? চল্লি কোথায়? জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ওই আমাদের ঘুঘুডাঙার বংশী। বড় ভাল ছেলে ছিল। আহা! সাপের কামড়ে এই বয়সেই বেচারা মারা পড়ল।'

ভবভূতি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'তা পিসিমাকে কোথাও নিয়ে যাবে মুঝি? কোন বড় ডাক্তারেব সন্ধান পেয়েছ?'

ভবভূতিবাবু লোকটিই এমন। কান করে কিছু শোনেনা। বললুম, 'পেয়েছি।'

'কোথায় শুনি?'

'কেকরাডিহিতে।'

'কেকরাডিহি? সে আবার কোথায় হে?'

'কেবলরামের দেশ।'

ভবভূতি নাক সিঁটকে বললেন, 'হুঃ! নিশ্চয় বেহদ্দ পাড়াগাঁ। তোমাদের কেবলচন্দ্রটিকে দেখলেই বোঝা যায়, তার দেশটা কেমন। তা সেখানে বুঝি কোন ওঝাটোঝার খবর পেয়েছ?'

'কতকটা তাই জ্যাঠামশাই। তবে তিনি মানুষ নন।'

ভবভূতি চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ! মানুষ নন! তবে কী?

'পক্ষী।'

'পক্ষী! মানে পাখি?' ভবভূতি খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। 'পাখি করবে মানুষের চিকিৎসা! ওই ব্যাটা কেবলচন্দ্রটা বলেছে বুঝি? যেও না হে, মারা পড়বে।'

গম্ভীর হযে বললুম, 'না জ্যাঠামশাই! ব্যাপাবটা বলি শুনুন। কেকরাডিহি গ্রামেব কাছে একটা পোড়ো মাঠ আছে নাকি। সেখানে মাঝে মাঝে একটা দাঁড়কাক আসে কোত্থেকে। মানুষের ভাষায় কথা বলে। বোগীদেব বোগেব কথা শুনে ওষুধ দেয়। কীভাবে খেতে হবে, তাও বলে দেয়।'

ভবভূতি আরও হেসে বললেন, 'দাঁড়কাকটার সঙ্গে একটা ওষুধের বাকসোও থাকে বুঝি?'

'না, না। কথাটা শুনুন আগে। রোগের কথা আঁতিপাতি জিজ্ঞেস করে দাঁড়কাকটা উড়ে যায়। চক্কব মেরে কোত্থেকে ঠোঁটে কবে একটা শেকড়বাকড় নিয়ে আসে।'

ভবভূতির চুরুট নিভে গিয়েছিল! ফের দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে ঠোঁটে চুরুট থাকা অবস্থায় বললেন, 'গাঁজা!' তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'গুল!' শেষে বললেন, 'বেঘোরে মারা পড়বে। যেও না।'

তারপর যেন খাপ্পা হয়েই বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু দুপুরবেলা যখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি সবে দেখি ভবভূতি সেজেগুজে হন্তদন্ত হাজির। মাথায় ফেল্ট টুপি, গায়ে বুশশার্ট, পরনে ব্রিচেসের মত আঁটো প্যান্ট, পায়ে হান্টিং বুট এবং কাঁধে কিটব্যাগ, পিঠে বন্দুক। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে একগাল হেসে বললেন, 'চলো, আমিও যাই সঙ্গে। অনেকদিন শিকার-টিকার করি নি। হাতটা সুড়সুড় করছে।'

রাঙাপিসিমা খুশি হয়ে বললেন, 'ভবদাকে পেয়ে মনে জোর এল। পাড়াগাঁয়ে আজকাল বড্ড নাকি ডাকাতের উপদ্রব।'

ভবভূতি নাদুস-নুদুস ভুঁড়িওয়ালা প্রকাণ্ড মানুষ—কিন্তু বেজায় বেঁটে। আমার পাশে বসে বললেন, 'ক্যাবলা, পেছনে যা।' কেবল পেছনে পিসিমার কাছে গিয়ে বসল। তারপর ভবভূতি বললেন, 'হ্যাঁ রে কেবলচন্দ্র, তোদের ওখানে বাঘ-টাঘ নেই?'

কেবলরাম একগাল হেসে বলল, 'নেই কী, তাই বলুন ছার।'

'ছার' শুনে রাঙাপিসিমা খিকখিক করে হেসে উঠলেন। আমার ভালই লাগল। অনেককাল পিসিমাকে হাসতে দেখিনি। ভবভূতি বললেন, 'বাঘ আছে বলছিস? কিন্তু বাঘ মারা আজকাল যে বেআইনি। বাঘ মারব না। বরং দু'চারটে পাখিটাখি মারব।'

কেবলরাম ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কক্ষনো ও কাজ করবেন না ছার! দণ্ডীবাবা ক্ষেপে যাবেন। শাপ দেবেন। শাপে কী হবে জানেন ছার?'

ভবভূতি গোঁফ পাকিয়ে বললেন, 'কী হবে শুনি!'

'মাথার সব চুল উড়ে যাবে।'

ভবভূতি নিজের মাথার প্রকাণ্ড টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ধুস! আমার তো চুলই নেই! পেছনে কয়েকগাছা আছে—যায় তো তাও যাক্। ক্ষতি কিসের?'

আমাদের গাড়ি শহর ছাড়িয়ে নদীর ব্রিজে পৌঁছল। তারপর ফাঁকা রাস্তা একেবারে। সারা পথ ভবভূতি কেবলরামের সঙ্গে রসিকতা করতে করতে চললেন। পিসিমা খুব হাসলেন। তার ফলে কেকরাডিহির দণ্ডীবাবার প্রতি আমার ভক্তিটা ক্রমশ বেড়ে গেল। এই হাসিখুশিটা খুব শুভ লক্ষণ বৈকি।

মাইল দশেক চলার পর কেবলরাম বলল, 'এবার কাঁচা রাস্তা দাদাবাবু!'

কাঁচা মানে কাঁচা! জীবনে এমন অখাদ্য রাস্তায় কখনও গাড়ি চালাইনি। ভয় হচ্ছিল, গাড়ি না বিগড়ে যায়। আরও মাইল চারেক এগিয়ে পড়ল বাঁদিকে একটা বিশাল ডাঙাজমি। ঘুটিং কাঁকড় যত, তত ছোটবড় পাথরের টুকরো। বাংলা বিহারের সীমান্ত এলাকা এটা। কেবলরাম চেঁচিয়ে উঠল, 'এইখানে। এইখানে।' গাড়ি থামালুম।

কেবলরাম মাঠের ওধারে একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল, 'ওই হল গে কেকরাডিহি, দাদাবাবু। আর এই হল গে দণ্ডীবাবার থান।'

ভবভূতি বললেন, 'থান? কোথায় থান?'

একটা বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছ দেখিয়ে কেবলরাম ঢিপ করে প্রণাম করল। রাঙাপিসিমাও তার দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। ন্যাড়া

তালগাছের পেছনে একটা মস্ত বড় পাথর রয়েছে। কেবলরাম বলল, 'বাবার ভোগ রাখতে হবে ওই পাথরটার ওপর। আর বাবা উড়ে এসে বসবেন ওই মুড়ো তালগাছটার মাথায়। এসে যখনই কা কা করে ডাকবেন তখন ওনাকে সব বলতে হবে।'

ভবভূতি বললেন, 'বাবার ভোগটা কি হে কেবলচন্দ্র?'

'আজ্ঞে ইঁদুর। মরা হলে চলবে না। জ্যান্ত চাই। লেজে সুতো বেঁধে পাথরটার ওপর রাখতে হবে। পালাতে পারবে না। সুতোটায় এক টুকরো পাথর চাপা দিয়ে রাখলেই চলবে।'

পিসিমা ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বললেন, 'তুই তাহলে শিগগির ইঁদুর নিয়ে আয় বাবা।'

কেবলরাম টাকাটা ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'আপনি থানের সামনে গে বসুন পিসিমা। হাতজোড় করে চোখ বুজে বসে থাকবেন। ভাগ্যে দর্শন থাকলে পাবেন—নৈলে পাবেন না। আমার কোন দোষ নেই। বলেছিলুম. বারবেলা তিথি নক্ষত্র দেখে আসতে হবে।'

পিসিমা বললেন, 'তুই যেন শিগগির ভোগ নিযে আসবি। দেরি কবিসনে বাবা!'

কেবল যেতে যেতে বলল, 'যাব আর আসব। নেতাইদাব ঘবে ইঁদুব পোষা আছে না? লোকেবা হবদম কিনে এনে ভোগ দিচ্ছে বাবাকে।'

সে চলে গেলে পিসিমা লাঠি ঠুকঠুক কবে ন্যাড়া তালগাছটাব গুঁড়ির কাছে গিয়ে করজোড়ে বসে পড়লেন। ভবভূতি চাবদিকটা দেখে নিযে বললেন, 'দেখি, কোথাও শিকার পাই-টাই নাকি।'

উনি বন্দুক বাগিয়ে সামনে ছোটবড় পাথরেব আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গ্রীষ্মের বিকেল। কিন্তু খোলামেলা জায়গা বলে হু হু করে বাতাস বইছে। গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। দৃষ্টি তালগাছের মাথার দিকে। উহুঁ—মাথাই নেই তালগাছটার। একেবারে কবন্ধ। এখন শুধু ভাবনা, কেবলবাম ভোগ আনবার আগে বাবা এসে পড়লে পিসিমা কিভাবে ঠেকিয়ে রাখবেন।

একটু আনমনা হয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল ভবাট গম্ভীর গলার ডাক—'গা গা গা!' তাকিয়ে দেখি তালগাছের বাজপড়া ডগায় কখন এসে গেছে এক দাঁড়কাক। পেল্লায় চেহারা। আর সে কী ডাক! কা কা নয়—একেবারে গা গা গাও গাও!

পিসিমা নিশ্চয় 'গাও গাও' শুনেই ভজন গাইতে শুরু করেছেন। ভারি মিঠে গলা তো রাঙাপিসিমার! উনি যে এত সুন্দব গান গাইতে পারেন, জানতুম না তো!

দণ্ডীবাবা মুগ্ধভাবে বসে গান শুনছেন মনে হল। কিন্তু কেবলরাম আসছে

না কেন? বাবা যদি রাগ করে চলে যান? পিসিমা যেন ওঁকে ঠেকিয়ে রাখতেই ভজন লম্বা করে চলেছেন। পিসিমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলতে হয়। যখনই দম নিতে থামছেন, দণ্ডীবাবা উঠছেন, 'গা গা! গাও গাও!'

এক সময় পা টিপেটিপে কেবলরাম এসে পড়ল। তার হাতে মোটা সুতোয় বাঁধা তিনটে নেংটি ইঁদুর ঝুলছে অথবা দুলছে। সুতো বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কেবলরামের ঝাঁকুনি খেয়ে ফের লম্বা হয়ে পা ছুঁড়ছে। লেজ নাচাচ্ছে।

সে ভক্তিভরে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে পিসিমার কাছে ভোগ পৌঁছে দিতে গেল। এখন একটাই সমস্যা। পিসিমার ইঁদুর-আরশোলাতে বড্ড ভয়। কেবলরাম অবশ্য সেটা জানে। কিন্তু পিসিমার কাছাকাছি ভোগ রাখলে পিসিমা কতটা সামলাতে পারবেন জানি না। উত্তেজনায় উদ্বেগে তাকিয়ে রইলুম।

ইঁদুর তিনটে দেখা মাত্র পিসিমার গান থেমে গেল। তিনি ইশারায় কেবলরামকে দূরে ওগুলো রাখতে বলছেন এবং সেই সঙ্গে হাঁউমাউ করে দণ্ডীবাবার উদ্দেশে বলছেন, ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর স্বপ্ন বাবা! বড় বড় রাক্ষস-খোক্ষস! হাঁ করে গিলতে আসে। আর একটা কালো কুচ্ছিত পেত্নী বাবা, সাদা থানের কাপড় পরে আমাকে ভেংচি কাটে। গাল দেয়। আমি কোন দোষ করিনি বাবা, তবু আমাকে গালমন্দ করে। শোনো বাবা, একটা-দুটো নয়—সাত-সাতটা ভালুক এসে নাচে। আমার দম আটকে যায় বাবা!'

দণ্ডীবাবা ডানা চুলকোচ্ছেন ঠোঁট দিয়ে। তারপর হঠাৎ ওপাশে ঘুরে কী যেন দেখতে থাকলেন। এবার ইঁদুর তিনটে দেখিয়ে মরিয়া হয়ে কেবলরাম চেঁচাল, 'ইদিকে দেখুন বাবা! ভোগ এনেছি আপনার!'

কিন্তু বাবার মনে কী ছিল, হঠাৎ উড়ে চলে গেলেন। পিসিমা করুণ মুখে বললেন, 'বাবা যে ভোগ ফেলে চলে গেলেন কেবলরাম! তাহলে আমার কী হবে?'

কেবলরাম বলল, 'কিছু ভাববেন না। ভোগ থানে ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা যখন খুশি ফিরে এসে খাবেন। চলুন, এখন আর বসে থেকে লাভ নেই।'

'আমার অসুখের ওষুধ যে দিয়ে গেলেন না?'

'ওই তো ওষধ আপনার মাথায়!'

পিসিমা ঝটপট মাথায় হাত দিতেই পেয়ে গেলেন কিছু। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধলেন। কেবলরাম ইঁদুরগুলো ছেড়ে দিল পাথরের ওপর। পিসিমা গাড়ির কাছে এলে বললুম, 'ওষুধটা দেখি, পিসিমা!'

পিসিমা বললেন, 'এখন দেখতে নেই। পরে দেখিস। ও কেবল, ভবদাকে ডাক।'

এই সময় ভবভূতির সাড়া পাওয়া গেল বন্দুকের আওয়াজে। নিশ্চয় পাখি-টাখি মারলেন। কেবল ওঁকে ডাকতে গেল।

একটু পরে ফিরলেন দুজনে। দুজনেরই মুখ গম্ভীর। কিন্তু শিকার কই? জিজ্ঞেস করলে ভবভূতি শ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, 'খুঁজে পেলুম না। যা পাথর চারদিকে। যাক্‌গে। খামোকা একটা গুলি খরচ হল।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আবার কাঁচা রাস্তায় নড়চড় করতে করতে গাড়িটা এগোল কষ্টে সৃষ্টে।

পিসিমা ওষুধটা দেখিয়েছিলেন। শুকনো এক টুকরো কাঠি—কিংবা শেকড়, বুঝতে পারিনি। সেটা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে কেবলরামের নির্দেশ মত রোজ সূচের ডগায় একবিন্দু তুলে জলের সঙ্গে খেতেন পিসিমা। আশ্চর্য ব্যাপার। আর রাক্ষস, ভাল্লুক বা পেত্নিটা এসে জ্বালাত না। দিব্যি ঘুমোতেন। সব সময় হাসিখুশি মেজাজ।

একদিন ভবভূতি এসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চলে যাবার পর কেবলরাম বলেছিল, 'ভব ছারেব মাথাটা দেখেছেন? পেছনে গোটাকতক চুল ছিল, তাও আর নেই! হুঁ—হুঁ বাবা, শাপ বলে কথা!'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কিসের শাপ? কে শাপ দিল ওঁকে?'

'আবার কে? দণ্ডীবাবা!' কেবলরাম গলা চেপে বলেছিল। 'বলতে বারণ করেছিলেন দুটো টাকা দিয়ে। তাই বলিনি। কিন্তু টাকা শোধ হয়ে গেছে এ্যাদ্দিনে। এবার বলে দিই দাদাবাবু ভবছার সেদিন কেকরাডিহির দণ্ডীবাবাকে গুলি করে মেরেছেন, জানেন?'

'এ্যাঁ! বলিস কী রে?'

'হ্যাঁ—দাদাবাবু। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড। দণ্ডীবাবা পড়ে রয়েছেন গুলি খেয়ে। আর ভব ছাব মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে আমি হায় হায় করে উঠলুম। তখন উনি বলেন কী, পানকৌড়ি উড়ে যাচ্ছে ভেবে গুলি করেছিলুম রে! তুই দুটো টাকা নে—কাকেও যেন বলিস নে।'

বলেছিলুম, 'চেপে যা। আমায় যা বললি, বললি। কক্ষনো পিসিমা যেন না শোনেন।'

বুদ্ধিমান কেবলরাম কথাটা পিসিমাকে বলেনি আজও। তবে একথা সত্যি যে ভবভূতির মাথায় আর একগাছিও চুল নেই। কেকরাডিহির দণ্ডীবাবার অভিশাপ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

ডাঃ জনার্দন অধিকারীর কথা

একমাস হল আরব সাগরের এই বিদঘুটে দ্বীপে জুটেছি। ডাক্তারিতে প্রচণ্ড রকমের পসার হবে ভেবেছিলুম। তার লক্ষণ দেখছিনে। দ্বীপের লোকগুলোর যেন অসুখ-বিসুখই হয় না। সবাই যে তাগড়া চেহারা, কিংবা দত্যিদানবের মত বলবান, তাও নয়। বরং অনেকেই রোগাপটকা। অথচ মাথাধরা হাঁচি সর্দি বা অগত্যা হোঁচট খেয়েও পায়ের আঙুল কেটেছে, এমন দেখিনি। ডাক্তারখানায় বসে মাছি তাড়ানো ছাড়া আর কাজ নেই আমার। মনে মনে খাপ্পা হচ্ছি আর ঈশ্বরকে বলছি, হে ঈশ্বব। তোমার এ কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! মানুষ থাকবে. আধিব্যাধি থাকবে না—এ কি হয় প্রভু? শিগগির যা হোক একটা অসুখ—জ্বরজ্বারি নয়তো পেট ব্যাথা দাও কাউকে। আমার যে আর দিন কাটে না।

হয়তো ঈশ্বর শেষ অব্দি ভক্তের আকুল আবেদনে সাড়া দিলেন। এক সন্ধ্যেবেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার রাঁধুনী-কাম-কম্পাউণ্ডার গোবিন্দ চমৎকার কফি বানায়। সেই কফি খাচ্ছি আর একটা মেডিকেল পত্রিকাব পাতায় চোখ বুলোচ্ছি, বাইরে বারান্দায় একটা অস্পষ্ট আওয়াজ হল। তাবপব চাপা গলায় কেউ বকিযে উঠল। তখন বললুম—কে?

দরজা খোলা। লোকটা যেই হোক, দরজার সামনাসামনি বাবান্দায় ওঠেনি। তাহলে তাকে দেখতে পেতুম। আমার কথার জবাবেই যেন তাব আব একবাব চাপাগলার আর্তনাদ শুনলুম। তখন গোবিন্দকে ডাকলুম।

গোবিন্দ ভেতর থেকে এসে বলল—ডাকছেন স্যাব?

—দেখ তো গোবিন্দ, বাইরে কে।

গোবিন্দ খোলা দরজায় উঁকি মারল। তাপব ব্যস্তভাবে বলে উঠল—স্যাব, স্যার! কে বারান্দার কোণায় পড়ে আছে।

শুনে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। গোবিন্দ ততক্ষণে বারান্দায চলে গেছে। বেরিয়ে গিয়ে দেখি, একটা লোক বারান্দার কোণার দিকে উপুড় হয়ে রয়েছে। তার আধখানা শরীর বারান্দার নীচে ঝুলছে। দুটো হাত মুঠো করে বেখেছে। কিন্তু একটুও নড়াচড়া নেই।

গোবিন্দ তাকে টেনে ওঠাচ্ছিল। বলল—অজ্ঞান হয়ে গেছে স্যার।

দুজনে ওকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে এলুম। রোগী পরীক্ষা কবি যে ঘরে, সেই ঘরে উঁচু স্ট্রেচারে শুইয়ে দিলুম। তারপর আঁতকে উঠলুম। ওর বুকে

একটা ক্ষত থেকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। খয়েরি শার্টটা শুকনো রক্তে মাখামাখি। বোতাম খুলে শার্ট সরিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হলুম। আধ ইঞ্চি লম্বা সরু দুটো চেরা দাগ দু' জায়গায়। খুব গভীর দাগ বলে মনে হল না। দুটো নখের আঁচড়ের মতো। তা থেকে রক্ত ঝরেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। তাই মনে হল, অন্তত কয়েক ঘন্টা আগে লোকটা জখম হয়েছে। দেহে প্রাণ আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। গোবিন্দকে ব্যান্ডেজ তৈরী করতে বলে আমি স্টোভ ধরাতে ব্যস্ত হলুম। জল গরম করে ক্ষতস্থান আগে সাফ করা দরকার।...

এক ঘন্টা পরে লোকটার জ্ঞান হল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। গোঙিয়ে উঠল দুর্বোধ্য ভাষায়। ওকে আশ্বস্ত করে বললুম—ভয় পাচ্ছ কেন?

গোবিন্দ বলল—স্যার, লোকটাকে আমি চিনি মনে হচ্ছে। ওকে আমি জেলে বস্তিতে দেখেছি।

লোকটার পরনে ছেঁড়া নোংরা একটা পাতলুন, গায়ের জামাটাও তেমনি। গায়ের রঙ কালো। একটু পরে সে মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখ খুলল। এবার অনেকটা শান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। আমাকে আরও অবাক করে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল-- আপনিই কি ডাঃ জি. অধিকারী?

—হ্যাঁ। আপনি কে বলুন তো? আর এমন জখমই বা হলেন কীভাবে?

সে গোবিন্দের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল—দয়া করে ওকে বাইরে যেতে বলুন। আমি আপনাকে গোপনে কিছু বলতে চাই।

আমার ইশারায় গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। আমি তার মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে বললুম—বলুন, কী বলতে চান। নির্ভয়েই বলুন। আমার এখানে আপনার কোন বিপদ নেই।

—দরজাটা আগে ভাল করে বন্ধ করুন ডাঃ অধিকারী।

দরজা বন্ধ করে দিলুম। সে ঘরের ভিতরটা দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় বলল--আমার নাম ডক্টর বি. ডি. কোহেলি।

অমনি চমকে উঠেছি। ডক্টর ভগবান দাস কোহেলি!! এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! আগে কালিকটে থাকার সময় এই প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানীর নাম শুনেছিলুম। এই দ্বীপে একসময় ওঁর একটা ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরি ছিল নাকি। হঠাৎ সেটা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারপর থেকে উনিও নিখোঁজ হন। খবরের কাগজে অনেক হইচই করাও হয়েছিল। ভারত সরকার যথারীতি তদন্তও করেছিলেন। কিন্তু ওঁর নিরুদ্দেশ রহস্যের কোন সমাধান করা যায়নি। ধ্বংস হওয়া ল্যাবরেটরিতে কোন লাসও পাওয়া যায়নি। অথচ গোবিন্দ বলল, ওঁকে সে

জেলে বস্তিতে দেখেছে। তার ওপর অদ্ভুত ব্যাপার, বুকে এমন ক্ষত নিয়ে আচমকা আমার কাছে ওঁর আবির্ভাব!

উত্তেজনা চেপে শান্তভাবে বললুম—আমি খুবই আনন্দিত যে আপনার মতো একজন মানুষের সেবা করার সুযোগ পেলুম। দয়া করে এবার আপনার বক্তব্য বলুন ডঃ কোহেলি।

ডঃ কোহেলি বললেন—আমার গলা শুকনো লাগছে। কিন্তু না, জল নয়। আপনি আমাকে একটু ব্র্যান্ডি খাইয়ে দিন ডঃ অধিকারী। কথা বলার শক্তি দরকার।

পাশের টেবিল থেকে ব্র্যান্ডি গ্লাসে এনে খাইয়ে দিলুম। ডঃ কোহেলি এক মিনিট চোখ বুজে থাকার পর চোখ খুলে ম্লান হাসলেন। বললেন—খামোকা আপনি আশ্বাস দিতে চেষ্টা করবেন না। আমি জানি, আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমাব মৃত্যু হবে। তাই আপনাকে সব কথা বলে যেতে চাই।

আমি কান পাতলুম। ডঃ কোহেলি বললেন—আপনি শুনে থাকবেন. এই দ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণ অংশে পাহাড়ী এলাকায় আমাব একটা ল্যাবরেটরি ছিল। আচমকা বিস্ফোরণে সেটা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ধ্বংস হওয়ার পেছনে আমারই হাত ছিল, একথা কেউ জানে না।

—কেন ধ্বংস করলেন?

—সজ্ঞানে করিনি। অর্থাৎ তখন আমি মানুষ ছিলুম না। ভুল করে ঘুমেব ট্যাবলেট খেতে গিয়ে একটা সাংঘাতিক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছিলুম। তাবপর আমার শরীর একেবারে বদলে যায়। বিকট এক সামুদ্রিক প্রাণীতে পরিণত হই। উত্তেজনায় অস্থির-হয়ে পড়ি। রাগে দুঃখে ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র ভাঙচুর শুরু করি এবং ঐ করতে গিযে রাসায়নিক গণ্ডগোলে আগুন ধবে যায়। তখন আমি খাঁড়িতে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ি।

—ওই সময় ল্যাবরেটরিতে আর কোন লোক ছিল না?

—না। কর্মচারীদের সন্ধ্যাতেই ছুটি দিতুম। কারণ রাতে ওখানে কেউ থাকতে চাইত না। আমি একা থাকতুম। ওরা আসত সকালবেলায়।

—রাতে ওরা থাকতে চাইত না কেন?

—শুনলে হাসবেন। ভূতের ভয়ে।...দয়া করে আমায় আর একটু ব্র্যান্ডি দিন। আবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

আবার গেলাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে ওঁকে খাইয়ে দিলুম। তাবপব বললুম—আপনি বিকট সামুদ্রিক জীব হয়ে গিয়েছিলেন বললেন। কিন্তু ডঃ কোহেলি, সত্যি কি তা বাস্তবে সম্ভব? ভুল কোন ট্যাবলেট খেয়ে আপনাব মানসিক অসুখ হয়ে যায় নি তো?

ডঃ কোহেলি ম্লান হেসে বললেন—না ডাঃ অধিকারী! যা বলছি, তা সম্পূর্ণ সত্যি। যে মানুষ একটু পরেই মারা যাবে, সে কেন মিথ্যা বলবে বলুন?

অপ্রস্তুত হয়ে বললুম—না, না আপনি বলুন। আমি অবিশ্বাস করিনি। ওটা একটা কথার কথা।

ডঃ কোহেলি বললেন—সমুদ্রের জলে আমার জীবন কাটানো অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ ডাঙায় এলেই যদি কোন মানুষের চোখে পড়ে যাই, তাহলে সে ভয় পেয়ে হয়তো আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। তাই প্রাণের টানে ডাঙায় ওঠার সময় আগে দেখে নিতুম, কোথাও কাছাকাছি মানুষ আছে কী না। আসলে আমি মানুষ, শরীরটা সামুদ্রিক প্রাণীর হলে কি হবে? একদিন ডাঙায় উঠে পাথরের ওপর বসে আছি, হঠাৎ দূর থেকে লাইটহাউসের প্রহরী আমাকে দেখতে পেল। আপনি নিশ্চয়ই লাইটহাউসটা দেখেছেন?

—দেখেছি। তারপর?

—সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সমুদ্র দেখছিল। হঠাৎ এদিকে ঘুরতেই আমায় দেখে ফেলল এবং সম্ভবত আমার বিকট চেহারা দেখে ভয় পেয়েই দূর পাল্লার রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ে বসল। গুলিটা আচমকা এসে লাগল আমার পায়ে। আর্তনাদ করে জলে ঝাঁপ দিলুম। যন্ত্রণায় অস্থির! লোনা জলে যন্ত্রণা বেড়ে গেল। ঘা বিষিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় একদিন ধরা পড়লুম জেলেদের জালে। তারা তো এমন বিদঘুটে প্রাণী কখনও দেখেনি। দুই হাত দুটো পা-ওলা কতকটা শুশুকের মতো দেখতে এক আজব প্রাণী দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। অবশ্য শুশুকের মতো হলেও মুখটা ছিল রাক্ষসের মতো ভয়ঙ্কর। হাতে-পায়ে বড় বড় নখও ছিল। বুঝতেই পারছেন, নিজের এই বিচ্ছিরি চেহারা নিয়ে আমি কত অসুখী ছিলুম।

ডঃ কোহেলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললুম—তারপর কী হল বলুন?

ডঃ কোহেলি বললেন—ওরা আমাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ধরে নিয়ে গেল। সরকারী সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণাগারের ডঃ মোহনদাস ভাটিয়ার কাছে নিয়ে গেল। ডঃ ভাটিয়া বরাবর আমার ঘোর শত্রু। আমার গবেষণা সম্পর্কে খুব ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করাই ওঁর অভ্যাস ছিল। ওঁর হাতে গিয়ে পড়তে আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না! কিন্তু কী করব? আমি তো আর মানুষ নই।

—ডঃ ভাটিয়া আপনাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু তিনি খুব বুদ্ধিমান এবং ধূর্ত। আমার জামা-কাপড়ের কিছু টুকরো তখনও আমার গায়ে এখানে ওখানে আটকে ছিল। সবটা সমুদ্রের জলে পচে খসে পড়েনি। জেলেরা সেগুলো টের পায় নি। কারণ শ্যাওলা আর কাদায় ওগুলো কাপড় বলে চেনার উপায় ছিল না। ডঃ ভাটিয়া কাপড়ের টুকরোগুলো

নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। তারপর ওঁর মুখে তীব্র কৌতূহল লক্ষ্য করলুম। বারবার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন।

—তখন আপনাকে কীভাবে রাখা হয়েছে?

—টেবিলের ওপর আষ্টেপিষ্টে বেঁধে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

—আপনি নখ দিয়ে কাকেও আক্রমণ করলেন না?

—না। কেন করব? আমি তো আসলে মানুষ। তাছাড়া মানুষেব মধ্যে ফিরতেই চাইছিলুম।

—বুঝেছি। তারপর কী হল বলুন?

—ডঃ ভাটিয়া জানতেন, আমি নিজের খরচায় গবেষণাগার তৈরী করে সমুদ্রপ্রাণী নিয়ে গবেষণা করছিলুম। উনি বিশেষ কবে আমার গোপন গবেষণা কিভাবে টের পেয়েছিলেন। কাপড়ের টুকরো দেখেই তিনি তক্ষুনি টের পেলেন কী হয়েছে। কিন্তু আমিই যে ডঃ কোহেলি, তা উনি বুঝতে পারেননি তখনও। কাছে এসে চোখে চোখ রেখে বললেন—আপনি কে? দুঃখের বিষয়, মানুষের ভাষা বলা আমার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকল। ডঃ ভাটিয়া বললেন—আপনি কী ডঃ কোহেলি, নাকি তাঁর কোন কর্মচারী? আমি বাঁধা অবস্থাতেই নড়াচড়ার চেষ্টা করে বোঝালুম, হ্যাঁ—আমিই সেই হতভাগ্য ডঃ কোহেলি। ডান হাতটা বেশি নাড়ছি দেখে উনি সাবধানে ডান হাতটা খুলে দিলেন। তারপর একটু তফাতে দাঁড়ালেন—পাছে দৈবাৎ আক্রমণ করে বসি। খোলা হাতটা দিয়ে কলম ও একটুকবো কাগজের জন্যে ইশারা করলুম। ডঃ ভাটিয়া কাগজ ও কলম সাবধানে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু লিখতে গিযে দেখলুম, হাত আমাব বশ মানছে না। অতি কষ্টে লিখলুম ঃ 'আমি ডঃ কোহেলি। বাঁধন খুলে দিন।' ডঃ ভাটিয়া বাঁধন খুলে দিলে আমি উঠে বসলুম। ইসারায় পায়ের ক্ষতস্থান দেখালুম। উনি অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলেন এবং গুলিটা বের করে ওযুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন—কিছু খাবেন কী? মাথা দোলালুম। উনি খাবার এনে দিলেন। কিন্তু ততদিনে মুখের রুচিই যেন বদলে গেছে। কাঁচা শামুক ঝিনুক আর মাছ খেতে খেতে মানুষের খাদ্যে আর রুচি হচ্ছে না। ইসারায় ওঁকে কাচের জারে রাখা মাছ দেখালুম। উনি একটু হেসে জার থেকে মাছটা দিলে জ্যান্ত কচমচ করে সেটা খেয়ে ফেললুম। ডঃ ভাটিয়া যখন দেখলেন, আমি ওঁকে আক্রমণ করছি না, তখন উনি স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন। বললেন—আপনার ভয় নেই। নিশ্চিন্তে থাকুন আমার কাছে। বিছানায় শুতে অসুবিধে হলে ওই লোনা জলের চৌবাচ্চায় শামুক ও ঝিনুকগুলোর সঙ্গে বাস করুন। কিন্তু দয়া করে ওই দুষ্প্রাপ্য শামুক আর ঝিনুকগুলো যেন খাবেন না। আপনার জন্যে রোজ আমি মাছ আনিয়ে দেব।

ডঃ কোহেলিকে থামতে দেখে বললুম—তাহলে ডঃ ভাটিয়ার কাছে রয়ে গেলেন? তারপর আবার মানুষ হলেন কীভাবে, সেকথা বলুন?

ডঃ কোহেলি বললেন—কিন্তু ডঃ ভাটিয়ার মতলব ছিল আমার কাছ থেকে সেই গোপন গবেষণার ফরমুলা জেনে নেওয়া। প্রতিদিন চৌবাচ্চার ধারে বসে কথা বলতেন আমার সঙ্গে। একটা কাগজ বোর্ডে এঁটে সামনে ধরতেন। কলম দিতেন আমার হাতে গুঁজে। অতিকষ্টে জবাব লিখতুম। কয়েকদিনেই অনেকটা আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল হাতের। বোকার মতো ওকে ফরমুলা লিখে দিলুম। সেই ফরমুলা অনুসারে ট্যাবলেট তৈরী করে মানুষকে খাইয়ে দিলে সে আমারই মতো বিকট চেহারার সামুদ্রিক প্রাণী হয়ে উঠবে—অথচ মনটা থাকবে মানুষেরই। ডঃ ভাটিয়া ফরমুলা পেয়ে ট্যাবলেট তৈরী করে ফেললেন। তারপর এক নিশুতি রাতে অবাক হয়ে দেখলুম, নিজের এক কর্মচারীকে ডেকে এনেছেন। বেচারা কিছু টের পায়নি। তাকে ট্যাবলেটটা খেতে বলছেন। বলছেন, 'এটা খেলে রাতে ভাল ঘুম হবে। তোমার নাকি ঘুম হয় না বলছিলে!' আমি তো শুনেই চৌবাচ্চা থেকে লাফ দিয়ে পড়লুম। বাধা দিতে যাচ্ছি টের পেয়ে ডঃ ভাটিয়া অন্য মূর্তি হয়ে গেলেন। কমচারীটিও আচমকা আমাকে এগোতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ডঃ ভাটিয়া পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করেন আর কি! আমি ভয় পেয়ে আবার চৌবচ্চার জলে পড়লুম। অসহ্য দুঃখে ছটফট করতে থাকলুম। আমার চোখের সামনে একটা মানুষের ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটতে দেখছি!. . . .কর্মচারীটির ট্যাবলেট খাওয়ার পরই অনিবার্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে তার চেহারা বদলে গেল। যেমনি সে এই বদলটা টের পেল, আঁতকে উঠে পাগলের মত লাফালাফি শুরু করল। ঠিক আমি ওই রকমটি করেছিলাম। প্রতিমুহূর্তে ভাবছি, এই যাঃ। ভাঙচুর শুরু করে দেবে বুঝি! কিন্তু বুদ্ধিমান ডঃ ভাটিয়া ঝটপট দরজা খুলে গর্জন করে বললেন—গেট আউট! গেট আউট! সে পাগলের মতো বেরিয়ে গেল। টের পেলুম বেচারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেই গেল। এখন সমুদ্র ওকে টানছে।..... ....আবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দয়া করে আবার একটু ব্র্যান্ডি দিন!

ব্র্যান্ডিটুকু খেয়ে ডঃ কোহেলি শুরু করলেন—ডঃ ভাটিয়াকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছিল। আমি পাছে বাধা দিই, আমার চৌবাচ্চার চারদিকে ঘরের ছাদ অব্দি লোহার গরাদ দিয়ে ঘিরে ফেললেন। খাঁচার মধ্যে বন্দী রইলুম। এরপর প্রতিদিন, রাত গভীর হলে ডঃ ভাটিয়া নানান ছলে একজন করে মানুষ আনতেন। তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে সামুদ্রিক জন্তু করে ফেলতেন এবং দরজা খুলে দিয়ে বলতেন—গেট আউট! তারা দৌড়ে বেরিয়ে যেত। সমুদ্রে ঝাঁপ দিত নিশ্চয়। আবার কোথায় যাবে?...

—তারপর? উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলুম।

ডঃ কোহেলি বললেন—একদিন ডঃ ভাটিয়া লোহার খাঁচার কাছে এসে বললেন, ডঃ কোহেলি! সাতজন মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখলুম, আপনার ফরমুলা নিখুঁতই বটে। কিন্তু ওদের আবার মানুষ করার উপায় কী? ইসারায় কাগজ-কলম চাইলুম। তারপর তাতে লিখে দিলুম, 'আগে আমাকে খাঁচা থেকে মুক্তি দিন। তাহলে বলব।'...কাগজটা পড়ে দেখে ডঃ ভাটিয়া বললেন. 'মুক্তি দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, আমার হাতে থাকবে গুলি ভরা পিস্তল। আক্রমণের চেষ্টা করলেই গুলি ছুঁড়ব।' খাঁচার দরজা খুলে দিলেন। হাতে পিস্তলও দেখলুম। আমি গবেষণাগারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু হায়! সত্যি তো সামুদ্রিক প্রাণী হয়ে যাওয়া মানুষকে আবার মানুষ করে তোলার ফরমুলা জানিনা! সেটা আবিষ্কারের আগেই দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সৌভাগ্যবশত একটা গবেষণাগার পেয়েছি, চেষ্টা করে দেখিনা--যদি কিছু ফরমুলা আবিষ্কার করতে পারি। কাগজে লিখে বললুম--'আমার হাত ব্যবহার করা কঠিন। আমি যেসব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিখছি, আপনি সেগুলো মিশিয়ে জারে ঢালুন।' ডঃ ভাটিয়া তাই কবলেন। তখন লিখলুম, 'সাতদিন ধরে আমার কথামতো রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরী করুন, একটার পব একটা।' তার মানে, ডঃ ভাটিয়ার হাত দিয়ে আবার আমি গবেষণায় নামলুম। পাঁচদিন পরে একটা ট্যাবলেট তৈরী করা হল। ট্যাবলেটটা আমার ওপরেই প্রয়োগ করতে চাইলেন ডঃ ভাটিয়া। কে জানে কেন, আমার মনে হচ্ছিল- -আবার একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করতে পেরেছি। চোখ বুজে গিলে ফেললুম ট্যাবলেট। দু মিনিটের মধ্যে টের পেলুম আমার শরীর বদলে যাচ্ছে। ডঃ ভাটিয়া আমার দিকে আগ্রহে তাকিয়ে আছেন। দেখতে দেখতে আমার শরীর আবার মানুষের হয়ে উঠল। আনন্দে লাফালাফি শুরু করলুম। ডঃ ভাটিয়া বলে উঠলেন---'ডঃ কোহেলি! আগে মানুষের মতো পোষাক পরে ফেলুন। আপনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ।' বলে উনি গবেষণাগারের দরজা খুলে নিজের ঘরে গেলেন এবং জামাকাপড় এনে দিলেন। আমি আবার মানুষ হয়ে গেলাম। ডঃ ভাটিয়ার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করতে থাকলুম।..

ডঃ কোহেলি একটু চুপ করে থাকার পর ফের শুরু করলেন।—কিন্তু ডঃ ভাটিয়া খলপ্রকৃতির লোক। এই যুগান্তকারী আবিষ্কার উনি নিজের নামে চালাতে চাইছেন, বুঝতে আমার দেরী হল না। কালিকট থেকে এই দ্বীপে খবরের কাগজ আসে। একদিন হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ছোট খবর। ডঃ ভাটিয়া একটা সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন। সেই বৈঠকে তিনি তাঁর এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবেন। এমনকি হাতে-নাতে তার প্রমাণও দেবেন। খবরটা পড়ে ডঃ

ভাটিয়াকে কিছু বললাম না। কিন্তু মনে খুব দুঃখ হল। আবার একটা আশঙ্কাও হল। হয়তো আবিষ্কারটা ঘোষণার ব্যাপারে আমি বাদ সাধব ভেবে উনি আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবেন! ভাগ্যিস সতর্ক ছিলাম। এক রাতে শুয়ে আছি—আমাকে একটা ঘর উনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, হঠাৎ খোলা জানলার পর্দাটা একটু ফাঁক হল এবং অন্ধকারে আবছা দেখলাম একটা হাত ঢুকছে—হাতে একটা কিছু আছে। নিঃশব্দে সরে বিছানার অন্যপাশে চলে গেলুম। তারপর গুলির শব্দ হল পরপর পাঁচবার। বিছানা লক্ষ্য করে গুলিটা ছোঁড়া হল। তারপর হাতটা সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে বাইরে কর্মচারীদের হইচই শুনলুম। গুলির শব্দে তারা জেগে উঠেছে। তারপর ডঃ ভাটিয়ার গলা শোনা গেল—'ও কিছু না। নৌবাহিনীর সৈন্যরা টার্গেট প্র্যাকটিস করছে।' ওপাশে নৌবাহিনীর ঘাঁটি। তাই ওরা কথাটা বিশ্বাস করে যে-যার ঘরে শুতে চলে গেল আবার। কারও মাথায় এল না, এত রাতে নৌসেনারা গুলি ছুঁড়ে হাত পাকাতে যাবে কোন দুঃখে? যখন আবার নিস্তব্ধতা জাগল, তখন সাবধানে দরজা খুলে বেরুলুম। দেখলুম ডঃ ভাটিয়ার ঘরে আলো জ্বলছে।

বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলুম—আপনাকে দেখে কর্মচারীরা কোন প্রশ্ন করত না, কোথা থেকে এলেন এবং কে আপনি?

—না। আমাকে ওরা ভেবেছিল, ডঃ ভাটিয়ার কোন বন্ধু। বেড়াতে এসে ওঁর আতিথ্য ভোগ করছি। ওরা কেউ কিচ্ছু জানত না। ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জীবটি ল্যাবরেটরির চৌবাচ্চার মধ্যেই আছে, ভাবত ওরা। কারণ, ও ঘরে ডঃ ভাটিয়া কাকেও ঢুকতে দিতেন না।

—তারপর কী হল বলুন।

—পা টিপে টিপে ডঃ ভাটিয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে তিনবার টোকা দিলাম। উনি বললেন—'কে'? ওঁর এক চাকরের নাম ভান্টু। চাপা গলায় বললুম—'আমি ভান্টু স্যার।' ...'ভান্টু! কী ব্যাপার?' বলে উনি দরজা খুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম ওঁর ওপর। আমার শারীরিক শক্তি ফিরে এসেছিল প্রচণ্ড। ওঁকে কায়দা করতে দেরি হল না। ডঃ ভাটিয়ার বুকের ওপর বসে ওঁর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিলাম আগে। নিশ্চয় উনি আবার গুলি ভরে রেখেছেন। কারণ, পিস্তলটা আমার হাতে দেখে ডঃ ভাটিয়া কাকুতিমিনতি করতে থাকলেন। তখন বললুম— 'যা বলছি, তা না শুনলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব হতভাগা! আমি এখন মরীয়া। উঠে আমার সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে চলো এক্ষুনি।' পিস্তল তাক করে রেখে ওকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। ডঃ ভাটিয়া আর আক্রমণের চেষ্টা করলেন না। ওপাশের দরজা খুলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। বললুম— 'ওই চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকো।'

ডঃ ভাটিয়া আমার আদেশ পালন করলেন। জানতুম ল্যাবরেটরিতে শক্ত দড়ি আছে প্রচুর। ওই দড়ি দিয়ে নিজের হাতে এক অদ্ভুত ধরনের জাল তৈরী করতেন ডঃ ভাটিয়া। তা দিয়ে সমুদ্রের প্রাণী ধরে এনে গবেষণা করতেন। জাল প্রায়ই ছিঁড়ে যেত। তখন আবার নতুন জাল তৈরী করে নিতেন। সেই দড়ি দিয়ে ওঁকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেললুম চেয়ারের সঙ্গে। আমি রাগে ক্ষেপে গিয়েছিলুম। মাথার ঠিক ছিল না। ওঁর চোয়াল চেপে ধরে হাঁ করালুম এবং মোক্ষম একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলুম। নাক-মুখ বন্ধ করে রাখলে না গিলে উপায় কি?

আঁতকে উঠে বললুম—বলেন কী? তারপর?

ডঃ কোহেলি বললেন—জানতুম এখন ওঁর দেহে প্রচণ্ড শক্তি আসবে এবং দড়ি ছিঁড়ে ফেলবেন। আমাকে আক্রমণ করে বসবেন। তখন গুলি করে ওঁকে মারতে হবে। প্রাণে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না। ব্যাটা সমুদ্রে গিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে ঠ্যালাটা বুঝুক না! ওকে পরে সুযোগ মতো বরং ওষুধ খাইয়ে মানুষ করে দেব। এতে ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে যাবে। তাই ট্যাবলেট খাইয়েই আমি পেছনের দরজা খুলে পালিয়ে এলুম। তারপর এক দৌড়ে পাহাড়ী জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম। বাকী রাতটা একটা পাথরের ওপরে শুয়ে কাটিয়ে জেলে বস্তিতে গেলুম। ওখানে এক বুড়ো আমাকে চিনত। তার নাম ইস্কান্দার। সে আরব। ধর্মে মুসলমান। বাড়ি এডেনের ওদিকে। মাছ ধরার জন্যে এই দ্বীপে আরব জেলেরা এসে থাকে। পারমিট করিয়ে নিতে হয় ভারত সরকারের কাছে, এই যা। তো ইস্কান্দার বুড়ো আমাকে দেখে তাজ্জব বনে গেল। ওকে বললুম—'আমি তোমাদের বস্তিতে লুকিয়ে থাকতে চাই ইস্কান্দার।' ও তাতে রাজী হল। আমার ল্যাবরেটরিতে একসময় অনেক মাছ শামুক সাপ ইত্যাদি বেচে আসত সে। অনেক বখশিস পেত। আমি ওর আত্মীয় সেজে থেকে গেলুম।

—আর ডঃ ভাটিয়ার কি হল?

—সে যথারীতি সমুদ্রে গিয়ে রইল। মাসখানেক পরে একদিন সমুদ্রের ধারে একটা পাথরের ও..র বসে আছি, হঠাৎ সামনে ভেসে উঠল সেই বিদঘুটে সামুদ্রিক জন্তুটি। সে আমার দিকে তাড়া করে আসতেই বুঝলুম, এই সেই ডঃ ভাটিয়া। তার কর্মচারীগুলো হলে আমাকে ওভাবে তাড়া করবে কেন? আমি তো পালিয়ে বাঁচলুম। আর সমুদ্রের ধারে যেতুম না। আজ বিকেলে হঠাৎ কী খেয়াল হল, ভাবলুম—আহা, বেচারা ডঃ ভাটিয়া নিশ্চয় কষ্ট পাচ্ছেন। ওঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। যাই—যদি দেখা পাই, চেঁচিয়ে বলব—'আপনি মানুষ হতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন!' এই ভেবে সেই পাথরটার ওপর বসে রইলাম। একটু পরে সূর্য ডুবল। অন্ধকার ঘন হচ্ছে, এমন সময় টের পেলুম সমুদ্র থেকে কী একটা উঠে আসছে। ডঃ ভাটিয়া

ভেবে চেঁচিয়ে উঠলাম—'ডঃ ভাটিয়া! আপনাকে মানুষ করার জন্য নিতে এসেছি। চলে আসুন!' বিকট সামুদ্রিক জীবটা সেদিনের মতো তেড়ে এল না দেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাছে এসে সে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর নখ দিয়ে আমার বুকে খামচে ধরল। ছাড়িয়ে নিলুম। তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। তখনই টের পেয়ে গেছি, এই বিদঘুটে প্রাণীর নখে নিশ্চয়ই বিষ আছে। ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলুম। পথে বৃষ্টি নামল। এ দ্বীপে পাহাড় আর জঙ্গল প্রচুর। কী কষ্টে এসে বৃষ্টি আর অন্ধকারে প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে এগিয়েছি, বোঝাতে পারব না। প্রথমে মনে হল আপনার কথা। কারণ, ইস্কান্দার বুড়ো প্রায়ই বলত—'দ্বীপে একজন ডাক্তার এসেছেন। কিন্তু ওঁর নসিব মন্দ। একজনও রুগী পাচ্ছেন না। এখানকার আবহাওয়ায় লোকের অসুখ খুব কমই হয়।' যন্ত্রণায় টলতে টলতে আপনার বাড়ি খুঁজে বের করলুম। তারপর ভাবলুম, আমি যখন বাঁচবই না, তখন ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।

আশ্বাস দিয়ে বললুম—না, না। আপনি বাঁচবেন। ওষুধ খেয়ে যন্ত্রণাটা তো কমেছে?

—তা কমেছে। কিন্তু আমি জানি বাঁচব না। ওদের নখে বিষ আছে—হলফ করে বলতে পারি। তো এখন একটা জরুরী কথা শুনুন। আপনি পারেন তো আজই রাতে এখান থেকে কালিবটে একটা বেতার টেলিগ্রাম করুন সমুদ্রবিজ্ঞান দফতরের ডিরেকটর ডঃ রাকেশ শর্মার কাছে। বেতার টেলিগ্রামে জানান—ডঃ ভাটিয়া এবং তার সাতজন কর্মচারীর অন্তর্ধান রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছি। টেলিগ্রাম পেলেই উনি চলে আসবেন আগামীকাল। আমি যদি ততক্ষণ বেঁচে থাকি, ভাল—নয়তো আপনি আমার কাহিনী শোনাবেন। এবং ওঁকে বলবেন—সরকারী ল্যাবরেটরিতে ডঃ ভাটিয়া যে ঘরটায় একা গবেষণা করতেন, সেই ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের আলমারির তিন নম্বর ড্রয়ারে নীল খাতায় পাশাপাশি দুটো ফরমুলা লেখা আছে। বরং লিখে নিন। ভুলে যাবেন।'

আমি কাগজ কলম নিয়ে এলুম। লিখে নিলুম নির্দেশমতো। তারপর বললুম—এবার এই ওষুধটা খেয়ে নিন। ঘুম আসবে।

ডঃ কোহেলি ম্লান হেসে বললেন—আর ঘুম! শেষ ঘুমের অপেক্ষায় আছি ভাই!

ওষুধ খাইয়ে আমি ওঁর শোবার ব্যবস্থা করতে গেলুম। ডঃ কোহেলির কাহিনী আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কি সম্ভব? ভদ্রলোক পাগল নন তো?

ডঃ রাকেশ শর্মার কথা

একটা টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। 'ডঃ মোহনদাস ভাটিয়া এবং সাতজন কর্মচারীর অন্তর্ধান রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি। এক্ষুনি চলে আসুন।' টেলিগ্রামটা সামরিক বেতার মারফৎ এসেছিল। পাঠিয়েছিলেন জনৈক ডাক্তার জনার্দন অধিকারী।

কালিকট থেকে আরব সাগরে অবস্থিত কালপেনি দ্বীপের দূরত্ব প্রায় আড়াইশো মাইল। কালপেনি দ্বীপ থেকে মোনা দ্বীপ প্রায় বাহান্ন মাইল পশ্চিমে। মোনা দ্বীপে ভারত সরকারের একটি সামরিক ঘাঁটি আছে। আর আছে একটি সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণাগার। তার ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ছিলেন ডঃ ভাটিয়া। গত ২৩ মার্চ সকালে দেখা যায়, ডঃ ভাটিয়ার ঘরের দরজা খোলা। তার লাগোয়া তাঁর প্রাইভেট গবেষণাগারেরও দরজা খোলা। ঘরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। ডঃ ভাটিয়ার পাত্তা নেই।

সেই সঙ্গে আরো জানা গিয়েছিল, ওই সময় ডঃ ভাটিয়ার এক বন্ধু নাকি বেড়াতে এসেছিলেন। ওই দিন থেকে তাঁরও পাত্তা নেই এবং যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরেরও দরজা খোলা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, ভদ্রলোকের বিছানায় পাঁচটা গুলির দাগ। গুলিগুলো গদির মধ্যে আটকে ছিল। আগের রাতে—তখন রাত প্রায় আড়াইটে, কর্মচারীরা গুলির শব্দ শুনেছিল।

প্রাথমিক পুলিশ তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়, 'ডঃ ভাটিয়া এবং তাঁর সাতজন কর্মচারীকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে এবং তাঁর বন্ধুই এর পিছনে ছিলেন। বন্ধুটি নাকি পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন। বাইরের কারও সঙ্গে মিশতেন না। চেহারাও ছিল খুব নোংরা। চালচলনেও অভদ্র। সম্ভবত কোন বিদেশী গুপ্তচর ছিলেন ভদ্রলোক। ডঃ ভাটিয়া সামুদ্রিক প্রাণীসংক্রান্ত গবেষণায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি কোন আশ্চর্য এবং যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘোষণা করার জন্য কালিকটে সাংবাদিকদের বৈঠক ডেকেছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকের আগেই তিনি বেপাত্তা হয়ে যান। বোঝা যায়, ভারতের কোন শত্রু দেশ ডঃ ভাটিয়ার কাছ থেকে ওই আবিষ্কার হাতাবার জন্যে তাঁকে চুরি করেছে। পুলিশের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। কারণ, বিষয়টি সরকারের বিদেশ দফতরের আওতায় পড়ে। বিদেশ দফতরের গোয়েন্দা বিভাগ যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন।...'

এই রিপোর্টে ডঃ ভাটিয়ার বন্ধুর বিছানায় গুলির ঘটনা সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ডঃ ভাটিয়া ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর অন্তর্ধানে আমি ব্যথিত। তাই দ্বিতীয়বার গোয়েন্দা দফতর মারফৎ তদন্তের ব্যবস্থা করি। ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও মোনা দ্বীপে পাঠানো হয়। তাঁদের রিপোর্ট কিন্তু অদ্ভুত। ...বিছানায় গুলি করা হয়েছিল যে পিস্তল থেকে তা গবেষণাগারের বাইরে প্রাঙ্গণে ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেছে। কে ছুঁড়ে ফেলেছে পিস্তলটা? দ্বিতীয়ত, আরব জেলেরা কিছুকাল আগে একটি বিদঘুটে সামুদ্রিক প্রাণী জালে ধরেছিল। তারা ডঃ ভাটিয়াকে প্রাণীটি উপহার দেয়। তৃতীয়ত, লাইটহাউসের প্রহরী সূর্যলাল ওই রকম একটি প্রাণীকে গুলি করেছিল। জেলেরা বলেছে, তারা যে প্রাণীটি ধরেছিল, তার পায়ে ক্ষত ছিল। চতুর্থত, পিস্তলটি ডঃ ভাটিয়ারই। পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ডঃ ভাটিয়াকে কে বা কারা চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। দড়ি ছিঁড়ে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু এটা সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। অত শক্ত নাইলনের দড়ি ডঃ ভাটিয়া ছিঁড়লেন কীভাবে? কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। হঠাৎ ওঁর গায়ে দানবের জোর এল কোথা থেকে?.....

সত্যি বলতে কি, আগাগোড়া এক বিচিত্র রহস্যে ভরা এই ঘটনা। মোনা দ্বীপে জনসংখ্যা খুব কম। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটা ঘাঁটিও আছে। দশ বারোটি জেলে পরিবার আছে। তারা আরব এবং কেরলের লোক। জনা তিন শঙ্খব্যবসায়ী আছে। তারা জেলেদের কাছে শঙ্খ কেনে। নিজেদের লঞ্চ আছে। চালান দেয় নানা জায়গায়। একটা ছোট বাজার আছে। দোকানীরা কেরল, তামিলনাড়ু ও মহীশূরের লোক। তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি কে এক ডাক্তার জনার্দন অধিকারী গিয়ে জুটেছেন। টেলিগ্রাম করেছেন তিনিই।...

টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা দিলুম। কালপেনি দ্বীপ পৌঁছুলুম বিমানে। ওখানে একটা বিমানঘাঁটি আছে। সেটা বিমানবাহিনীর।অসামরিক ব্যক্তিদের ওখানে বিমানে নামতে দেওয়া হয় না। বিশেষ ব্যবস্থা করে নিয়েছিলুম কালিকটে। তাই অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। সামরিক বিমানেই পৌঁছেছিলুম। সেখান থেকে সামরিক বাহিনী অর্থাৎ নৌবিভাগের লঞ্চে যখন মোনা দ্বীপে পৌঁছলুম, তখন দুপুর একটা বেজেছে।

খুঁজে বের করলুম ডাঃ অধিকারীর বাড়ি। বাড়িটা বাজারের কাছাকাছি। ডাক্তারের পক্ষে ভাল জায়গা। ডাঃ অধিকারী আমার অপেক্ষায় ছিলেন। ভদ্রলোকের মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল। আমাকে অভ্যর্থনা করে একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলুম গোপনীয়তা অবলম্বন করতে চান।

ডাক্তার ভদ্রলোক একা থাকেন। ওঁর কম্পাউণ্ডার যে, সেই রাঁধুনি এবং ভৃত্য। নাম গোবিন্দ কুট্টি। কেরলের লোক। লোকটা কেমন বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে। কেন কে জানে।

লঞ্চে আমার দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছিলুম। তাই শুধু কফি ছাড়া আর কিছু খেলুম না। তারপর বললুম—এবার তাহলে কাজের কথা হোক ডাঃ অধিকারী।

ডাঃ অধিকারী বিমর্ষ মুখে বললেন—ডাঃ শর্মা, খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—গতরাতে এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, যাতে হয়তো আপনার কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবো। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন। যা বলতে যাচ্ছি, এতটুকু মিথ্যা নয়। অকারণে কেন আপনাকে অতদূর থেকে হয়রান করতে এখানে ডাকব?

কৌতূহলী হয়ে বললুম—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন পরে। আগে বলুন শুনি, কি হয়েছে।

ডাঃ অধিকারী চাপা গলায় এক লম্বা কাহিনী শুরু করলেন—তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি চমকপ্রদ। ডঃ ভগবানদাস কোহেলি নামে এক পাগলাটে সমুদ্রবিজ্ঞানী দ্বীপের একটা টিলার ওপর গবেষণাগার করেছিলেন। আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় সেটা। ডঃ কোহেলিও নাকি তাতে পুড়ে মরেন। কিন্তু এসব কী বলছেন ডাঃ অধিকারী। ডঃ ভাটিয়ার বিদঘুটে সামুদ্রিক প্রাণী হয়ে যাওয়াই তাহলে সেই অন্তর্ধান রহস্য? নির্ঘাত এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

কিন্তু চুপচাপ শুনে গেলুম। তারপর বললুম—বেশ। বোঝা গেল সব। তাহলে এবার ডঃ কোহেলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। কোথায় তিনি?

ডাঃ অধিকারী গম্ভীর মুখে বললেন—সেটাই বলতে যাচ্ছিলুম ডঃ শর্মা। গত রাতে পাশের ঘরে ওঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আমি গিয়েছিলুম আপনাকে টেলিগ্রাম করতে। এসে দেখি ঘরের দরজা খোলা। ডঃ কোহেলির কোন পাত্তা নেই। গোবিন্দ বলল, সে ডাক্তারখানার বেঞ্চে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। কিচ্ছু জানে না।

অবাক হলুম। আবার রাগও হল। বললুম—আপনি যে মিথ্যা বলছেন না, তার প্রমাণ কী।

ডাঃ অধিকারী বিব্রতমুখে বললেন—আপনি গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করুন। অবশ্য গোবিন্দ জানে না যে ডঃ কোহেলিই আহত অবস্থায় আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন।

ক্ষুব্ধভাবে বললুম—আপনি বললেন, নোটবইতে ডঃ ভাটিয়ার গবেষণাগারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের আলমারির কোন ড্রয়ারে ফরমুলা লেখা আছে। আমি এখনই সেখানে গিয়ে খুঁজে দেখছি বরং। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,

তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। কারণ, আপনার গল্পটা আগাগোড়া গাঁজাখুরি। এভাবে হয়রান করার জন্যে আপনাকে পুলিশে দিতে পারি জানেন?

ডাঃ অধিকারী ভয় পেয়েছেন মনে হল। কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন—বিশ্বাস করুন, আমি একবিন্দু মিথ্যা বলিনি। ডঃ কোহেলির কাছে যা শুনেছি এবং এখানে যা ঘটেছে, সব সত্যি। আমার নোটবইটাও দেখুন!

নোটবইটা নিয়ে বললুম—ঠিক আছে। তাহলে আমার সঙ্গে চলুন। অবশ্য, আপনাকে যেতে আমি বাধ্য করতে পারি না। কিন্তু আপনার বক্তব্য এখানকার দফতরে নথিভুক্ত করার দরকার হবে।

ডাঃ অধিকারী অগত্যা আমার সঙ্গে বেবোলেন। ভদ্রলোক একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। দেখে হঠাৎ আমার মনে হল, উনি একেবারে যে মিথ্যাই বলছেন, তা না হতেও তো পারে। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। আর সত্যি যদি গবেষণাগারে তেমন কোন ফরমুলা পেয়ে যাই, তাহলে বড় আনন্দের কথা। ভারতীয় বিজ্ঞানীর কৃতিত্বে পৃথিবীকে চমকে দেওয়া যাবে।

আশা-নিরাশায় অধীব হয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান দফতরের দিকে চললুম। ডাঃ অধিকারী আমার পাশে-পাশে হাঁটতে থাকলেন। সারাক্ষণ মুখটা নীচু। আমার মনে হল, ভদ্রলোক কেনই বা অকারণ ধাপ্পা দেবেন?

আমাব আসার খবর আগেই এখানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। নতুন ডিরেক্টব ডঃ পরিতোষ দত্তকে ডঃ ভাটিয়ার বিস্ময়কর অন্তর্ধানের পর এখানে পাঠানো হয়েছে। তিনি সসম্ভ্রমে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ডাঃ জনার্দন অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলুম। ডঃ দত্ত বললেন -কী কাণ্ড! আপনি বাঙালী? আরে মশাই, আগে জানলে গিয়ে আলাপ করে আসতুম।

ডাঃ অধিকাবীর কাঁচুমাচু ভাবটা কেটে গেল। খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মনে জোর পেলেন যেন। মাতৃভাষায় কথা শুরু হল তাঁদের।

আমি ডঃ ভাটিযাব ব্যক্তিগত গবেষণাগারে যেতে চাইলুম প্রথমে। ডঃ দত্ত যেন একটু বিব্রত হলেন। বললেন—একটা অদ্ভুত ব্যাপাব ঘটেছে ডঃ শর্মা।

শোনামাত্র বিরক্ত হয়ে বলে উঠলুম—মোনা দ্বীপে শুধু অদ্ভুতেব ছড়াছড়ি ডঃ দত্ত। এখানেই যত রাজ্যের উদ্ভট উদ্ভট ব্যাপার ঘটে। বলুন কী ঘটেছে আবার?

ডঃ দত্ত বললেন—আমিও আপনার সঙ্গে একমত। ডঃ ভাটিয়ার গবেষণাগারের তালা ভেঙে গতরাতে চোর ঢুকেছিল! কিছু নিয়ে গেছে কি না, বুঝতে পারছি না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সব দেখে গেছে। এখন আমাদের দুজন কর্মীকে পাহারায় রেখেছি।

ডাঃ অধিকারী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। —হায়, হায়। আমি তাহলে এবার নির্ঘাৎ মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়ে গেলুম।

ডঃ দত্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। আমি বললুম—কই, চলুন তো দেখি।

গিয়ে দেখলুম, গবেষণাগারের দরজায় তালা আটকানো রয়েছে। দুজন যণ্ডামার্কা লোক পাহারা দিচ্ছে। ডঃ দত্ত বললেন—এ তালাটা আমরা দিয়েছি। এক মিনিট, চাবি আমার কাছে আছে।

ভেতরে ঢুকে ভাঙা তালাটা টেবিলে পড়ে থাকতে দেখলুম। অজস্র কাচের জার এবং টবে বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা জলের মধ্যে রয়েছে। এক কোণায় লোহার খাঁচার মধ্যে বড় চৌবাচ্চা দেখা গেল। ডাঃ অধিকারী লাফিয়ে উঠলেন। বললেন— এই তো সেই চৌবাচ্চা!

আমি দক্ষিণ-পশ্চিমের আলমারির সামনে গিয়ে বললুম—এটা কি তালা দেওয়া আছে?

ডঃ দত্ত বললেন—তালা দেওয়া ছিল। রাতের চোর একটা ড্রয়ারের তালা ভেঙে রেখে গেছে। এখনও নতুন তালার ব্যবস্থা করা হয় নি।

ডাঃ অধিকারী আবার আর্তনাদ করলেন—হায়, হায়! আমি যে মিথ্যুক বনে গেলুম!

তিন নম্বর ড্রয়ার টেনে দেখলুম, এটাই ভাঙা হয়েছে। ভেতরে কতকগুলো কাগজ আছে। কিন্তু নীল রঙের কোন নোটবই নেই। ডাঃ অধিকারী মুখ বাড়িয়ে ছিলেন আমার কাঁধের ওপর। তাঁর দীর্ঘশ্বাস আমার কাঁধে লাগল।

গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে ঘুরে বললুম—ডাঃ অধিকারী, আপনার সব কথা এতক্ষণে বিশ্বাস করলুম।

ডাঃ অধিকারী খুশি হয়ে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইলেন। ডঃ দত্ত বললেন —আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। ব্যাপার কি ডঃ শর্মা?

বললুম—সব বলছি! আপাতত ডাঃ অধিকারীকে গোপনে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই!

ডাঃ অধিকারী বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

ডঃ দত্ত বললেন—তাহলে আপনারা কথা বলুন। আমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।

উনি বেরিয়ে গেলে বললুম—ডাঃ অধিকারী, আপনার ওই গোবিন্দ লোকটি কেমন?

—লোক তো খুবই ভাল। বিশ্বাসী। আজ অবধি এতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়নি আমার।

—ওকে পেলেন কোথায়?

—কালিকটে। মাসখানেক আগে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম—মোনা দ্বীপে গিয়ে আমাকে সাহায্য করার জন্যে একজন সহকারী চাই। কম্পাউন্ডারী জানা চাই। আবার যেন সবরকম কাজকর্ম করতে পারে। বিজ্ঞাপনের পর অনেক লোক এল। তাদের মধ্যে বেছে নিয়েছিলুম গোবিন্দকে।

—কাল রাতে ডঃ কোহেলি আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় গোবিন্দর কি শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল?

ডাঃ অধিকারী একটু ভেবে বললেন—তা ছিল। দরজায় কান পাতলেই শুনতে পাওয়ার কথা। কিন্তু গোবিন্দ...

বাধা দিয়ে বললুম—গোবিন্দ ওষুধপত্রের ব্যাপারে কি অভিজ্ঞ? নাকি আনাড়ি বলে মনে হয়েছে আপনার?

ডাঃ অধিকারী ম্লান হাসলেন। সত্যি বলতে কী, এই দ্বীপে এসে ওর জ্ঞান বুদ্ধি পরীক্ষার সুযোগ পাইনি এখনও। একজনও রুগী আসেনি এপর্যন্ত।

—বলেন কী! কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় তো ডঃ কোহেলি আহত অবস্থায় এলেন। তখন কি গোবিন্দ আপনাকে সাহায্য করেনি!

—করেছিল বটে। হ্যাঁ, ইঞ্জেকশন দিয়েছিল। চমৎকার হাত! বলে ডাঃ অধিকারী জিভ কাটলেন। হ্যাঁ, তাও তো বটে। ভুলে গিয়েছিলুম। গোবিন্দকে তখন পাকা কম্পাউন্ডার বলে মনে হচ্ছিল। আসলে আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে!

নানা কথা ভাবতে ভাবতে বললুম—ঠিক আছে। দঃ দত্তকে ডাকা যাক্।

ডাঃ অধিকারী বললেন—আপনার কি মনে হয় গোবিন্দ ফরমুলা হাতিয়েছে?

—কিচ্ছু অসম্ভব নয়। ওই ফরমুলা দুটো বিদেশের কোন বিজ্ঞানী কিংবা কোন সরকারী বিজ্ঞান দফতর কোটি কোটি টাকায় কিনতে চাইবেন!

—ওরে বাবা!...বলে ডাঃ অধিকারী আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বিকৃত মুখে বললেন আবার—ব্যাটা গোবিন্দ কোটিপতি হবার মতলব করেছে? তবে রে বাছাধন! রোস, তোমাকে দেখাচ্ছি মজাটা।

আমি ওঁর কাঁধে হাত রেখে বললুম—চুপ, চুপ, এখন কিছু টের পেতে দেবেন না ওকে। এখনও যখন লোকটা দ্বীপ ছেড়ে যায়নি. বোঝা যায়, ফরমুলা লেখা নীল নোটবইটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। হয়তো আপনার বাড়িতেই কোথাও রেখেছে।

ডাঃ অধিকারী ফিসফিস করে বললেন—তাহলে আমি ব্যাটার দিকে নজর রাখব। কি বলেন?

—রাখুন। কিন্তু এতক্ষণে সে কেটে পড়েছে কিনা, তারও ঠিক নেই।...বলে আমি পা বাড়ালুম বাইরে থেকে ডঃ দত্তকে ডাকার জন্যে।

ডাঃ অধিকারী বললেন—ডঃ কোহেলিকে তাহলে ও ব্যাটাই গুম করেছে। সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসেছে। দেখবেন লাসটা পাওয়া যাবে শিগগির।

—আমারও তাই অনুমান। বলে ডঃ দত্তকে ডাকলুম। উনি বাইরে পায়চারি করছিলেন। ঘরে এলে তাঁকে বললুম—এখনই পুলিশ স্টেশনে একটা ফোন করা দরকার।

ডঃ দত্ত বললেন—আসুন। আমার ঘরে ফোন আছে।

নৌবাহিনীর সুবাদে মোনা দ্বীপে একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গড়া হয়েছিল। পরে জনসাধারণের জন্যেও এক্সচেঞ্জের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চোরাচালানকারীদের ধরার জন্যে উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি দল এখানে আছে। তেমনি থানাও রয়েছে। পুলিশের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। একজন অফিসারইনচার্জ, একজন সেকেন্ড অফিসার, আর জনা দশ কনস্টেবল মাত্র। ফোন পেয়েই অফিসারইনচার্জ বললেন—ঠিক আছে স্যার। গোবিন্দকে এখনই পাকড়াও করছি। বাছাধনকে পাঁচ মিনিটে কবুল করিয়ে ছাড়ব।

বললুম—আহা. ঠিক তা বলছি না মশাই। ওর দিকে নজর রাখতে বলছি। তবে যদি পালাতে দেখা যায়, তখন বরং গ্রেফতার করবেন।

—ঠিক আছে, স্যার! ভাববেন না।

—আর একটা কথা। এখনই আগে একবার খবর নিন. গোবিন্দ ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে নাকি।

—অবশ্যই নিচ্ছি।

—আমাকে এখানেই ফোনে পাবেন।

—আচ্ছা, স্যার।...

ডঃ দত্তের ঘরে সোফায় বসে এবার আমি ডাঃ অধিকারীর কাছে শোনা কাহিনীটি ডঃ দত্তকে আগাগোড়া শোনালুম। ডঃ দত্ত হতভম্ব হয়ে বললেন—এ যে একেবারে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী, ডঃ শর্মা।

বললুম—বিজ্ঞান আজকাল আরব্য উপন্যাসের চেয়েও বিচিত্র ঘটনা ঘটাতে পারছে ডঃ দত্ত। নিজে বিজ্ঞানী হয়েও কি বুঝতে পারছেন না?

ডঃ দত্ত কাঁচুমাচু মুখে বললেন—তা তো বটেই! তা তো বটেই। কিন্তু ডঃ কোহেলি...নাঃ, ভাবতে গিয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। স্বীকার করছি, জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় দারুন উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মানুষের দৈহিক রূপান্তর!

কফি এসে গেল। কফি খেতে খেতে ডাঃ অধিকারী বললেন—আমায় এবার উঠতে অনুমতি দিন ডঃ শর্মা। বাসায় রাওয়া দরকার। এতক্ষণ গোবিন্দ ব্যাটা আরও

কী কীর্তি করে বসল কি না কে জানে! একটা জলজ্যান্ত লোককে হাওয়া করে দিয়েছে। গিয়ে হয়তো দেখব—আমার বাড়িটাই গাপ করে ফেলেছে!

হাসতে হাসতে বললুম—বলা যায় না। ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন। তেমন কিছু ঘটলে ফোন করবেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। ডঃ দত্ত ধরে বললেন—হ্যালো!...তারপর আমার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনার ফোন, ডঃ শর্মা।

থানার ফোন। যা ভেবেছিলুম, তাই। গোবিন্দ বেপাত্তা। ডাঃ অধিকারীর বাড়ির দরজা হাট করে খোলা। বাড়িতে কেউ নেই। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে নৌবাহিনী এবং উপকুল রক্ষীবাহিনীকে জানানো হয়েছে।

ডাঃ অধিকারীকে খবরটা বলামাত্র দৌড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি বললুম—গোবিন্দ দ্বীপ ছেড়ে পালাতে পারবে না। নৌবাহিনী তো বটেই—আপাতত উপকূল রক্ষীবাহিনী চারদিকে সমুদ্র চষে ফেলবে। সব বোট, লঞ্চ, জাহাজ তন্নতন্ন করে সার্চ করবে।

ডঃ দত্ত বললেন—বিকেল হয়ে গেছে। চলুন ডঃ শর্মা, আমরা একবার সমুদ্রের ধারে যাই।

উনি কি বলতে চান, বুঝতে পারলুম। বললুম—সেই বিদঘুটে সামুদ্রিক প্রাণীর দেখা পাবেন, ভাবছেন কি ডঃ দত্ত?

—ঠিক তাই। আমার ধারণা, যদি সত্যিসত্যি ডঃ ভাটিয়া সামুদ্রিক জীবে পরিণত হয়ে থাকেন, তাহলে অন্তত আমাকে দেখলে সমুদ্র থেকে তিনি উঠে আসবেনই—তাহলে চলুন।

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। দ্বীপের পূর্ব অংশ পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। আমরা পূর্ব-উত্তর দিকে চড়াই ভেঙে উঠতে থাকলুম। তারপর একটা খাঁড়ির ধারে গিয়ে পাথরের ধাপে পা রেখে সাবধানে নিচে নামলুম। নিচে এক জায়গায় ঢালু হয়ে একটা বড় পাথর গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবেছে। তার ওপর আছড়ে পড়ছে শাদা ফেনার মুকুটপরা ঢেউ। জলটা পাথরের বুকে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারপর নেমে যাচ্ছে। খাড়ির আশেপাশে অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি উড়ছে। শেষ বেলায় তাদের খুশির চিৎকার শোনা যাচ্ছে চারপাশে। মন কী এক আনন্দে ভরে উঠল! হঠাৎ অদ্ভুতভাবে মনে হল, আহা, আমি যদি এখনই সামুদ্রিক প্রাণী হয়ে যেতুম, কী আনন্দে না ওই ঢেউএর গলা ধরে দোল খেতুম সেই রূপকথার পাতালপুরীতে—যেখানে রূপসী মৎস্যকন্যাদের বাস।

এই মুহূর্তে ডঃ ভাটিয়ার জন্য আমার ঈর্ষা জাগল। আহা, আমি যদি ডঃ ভাটিয়া হতুম!

ডঃ মোহনদাস ভাটিয়ার কথা

প্রথম-প্রথম কিছুদিন খুব মানসিক কষ্ট হত। নির্জন খাড়ির ধারে পাথরে বসে কাঁদতুম। কত রাতে দ্বীপ নিশুতি হয়ে গেলে চুপিচুপি বেলাভূমি পেরিয়ে আমার গবেষণাগারের দিকে এগিয়েছি। কিন্তু একটু দূর থেকে দেখেছি দরজায় কড়া পাহারা রয়েছে। সান্ত্রীগুলো এত বজ্জাত, খুট করে একটু শব্দ হলেই রাইফেল তুলে তাক করে। একবার তো আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে বসল। ভাগ্যিস পাথরের আড়ালে ছিলুম।

আর ভয় ছিল জেলেদের। তারা ডঃ কোহেলিকে প্রাণে না মেরে আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার বেলায় কী করে বসবে, বলা যায় না। যদি উত্তেজিত হয়ে মেরেই ফেলে! ওদিকে লাইটহাউসের ওখানে সমুদ্র এমন চমৎকার দেখায়! জল আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ফোয়ারার মতো। সারাদিন কত রামধনুর খেলা দেখা যায়। কিন্তু লাইটহাউসের প্রহরী ব্যাটা মহা বদমাস। ডঃ কোহেলিকে গুলি করেছিল। আমি সেই ভয়ে ওদিকে যাইনে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয়ের ব্যাপার, আমার সেই সাতজন কর্মচারী! তারা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে দেখতে পেলেই তাড়া করে। ভাগ্যিস, এই খাড়ির দিকটায় সমুদ্রের তলায় প্রচুর পাথর আর গুহা আছে। সেখানে লুকিয়ে পড়ি। ওরা খুঁজে হন্যে হয়। তারপর চলে যায় অন্য দিকে। সেদিন ওরা তাড়া করেছিল। হঠাৎ আঁতকে উঠে দেখলুম, একটা সামুদ্রিক পাইথন বিকট হাঁ করে ওদের দিকে এগোচ্ছে। যেই দেখা, ওরা কেটে পড়ল। আর এদিকে কেউ আসে না। এতে আমার সুবিধেই হল। কিন্তু পাইথনটা আমাকে আক্রমণ করতেও পারে। তাই খাড়ি ছেড়ে একটু তফাতে গিয়ে এই ডুবোপাথরের ফাটলে আস্তানা করেছি। আশেপাশে প্রচুর মাছ। খাদ্যের অভাব হয় না। কিন্তু বাকী জীবন কি এভাবে কাটাতে হবে? আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা দিল্লীতে আছে। তাদের কথা ভাবলে আমার কান্না পায়। ঈশ্বরকে ডাকি—প্রভু! আবার আমার মানুষের জীবন ফিরিয়ে দাও। আর কখনও তোমারর সৃষ্টির নিয়ম বদলে দেবার কাজে হাত দেব না। যারা ওই কাজে অনধিকার চর্চা করছে. তাদের একের পর এক আমি হত্যা করব।

মানুষ হতে পারলে প্রথমে হত্যা করব ডঃ কোহেলিকে। ওই শয়তানটাই এই অনর্থের জন্যে দায়ী। সে আমার মানুষের জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছে। অসহায় ক্রোধে ছটফট করি। একদিন ব্যাটাকে দেখতেও পেয়েছিলুম। বদমাসটা ভালমানুষী

কবে ভাব জমাতে চাইছিল। আমাকে মানুষ কবে দেবে বলে লোভ দেখাচ্ছিল। বিশ্বাসই কবিনি। অমন লোককে বিশ্বাস কবা যায়? হয়তো এবাবও সে কৌশলে আবাব কোন ট্যাবলেট খাইয়ে আবও বিদঘুটে প্রাণী কবে ফেলত। তাই তাকে নখ বাগিয়ে আক্রমণ কবেছিলুম। সে পালিয়ে গেল। তাবপব আব তাব পাত্তা নেই। মবে-টবে যায় নি তো? মবলে কিন্তু আমাব আশাভবসা আব বইল না। এই বিচিত্র ঘটনাব কথা একমাত্র সেই জানে।

আশ্চর্য, দেহে যতই বদল ঘটুক, আমাব মনটা মানুষেবই বয়ে গেল। এটাই মহা সমস্যা। কিছুতেই ভোলা যায় না যে আমি একজন মানুষ। আমাব নাম ডঃ মোহনদাস ভাটিয়া। আমাব জন্ম হয়েছিল উত্তবপ্রদেশেব সুন্দব একটি পাহাড়ী গাঁয়ে। আহা, ছেলেবেলাব সেই সুখেব দিনগুলো কোথায় গেল।

মানুষেব মন নিয়ে বেঁচে আছি বলেই ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন ভাঙলে তখন কী যে কষ্ট হয়! গত বাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, কতকাল পবে দিল্লীতে আমাব বাড়ি ফিবছি। দবজায় দাঁড়িয়ে আছে আমাব স্ত্রী। আমাব বড ছেলে বাহুল, ছোট ছেলে কণিষ্ক, মেয়ে সুপ্রভা বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধবল। সুপ্রভা তো কাঁধে চেপে বসল। আমাব মন ভবে যাচ্ছিল সুখে। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখলুম পাথবেব খাটলে জলেব তলায় শুয়ে আছি। কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে বইলুম, কোনটা স্বপ্ন? আগেবটা না পবেবটা? ভেসে উঠলুম জলেব ওপব। না, এ তো স্বপ্ন নয়। এটাই সত্য। সমুদ্রেব জলে জ্যোৎস্না পড়েছে। ফেনায় ফেনায় শাদা হয়ে আছে চাবপাশটা। ঢেউয়েব মাথায় ফসফবাস ঝিকমিক কবছে। চাঁদেব দিকে তাকালুম। টিলাব মাথায় ভাঙা চাঁদটা কাত হয়ে ঝুলে আছে। ওই তো সেই পুবনো পৃথিবী--বহস্যময় সৌন্দর্যে ভবা ওই জ্যোৎস্না।

আমাব গায়ে তখনও বাহুল, কণিষ্ক আব সুপ্রভাব নবম স্পর্শ যেন লেগে বয়েছে। তখনও কানে ভাসছে তাদেব 'বাবা, বাবা' ডাক। নিশুতি বাতেব সমুদ্রে ভেসে সামনেব উঁচু পাথবে গিয়ে বসলুম। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকলুম।

বতক্ষণ পবে মনটা একটু শান্ত হল। তখন ভেবে দেখলুম, এ শাস্তি আমাব পাওনা ছিল। এ শাস্তি আমাব লোভেব। আমাব পাপেব। আমি খ্যাতি চেয়েছিলুম। টাকাকড়ি চেয়েছিলুম। কিন্তু সেই খ্যাতি ও অর্থেব স্বাভাবিক ইচ্ছেকে লোভ দিয়ে কলুষিত কবেছিলুম। অন্যেব আবিষ্কাবের গৌবব চুবি কবতে যাওয়াতেই ঈশ্বব আমাকে এভাবে শাস্তি দিয়েছেন।

মনে মনে কামনা কবলুম, মৃত্যু তো একদিন হবেই। আবাব যদি জন্ম হয়, তাহলে যেন আমি মানুষ হয়েই আবাব জন্মাই। তাহলে সাবাজীবন এই পাপেব

প্রায়শ্চিত্ত করব। লোভ খ্যাতি অর্থের আশায় কাজ করব না। কাজ করব মানুষের মঙ্গলের জন্যে।...

আজ সকাল থেকে মনটা একেবারে বদলে গেছে। এই অভিশপ্ত জীবন মেনে নিয়েছি। ভেবেছি, যতদিন মানুষ হয়ে বেঁচেছিলুম, ততদিন সমুদ্রের জগতের রহস্য জানবার চেষ্টা করেছিলুম। এবার তো আমি সমুদ্রের সেই জগতে থাকার সুযোগ পেয়েছি। যতদিন বাঁচি, সেই রহস্য জেনে যাব। দুচোখ ভরে দেখে যাব জলের তলার জগতটাকে।

আজ তাই অনেক দূর অবধি গভীর সমুদ্রে ঘুরতে গিয়েছিলুম। কী সুন্দর, কী সুন্দর! পৃথিবীর স্থলভাগের মতোই কত বনজঙ্গল, কত পাহাড়, কত বিচিত্র প্রাণী! সুন্দর রঙীন ছোট ছোট মাছের ঝাঁক আমার গায়ে ঠোঁট আর পাখনা ঘষে আদর করল। কী যে ভাল লাগল। শঙ্খগুলো শুঁড় দিয়ে আমাকে ছুঁল। হঠাৎ একখানে দেখি, একটা জাহাজ ডুবে রয়েছে। কতকালের জাহাজ কে জানে। তার কাঠগুলো পচে ক্ষয়ে গেছে। মরচেধরা লোহার কাঠামোর মধ্যে কয়েকটা কামরা এখনও টিকে রয়েছে। একটা কামরায় ঢুকে দেখি সিন্দুক রয়েছে তিনটে। নখ দিয়ে চিরে তালা ভাঙলুম। শক্ত ছোট বড় কীসব জিনিসে ভর্তি। পরক্ষণে চমকে উঠলুম! এ যে হীরে জহরত মনে হচ্ছে! তাহলে কী প্রাচীন জলদস্যুদের একটা ডুবন্ত জাহাজের খোঁজ পেয়ে গেছি? হ্যাঁ—কোন ভুল নেই। পরক্ষণে দমে গেলুম। ধুর! কী হবে এই মণিমাণিক্য গুপ্তধন দিয়ে? আমার কী কাজে লাগবে? বরং কোন মানুষ এর সন্ধান পেলে রাজা হয়ে যাবে।

কিন্তু না। তাই বলে কোন মানুষকে এর সন্ধান আমি দিচ্ছি না। সুযোগ পেলেও না। মানুষের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

দূরের দিকে এগিয়ে চললুম। কত দূর—কত দূর! গভীব গভীরতর তলদেশে নেমে গেলুম। আমি এখন সমুদ্রের তলায় ঘুরে পৃথিবীর অন্যরূপ দেখতে চাই। অতএব হে মোনা দ্বীপ, বিদায়! বিদায় অতীত জীবনের বন্ধু ও শত্রুরা! বিদায় হে মাটি ও আকাশ। আপাতত আমার যাত্রা কুমেরুর হিম শীতলদক্ষিণ সমুদ্রে।...

লাইটহাউসের প্রহরী সুলেমানের কথা

মোনা দ্বীপ বড় তাজ্জব জায়গা। এখানকার সমুদ্রও বড় আজব খেলা দেখায়। এই লাইটহাউসে আজ বিশ-বাইশ বছর থেকে চুলদাড়ি পাকিয়ে ফেললুম। তবু এখানকার রকমসকম আমার ধাতস্থ হল না। আমার এক সঙ্গী আছে। তার নাম সূর্যলাল। আমার ছেলের বয়সী। খুব চৌকস ছোকরা! তেমনি ডানপিটে আর বলবান। রাইফেলের তাক ভারি মোক্ষম। আধমাইল দূর থেকে একটা মাছিকেও গুলি করতে ওস্তাদ।

বিকেলে আমার পাহারার পালা। দূরবীণ চোখে দিয়ে বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে ডাইনে দূরবীণটা খেয়ালবশে ঘোরালুম। হঠাৎ দেখি, একটা লোক চুপচাপ উঁচু খাড়ির একটা ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে পশ্চিম থেকে সোজা রোদ্দুর পড়েছে বলে তার চোখের ভাবভঙ্গীগুলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। ওখানে কোন্ মতলবে দাঁড়িয়ে আছে? হাতে তো মাছ-ধরা ছিপ নেই!

তারপর তার পায়ের কাছে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। কী একটা মানুষের মতো শোয়ানো আছে। ব্যাপারটা কী? পরক্ষণে দেখি, সে পায়ের কাছের জিনিসটাকে দুহাতে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ও কী! ওটা যে আস্ত একটা মানুষ! তার দুই পা আঁকড়ে ধরেছে। ধস্তাধস্তি হচ্ছে। নির্ঘাৎ ব্যাটা কাকেও জখম করে টেনে এনেছে এবং সমুদ্রে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে।

তক্ষুণি রাইফেলের মাথায় দূরবীণটা সেঁটে দিয়ে তার কাছাকাছি একটা জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। ভড়কে দেওয়া দরকার ব্যাটাকে। ব্যস, কাজ হল। সে জখমী লোকটাকে ফেলে পালিয়ে গেল।

তাকে আরও ভড়কে দেওয়ার জন্যে আবার গুলি ছুঁড়লুম। সমুদ্রের ধারে পাহাড়গুলো বিকট প্রতিধ্বনি তুলল। শঙ্খচিল আর সমুদ্র-শকুনের ঝাঁক ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এদিক-ওদিক ওড়াওড়ি করে বেড়াল। তখন রাইফেল নিয়ে লাইটহাউস থেকে নেমে গেলুম।

নিচের ঘরে সূর্যলাল দুপুরের ঘুম তখনও অবধি পুষিয়ে নিচ্ছিল। তাকে জাগিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলতেই সে তার রাইফেল নিয়ে আমার সঙ্গে বেরুল।

দুজনে সেই খাড়ির ধারে গেলুম। জখম হওয়া লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমি তার দিকে এগোতে এগোতে সূর্যলালকে বললুম, তুমি বদমাশটাকে খুঁজে দেখ সূর্যলাল। ততক্ষণ আমি এই লোকটাকে দেখি।

সূর্যলাল তক্ষুনি তাকে খুঁজতে ব্যস্ত হল। তার সঙ্গেও দূরবীণ আছে। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সে শয়তানকে খুঁজতে থাকল। আমি যখন নিচের আহত লোকটার কাছে এসে পৌঁছেছি, ওপরে সূর্যলালকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনলুম—ওই পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!

সূর্যলাল হুঁশিয়ার ছোকরা। নিশ্চয় ব্যাটাকে পাকড়ে ফেলবে। আমি আহত লোকটাকে বললুম—আমার পিঠ আঁকড়ে ধরুন। আপনাকে লাইটহাউসে নিয়ে যাই আপাতত। তারপর ডাক্তারের ব্যবস্থা হবে।

আহত লোকটা শুয়ে হাঁপাচ্ছিল। তার বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। সেখান দিয়ে টাটকা রক্ত চোঁয়াচ্ছে। জামা ও প্যান্ট ধুলোকাদায় নোংরা। রক্তের দাগও প্রচুর। পায়ে জুতো নেই। অতি কষ্টে বলল- জল! একটু জল!

সঙ্গে জল নেই। বললুম--বেশি দূরে নয়। কাছেই লাইটহাউস। সেখানে নিয়ে গেলে আপনাকে জল দিতে পারব। আপনি আমার পিঠ আঁকড়ে ধরুন।

লোকটার সেই ক্ষমতাও নেই। তখন রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে তাকে দুহাতে ধরে বুকের কাছে তুলে নিলুম। বুড়ো হয়েছি। উঁচু খাড়াই ভেঙে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। একটু পা ফসকালে একেবারে পাঁচশো ফুট নীচে সমুদ্রে গিয়ে পড়ব দুজনে। জলে পড়লেও হয়তো বাঁচা যায়। কিন্তু খাড়ির জলটা বড় বড় পাথরে ভর্তি।

লাইটহাউস পর্যন্ত পৌঁছতে আমাকে পাঁচবার বিশ্রাম নিতে হল। লোকটার অবস্থা তখন আরও সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। তার জখমের রক্ত ব্যান্ডেজ ছাপিয়ে আমার জামা প্যান্ট লাল করে দিচ্ছে।

নিচের তলায় আমি ও সূর্যলাল যে ঘরে থাকি, সেই ঘরে ওকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে একটু করে ওর মুখে দিতে থাকলুম। তারপর সে মাথা নেড়ে আর জল দিতে বারণ করল। তখন পাশের টেবিলে গিয়ে ফোন করলুম। নৌবাহিনীর ছোট্ট একটা হাসপাতাল আছে মোনা দ্বীপে। সরকারী লোকদের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা সেখানেই করা হয়।

ফোন করার পর তার মুখের কাছে ঝুঁকে জিগ্যেস করলুম--আপনি কে? কেনই বা ওই শয়তানটা আপনাকে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছিল?

আহত লোকটি অতিকষ্টে জবাব দিল—আমি ডঃ কোহেলি।

চমকে উঠলুম। বললুম—সে কী। আপনি আগুনে পুড়ে মরেন নি? আর এতদিন ছিলেনই বা কোথায়? আপনাকে জখমই বা করল কে?

সে এসব কথার জবাব না দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—গোবিন্দ আমাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিল। আজ সারাদিন একটা গুহায় আটকে রেখেছিল।...নীল খাতার কোন পাতায় ফরমুলা দুটো আছে জানতে চাইছিল।...বলিনি। সে আমার গায়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছিল... সে বড় যন্ত্রণা। তবু বলিনি। নীল খাতাটা নিয়ে দ্বীপ ছেড়ে পালানো কঠিন। খাতাটা খুব মোটা।... গোবিন্দ ফরমুলা লেখা দুটো পাতা ছিঁড়ে সহজেই লুকিয়ে রাখতে পারত। তাই সেই পাতা দুটো দেখিয়ে দিতে বলছিল।... সারাদিন অত্যাচার! উঃ! আর বাঁচব না।... ডঃ ভাটিয়া শুশুক-মানুষ হয়ে গেছে। তার সাতজন কর্মচারীও শুশুক-মানুষ হয়ে গেছে।... হায় ঈশ্বর! কেন তোমার সৃষ্টির নিয়মে নাক গলাতে গেলুম!... আঃ! ক্ষমা— শাস্তি! ডাঃ অধিকারীকে বলবেন, গোবিন্দ নিশ্চয় কোন বিদেশী গুপ্তচর! ওকে যেন তাড়িয়ে দেন... আঃ! একটু জল.....

কথাগুলোর মানে কী? আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম। মাথামুণ্ডু বুঝিনা। ক্রমশ তার চোখ দুটো ফেটে বেরিয়ে আসছিল। শ্বাসকষ্ট বাড়ছিল। তারপর তার বুকটা ফুলে উঁচু হয়ে উঠল এবং শেষ কথাটা বলার পর ব্লাডার ফেটে হওয়া বেরিয়ে যাওয়ার মতো ফোঁস করে একটা শব্দ হল। তারপর সে নিস্পন্দ হয়ে রইল। দুটো চোখ খোলা—বড় ভয়ঙ্কর হয়ে গেল মুখের চেহারা।

নাড়ি দেখলুম। কোন স্পন্দন নেই। বুঝলুম মৃত্যু হয়েছে। হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম। ততক্ষণে বাইরে দিনের আলো নিভে এসেছে। সূর্য ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। সমুদ্রের দিকে ফিকে লাল একটা ছটা তখনও আকাশ ও জলে খেলা করছে।

উঠে আলো জ্বেলে দিলুম। লাইটহাউসের মাথার চারদিকে চারটে বড়বড় লাল আলো আছে। দূর থেকে তা দেখে জাহাজগুলো হুঁশিয়ার হয়। ওই আলোর মানে—এদিকে ডুবোপাহাড় আছে, সাবধান!

একটু পরে বাইরে জীপের আওয়াজ শোনা গেল। দরজায় বেরিয়ে দেখলুম, নৌবাহিনীর হাসপাতালের জীপ। ডাক্তার এসে গেছেন।

এইসময় মনে হল, সূর্যলাল বেকুবের মতো এখনও কি লোকটার পিছনে তাড়া করে যাচ্ছে? যদি কোন বিপদে পড়ে? অবশ্য তার কাছে রাইফেল আছে।

ডাক্তার ভদ্রলোক আমার পরিচিত। তাঁর নাম মেজর রাজেন্দ্র গোপাল। জিপ থেকে নেমে বললেন—ব্যাপার কী সুলেমান মিয়া?

বললুম—আসুন স্যার। দয়া করে ভেতরে আসুন, সব বলছি।..

ডঃ পরিতোষ দত্তের কথা

আমি এবং ডঃ রাকেশ শর্মা সমুদ্রের ধারে বিশাল পাথরটার ওপর বসে কথা বলছিলুম। কতক্ষণ পরে সূর্য ডুবলে তাড়া দিয়ে বললুম, এবার উঠে পড়া যাক, ডঃ শর্মা।

ডঃ শর্মাকে খুব আনমনা মনে হচ্ছিল। কী যেন ভাবছিলেন। চমক ভেঙে বললেন—হ্যাঁ, চলুন।

দুজনে পাথরের ধাপগুলো পেরিয়ে ওপরে পৌঁছেছি, হঠাৎ কাছে কোথাও রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ হল। দুজনেই চমকে উঠে মুখ তাকাতাকি করলুম। তারপর ডঃ শর্মা বললেন—নৌসেনারা টার্গেট প্র্যাকটিস করছে হয়তো। চলুন।

বললুম—উঁহু। তাহলে একবার আওয়াজ হবে কেন? তাছাড়া এখন আলো কমে এসেছে। টার্গেট প্র্যাকটিসের সময় নয়। আর আওয়াজটা যেখানে হল, সেখানে তো জঙ্গল।

—তাহলে অসময়ে কেউ শিকারে বেরিয়েছে।

—হুঁ তাও হতে পারে। তবে এ দ্বীপে কিন্তু শিকার করা বেআইনি, ডঃ শর্মা।

ডঃ শর্মা হাসতে হাসতে বললেন—আইন-মানা লোকের চেয়ে আইন-না-মানা লোকের সংখ্যা সবখানেই আজকাল বেড়ে যাচ্ছে, ডঃ দত্ত।

দ্বীপের মাঝামাঝি একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একটা পিচের রাস্তা আছে। সেই রাস্তায় যখন পৌঁছলুম, তখন ফের রাইফেলের গুলির শব্দ শোনা গেল। এত কাছে শব্দটা হল যে আমরা সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে তক্ষুনি বসে পড়লুম। রাস্তার ওপাশে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে প্রচুর পাথর ছড়ানো রয়েছে। একটা পাথরের আড়াল থেকে কে লাফিয়ে উঠল এবং ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে থাকল। দিনের আলো তখনও একটু আছে। লোকটা আমাদের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল এবং হাঁচোড় পাঁচোড় করে একটা পাথরের ওপর দিয়ে উঠতে থাকল। তখন দুজনে উঠে দাঁড়ালুম। আমার কাছে রিভলবার নেই। ডঃ শর্মার আছে। তিনি চাপাগলায় বলে উঠলেন—আসুন, ব্যাপারটা দেখা যাক্।

ডঃ শর্মা রিভলবার বের করে দৌড়ে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে দৌড়লুম। রাস্তার ওপাশে ঝোপগুলোর মাথায় উঁচুতে সেই পাথরটার কাছে গিয়ে ডঃ শর্মা রিভলবার তুলে গর্জন করলেন—নড়লে গুলি করব। চুপ করে দাঁড়াও বলছি!

আমিও একলাফে এগিয়ে লোকটার জামার কলার খামচে ধরলুম। তারপর তাকে টানতে-টানতে রাস্তায় নিয়ে এলুম। ডঃ শর্মা বললেন—কে তুমি?

এইসময় পিছনে পায়ের শব্দ হল। ঘুরে দেখি, কে একজন রাইফেল নিয়ে দৌড়ে আসছে। সে চেঁচিয়ে উঠল—ধরে থাকুন! যেতে দেবেন না শয়তানটাকে।

চিনতে পেরে অবাক হয়ে গেলুম। লাইটহাউসের প্রহরী সূর্যলাল। যুবকটির সঙ্গে সম্প্রতি আমার আলাপ হয়েছে। সে আমাকে এক বিদঘুটে শুশুক-মানুষের কথা বলেছিল। তার কথা বিশ্বাস করিনি। এখনও অবশ্য বিশ্বাস করতে গিয়েও বাধো-বাধো ঠেকছে। এ দ্বীপ যেন কত আজগুবি ঘটনার রাজ্য। মাথামুণ্ডু নেই!

সূর্যলাল এসেই লোকটাকে এক থাপ্পড় কষে মারল। আমরা বাধা না দিলে সে ওকে মেরেই ফেলত। সূর্যলাল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এ ব্যাটা খুনে স্যার! একটু আগে একটা জখমী লোককে সমুদ্রের খাড়িতে ফেলতে যাচ্ছিল।

জখমী লোককে সমুদ্রের খাড়িতে ফেলতে যাচ্ছিল। বিদ্যুতের মতো একটা কথা আমার মাথায় ঝিলিক দিল। বললুম—জখমী লোক? তার বুকে ব্যাণ্ডেজ ছিল?

সূর্যলাল বলল—হ্যাঁ স্যার।

লোকটার জামার কলার ছাড়িনি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললুম—তুমি গোবিন্দ কুণ্ডু না? ডাঃ জনার্দন অধিকারীর কম্পাউণ্ডার?

লোকটা জবাব দিল না। বললুম—ডঃ শর্মা, ওর কাঁধের ব্যাগটা নিন। সম্ভবত এটার মধ্যেই একটা নীল খাতা পেয়ে যাবেন।

—নীল খাতা! মাই গুডনেস! ডঃ শর্মা ওর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন। তারপর হতাশভাবে বললেন—নেই তো!

—নেই? তাহলে এর বডি সার্চ করা দরকার এক্ষুনি। সূর্যলাল, তুমি লক্ষ্য রাখো। আমি বডি সার্চ করে দেখি।

সূর্যলাল ওর পিঠে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে রাখল। ডঃ শর্মাও ওর সামনে রিভলবার তাক করে দাঁড়ালেন। আমি ওর জামা প্যান্ট আন্ডারউয়্যার হাতড়াতে ব্যস্ত হলুম। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও নীল খাতাটা নেই। বললুম—তাহলে নির্ঘাৎ ব্যাটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। চলুন, একে পুলিশের হাতে দেওয়া যাক।

গোবিন্দ এতক্ষণে হাউমাউ করে কেঁদে পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাকুতি মিনতি করতে থাকল। পুলিশের হাতে পড়ার মানেটা সে ভালভাবেই জানে—অর্থাৎ তার এ ব্যাপারে অতীত অভিজ্ঞতা আছে বলেই হয়তো এমন করছে। সূর্যলাল

থাপ্পড় তুলে বলল—ন্যাকামি রেখে স্যাররা যে জিনিসটার কথা বলছেন, ভালয়-ভালয় বের করে দাও দিকি বাছাধন। নৈলে জেনো, আমি পুলিশেরও বড়ো। এক থাপ্পড় মারলে সবগুলো দাঁত খসে যাবে। সেটা কি ভাল হবে খোকামণি?

রাস্তায় দূরে গাড়ির আলো দেখা গেল। দেখতে দেখতে গাড়িটা কাছে এসে থামলো। দূর থেকেই আমাদের দেখতে পেয়েছিল হেড লাইটের ছটায়। তারপর নেভি হাসপাতালের ডাক্তার মেজর রাজেন্দ্র গোপালের গলা শুনলুম—হ্যাল্লো ডঃ দত্ত! ব্যাপার কী? রাস্তার মধ্যে আপনারা কী থিয়েটারের মহড়া দিচ্ছেন?

তারপর উনি নেমে এসে টর্চ জ্বেলে লোকটাকে দেখে নিলেন এবং সূর্যলালের দিকে ঘুরে বললেন—নীল খাতাটা পাওয়া গেছে ওর কাছে?

সূর্যলাল নীল খাতার ব্যাপার নিশ্চয় জানে না। কিন্তু মেজর রাজেন্দ্র গোপাল কীভাবে জানলেন? আমি বললুম—না, নীল খাতাটা এর কাছে নেই, মেজর সাহেব। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে।

মেজর বললেন—ওকে জিপে ওঠান। চলুন, যেতে-যেতে কথা হবে।

ডঃ ভগবানদাস কোহেলির মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর লাস লাইটহাউসে রয়েছে শুনে হতাশায় দমে গেলুম আমরা। ডঃ কোহেলি বেঁচে থাকলে তাঁর মুখ থেকে ফরমুলা দুটো লিখে নেওয়া যেত। সে আশা আর রইল না। এখন শুধু সেই নীল খাতাটাই যা আশা। ওটা পেয়ে গেলে আবিষ্কারের সত্য মিথ্যা জানা যাবে। ডঃ ভাটিয়া এবং সাতজন কর্মচারীর অন্তর্ধানের সুরাহা হবে। কিন্তু এখনও ওই আজব আবিষ্কারের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আবার এও মনে হচ্ছে, যদি মিথ্যাই হবে, তাহলে কেন গোবিন্দ খাতাটা চুরি করল এবং কেনই বা ডঃ কোহেলিকেও আহত অবস্থায় অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল ডঃ অধিকারীর বাড়ি থেকে?...

সমুদ্রবিজ্ঞান ভবনে এসে পৌঁছে থানায় ফোন করলুম। একটু পরে পুলিশ এল। গোবিন্দকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা পরামর্শ করতে বসলুম।

নীল খাতাটা গোবিন্দ লুকিয়ে রেখেছে, খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু সে তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বের করার মতো! সূর্যলাল বলল—খাড়ির ওখান থেকে ওই রাস্তা পর্যন্ত খুঁজলে হয়তো জিনিসটা পাওয়া যাবে, স্যার। আমার ধারণা আমার তাড়া খেয়ে পালাবার সময় কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। আমার সঙ্গে জনাকতক লোক দিন। টর্চ নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক।

সমুদ্রবিজ্ঞান দফতরের ষোলজন কর্মচারী এবং সাতজন সহকারী বিজ্ঞানীর একটা দল আলো নিয়ে সূর্যলালের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। মেজর রাজেন্দ্র ঘড়ি দেখে বললেন—এতক্ষণে এ্যাম্বুলেন্স গিয়ে লাইটহাউস থেকে ডঃ কোহেলির লাসটা

এনেছে। পোস্টমর্টেম করতে হবে। আমি উঠি, ডঃ শর্মা! ডঃ দত্ত, চলি। দরকার হলে ফোনে যোগাযোগ করবেন।

ডঃ শর্মা বললেন—পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আমাদের অবশ্যই চাই, মেজর।

—বেশ। একটা কপি পাঠিয়ে দেব।

মেজর রাজেন্দ্রগোপাল জিপ নিয়ে চলে গেলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে। আবার এক দফা কফি খেয়ে আমি এবং ডঃ শর্মা আলোচনা করতে থাকলুম।

ডঃ শর্মা বললেন—গোবিন্দ নিশ্চয় কাছাকাছি লুকিয়ে থেকে শুশুক-মানুষ হওয়ার ব্যাপারটা দেখে থাকবে। তা না হলে সে ফরমুলা চুরি করতে যাবে কেন?

আমি বললুম —মোটেও তা নয়, ডঃ শর্মা। ডঃ অধিকারীর কথায় বোঝা যাচ্ছে, গোবিন্দ গত রাতে ডঃ কোহেলির কাহিনী আড়ি পেতে শুনেছিল। এতে কোন ভুল নেই! কাহিনী শুনেই সে...

বাধা দিয়ে ডঃ শর্মা বললেন—হ্যাঁ. আপনার যুক্তি অস্বীকার করছি না। কিন্তু গোবিন্দ বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার লোকও তো হতে পারে। আমার ধারণা, যেভাবেই হোক—কোন বিদেশী গুপ্তচর সংস্থা ডঃ কোহেলির আবিষ্কারের ব্যাপারটা টের পেয়ে থাকবে। তারপর তারা গোবিন্দকে মোনা দ্বীপে পাঠায়। ডাঃ অধিকারীর কম্পাউন্ডার সাজিয়েই পাঠায়। তারপর গোবিন্দ এখানে এসে গোপনে খোঁজখবর চালিয়ে যেতে থাকে এবং

কথায় বাধা পড়ল। ফোন বাজছিল। ফোন তুলে নিয়ে বললুম—সমুদ্রবিজ্ঞান ভবন থেকে ডঃ দত্ত বলছি। কে?...

থানার ওসি ফোন করছেন। যা বললেন, শুনে তো আমি অবাক। গোবিন্দ নিছক গোবিন্দ কম্পাউন্ডার নয়। তার আসল নাম গোপকৃষ্ণ ভরদ্বাজ। বোম্বাই সমুদ্র বিজ্ঞান দফতরের একজন প্রাক্তন বিজ্ঞানী। একটা মূল্যবান গবেষণার ফাইল এক বিদেশী দূতাবাসে পাচারের অভিযোগে তার চাকরি গিয়েছিল। সঠিক প্রমাণের অভাবে তার সাজা হয়নি।

শুনেই ডঃ শর্মা লাফিয়ে উঠলেন।—তাহলে প্রথমে যা সন্দেহ করেছিলুম, ঠিক তাই!

বললুম—কী সন্দেহ করেছিলেন বলুন তো?

—ডাঃ অধিকারীকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম লোকটার সম্পর্কে। সমুদ্রবিজ্ঞানী ডঃ গোপকৃষ্ণ ভরদ্বাজের নাম আমি জানতুম। কাগজে ছবিও দেখেছিলুম। ভদ্রলোক কিন্তু গোড়ার দিকে,ডাক্তারী করতেন। এম বি. বি. এস. ডাক্তার ছিলেন। পরে ডাক্তারী ছেড়ে সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা শুরু করেন। শুনেছিলুম, শুশুক নিয়ে গবেষণা করতেন। ডাঃ অধিকারী গোবিন্দের ব্যান্ডেজবাঁধা

এবং ইঞ্জেকশন দেওয়ার তারিফ করেছিলেন। কিন্তু সেটা হয়তো সাধারণ লোকেও শিখে নিলে চমৎকার পারে। সেজন্যে নয়, ডাঃ অধিকারীর বাড়িতে গিয়ে ওকে দেখামাত্র আমার মনে হয়েছিল, চেনা ঠেকছে কেন? খবরের কাগজে ওর বিরুদ্ধে মামলা চলার সময় ছবি ছাপা হয়েছিল। স্মৃতিটা একটু ঝাপসা ছিল আমার। কিন্তু তাহলেও ওকে দেখে চমকে গিয়েছিলুম মনে মনে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—তাহলে তো আমাদের থানায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। এবার একটু আশা হচ্ছে। আফটার অল, সুশিক্ষিত মানুষ এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানী যখন—তখন অন্তত বিবেকের দায়েও নতি স্বীকার করতে পারেন। নীল খাতায় লেখা ফরমুলা দুটো তো পৃথিবীর মানুষ জাতিরই একটা বিস্ময়কর কৃতিত্ব। উনি কী এ কথাটা বুঝবেন না?

ডঃ শর্মা উঠে দাঁড়ালেন। চিন্তিত মুখে দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললুম। একটু পরেই আমরা পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছলুম। পশ্চিমের উপত্যকায় বসতি এবং বাজার। থানা সেখানেই রয়েছে। আমাদের গাড়ি দ্রুত ঢালু রাস্তায় এগোতে থাকল। আশা নিরাশায় দুলছিলুম।

থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ওসি ভদ্রলোক। দেখেই নেমে এসে বললেন—আসুন স্যার! এইমাত্র আবার ফোন করেছিলুম। শুনলুম, আপনারা থানায় আসছেন। এদিকে এক কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে! আমি একটুও ভাবিনি, এমন হবে। আমারই বোকামি!

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম—কী হয়েছে?

—গোবিন্দ ওরফে গোপকৃষ্ণ ভরদ্বাজ আত্মহত্যা করে বসেছে!

—অ্যাঁ! সে কী!

—হ্যাঁ, স্যার আমরা ভাবতেই পারিনি। থানায় নিয়ে আসার পথে কখন চুপিচুপি বিষাক্ত কিছু খেয়ে বসেছে। লকআপে ঢোকালুম, তখন চেহারা দেখে কেমন যেন লাগছিল। জেরা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট নিজের পরিচয় দিতে থাকল! চাপ দেবার দরকারই হল না। তারপর বলল—'নীল খাতাটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলেছি। ওদের বলে দেবেন।' তারপর দেখি, ওর মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। জিভটা বেরিয়ে আসছে। লালা ঝরছে। সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলুম—কিছু খেয়েছেন নাকি? বিকট হেসে বলল—'হ্যাঁ, বিষের ট্যাবলেট খেয়েছি। আমি তোমাদের কলা দেখিয়ে কেটে পড়লুম।' তারপর স্যার, লোকটা টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে রইল। গা হিম একেবারে। মেজর সায়েবকে ফোন করেছি। তিনি আসছেন।

আমরা দুজনে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।....

দৈনিক মাদার ইণ্ডিয়া পত্রিকার খবর

কুইনসল্যাণ্ড, ১৭ মে—গতকাল দুপুরের দিকে এখান থেকে প্রায় সাতশো কিলোমিটার দক্ষিণে আন্টার্কটিকা অঞ্চলের সমুদ্রে দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীরা একটি বিস্ময়কর সামুদ্রিক প্রাণীকে ভাসমান তুষার-শৈলে বসে রোদ পোহাতে দেখেন বলে দাবী করেছেন। তাঁরা নাকি প্রাণীটির ছবিও তুলেছেন। জাহাজ থেকে প্রাণীটির দূরত্ব ছিল মাত্র কুড়ি গজ। কতকটা শুশুকের মতো দেখতে হলেও মানুষের মতোই তার দুটো হাত ও দুটো পা আছে। হাতে-পায়ে পাঁচটা করে আঙুল। কিন্তু নখগুলো বেশ বড়। মুখটা রাক্ষুসে। মাথায় একরাশ চুলও আছে। চোখদুটো অবিকল মানুষের চোখের গড়নের—কিন্তু অনেকটা বড়ো। চাহনি ও হাবভাব মানুষের মতোই। সে হাত নেড়ে যেন অভিযাত্রীদের সম্ভাষণ করছিল। একজন অভিযাত্রী বোকামি করে রিভলবার তাক করতেই প্রাণীটি বিকট চিৎকার করে জলে ঝাঁপ দেয়। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। রেডিও ফোটোটি এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কুইনসল্যাণ্ডের সমুদ্রবিজ্ঞান সংস্থার বিজ্ঞানীরা শীঘ্র জানাবেন, ছবিটা জাল, না কোন প্রকৃত সামুদ্রিক প্রাণীরই।

এ প্রসঙ্গে অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে যে, গত বছর মোনা আইল্যাণ্ডের কাছে জেলেরা অবিকল এই রকম কয়েকটি প্রাণীকে দেখতে পেয়েছে বলে দাবী করেছিল। তাছাড়া সেখানকার লাইটহাউসের প্রহরীও নাকি গুলি ছুঁড়ে একটি প্রাণীকে আহত করেছিল। কিন্তু সমুদ্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, তথাকথিত মৎস্যকন্যাদের কাহিনীর ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে, এক্ষেত্রেও তেমনি ব্যাপারটা চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়।—**রয়টার**।

উড়ুক্কু চোখ

কদিন থেকে কলোনি 0077 এলাকায় একটা চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষজন বিশেষ বেরোয় না। ছোটদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। যানবাহনও দেখা যায় না। সব একেবারে খাঁ খাঁ নিঝুম হয়ে গেছে। যে যার বাড়ি বসে সুপার-ভিসন যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। যন্ত্রটা প্রাচীন যুগের টিভির মতো দেখতে। তবে তখন যেমন মানুষ জীবজন্তু গাছপালা বা সব জিনিসের প্রতিকৃতি ফুটে উঠত পর্দায়, এখন তার বদলে রঙবেরঙের আলোর ফুটকি। ওই দেখেই লোকেরা জিনিসটি কী বুঝতে পারে। সুপার ভিসনের পর্দায় একসার ফুটকি খালি এদিক থেকে ওদিক করে বেড়াচ্ছে। ওরা পুলিশ। একটানা আর কতক্ষণ পুলিশ দেখতে ভাল লাগে লোকের?

কে-কে হাই তুলে বেজার মুখে বললেন, ধুশ! ওদের অত করে বললুম, পাতালে গিয়ে দেখে এসো! তা নয়, খালি সময়ের ভেতর খুঁজে হন্যে হচ্ছে। সময়ের ভেতর খামোকা এ গ্যালাক্সি থেকে সে গ্যালাক্সি। কোনো মানে হয়?

কে-কের গৃহিণী পি-পি রাগ করে বললেন, পাতাল-পাতাল করো কেন বলো তো? পৃথিবী বলতে কেন এত ঘেন্না? হুঁ—বুঝেছি, আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি বলে তো?

কে-কে স্ত্রীর দিকে মনোযোগ দিলেন না। বন্ধু এলকে বললেন, আচ্ছা এল, তোমার কী ধারণা?

এল চিত হয়ে ভেসে-ভেসে ঘরের ভেতর বেড়াচ্ছিলেন। গ্র্যাভিটি-বোতাম টিপে মেঝেয় সিধে হলেন। বললেন, কী বিষয়ে?

তথাকথিত ছেলেধরার কথা বলছি।

ওটা কি সত্যি তাই? আমার মনে হয়, কলোনির গার্ডরা ভুল দেখেছিল। জিনিসটা—

এলের কথা থামিয়ে বাইরে থেকে প্রজাপতির মতো ফুড়ুৎ করে উড়ে এল মি-মি। চোখ বড় করে বলল, বাবা! মা! কাকু! দেখবে এস, দেখবে এস। বাগানে একটা লোক পায়ে হেঁটে জগিং করে বেড়াচ্ছে।

কে-কে ভীষণ অবাক হয়ে বললেন, সে কী! আর পি-পি রাগ করে বললেন. কথা শোনো মেয়ের। পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে তো কি হয়েছে? শুনেছি আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা পায়ে হেঁটেই বেড়াতেন।

কে-কে এবং এল জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন। কৃত্রিম রোদে বাগান ঝলমল করছে বটে, কিন্তু গাছপালা ঝোপঝাড়ের ছায়া এমন গাঢ় যে ভীষণ আলো-আঁধারি জট পাকানো অবস্থা। প্রাচীন যুগের খারাপ কালার-টিভিতে যেমন ঘটত। কে-কে উঠে গিয়ে বাগানের রোদ নিয়ন্ত্রণ করার নব ঘুরিয়ে দিলেন। রোদ ফিকে হল, ছায়াটাও পাতলা হয়ে গেল। এবার চোখে পড়ল সত্যি একটা শাদা পোষাক পরা লোক দুপায়ে হাঁটার মতো পা ফেলে বেড়াচ্ছে। বাগানে মাটি নেই, শূন্যে ভেসে আছে। গাছপালার শেকড়বাকড়ও দেখা যাচ্ছে। এসব গাছ-গাছালি ঝোপঝাড় সব উদ্ভিদ পঞ্চম জেনারেশনের—সংক্ষেপে বলা হয় জি 5 প্ল্যান্টস্। তবে শুধু উদ্ভিদ কেন, গোটা কলোনি-0077 শূন্যে ভেসে আছে। জায়গাটা পৃথিবী ও চাঁদের মাঝামাঝি একটা জায়গায়, অতীতে যাকে বলা হত লাগ্রাজিঁয়ান পয়েন্ট (Lagrangian points) এবং এরকম জায়গা দুটো আছে। পৃথিবীর পুব ও পশ্চিম আকাশে—দিগন্তের ওপরে। তাই কলোনিও হয়েছে দু জায়গায় দুটো। অন্যটার নাম কলোনি—0088।

এল চমকে উঠে কী বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কে-কে সহাস্যে মেয়েকে বললেন, আচ্ছা মি-মি! তুই কেমন করে জানলি লোকটা পায়ে হাঁটছে?

মি-মি আঙুল কামড়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, বারে! আমরা জগিং করি না? তাছাড়া স্কুলের আন্টি ইতিহাস পড়ান না বুঝি? ওতে লেখা আছে, সেকালের লোকেরা পায়ে হেঁটে বেড়াত। ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, জানো বাবা? সামনে-পেছনে পা এগিয়ে আর পিছিয়ে চলাকে হাঁটা বলে।

পি পি ধমক দিলেন, ফের আঙুল চোষা হচ্ছে? বারে বাবে আঙুল কিনতে হয়েছে এক গুচ্ছের টোকেন দিয়ে, মনে নেই?

মি-মি আঙুল বের করে ফ্রকে মুছতে লাগল। ইশ! আঙুলটা লিকলিকে করে ফেলেছে একেবারে। কে কে বললেন, কি বলছিলে এল?

এল সন্দিগ্ধ মুখে বললেন, ব্যাপারটা রহস্যময়। লোকটা অচেনা। কলোনিতে এর আগে ওকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া ও ছোটলোকের মতো হাঁটা প্র্যাকটিস করার জন্যে তোমার বাগানে ঢুকেছে, এর মানেটা কী?

কে-কে হাসতে হাসতে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খুদে নলের মতো জিনিস নিয়ে এলেন। সেটা জানালা দিয়ে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিলেন। অমনি সুতোর মতো লাল নীল হলুদ আলো বেরিয়ে গিয়ে লোকটাকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ফেলল। আর লোকটা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, কেতু! কেতু! কেতুকুমার!

কে কে চমকে উঠে বললেন, সর্বনাশ! এ যে দেখছি পিসেমশাই। চাঁদের কলোনির পিসেমশাই।

বলেই সুড়ুৎ করে ভেসে গেলেন, বলা বাহুল্য, গ্র্যাভিটি বোতামটি টিপে জিরো করে দিয়েই।

একটু পরে পিসেমশাইকে নিয়ে ফিরে এলেন। পিসেমশাই ঘরে ঢুকেই বললেন, বাথরুমে যাব। ইশ! জামাকাপড় চটচট করছে। তারপর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখেই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।.....এ কী বাবা কেতু? তোমার উড়ুটে নাগপাশের বিচ্ছিরি রঙে আমার সাদা জামাকাপড়ের এ কী অবস্থা হয়েছে।

কে-কে জিভ কেটে বললেন, ক্ষমা করবেন। আসলে প্রায় একশো চার বছর পরে দেখা—চিনতেই পারিনি।...

2626 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অন্তর্মহাকাশে বিস্তর কলোনি গড়ে উঠেছে, মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত। তার ওধারে গ্রহাণুর দেশ (Asteroids)। কোনো-কোনোটার পরিধি এক হাজার কিলোমিটার। কোনোটার আবার এক কিলোমিটার মাত্র। এরকম গ্রহাণুর সংখ্যা অতীতে মনে করা হত চল্লিশ হাজার থেকে এক লাখের মাঝামাঝি। তখন মানুষ কতটুকুই বা জানত। এখন কচি শিশুও জানে গ্রহাণুর সংখ্যা 99203 টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টিতে কলোনি হয়েছিল। কিন্তু কেউ টিকতে পারেনি। বহির্মহাকাশের সীমানা শুরু তারপর থেকেই এবং সেই বহির্মহাকাশ থেকে উল্কাদের ঠেকানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু মহাজাগতিক ধূলিকণার উৎপাতে অস্থির' শুধু তাই নয়, মাঝেমাঝে অদ্ভুত কী সব আলোকণিকা এসে পড়ছিল। বেছে বেছে শুধু ছোটদেরই রক্ত শুষে নিচ্ছিল। সেই ডাইনি আলোকণিকার নাম ফোটন-এগ্র। কলোনিটি এখন ফাঁকা পড়ে আছে।

কে-কের ড্রইংরুমে এইসব কথা হচ্ছিল। পিসেমশাই সব শোনার পর বললেন, কেন বাবু এত ধানাই পানাই করা তোমাদের? পৃথিবীতে ফিরে গেলেই পারো। আমি গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আসি—দারুন লাগে!

শ্রীমতী পি-পি বললেন, ওমা! সেখানে তো শুধু জন্তুজানোয়ার।

এল বললেন, শুনেছি পোকামাকড় সাপ ব্যাঙ টিকটিকিও থিকথিক করছে।

করবে না? পিসেমশাই বললেন, খামোকা ঘেন্না করে সবাই চলে এলে সেখান থেকে।

কে-কেও বললেন, না। ইনার স্পেস ফেডারেল গভমেন্ট সিদ্ধান্ত করেছিলেন নাকি, বরং চিড়িয়াখানাই করা হোক ওই গ্রহটাকে। বুঝলেন না? ওই গ্রহটার আবহমন্ডল আর মাটিতে কি যেন আছে। খালি হিংসে আর খেয়োখেয়ি। মারামারি খুনজখম। মানুষের জন্তুর স্বভাব নষ্ট হচ্ছিল না। তাই—

বাধা দিয়ে পিসেমশাই বললে, ওই জন্তুদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে এল। আশ্চর্য!

শ্রীমতী পি-পি দুঃখিত মুখে বললেন, আমার কিন্তু পৃথিবীর জন্য নাড়ির টান থেকে গেছে। আপনার বোনপোর কথা আলাদা। ওঁর বংশও নাকি আপনাদের চাঁদের কোন কলোনির। বিশ্বাস হয় না।

কে-কে গর্বিতমুখে বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন আর্টিফিশিয়াল ম্যান—কৃত্রিম মানুষ।

এল মনোযোগ দিয়ে সুপার-ভিসন পর্দায় কি দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, সর্বনাশ। আমি বলেছিলাম, ওটা কোনো বিষাক্ত মহাজাগতিক পোকা নয়, একটা নিছক রোবোট। ওই শোনো কে-কে। পুলিশের বড়কর্তা বলছেন, ওটা একটা রোবোট।

পিসেমশাই বললেন, ব্যাপারটা কি?

শ্রীমতী পি-পি বললেন, কিছু দিন থেকে একটা উৎপাত চলেছে। তিনটে বাচ্চা চুরি গেছে। কি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা গেছে, দেখতে অবিকল নাকি চোখের মতো। তবে চোখটা প্রকাণ্ড। আমাদের চোখ তো লম্বালম্বি বসানো। এই চোখকে যদি সিধে দাঁড় করানো হয়—মানে লম্বের মতো, দুধারে 90 ডিগ্রি করে দুটো কোণ—ঠিক সেইরকম।

কে-কে বললেন, ফ্লাইং আই—উড়ুক্কু চোখ।

পিসেমশাই একটু হেসে বললেন, উড়ুক্কু চোখ বাচ্চা চুরি করেছে! বলো কী!

তিনি গুম হয়ে বসে রইলেন। কে-কে খট করে চাবি টিপে সুপার-ভিসন অফ করলেন রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রের সাহায্যে। শ্বাস ছেড়ে বললেন, খুব সমস্যায় পড়া গেল দেখছি। মি-মির পরীক্ষা সামনেই। স্কুল যেতে পারছে না কেউ। অথচ হেডমিস্ট্রেস ভদ্রমহিলা এমন কট্টর যে ঠিক সেই তারিখেই পরীক্ষা নেবেন। কেউ দিক বা না দিক। আমরা বললুম, কলোনি-0088-এর মতো বাড়ি বসেই কম্পিউটারে পরীক্ষা দিক মি-মিরা। উনি বললেন, তা হয় না। স্কুলের পরীক্ষা নাকি সত্যিকার পরীক্ষা। আসলে ভদ্রমহিলা বড় সেকেলে।

পিসেমশাই গুম হয়ে কী ভাবছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, কেতুকুমার! সম্প্রতি আমি পৃথিবীতে গিয়েছিলাম। সেখানে—

পি-পি ব্যস্তভাবে বললেন, কী দেখলেন সেখানে?

কে-কে মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, চিড়িয়াখানা। এলও ফিক করে হেসে বললেন, মশা-মাছি, সাপ-ব্যাঙ, পোকা-মাকড়।

পিসেমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, আহা, বলতে দাও। তোমরা ওই যে উড়ুক্কু চোখের উৎপাতের কথা বলছ, সম্ভবত আমি তাই দেখে এসেছি।

সবাই কৌতূহলী হয়ে একগলায় বললেন, বলুন, বলুন।

নেমেছিলুম হিমালয়ে। পিসেমশাই হাসতে হাসতে বললেন।. আসলে হাঁটবার জন্যে পা সুড়সুড় করছিল। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। তো সমতলে যেখানেই যাই, দেখি বাঘ, ভাল্লুক. সিংহ, হাতি এইসব হালুম হালুম করে বেড়াচ্ছে পালে-পালে। তার ওপর ওই যে বললে, সাপ! হ্যাঁ—সাপও অসংখ্য। তাই অগত্যা নেমে পড়লুম একেবারে এভারেস্টের মাথায়। কি বরফ! কি বরফ! ঠাণ্ডায় কেঁপে অস্থির। শেষে আমার নাতি শ্রীমান হ-র যে যন্তরটা দিয়েছিল, তার বোতাম টিপে আগুন জ্বেলে গরম হওয়া গেল। তো সবে আগুনটা নিভিয়েছি, হঠাৎ একটা গুহা থেকে উড়ুক্কু চোখের মতো লম্বাটে প্রাণী বেবিয়ে এল। মাঝখানে একটা নীল ডেলা—ওটাই তাহলে চোখটার তারা। সেই ডেলাটা জ্বলজ্বল করছিল। প্রাণীটা এসে আমার চারধারে চর্কির মতো ঘুরে কী যেন দেখে নিয়ে বাঁই করে চলে গেল বিদ্যুৎ গতিতে। তাহলে কি সেই হতচ্ছাড়াই তোমাদের কলোনিতে এসে জুটেছে?

কে-কে কান খাড়া করে শুনছিলেন। ঝটপট উঠে গিয়ে ফোন তুলে চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। পি-পি আস্তে বললেন, পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছে। দেখা যাক, ওরা কী করে।

মি-মি পাশের ঘর থেকে এসে বলল, দাদু! চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।

পি-পি চোখ কটমটিয়ে বললে, যায় না। চাবদিকে কী বিপদ, আর তোমাব বেড়ানোর শখ! চুপচাপ বসে পড়োগে যাও।

পিসেমশাই বললেন, আহা! একটু না বেড়ালে মগজ খোলতাই হবে কেন? এস, এস মি-মি! আমরা এক চক্কর ঘুরে আসি।

কে-কে বললেন, যায় তো যাক না! তবে বেশি দূরে নয়। পাওয়ার হাউস এবার সন্ধ্যে করে দেবে—৬টা বাজে। পিসেমশাই বরং বাগানেই ঘুরুন ওকে নিয়ে। মি-মি গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। আপনি তো গল্পের রাজা!..

দাদুর দেখাদেখি মি-মি মাটিবিহীন শূন্যতায় অর্থাৎ কি না স্পেসে পা দুখানি সামনে—পিছনে এগিয়ে-পিছিয়ে চলার ভঙ্গী করছিল। শেষে একমুখ হেসে বলল, দাদু, দাদু! একে তো জগিং করা বলে? স্কুলে আমরা এটাই তো কবি।

কে-কের পিসেমশাই, মি-মি যাকে দাদু বলছে, তাঁর নাম হরনাথ। তিনি থাকেন চাঁদের একটি কলোনিতে। অন্তর্মহাকাশ ফেডারেশনের রীতি অনুসারে তাঁকে ডাকা হয় হ-ন নামে। কিন্তু এ নাম তাঁর অপছন্দ হলেও মেনে নিতে হয়। হ-ন বললেন, স্কুলে যে জগিং করো, তা হ'ল তোমাদের একেলে ফ্যাশান। আমি যা করছি, তা ফ্যাশান নয়, সত্যিকার হাঁটা। তবে স্পেসে কি সত্যিসত্যি হাঁটা যায়? কল্পনা করি যে মাটিতে পা ফেলছি—স্রেফ কল্পনা।

মি-মি বলল, কোথায় সত্যিসত্যি হাঁটা যায় দাদু?

পৃথিবীতে।

চলুন না, পৃথিবীতে গিয়ে হেঁটে আসি।

হ-ন বাড়ির দিকটা সাবধানে দেখে নিয়ে বললেন, তাই তো! সঙ্গে যে টাইম মেসিনটা আনিনি। আনলে তোমার বাবা-মা টের পেতেন না। ওঁদের এক মিনিট সময়ের মধ্যে আমরা দুজনে অন্তত একটা দিন ঘুরে আসতে পাবতুম।

মি-মি নেচে উঠল। চাপা স্বরে বলল; দাদু, বাবার একটা টাইম মেসিন আছে। বাবা যে ইঞ্জিনিয়ার। অ্যাস্টারয়েডে কলোনি করতে যাবার সময অফিস থেকে বাবাকে মেসিনটা দিয়েছিল। নইলে বাবার সেখানে যেতে অনেক সময লেগে যেত যে। মা বলেছিল, টাইম মেসিন না থাকলে তোর বাবা ফিরে আসতে আসতে আমি বুড়ি হয়ে যাব। আমাকে চিনতেই পারবে না। অথচ বাবার বয়েস নাকি তাই থাকবে। কেন দাদু?

হ-ন বললেন, পরে বুঝিয়ে বলব। টাইম মেসিনটা চুপিচুপি আনতে পারবে নাকি?

হুঁ। বলে মি-মি একটা রঙীন প্রজাপতির মতো ফুড়ুৎ করে ভেসে চলে গেল।

একটু পবে টাইম মেসিনটা ফ্রকের তলায় লুকিয়ে সে নিয়ে এল। জিনিসটা প্রাচীনকালের পকেট-রেডিওর মতো। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে হ-ন ঝটপট প্লাগটা টেনে বুকপকেটেব সকেটে এঁটে দিলেন। তারপর মি-মিকে কাঁধে চাপিয়ে তাব দুটো হাত বুকের ওপর ধরে রাখলেন। দাঁতে কামড়ে ধরলেন টাইম মেসিনের একটা নরম নব। নবটা দাঁতে চাপতেই আলোর ঝিলিক দেখা দিল। পরমুহূর্তেই দুজনেই ফোটনে পরিণত হলেন, সুতবাং চর্মচক্ষে তাঁরা অদৃশ্য। লেসার রশ্মিব ঘেরাটোপে দুজনের ফোটনে রূপান্তরিত শরীর আটকানো না থাকলে পলকে ছড়িয়ে পড়ত ফোটনগুলো এবং ছড়িয়ে যেত বহির্মহাকাশ ছাড়িয়ে কোটি-কোটি আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে। আর তাঁদের উদ্ধার করাই অসম্ভব ছিল।

হিমালয়ে পৌঁছে টাইম মেসিন এক করে দিলেন হ-ন। মানুষেব দেহও ফিরে পেলেন দুজনে। তারপর একইভাবে মি মিকে কাঁধে চাপিয়ে চক্কর দিতে শুরু করলেন সমতলের ওপর। পৃথিবীতে এখন সকাল হয়েছে। মাত্র দুশো-আড়াইশো বছরেই মানুষেব ফেলে যাওয়া পৃথিবী ঘন অরণ্যে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়া হয়েছে নির্মল। উড়তে উড়তে দুজনে একটা হ্রদের ধারে পৌঁছুলেন। দেখে নিলেন কোনো জন্তু কোথাও আছে কিনা।

আছে—তবে সেগুলো সব হরিণ। হ্রদের ধারে কোমল ঘাসে তারা চরছিল। দুজন মানুষ দেখে তারা অবাক হয়ে ঘাস থেকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে গেল। মি-মি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, মিউজিয়ামে দেখেছি দাদু! এগুলো কী দাদু?

হরিণ। হ-ন বললেন। তারপর একটু হাসলেন, খিদে পেয়েছে, পায়নি তোমার মি-মি?

মি-মি বলল, পেয়েছে তো। কিন্তু কি খাব? ক্যাপসুল কি পাওয়া যাবে এখানে?

হ-ন সামনে ফলন্ত আপেলগাছ দেখিয়ে বললেন, এস আমরা আপেল খাই!

মি-মি অবাক হয়ে বলল, ওই ক্যাপসুলের নাম বুঝি আপেল? অত বড় ক্যাপসুল! ও দাদু, গিলব কি করে?

হ-ন হাসলেন।... গিলতে হবে না। এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

হ-ন আপেল পেড়ে ঘাসে জড়ো করলেন। মি-মিকে খাওয়া শেখালেন হ-ন। মি-মি হাঁটতে অনভ্যস্ত। সে টুকটুকে প্রজাপতির মতো গ্র্যাভিটি-জ্যাকেটের নব ঘুরিয়ে জিরো করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। শেষে হ-নর দেখাদেখি হাঁটতে চেষ্টা করল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে চিবিয়ে খাওয়া আর হাঁটাটা শিখে নিল। হ-ন তাকে নিয়ে আঙুরলতার বনে গেলেন। মি-মি তো আঙুর খেয়ে পেট ঢোল করে ফেলল। হ্রদের নির্মল জল খাওয়া তাকে শেখালেন হ-ন। তারপর তিনি গাছের ছায়ায় বসলেন। মি-মি হেঁটে বেড়াতে থাকল। ক্রমশ সে হাঁটার মজাটাও পেয়ে গেল। সে নরম ঘাসের মাঠে হরিণগুলোর সঙ্গে খেলে বেড়াতে থাকল। হরিণগুলি কখনও মানুষ দ্যাখেনি। মি-মি তাদের ক্ষতি করছে না দেখে তারাও খেলায় মেতে উঠল। মি-মি জীবনে কখনও এমন আনন্দ পায়নি।

এক সময় সে ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে হ-নকে খুঁজল। কিন্তু দেখতে না পেয়ে ভয় হল তার। চেঁচিয়ে ডাকল, দাদু! দাদু! তুমি কোথায় গেলে?

একটু পরে মি-মি হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, ঘাসে মাঠের ওপাশে সবুজ বনের ভেতর থেকে দৌড়ে আসছে রি-নি, কি-টি আর টা-টা। কলোনি 0077 থেকে ওদেরই তো চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল উড়ুক্কু চোখ। ওরা অবাক মি-মিকে ঘিরে লাফালাফি শুরু করে দিল। মি-মি বলল, কী রে? তোরা এখানে কীভাবে এলি?

রি-নি বলল, তুই এসেছিস কি করে?

আমি তো দাদুর সঙ্গে এসেছি। মি-মি বলল দুঃখিতভাবে। ওকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না।

ওরা সবাই খিলখিল করে হাসতে লাগল। এমন সময় শনশন শব্দ করে কি একটা এসে ওদের কাছে দাঁড়াতেই মি-মি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল। একটা উড়ুক্কু

চোখ। পেটের ওপর জ্বলজ্বল করছে নীল উজ্জ্বল তারা। মি-মি রি-নিকে জড়িয়ে ধরল। রি-নি বলল, ওকে ভয় পাচ্ছিস কেন? কিচ্ছু বলবে না। আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে—কত আনন্দে আছি আমরা। আর বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করে না।

হঠাৎ উড়ুক্কু চোখটা দরজার মতো খুলে গেল। আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন হ-ন। একমুখ হেসে বলল, কি মি-মি? এবার বুঝলে তো আমি কে? তোমার বাবা-মাকে হিমালয়ে উড়ুক্কু চোখ দেখার গল্প বলে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম। নৈলে বলা যায় না, তোমার বাবা যা চালাক মানুষ। ধরে ফেলতেন যে আমিই উড়ুক্কু চোখ আসলে। যাক্ গে, চলো সবাই। আমার বনের কুটিরে বিশ্রাম করবে। তোমরা পৃথিবীতে আরও কিছুদিন থেকে দ্যাখো, কেমন লাগছে। ভাল না লাগলে ফিরিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের। টাইম মেসিন সঙ্গে আছে। কাজেই ব্যাপারটা কেউ ধরতে পারবে না। তোমাদের বাবা-মায়েদের একদিন মানে পৃথিবীতে অন্তত একটা মাস। এস—এস সব।

হাঁটতে হাঁটতে মি-মি বলল, দাদু! তুমি বাড়ি ফিরবে কবে?

হ-ন বললেন, চাঁদের কলোনিতে মানুষ থাকে? ছ্যা ছ্যা। কাঁচের ভেতর বন্দী সব সময়। হাওয়া-বাতাস নেই, কিচ্ছু নেই। আর সেখানে ফিরব না। দ্যাখো তো খোকা-খুকুরা, এখানে কত হাওয়া! আকাশই বা কত বড়। সূর্যটা কেমন ঝলমলে দ্যাখো। আর দ্যাখো এই মাটি। হেঁটে কত সুখ।

কালো ঘুড়ি

কাল বিকেল থেকে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিদিন বিকেলে আমার প্রিয় কুকুর জিমকে নিয়ে একচক্কর ঘুরতে বেরোই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কবরখানার পাশ দিয়ে খেলার মাঠে এবং সেখান হয়ে নদীর ধারে যাই। সেচ দপ্তর নদীর বাঁধে উঁচু জায়গাটাতে সুন্দর একটা পার্ক বানিয়ে দিয়েছেন। সেই পার্কে সন্ধ্যা অব্দি বসে থাকি। জিম আমার চারপাশে ছোটাছুটি করে বেড়ায়। আলো কমে এলে আমরা বাড়ির পথ ধরি।

কাল পার্কের দিকে না গিয়ে খেলার মাঠের যে দিকটায় ঝিল, সেদিকে গিয়েছিলুম। ঝিলের পারে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর ভাঙাচোরা একটা পুরনো মন্দির আছে। আমি ঝিলের ধারেই ঘাসেব ওপর বসলুম। জিম আমাকে বুড়ি করে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে অভ্যাসমতো ছোটাছুটি কবে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার মুখ তুলে গরগর শব্দে কাকে যেন শাসাল।

একটু অবাক হয়ে বললুম, "কী হয়েছে জিম?"

জিম হঠাৎ দৌড়তে শুরু করল। ঘাসের মাঠটা পেরিয়ে যেতেই ওকে বারণ করলুম। ধমক দিলুম। কিন্তু সে কানে নিল না। শেষ বিকেলের সোনালী রোদ্দুরে তার ছোট্ট সাদা শরীরটা ক্রমশ আবও ছোট্ট হয়ে উঠছিল। তারপর অবিশ্বাস্যভাবে আমার চোখের সামনে সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঝটপট উঠে দাঁড়ালুম। নির্ঘাত কোনো গর্তে পড়ে গেছে বেচারা। তার ক্ষীণ কান্নাকাটির শব্দও কানে আসছিল।

কিন্তু যেখানে তাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি, সেখানে পৌঁছে তার আর সাড়া পেলুম না। তাছাড়া জমিটা হাতের তালুর মতো সমতল এবং ছোট ছোট নরম ঘাসে ঢাকা। কোথাও কোনও গর্তই নেই। ডাকতে থাকলুম, "জিম! জিম! তুই কোথায়?"

কোনো সাড়া নেই দেখে ভারি অবাক হয়ে গেলুম। জলজ্যান্ত একটা প্রাণী বেমালুম চোখের সামনে নিপাত্তা হয়ে গেল! জঙ্গল শুরু হয়েছে অন্তত তিরিশ মিটার দূরে। ওই জঙ্গলে হিংস্র বন্যপ্রাণী থাকাও অত্যন্ত অসম্ভব। আজকাল এই মফস্বল শহরে মানুষের ভিড় প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। সবখানেই মানুষজনের আনাগোনা। এই জঙ্গলে একটা শেয়ালও আছে কিনা সন্দেহ। কারণ জঙ্গলট

পুরপিতারা নিছক সৌন্দর্যের জন্য তৈরী করেছেন। বেলা পড়ে আসছিল। রোদ্দুরের রঙ ফিকে হতে হতে ধূসর হচ্ছিল। শরৎকালীন হাল্কা নীল কুয়াসা জমছিল চারদিকে। পাখিদের তুমুল চেঁচামেচি মিইয়ে আসছিল ক্রমশ। আরও কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে খুব ভাবনায় পড়ে গেলুম।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল আমার সামনে ঘাসের ওপর একটা কালো ঘুড়ি পড়ে আছে। ঘুড়িটা আপনমনে কুড়িয়ে নিলুম।

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ একটা ঘুড়িই। কিন্তু তারপর আবিষ্কার করলুম, ঘুড়িটাতে বাঁশের কাঠির ফ্রেমের বদলে ধাতব কাঠির ফ্রেম। ছাতার কালো শিকের মতো। তবে তার চেয়েও অদ্ভুৎ ব্যাপার, কোনো সুতোর চিহ্ন নেই ফ্রেমে।

ঘুড়িটা সাধারণ ঘুড়ির চেয়ে একটু ভারিও বটে। দুই কোণে বাঁকানো সরু শিকের ডগায় এতটুকু দুটো চৌকো বাকসো—আন্দাজ দুই বর্গ সেন্টিমিটার তাদের আয়তন। তাহলে কি এটা কোনো আবহাওয়া ঘুড়ি?

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। সম্ভবত তাঁরই কীর্তি। ঘুড়িটা তাঁকে দিয়ে আসা যাবে। কিন্তু জিমের ব্যাপারটা তো ভারি রহস্যজনক।

এইসময় পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি রামু ধোপা মাথায় কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে বাড়ি ফিরছে। আমাকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। বললুম, "রামু, আমার কুকুরটাকে দেখেছ?"

রামু মুচকি হেসে বলল, 'বাবুজী, আমিই জিগ্যেস করব ভাবছিলুম। আমার গাধাটাকে দেখেছেন নাকি।"

"তোমার গাধাটা হারিয়ে গেছে নাকি?"

"হ্যাঁ বাবুজী! কাল বিকেলে এখানেই চরছিল। চরতে চরতে হঠাৎ বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল।"

"বলো কী রামু? আমার কুকুর জিমও—"

রামু হঠাৎ চমকখাওয়া গলায় বলে উঠল, "বাবুজী! বাবুজী! আপনার হাতের ঘুড়িটা এখুনি ফেলে দিন!"

অবাক হয়ে বললুম, "কেন ফেলে দেব?"

"ওটা ঘুড়ি নয়—একটা সাংঘাতিক রাক্ষুসে জিনিস!" রামু ভয়ার্ত গলায় বলল। "বাবুজী, আমার ধারণা, ওটাই আমার গাধা আর আপনার কুকুরকে গিলে খেয়েছে। কাল আমিও ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। তারপর বাবুজী, ওটার ভেতর আমার গাধার ডাক শুনতে পেয়েছিলুম। এক্ষুনি ফেলে দিয়ে বাড়ি যান।"

ওর কথায় হো হো করে হেসে ফেলতুম। কিন্তু ততক্ষণে সত্যিই কালো

ঘুড়িটার ভেতর ক্ষীণগলায় জিমের চিৎকার ভেসে এল—বহুদূর থেকে জিম যেন চেঁচামেচি করে আমাকে ডাকছে। তারপরই তেমনিভাবে একটা গাধারও দূরে চিৎকার শোনা গেল।

অবিশ্বাস্য এই অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে পড়ে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেলুম। রামুকে ধুপ ধুপ শব্দে পালিয়ে যেতে দেখে সম্বিত ফিরল।

কিন্তু ঘুড়িটা ফেলে দিলুম না। ওটার ওপর একটা অদ্ভুত আক্রোশ জেগে উঠল। হঠকারিতায় ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু রামুর কথামতো যদি সত্যি ওর ভেতর জিম দুর্জ্ঞেয় কোনো কারণে আটকে গিয়ে থাকে, তাহলে আর তাকে উদ্ধার করাই যাবে না।

তাছাড়া ঘুড়িটা ছেঁড়াও অসম্ভব। কাগজের মতোই নরম. অথচ শক্তিশালী কোনো ধাতুতে তৈরী যেন। সাবধানে ওটাকে বাড়ি নিয়ে এলুম। দেয়ালের হুকে আটকে রেখে দিলুম।

তারপর সারারাত ওখান থেকে কুকুর আর গাধার চিৎকার শুনেছি। যতবার ঘুম ভেঙেছে, ততবার। সেইসঙ্গে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। অন্ধকারে দেয়ালের দিকে তাকালেই দেখেছি, আবছা নীলরশ্মি ঠিকবে বেরুচ্ছে এবং চৌকো ঘুড়ির কালো বুক জুড়ে যেন এক অনন্ত গহ্বর। মাঝে মাঝে ক্লিক ক্লিক শব্দ ঘড়ির মতো।...

সকালে চন্দ্রকান্ত চৌধুরী মশাই হঠাৎ এসে হাজির। ব্যস্ত হয়ে বললুম, "আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। ভাবছিলুম এখনই বেরুব।"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আপনাব কী হয়েছে? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

ওঁর হাত ধরে টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলুম। দেয়ালের হুকে আটকানো কালো ঘুড়িটা দেখিয়ে বললুম, "দেখুন তো ওটা কী।"

চন্দ্রকান্ত কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর বললেন, "এটা আপনি কোথায় পেলেন?"

সংক্ষেপে ওঁকে ঘটনাগুলো বললুম। চন্দ্রকান্ত সব শোনার পর গুম হয়ে গেলেন। চেয়ার টেনে বসে পাইপ ধরালেন। তারপর পাইপ টানতে টানতে বললেন, "দুদিন যাবৎ আমার ল্যাবরেটরি নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। আপনাকে সেদিন বলেছিলুম. একটা রোবোট তৈরী করার চেষ্টায় আছি। রোবোট তৈরির জন্যে শিলিকন দরকার। জাপান থেকে শিলিকন ধাতুর কিছু পাত এসে পৌঁছল শুক্রুরবার। আজ হল মঙ্গলবার। কিন্তু শনিবার সকালে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেখি কোনো

মেসিন কাজ করছে না। লেসার রশ্মির যন্ত্রটা পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়। এমন কী বিদ্যুতের ব্যাপারেও গণ্ডগোল ঘটছে বারবার। মেইন ফিউজ হয়ে যাচ্ছে। তারপর গতরাতে আবিষ্কার করলুম, এই এলাকায় হঠাৎ মহাজাগতিক রশ্মির বিচ্ছুরণ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, ছাদের সৌরচুল্লীটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে।"

চন্দ্রকান্ত তাঁর বাঁহাতের কড়ে আঙুলে আংটির মতো পরা একটা চৌকো জিনিস দেখিয়ে বললেন, "এটা সি আর ডিটেক্টর। কসমিক রের মাত্রা নির্ণয় করে। যাই হোক, এই সুক্ষ্ম কাঁটাটা লক্ষ্য করুন। দেখতে পাচ্ছেন কি কাঁটার গতি আপনার ঘুড়ির দিকে?"

দেখে নিয়ে বললুম, "তাই তো দেখছি।"

চন্দ্রকান্ত আস্তে বললেন, "ওটা আসলে একটা কসমিক কাইট। মহাজাগতিক ঘুড়ি।"

"তার মানে, ওটা কি মহাকাশ থেকে উড়ে এসেছে?"

"ত্ছাড়া আর কি বলা যাবে? সম্ভবত ওটা অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে উড়ে এসেছে?"

চমকে উঠে বললুম, "কে পাঠাল এই কসমিক ঘুড়ি? নাকি— "

আমার কথা থামিয়ে চন্দ্রকান্ত রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "আমাদের চেয়ে উন্নত কোনো প্রাণী পাঠাতে পারে। আবার দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়েও ওটা পৃথিবীতে এসে যেতে পারে।"

"কী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে?" জানতে চাইলুম বিজ্ঞানীর কাছে।

চন্দ্রকান্ত একটু ভেবে বললেন "আপনি হয়তো জানেন এ বিশ্বজগত চতুর্মাত্রিক। তার মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিনটে মাত্রা ছাড়াও সময় নামে আরেকটা মাত্রা আছে।"

"হ্যাঁ- আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের কথা বলছেন আপনি?"

"ঠিক ধরেছেন। এখন ধরুন, কাগজে আঁকা একটা পুতুল।" চন্দ্রকান্ত আমার টেবিল থেকে কাগজ-কলম নিয়ে একটা পুতুল আঁকলেন। তারপর বললেন, "এই দেখুন, পুতুলের মাথাটা আপনার দিকে এখন। পা আমার দিকে। কেমন তো? এটার দুটো মাত্রা শুধু—দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ। এবার এই দেখুন এটা তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ উচ্চতার মধ্যে দিয়ে উল্টে দিলুম। এটাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় একটা দুর্ঘটনা। এর ফলে কী ঘটল? না—পুতুলের পা আপনার দিকে, মাথা আমার দিকে হয়ে গেল। ঠিক তেমনি যদি কোনো জিনিস চতুর্থ মাত্রা অর্থাৎ সময়ের মধ্যে দিয়ে উল্টেযায়—"

দ্রুত বললুম, "ব্যাপারটা কল্পনা করাই অসম্ভব।"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "মানুষের কল্পনার দৌড় সীমাবদ্ধ। কিন্তু সত্যিই অমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সময়ের মধ্য দিয়ে উল্টে যেতে পারে কোনো জিনিস। এই মহাজাগতিক ঘুড়িটা ঠিক ওইভাবে সময়ের মধ্যে দিয়ে উল্টে গিয়ে পৃথিবীতে চলে আসতে পারে। তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে দেখুন। যাদের এই ঘুড়ি, তারা হয় লক্ষকোটি বছর আগে বেঁচে ছিল কোনো বহুদূরের গ্যালাক্সি বা ব্রহ্মাণ্ডে, অথবা তারা এখন থেকে লক্ষকোটি বছর পরে সেখানে জন্মাবে।"

মাথা ঘুরছিল এসব কথা শুনে। বললুম, "অর্থাৎ হয় এ ঘুড়ি অতীতের অথবা ভবিষ্যতের কোনো উন্নতবুদ্ধির প্রাণীর তৈরী। যাক্ গে, মোদ্দা কথা হল, আমার কুকুর জিমকে উদ্ধার করার উপায় আছে কি না বলুন।"

চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। "আপত্তি না থাকলে ঘুড়িটা আমি নিয়ে যেতে চাই।"

"কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু জিমের কি হবে?"

চন্দ্রকান্ত ঘুড়িটা পেড়ে নিয়ে বললেন, "আপনি আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে আসুন। তখন বলব, আপনার কুকুর কিংবা রামুধোপার গাধাটার কোনো কিনারা করা যাবে কি না।"...

·

জিমের জন্যে সারাদিন মন খারাপ করছিল। ভীষণ একা লাগছিল। সন্ধ্যায় অনেক আশা নিয়েই হাজির হলুম বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাড়িতে। ওঁর বাড়িটা নিরিবিলি নদীর ধারে। চারদিকে সুন্দর বাগান, মধ্যিখানে একতলা বাড়ি। ছাদের ওপর আকাশমুখো অদ্ভুত একটা চোঙা বসানো। তার পাশে সৌর চুল্লী।

আজ সন্ধ্যায় বাড়িটা অন্ধকারে ছম ছম করছিল। জ্বলন্ত মোম হাতে চন্দ্রকান্ত আমাকে পথ দেখিয়ে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলেন। বললেন. "ক্রমশ আরও রহস্যের জালে জড়িয়ে যাচ্ছি। সোলার প্যানেল চালু করতে পারি নি। এদিকে বিদ্যুৎ সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন। বিদ্যুৎ সংস্থার লোকেরা হয়রান হয়ে ফিরে গেছে। যাক্ গে, আপনি বসুন। আমি কফি তৈরি করে আনি।"

চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে গেলে দেখলুম, টেবিলের ওধারে একটা লাল বোর্ডে সেই কালো ঘুড়িটা আটকানো রয়েছে। তেমনি নীল রশ্মি ঠিকরোচ্ছে। সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পড়ল গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো গোল খানিকটা অংশ যেন ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক রেকর্ডের মতোই তার ভেতর বহুদূরের একটা কণ্ঠস্বর ফুটে উঠল। এত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যে প্রথমে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু পরে চমকে উঠলুম। বাচ্চা মেয়ের গলায় কেউ কান্নাকাটি করে বলছে, "আমি হারিয়ে গেছি! বাড়ির পথ খুঁজে পাচ্ছি না।"

বললুম, "কে তুমি?"

"আমি কিকি।"

"কোথায় থাকো?"

"ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশে লাল রঙের বাড়িতে।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, তপনবাবুর মেয়ে তিনদিন ধরে নিখোঁজ। ওর নাম জানি না। কিন্তু ওকে চিনি। রোজ খেলার মাঠের একধারে আপন মনে স্কিপিং করতে দেখেছি ওকে। বয়স বড়জোর আট-ন বছর। খুব চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটা।

বললুম, "তুমি এখন কোথায় কিকি?"

"মাঠে।"

"কিকি, ওখানে কি একটা ছোট্ট শাদা কুকুর দেখতে পাচ্ছ?"

"কুকুরটা তো আমার কোলে।"

"একটা গাধা দেখতে পাচ্ছ কি?"

"রামুর গাধা তো? ওই তো ঘাস খাচ্ছে।"

কখন চন্দ্রকান্ত এসে গেছেন কফির পেয়ালা নিয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, "তাহলে বুঝতে পারছেন তো কি ঘটেছে? শব্দ যেমন রেকর্ড হয়ে যায়, তেমনি তপনবাবুর মেয়ে, আপনার কুকুর আর রামুর গাধা ওই মহাজাগতিক যন্ত্রটার ভেতর রেকর্ড হয়ে গেছে।"

"কী অদ্ভুত ব্যাপার!"

"মোটেও না। আপনাকে সময়ের ভেতর দিয়ে উল্টে যাওয়ার কথা বলেছিলুম। ব্যাপারটা একটা চোরাবালির মতো। তলিয়ে গিয়ে উল্টো একটা জগতে পৌঁছনো। সেখানে অতীত ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, আছে চিরবর্তমান। বাই দা বাই, আপনি অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়েছেন কি? অ্যালিস যেমন আয়নার ভেতরকার জগতে—"

চন্দ্রকান্তের এসব কথাবার্তার মাথামুণ্ডু বোঝা কঠিন। সবই হেঁয়ালি আমার কাছে। একটু বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু ওদের উদ্ধারের উপায় কি?"

"কফি খান।" বলে চন্দ্রকান্ত পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বসলেন। নিজের কফিতে চুমুক দিয়ে ফের বললেন, "আমরা এখন সময়ের যে বিন্দুতে আছি, আর ওরা এখন সময়ের যে বিন্দুতে আছে দুটোর মধ্যে মহাজাগতিক দূরত্ব বিশাল। কয়েক কোটি আলোকবর্ষ। মাইলের দুই প্রান্ত বলা যায়।"

"প্লিজ! হেঁয়ালি করবেন না আর।"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন: "ওই কসমিক ঘুড়ি সময়ের বুকে একটা চোরাবালি।"

"ওটা তো রেকর্ডের মতো ঘুরছে দেখতে পাচ্ছি।" বলে আমি কিকিকে ডাকলুম, "কিকি! কিকি!"

কিকি বলল, "এই তো আমি।"

"তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ কি?"

"না। বড্ড আঁধার যে।"

এবার আমি জিমকে ডাকলুম, "জিম। জিম!"

জিম গরগর করতে থাকল। চন্দ্রকান্ত খিক খিক করে হেসে বললেন, "আগের দিকে গ্রামোফোন রেকর্ডে কুকুরের ছবি থাকত মনে আছে? হিজ মাস্টার্স ভয়েস।"

চন্দ্রকান্ত কফিটা একচুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। "একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। কসমিক রেকর্ডটাকে যদি উল্টোপাকে ঘোরানো যায়—" বলে উনি টেবিল থেকে সূক্ষ্ম পিনের মতো একটা জিনিস তুলে নিলেন। পিনটার গোড়ার দিকে একটা তার লাগানো আছে। পিনটা কালো ঘুড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থামলেন চন্দ্রকান্ত। গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিন্তু উল্টোপাকে ঘোরার মানে যদি এই দাঁড়ায় যে ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব জীবনের সঙ্গে মৃত্যুব দূরত্বের মতো, তাহলে তো আর ওদের ফিরে পাওয়াই যাবে না। উঁহু, থাক! আরও চিন্তাভাবনা দরকার।"

চন্দ্রকান্তের হাবভাব, কথাবার্তার হেঁয়ালি আমার পছন্দ হচ্ছিল না। ভেতর-ভেতর ক্রমশ ওঁর ওপর রেগে উঠছিলুম। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "যথেষ্ট হয়েছে। আমার জিনিস আমাকে ফেরত দিন। আপনার ক্ষমতার দৌড় বোঝা গেছে।"

এই বলে হাত বাড়িয়ে এক টানে কালো ঘুড়িটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলুম। চন্দ্রকান্ত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার এমন রুক্ষ ব্যবহার কখনও দেখেননি।

ঘুড়িটা নিয়ে হনহন করে এগিয়ে চললুম খেলার মাঠের দিকে। যেখানে ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, সেখানে যেই গেছি, হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। ঘুড়িটা আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তারপর চাপা শনশন শব্দ শুনতে পেলুম। শরৎকালের পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্র ঝলমল করছে। দেখলুম, কালো চৌকো ঘুড়িটা ভেসে চলেছে সেইসব নক্ষত্রের দিকে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "ওদের নিয়ে যেও না। ফিরিয়ে দিয়ে যাও!"

তারপর নিজের বোকামি টের পেয়ে নিজের ওপর খুব রাগ হল। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের কাছ থেকে ঘুড়িটা না নিয়ে এলে এই কাণ্ডটা হত না! কিকি হারিয়ে গেল, জিম হারিয়ে গেল. হারিয়ে গেল রামুর গাধা চিরকালের মতো। এতক্ষণ কোন গ্যালাক্সিতে কত আলোকবর্ষ মাইল দূরে চলে গেল ওরা।

ধূপ করে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর বসে পড়লুম।

কতক্ষণ বসে ছিলুম জানি না, কাছাকাছি কোথাও গাধার বিকট চিৎকারে সম্বিৎ ফিরল। আকাশে এতক্ষণে একটুকরো চাঁদ ভেসে উঠেছে। জ্যোৎস্না ঝিলমিল করছে মাঠে। আমার ডাইনে সামান্য দূরে একটা গাধা চরছে।

তারপর সাদা একটা ছোট্ট প্রাণী দৌড়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠলুম আনন্দে, "জিম! আমার জিম!" দয়ালু ঘুড়িটা তাহলে যাবার সময় এদের ফিরে দিয়ে গেছে।

তাকে তুলে নিয়ে পা বাড়াতেই দেখি, ফ্রকপরা একটা ছোট্ট মেয়ে জ্যোৎস্নায় আপনমনে স্কিপিং করছে। বললুম, "কিকি! বাড়ি যাবে না?"

কিকি বলল, "একটু দাঁড়াও না কাকু, একশো হলেই আমার শেষ।"

চন্দ্রকান্তের সাড়া পেলুম হঠাৎ। "ওরা ফিরেছে দেখছি!"

"ফিরেছে।"

বিজ্ঞানী আকাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছিলেন। "আসলে সবটাই একটা কসমিক জোক—মহাজাগতিক কৌতুক। বুঝলেন তো?"

পাছে আবার কোন জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পাল্লায় পড়তে হয়, কিকিকে তাড়া দিয়ে বাড়ির পথ ধরলুম। যেতে যেতে পিছু ফিরে দেখলুম, বিজ্ঞানী রামু ধোপার গাধার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মহাজাগতিক কালো ঘুড়ির খপ্পরে পড়ে গাধাটাও মহাজাগতিক জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। কাজেই এই শরৎকালীন জ্যোৎস্নারাতে দস্তুরমতো একটা বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন বসতে চলেছে। আমি ফিক করে হেসে ফেললুম। কিকি বলল, "হাসছ কেন কাকু?"

"কিকি, তুমি বলেছিলে বাড়ির পথ হারিয়ে ফেলে—"

কিকি চটপট বলল, "মিথ্যে করে। তা না বললে বাবার হাতে পিটুনি খেতে হবে যে!"

কাকতাড়ুয়া জ্যান্ত হলে

এক

এমন যদি হয়, বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটি নিঝুম জ্যোৎস্নার রাতে ক্ষীণ সুরে গান গাইতে গাইতে চলাফেরা করে বেড়ায়, তা হলে সত্যিই ব্যাপারটা বড্ড ভয়-ভুতুড়ে হয়ে ওঠে। কিন্তু তার গায়ের জামায় আর বেগুনপাতায় রক্তের ফোঁটা থাকলে সে-একটা সাঙ্ঘাতিক রহস্যই।

কাকতাড়ুয়াটি বানিয়েছিল ফান্টু, তুলারাম দণ্ডীমশাইয়ের ভাগনে। স্কুল ফাইনালে তিন-তিনবার ফেল করায় যাকে গঙ্গার পাড়ে মামার সাবেক ফার্মে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ফান্টুর মেধা খেত-খামারেই ভাল খুলেছে। খামোখা কাগজে ছাপানো কথাবার্তা মুখস্থ করে জীবন বরবাদ করে ফেলছিল। কাটরার মাঠে দণ্ডীমশাইয়েব পনেরো একর খেতে মরসুমি ফসল আর ফুল-ফলের ফলন দেখার মতো! একটুকরো নার্সারির লাবণ্য তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। গত শীতে কালীগঞ্জে কৃষি-প্রদর্শনী মেলায় তিন কিলো ওজনের বেগুন সরকারি মেডেল পাইয়ে দিল, এও একটা বড় ঘটনা।

তবে সবই নাকি ঈশান কোণে পোঁতা কাকতাড়ুয়াটির জোরে, এটা ফান্টুব নিজের মত। গঙ্গার ধারে ওই যে পুরোনো শিবমন্দিব আর বটের গাছ, সেখানে কখনও-না-কখনও সাধু-সন্নেসি এসে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। তাঁদেরই একজনকে তুষ্ট করে পরামর্শটি পায় সে। পৃথিবীতে সবকিছু নাকি জোড়ায়- জোড়ায সিধে আর উলটোটা থাকার নিয়ম। যেমন, দিন আর রাত, মাটি আর জল, গরম আব ঠাণ্ডা, মামা আর মামি—ফান্টুর দেওয়া নমুনা। মামা যেমন কুচুটে বদরাগী, মামি তেমনি শান্ত, মিঠে, নরম। তো লক্ষ্মীর উলটো অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীর দৃষ্টি সবসময় কু। বিশেষ করে বেগুনখেতের দিকে তার নজর বেশি। পোকায়-পোকায় বেগুন জেরবার। শেষে যেই কাকতাড়ুয়াটি তৈরি কবে ঈশাণ কোণায পোঁতা হল। একজিবিশনে মেডেল! আর কী প্রমাণ চাই?

কাকতাড়ুয়া বানানো খুব সোজা। পল্‌কা দু'টুকরো বাঁশ আড়াআড়ি বেঁধে ক্রুশ তৈরি করো। তাতে খড় জড়িয়ে কষে বাঁধো। দু'ধারে দু'হাত বাড়ানো একঠেঙে মানুষটির আকার হল। এবার একটা ছেঁড়াখোঁড়া পাঞ্জাবি পরিয়ে দাও। মাথায় বসিয়ে দাও একটা কেলে মাটির হাঁড়ি। চুন দিয়ে ওতে চোখ-মুখ এঁকে দাও, দাঁতসুদ্ধু। দেখবে কী বিকট চেহারা হল। অলক্ষ্মী অবশ্য শুধু এতেই ভয়

পাবার নয়, সেই সন্নেসি কাকতাড়ুয়াটির মাথায় মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিলেন, যেটা ফাণ্টুর মুখস্থ হয়ে গেছে ঃ 'ঔং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা।'

হুঁ, পাঞ্জাবিটি মামার। মামির কাছে গোপনে সেধে আনা। মামা হাড়কেপ্পন, হিসেবি মানুষ। তবে একটাই সুবিধে. বড্ড ভুলো মন। পাঞ্জাবিটি চিনতে দেরি হয়েছিল এবং তখন একজিবিশনে মেডেল জুটেছে। ফাণ্টু একগাল হাসি আর আশীর্বাদ পেল। তারপর থেকে মামার মন ফার্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যেটি হলেই গঙ্গা পেরিয়ে কাটরার মাঠে ছোট্ট একতলা ফার্মহাউসে রাত কাটান। খুব 'নেচার, নেচার' করেন। বলেন, "নেচারেই শান্তি আছে রে বাবা। সাধু-সন্নেসিরা সেটা জানেন বলেই তো নেচারের ভেতর ঘুরে বেড়ান।" ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে ঘুম ভেঙে মামাকে খোলা বারান্দায় হেঁড়ে গলায় গান গাইতেও শুনেছিল ফাণ্টু।

কিন্তু এ-গান সে-গান নয়। নিশুতি রাতে চলন্ত কাকতাড়ুয়ার খোলা সুরের ভয়-জাগানো গান। মামা-ভাগনে দু'জনেই আতঙ্কে কাঠ। ফাম'হাউসে বিদ্যুৎ আছে। ঘটনাব সময় রহস্যময় লোডশেডিং। টর্চের আলো ফেলতেই কাকতাড়ুয়াটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গানও গেল থেমে।

ফার্মে আরও দু'জন লোক আছে। মুকুন্দ আর রমজান। মুকুন্দ পাওয়ারটীলার চালায়। রমজান কীটনাশক ওষুধ ছড়ায়। দণ্ডীমশাইয়ের সন্দেহ, দু'জনেই গাঁজাখোর। ওঠানো গেল না। সকালে দেখা গেল, কাকতাড়ুয়াটি নিজের জায়গা ছেড়ে অন্তত হাত-তিরিশেক এগিয়ে বেগুনখেতের মাঝামাঝি পোঁতা আছে। বেগুনের গাছে যথেচ্ছ কাঁটা। ফাণ্টু সাবধানে কাকতাড়ুয়াটিকে আগের জায়গায় পুঁতে রেখে এল।

পরের রাতে আবার একই ঘটনা।

বদরাগী দণ্ডীমশাই এ-রাতে বন্দুকে গুলি ভরে তৈরিই ছিলেন। ধুধু জ্যোৎস্নায় কাকতাড়ুয়াটি জ্যান্ত হয়ে ঠ্যাং বাড়িয়ে খোনা সুর ভেঁজেছে কি, বন্দুক চিক্কুর ছাড়ল। ফট্টাস শব্দ এবং কাকতাড়ুয়া বেগুনখেতের ভেতর কুপোকাত।

কিন্তু না, তখনও রক্তের ফোঁটা দেখা যায় নি। ভোরে ফাণ্টু গেল অবস্থা দেখতে। মামা তখনও জয়ের আনন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ফট্টাস শব্দটি ছিল কাকতাড়ুয়া বেচারার মুণ্ডুর, মানে—সেই কেলে হাঁড়িটি গুলি লেগে চৌচির হওয়ার। মন্ত্রপড়া মুণ্ডুর দশা দেখে ফাণ্টুর মন খারাপ হয়ে গেল। কবন্ধ কাকতাড়ুয়াকে পুঁতে রাখল অগত্যা।

সেদিনই দ্বিতীয় রহস্যের সূত্রপাত।

তুলারাম দণ্ডীর সঙ্গে তুলাদণ্ডের সম্পর্ক আছে। কালীগঞ্জের বাজারে পশুখাদ্য খোল-ভুসির বড় আড়ত তাঁর। দুপুরে ঔরঙ্গাবাদ থেকে একট্রাক টাটকা

গমের ভুসি এসেছিল। বাঁধা খদ্দেররা ধরলে টাটকা ভুসি বেচতে হয়। একটা বস্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা মড়ার খুলি। হইচই পড়ে গেল চারদিকে। এ কী বিদঘুটে ব্যাপার!

সাপ্লায়ার দণ্ডীমশাইয়ের মাসতুতো ভাই চণ্ডীচরণ। খবর গেল তাঁর কাছে। খুলিটি ওজনদার, প্রায় ন'শো গ্রাম। সেই ন'শো গ্রাম ভুসি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি এল চণ্ডীচরণের কাছ থেকে। চিঠির বক্তব্য হল, সম্ভবত যে-গমখেতের গম থেকে এই ভুসির উৎপত্তি, তার শিয়রে একটি কাকতাড়ুয়া ছিল এবং খুলিটি সেটির মাথায় বসানো ছিল। কোনও আমুদে চাষির রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। দাদা যেন ক্ষমাঘেন্না করে দেন এবারকার মতো। এবার থেকে সব মাল বিশদ খতিয়ে না দেখে পাঠানো হবে না।

দণ্ডীমশাই বিশেষ তুষ্ট হলেন। কারণ, বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটির মাথা তিনি গত রাতে ফাটিয়েছেন। ফাণ্টু কেলে হাঁড়ির খোঁজে সাবাদিন হন্যে হচ্ছে, খবর পেয়েছেন। আজকাল আব মাটির হাঁড়িতে রান্নার চল নেই। দৈবাৎ একটা পেযে গিয়েছিল সেই সন্নেসির দয়ায়, যিনি মৃৎপাত্রে বান্না কবা ছাড়া অন্ন অশুচি গণ্য করতেন।

সন্ধ্যে হতে-না হতে গঙ্গা পেবিয়ে দণ্ডীমশাই কাটখাব মাঠে তাঁর ফার্মে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন মড়াব খুলিটা। একগাল হেসে বললেন, "ফাণ্টু. এই দ্যাখ, কী এনেছি তোব জন্যে।"

ফাণ্টু আঁতকে উঠে বলল, "ওরে বাবা! এ আমি কী কবব মামা?"

"ধুর্ বোকা!" দণ্ডীমশাই বললেন। "দেখিসনি কাকতাড়ুযার মাথায় মড়ার খুলিও থাকে। নে ব্যাটাছেলেকে পরিযে দে। ন্যাড়া লাগছে বড্ড। আব শোন্। সাধুবাবার কাছে কী মন্ত্র শিখেছিলি, ফুকে দিতে ভুলিসনে যেন।"

ফাণ্টু খুলিটা কাকতাড়ুযার ঘাড়ে আটকে দিযে মন্ত্রটা পড়ল, "ওঁং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!"

তারপর মামার কাছে ফিরে বলল, "ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না মামা। যদি—"

দণ্ডীমশাই চোখ কটমট করে বললেন, "কী যদি? যদি-টদি কিছু নয়। ত্যাঁদড়ামি করলেই গুলি খাবে।"

রমজান বলল, "বাবুমশাই, মনে হচ্ছে, এ-ব্যাটা একটু বেশি ত্যাঁদড়ামিই করবে।"

"কেন, কেন?"

"যার খুলি, সে-সুদ্ধু এসে যোগ দেবে। ছিল এক, হবে দুই।"

দণ্ডীমশাই বাঁকা হেসে বললেন, "আমার বন্দুকও দোনলা। এক সঙ্গে দুটো ঘোড়াই টিপে দেব।"

মুকুন্দ কিছু না বুঝেই বলল, "খুব জমে যাবে মনে হচ্ছে। খুলিতে গুলিতে জমজমাট।"

দণ্ডীমশাই ভেংচি কেটে বললেন, "তোরা তো গাঁজা খেয়ে মড়া হয়ে থাকবি।"

মুকুন্দ জিভ কেটে বলল, "কী যে বলেন স্যার! কিছু বাধলে ডেকেই দেখবেন, কী করি।"

কী করে, যথারীতি দেখা গেল সে-রাতে। গাঁজা খাক বা নাই খাক, দুই বন্ধুর ঘুমটাও বড্ড বেশি। ফাণ্টু চুপি চুপি ডাকতে গিয়ে ফিরে এল। পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্না ফেটে পড়ছে কাটরার মাঠে। কাকতাড়ুয়াটি, রমজানের হিসেব অনুসারে, দুনো জ্যান্ত হয়েছে। খোনাসুরে কী গাইছে, কথাগুলো বোঝা যায় না, হাওয়ার তোলপাড় খুব। বন্দুকের নল জানালার বাইরে. ট্রিগারে আঙুল, হ্যামার দুটোই ওঠানো, দণ্ডীমশাই তৈরি। শুধু একটু কৌতূহল জেগেছে, শেষ পর্যন্ত কী করে কাকতাড়ুয়া হতচ্ছাড়া, তাই দেখবেন।

তেমন কিচ্ছুটি করছিল না। শুধু গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজা, আর দু'ধারে চিতোনো লম্বা হাত্দুটো সমেত একবাব এদিক. একবার ওদিক ঘোরা, ট্যাঙাস ট্যাঙাস করে এ কোণা থেকে ও কোণা পায়চারি। গত রাতে গুলি খেয়েই যেন রেগে আছে, এমন বেপরোয়া ভঙ্গি। শেষে ঘরটার দিকে মুখ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। অমনি খাপ্পা দণ্ডীমশাই একসঙ্গে দুটো ট্রিগারই টেনে দিলেন।

ফলে উল্‌টো ধাক্কাটা যথেষ্ট দিল বন্দুকের কুঁদোটা এবং পড়ে গেলেন দণ্ডীমশাই। পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আলো! আলো"

হুঁ. এ রাতেও বিদ্যুৎ অদ্ভুতভাবে বন্ধ। সাড়ে-বারোটা বাজে। টর্চের আলো ফেলে কাকতাড়ুয়াটিকে বেগুনখেতের ভেতর কাত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মামা-ভাগনে সাহস করে বেরোতে পারলেন না। আগের দুটো রাতের মতোই। তারপর বিদ্যুৎ এল আধঘন্টা পরে—এও আগের দু'রাতের মতোই।

ভোরে কাকতাড়ুয়ার পাঞ্জাবিতে একটু রক্তের ছোপ, তাবপর বেগুনগাছের পাতায় খুঁজতে খুঁজতে আরও পাওয়া গেল। শেষদিকটায় ঝোপঝাড় ও কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত রক্তের দাগ রেখে গেছে কেউ। বেড়ার সঙ্গে বুনো লতার ঝালর থাকায় আগে ধরা পড়েনি। এদিন ঝালর সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কাঁটাতারের খানিকটা অংশ কাটা। একটা বড় ফোকর। গুলিখোরটি যেই হোক, ভূত কি মানুষ, ওই পথেই পালিয়েছে।

ফাণ্টু চ্যাঁচাতে থাকল, "মামা. মামা. মামা।"

দুই

"এই আপনার তেরো নম্বর কেস?"

"হ্যাঁ, আনলাকি থারটিন।" গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার ওরফে কে. কে. হালদার ওরফে আমাদের হালদারমশাই নাকে নস্যি গুঁজে নাকি-স্বরে বললেন। মুখে তেতো ভাব। অনিশ্চয়তার।

কিছুদিন থেকে আমার ফ্রেণ্ড-ফিলজফার গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁর ছাদের বাগানে নিপাত্তা হয়ে আছেন। এদিকে পৃথিবীতে কত রহস্যময় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কাগজে ছাপা হচ্ছে তার খবর। কালীগঞ্জের তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতে ভুতুড়ে কাকতাড়ুয়াটি নাকি রাতবিরেতে জ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এটুকুই ছাপা হয়েছিল। কর্নেলের আশা ছেড়ে অগত্যা গিয়েছিলুম হালদার মশাইয়ের আপিসে। গণেশ অ্যাভিনিউতে একটা চারতলা বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁর 'হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি'। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রাস্তা থেকে দেখা যায়।

ঘরে ঢুকে দেখি, সামনে নোটবই আর নস্যির খোলা কৌটো, আঙুলের টিপে নস্যি, গোঁফ বেয়ে সেই নস্যি ঝরছে, অর্থাৎ সিরিয়াস কেস হাতে পেয়েছেন। মুখও গুরুগম্ভীর। নোটবইয়ের পাতায় কোনও-কোনও শব্দ লাল রঙের খোপে ঢোকাচ্ছেন। উল্‌টো দিক থেকে তিনটে শব্দ বন্দী দেখতে পেলুম, 'তুলা', 'দণ্ড', 'মুণ্ড'।

সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলুম, "তুলারাম দণ্ডীর ব্যাপারটা নয় তো?"

এবার মুখ তুলে ফিক করে হাসলেন হালদারমশাই। "হঃ!" বলে বিচিত্তির রুমালে, ন্যাতা বলাই উচিত, নাক ও গোঁফ মুছলেন। রীতিমত আপিস যখন. তখন একজন বেয়ারাও বহাল আছে। তার নাম রামধারী। হালদারমশাই পুলিশে চাকরি করতেন। রামধারীও করত। পেল্লায় চেহারা। কেটলি নিয়ে চা আনতে বেরোলো কর্তার ইশারায়।

তারপর হালদারমশাই সবিস্তারে রহস্যের জালটি আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন, নিজের ভাষায় যেটি আগেই মোটামুটি বর্ণনা করেছি। দিয়ে বললেন, "মিনিট-দশেক আগে দণ্ডীমশাই গেলেন। রাত জেগে ট্রেনে এসেছিলেন। সাড়ে ন'টার বাস ধরে ফিরে যাবেন। কারবারি মানুষ। কিন্তু—"

"কিন্তুটা কী?"

"ওই যে কইছিলাম, আনলাকি থারটিন।" একটু গুম হয়ে থাকার পর ফের বললেন, "আপনে কী কন?" হালদারমশাই সমস্যাগ্রস্ত, সেটা বোঝাতে মাঝে-মাঝে পূর্ববঙ্গীয় মাতৃভাষায় কথা বলে ফেলেন।

"কেস তো নিয়েছেন?"

"নিয়েছি। কথাও দিয়েছি।"

"তা হলে আর কথা কী? চলুন, আমিও সঙ্গ দেব।"

হালদারমশাইকেও একটু উত্তেজিত দেখাল। চাপা স্বরে এবং ভুরু নাচিয়ে বললেন, "কর্নেল স্যার কী বলেন, শুনে আসি চলুন! কেসটা শুনে যদি কোনও ক্লু দেন, মন্দ হবে না। ওল্ডম্যানরা এমনিতেই ওয়াইজ, তার ওপর কর্নেল স্যারের মতো ওয়াইজ ম্যান কে কোথায় দেখেছে?"

"কর্নেল তাঁর শূন্যোদ্যানে ঢুকে গেছেন। গাছ হয়ে গেছেন। নড়াচড়া চোখে পড়বে। তবে বোবা।"

হালদারমশাই খিখি করে হাসতে লাগলেন। "না, না, এই কেসে রক্ত-টক্ত আছে. বুঝলেন না? স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার হলে কথা ছিল। কর্নেলস্যার হলেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, রক্তের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে আসবেন।"

চা খাওয়ার পর হালদারমশাইয়ের টানাটানিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদের ডেরায় আবার গেলাম। শূন্যোদ্যান থেকে নেমে ব্রেকফাস্ট করে সবে চুরুট ধরিয়েছেন। আমাদের দেখে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, "বসার আগে দু'জনেই একবার ছাদে গিয়ে দেখে আসুন ষষ্ঠী কী করছে। না, না ডার্লিং, হালদাবমশাইয়েব সঙ্গে তুমিও যাও। দেখে এসো। এতদিন যে কেন আইডিযাটা আমার মাথায় আসেনি, আশ্চর্য!"

হালদার মশাই ততক্ষণে ছাদে পৌঁছে গেছেন।, আমি সোফায় বসে পড়লাম। ষষ্ঠী কী করছে দেখার মুড নেই। কর্নেল তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আপনমনে বললেন, "এতদিন ধরে অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছি। অথচ মাথায় এই সামান্য ব্যাপারটা আসেনি। এবার ব্যাটাচ্ছেলেরা দেখবে কি, তল্লাট ছড়ে পালাবে।" বলে স্বাভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য করতে থাকলেন।

অট্টহাসি থামলে বললুম, "কাক?"

"ঠিক ধরেছ. ডার্লিং!"

"ষষ্ঠী কাকতাড়ুয়া তৈরি করছে বুঝি?"

"হুঁউ। তুমি বুদ্ধিমান।"

"কাগজে কালীগঞ্জের কাকতাড়ুয়ার খবর পড়েছেন বুঝি?"

কর্নেল নড়ে বসলেন। "আমাকে সত্যিই বাহাত্তরে ধরেছে, জয়ন্ত। কাকতাড়ুয়া জিনিসটা যে এত কাজের, কতবার কত জায়গায় দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসেনি। আসলে কলকাতা বহু জরুরি জিনিস ভুলিয়ে দেয়। হরিয়ানায় আমার এক বন্ধু কর্নেল কেশরী সিংয়ের ফার্মে একটিমাত্র কাকতাড়ুয়া বহু একর জমির গম রক্ষা করেছিল—না, কাকের মুখ থেকে নয়, হরিণের মুখ

থেকে। জিনিসটাকে আমরা বাংলায় কাকতাড়ুয়া বলি বটে. কিন্তু ওটা সমস্ত প্রাণীকে ভয় পাইয়ে দেয়। মানুষকেও, ডার্লিং, মানুষকেও। বিশেষ করে রাত-বিরেতে তো বটেই।"

হাসি চেপে বললুম, "ভয় পেয়ে গুলিও চালায় অনেক মানুষ।"

"স্বাভাবিক। খুবই স্বাভাবিক।" বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ সায় দিলেন। "জ্যোৎস্নারাতে বাতাস দিলে কাকতাড়ুয়াকে জ্যান্ত মনে হয়। কাজেই চমকে উঠে গুলি চালানো অসম্ভব কিছু নয়, হাতে ফায়ার আর্মস্ যদি থাকে।"

"তারপর যদি সকালে কাকতাড়ুয়ার গায়ে ......"

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "রক্তের দাগ থাকলে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, জয়ন্ত।"

জোব গলায় বললুম, "প্রমাণ হয় না? কী বলছেন আপনি?"

"রক্তের দাগ বলে যেটা ভাবা হচ্ছে, সেটা রক্তেরই দাগ কি না যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছ, ততক্ষণ কিছু প্রমাণ হয় না।"

"কালীগঞ্জের তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়ার জামায আর বেগুনগাছের পাতায় রক্তের দাগ পাওযা গেছে।"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তারপর মিটিমিটি হাসলেন। "হালদারমশাই সম্প্রতি যে হারে কাগজে তাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, এই কেস তাঁর হাতে আসা স্বাভাবিক। যাই হোক, তুমি আবার এসেছ এবং হালদাবমশাই তোমার সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে, তুমি এতে খুব আগ্রহী।"

"নিশ্চয়। কাগজের বিপোর্টাররা আজকাল অন্তর্তদন্ত লেখে। আমিই বা সুযোগ ছাড়ি কেন?"

কর্নেল হঠাৎ কেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে ধরে চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, "হালদারমশাই সম্ভবত কাকতাড়ুয়াটির গঠনকৌশল লক্ষ্য করছেন মন দিয়ে। উনি গ্রামাঞ্চলে পুলিশের দারোগা ছিলেন। ষষ্ঠী বর্ধমানের গ্রামের লোক। সে কাকতাড়ুয়া বোঝে। আসলে হালদারমশাইয়ের ববাবর দেখে আসছি বুদ্ধিসুদ্ধি, উৎসাহ, সাহস, অভিজ্ঞতা সবকিছুই প্রচুর আছে। শুধু একটু অনুসন্ধিৎসা আব একটু পর্যবেক্ষণ, এই দুটো জিনিসের ঘাটতি আছে।" চোখ খুলে আমার চোখে চোখ বেখে বললেন হঠাৎ, "আমি বলি কি. তুমি কালীগঞ্জে যেও না।"

"কেন বলুন তো?"

"তুমি যে ছদ্মবেশ ধরতে একেবারে আনাড়ি।" গম্ভীর মুখেই কর্নেল বললেন। "আশা করি, লোহাগড়ার ঘটনাটা ভুলে যাওনি। তোমাব গোঁফ খুলে পড়ে কী কেলেঙ্কারী ঘটেছিল।"

ঝটপট বললুম, "কালীগঞ্জে ছদ্মবেশ ধবার দরকারটা কি?"

"দরকার হবে, যদি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে চাও।" বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের ওপর একটা সুইচগোঁছের কিছু টিপে দিলেন।

অমনি খড়খড়-খসখস বিবিধপ্রকার শব্দ শোনা গেল। তারপর কাকের চ্যাঁচামেচি। সেইসঙ্গে এইসব কথাবার্তা ঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ......ব্যাস্.. .. হয়েছে. ....খাসা! এবার মন্তরটা পড়ে দিই মাথায়। ওঁং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!" .

হালদারমশাইয়ের গলা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, "ছাদের বাগানে কী ঘটছে, ঘবে বসে খোঁজ খবর নেবার জন্য এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা করেছি, জয়ন্ত! মন্ত্রতন্ত্র পাঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, হালদারমশাই ছদ্মবেশ ধরেই কালীগঞ্জে যাবেন—অবশ্যই সাধুবাবা সেজে। যাবাব সময চিৎপুর হয়েই যাবেন. ওখানে যাত্রা থিয়েটারেব ড্রেস-সাপ্লায়ার প্রচুর। কাজেই ভেবে দ্যাখো, কী করবে।"

ষষ্ঠীচরণ ভক্তিমাখা মুখে ছাদ থেকে নেমে এসে ঘোষণা করল, "বাবামশাই, কাজ শাঁক।·

কর্নেল শুধু বললেন. "কফি।" ষষ্ঠী গুম হয়ে চলে গেল ভেতরে। একটা প্রশংসা আশা করেছিল বেচারা!

হালদারমশাই যথারীতি ষষ্ঠীকে মনে করিয়ে দিলেন. "দুধটা একটু বেশি কবে, ভাইটি!" তারপব এসে সোফায় বসলেন। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে নোটটা বের করে একটু হেসে বললেন, "কর্নেলস্যারবে, বুঝলেন জয়ন্তবাবু, এইজন্যেই অন্তর্যামী বলি। ওপরে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া। বড়ই আশ্চর্য! ভাবা যায় না।

কর্নেল বললেন "হালদারমশাই কি সন্ন্যেসি সেজে কালীগঞ্জে যাচ্ছেন?"

"অ্যাঁ!" হালদারমশাই অবাক হয়ে আমার দিকে ঘুবে ফিক করে হেসে বললেন, "হ। বুঝছি। জয়ন্তবাবু সব কইয়া দিছেন স্যারেরে।"

বললুম. "পুবোটা বলিনি। আপনি বলুন। দেখুন কী ক্লু পান।"

হালদারমশাই সোফার কোণায পিছলে গেলেন. কর্নেলের ইজিচেয়ারের পাশে। তারপর চাপা স্বরে মন্ত্রপাঠের মতো নোট-বই থেকে রহস্যজনক ঘটনাটির বিবরণ দিতে থাকলেন। ইতিমধ্যে ষষ্ঠী কফির ট্রে রেখে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই দ্বিগুণ উদ্যমে বাকি বৃত্তান্ত শেষ কবে বললেন, "আমি যে প্ল্যান ছকেছি, আগে বলে দিই কর্নেলস্যার!"

কর্নেল বললেন. "সাধুবাবা সেজে গঙ্গাব ধাবে মন্দিরতলায় ধুনি জ্বেলে বসবেন তো?"

জবাবে হালদারমশাই 'খিখি-খিখি' করলেন। অর্থাৎ সেটাই ইচ্ছে।

"জয়ন্তবাবুকে তা হলে চেলা সাজতে হবে।"

আপত্তি করে বললুম, "মোটেও না। আমি ফার্মে কৃষি-সংবাদদাতা হয়ে থাকব। দৈনিক সত্যসেবকে কৃষির একটা পাতা বেরোয় ফি সপ্তায়।"

"সাধু সাজার সুবিধে এ-ক্ষেত্রে আছে।" কর্নেল বললেন। "সাধু-সন্নেসিরা গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসেন। তাই এলাকার গাঁজাখোরদের চেলা হিসেবে পাওয়ার আশা আছে। বিশেষ করে রমজান আর মুকুন্দকে সবার আগে পাওয়ার কথা। হালদারমশাই তাদের মুখ থেকে কিছু তথ্য পেতেও পারেন"

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে নোট করে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এটা একটা বড় পয়েন্ট।"

"আবার নাও পেতে পারেন।"

"সে কী!" বলে হালদারমশাই নোটবইতে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেগে দিলেন।

"যদি তারাও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকে—"

"কিসের চক্রান্ত, কর্নেলস্যার?" হালদারমশাই করুণ মুখে প্রশ্নটা করলেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ভূত হোক বা মানুষ হোক, কেউ বা কারা চায় না তুলারাম দণ্ডী ফার্মে রাত্রিবাস করেন—শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে আপাতত। জয়ন্ত, যাচ্ছ, যাও। কিন্তু সাবধান!"

জেদ ধরে বললুম, "যাচ্ছি।"

"কাকতাড়ুয়াটি বিপজ্জনক, ডার্লিং! তবে আরও বিপজ্জনক জিনিস তুলাদণ্ড।"

হালদারমশাই নোটবইতে 'তুলাদণ্ড' লালকালিতে বন্দী করে আমার পক্ষ হয়ে বললেন, "বুঝাইয়া কন!"

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, "তুলারাম দণ্ডীর সঙ্গে তুলাদণ্ডের যোগ আছে। কারণ খোল-ভুষি ওজন করে বেচতে হয়। দণ্ডী পদবির কী ব্যাখ্যা উনি দেন জানি না। তবে দণ্ডী বলতে প্রাচীন যুগে রাজবাড়ির দরোয়ান বোঝাত। কালীগঞ্জে গুপ্তযুগের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে শুনেছি।"

হালদারমশাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "গুপ্তধন! গুপ্তধন!"

"সমস্যা হল," কর্নেল বলতে থাকলেন, "বরাবর দেখে আসছি, 'ণ্ড', এই যুক্তবর্ণটি সর্বত্র গণ্ডগোলের প্রতীক। হুঁ, গণ্ডগোলেও 'ণ্ড' লক্ষ্য করুন। তারপর দেখুন, দণ্ড, মুণ্ড, ভাণ্ড, পিণ্ড, চণ্ড, ষণ্ড, লণ্ডভণ্ড....। যাই হোক, এবার কাকতাড়ুয়ার কথা ভাবুন। দণ্ডের ওপর মুণ্ড দেখতে পাচ্ছেন। দণ্ডমুণ্ড সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। তা ছাড়া দণ্ডীমশাইয়ের বেগুন খেতে মুণ্ডটি আস্ত মড়ার খুলি!"

গোয়েন্দামশাই খসখস করে নোট করছিলেন। বললেন, "একটা কথা জিগানো বাকি, কর্নেলস্যার। কাটরার মাঠ। কাটরাটা কী কন তো?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "সেখানে গিয়েই জানা যাবে!"

হালদারমশাই আমাকে পাত্তা দিলেন না। বললেন, "দণ্ডীবাবু বলছিলেন, সেখানে নাকি মোগল-পাঠানে খুব কাটাকাটি হয়েছিল। তাই কাটরা। আপনি কী কন?"

কর্নেল ফের একটি অট্টহাসি হাসলেন। "হয়েছিল। তবে কাটরা কথাটা আসলে কাঠরা। মানে, রবিশস্য। কোথাও-কোথাও কাঠখন্দও বলা হয় রবিশস্যকে।" বলে আমার দিকে তাকালেন। "কাঠরা বলতে কাঠগড়াও বোঝায়, জয়ন্ত। না, না কাঠগড়ার ভয় তোমার কিসের? শুধু একটা ব্যাপরে সাবধান করে দিই। কাটরার শ্মাশানে নাকি পিশাচ আছে।"

শুনে একটু ভড়কে গেলুম নিশ্চয়। 'পিশাচ' শব্দটা লিখে হালদারমশাই নোটবই বুজিয়ে তাড়া দিলেন। "উঠে পড়া যাক জয়ন্তবাবু। বারোটা পাঁচে ট্রেন।" বলে সহাস্যে কর্নেলকে ধন্যবাদ দিলেন। "অনেক ক্লু দিয়েছেন। থ্যাংকস, থাউজ্যাণ্ড থ্যাংকস কর্নেলস্যার!"

তিন

গুরুজনের চোখে ছেলেপুলের বয়স বাড়ে না। ফলে দণ্ডীবাবুর বর্ণনা অনুসারে তৈরি হালদারমশাইয়ের নোটবুকের বৃত্তান্ত থেকে ফাণ্টুর যে মূর্তি বানিয়েছিলুম, মিলল না। বরং ওকে দেখলেই কেন যে হাসি পায়। বেঢপ গড়ন বলেই হয়তো কার্টুনচিত্র মনে হয়। গোলগাল, বেঁটে, মুখটি প্রকাণ্ড—তবে এ ক্ষেত্রে 'গু' বর্ণ বিপজ্জনক কদাচ নয়। বড় বড় দাঁতখোলা হাসি সবসময় মুখে টাঙানো। নিরীহ গোবেচারা বলাই উচিত। পবনে কালো রঙের শর্টস আর নীলচে স্পোর্টিং গেঞ্জি। পায়ে গামবুট। ধুলোকাদায় নোংরা। মাথায় আঁটোসাঁটো টুপি দিনশেষেও আঁটা দেখে দণ্ডীবাবু ধমক দিলেন, "রোদ্দুর আছে? আবার আমাকে বলা হয়, ভুলো মন। যা, ওই নোংরা মেঠো পেন্টুল ফেন্টুল খুলে আয়।"

ফাণ্টু আমাকে বোঝাচ্ছিল, কী কৃৎকৌশলে উদ্ভিদের কাছে অনেক বেশি আদায় করা যায় এবং সে সত্যিই কৃষিবিজ্ঞানীর কান কাটতে পারে। মামার কথায় জিভ কেটে বিব্রতভাবে পাম্পঘরের সামনে চৌবাচ্চাটির দিকে গেল। পনেরো একর ফার্মের চারদিকে ঝোপঝাড়, কিছু গাছের জটলা। পুবে পোড়ো শিবমন্দির আর বট, দ্রুত আবছা হয়ে আসছে। হুহু করে বাতাস দিচ্ছে। বেগুনখেতের এক কোণে, খানিকটা দুরে কাকতাড়ুয়াটি কালো হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আব দুলছে। গা ছমছম করছিল। ফার্ম-ঘরের খোলামেলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দণ্ডীবাবু তেরাত্তিরের রহস্যময় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। নতুন কোনও কথা শুনলুম না। হালদারমশাই গঙ্গার ওপারে কালীগঞ্জে দণ্ডীবাবুর বাড়িতে আছেন। নিশুতি রাত্তিরে

তাঁর অভিযান শুরু হবে। প্ল্যানমাফিক আমি কলকাতার কাগজের কৃষিবিষয়ক রিপোর্টার। রমজান আর মুকুন্দ কলকাতার কাগজে তাদের ছবি ছাপা হবে শুনে আমাকে খাতিরের চূড়ান্ত করছিল। শেষে মুকুন্দ গঙ্গা পেরিয়ে আমার সরেসরকম সৎকারেরের জন্য মাছ-মাংস-রসগোল্লা-দই আনতে গেল বাজার থেকে। রমজান চায়ের সঙ্গে দাগড়া-দাগড়া বেগুনভাজা আর 'পটাটো-চিপস' আনল। গর্বে হেসে বলল, "সবই আমাদের এই মাটির উৎপন্ন স্যার। এই বেগুন বলুন. বেগুন। আলু বলুন, আলু!"

দণ্ডীবাবু কৌতুকে বললেন, "বল্ না চায়ের পাতাও ফলিয়েছিস। কাগজে তাও ছাপা হবে।

কর্তাবাবুর কথায় রমজান দমল না। বলল, "সেও আমাদের ভাগনেবাবুর পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়, বাবুমশাই। দেখবেন, কবে চায়ের বাগান করে বসে আছে। লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি—সবই ফলাতে পেরেছে, চা এমন কী জিনিস?"

দণ্ডীবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন. "আলো জ্বেলে দে। খালি বড় বড় কথা আর রাতটি এলেই ঘুমিয়ে পড়া!"

রমজান সুইচ টিপে দরজার ওপরে কার্নিশের নীচের বালবটি জ্বেলে দিল। আমার উদ্দেশে বলল, "কিছু দরকার হলেই ডাকবেন, স্যার! আমি ধাঁ করে একচক্কর মাঠ ঘুরে আসি। গম পেকেছে। সন্ধ্যার দিকেই গম চোরেদের উৎপাত হয়।"

সে চলে গেলে দণ্ডীবাবু বললেন, "আমার এই লোক দুটো, রমজান আর মুকুন্দ, খুব বিশ্বাসী। অনেস্ট। শুধু একটাই দোষ। রাত দশটার পর গাঁজার নেশায় মড়া হয়ে পড়ে থাকে।"

ফাণ্টু চায়ের গেলাস হাতে এল। টুপিটি নেই এই যা। পরনে সেইরকম পোষাক—শর্টস আর গেঞ্জি। মুখে কার্টুন হাসি টাঙানো। একটা চেয়ার টেনে একটু তফাতে বসে বলল, "চান করার সবয় একটা কথা মাথায় এল মামা। বলি কাগজের দাদাকে?"

দণ্ডীবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ভাগনের দিকে।

ফাণ্টু বলল, "গতরাত্তিরে কাকতাড়ুয়া দুষ্টুমি করেনি। মামা ছিলেন না, তাই। আজ রাত্তিরে মামা আছেন। দেখবেন, ঠিক গণ্ডগোল বাধাবে। যত রাগ যেন মামার ওপর।"

দণ্ডীবাবু উরুতে ঠেস দিয়ে রাখা দোনলা বন্দুকটা তুলে নিয়ে বললেন, "খুলি উড়িয়ে দেব। আমার ওপর রাগ! আমি কোন ব্যাটাছেলের পাকা ধানে মই দিয়েছি? বুঝলেন জয়ন্তবাবু? এ স্রেফ কারুর জেলাসি। কেউ বা কারা চায় না আমার ফার্মে তিন কিলো বেগুন ফলুক। একজিবিশনে মেডেল পাক্।"

ফান্টু বলল, "না মামা, তোমাকে বার বার বলেছি, তুমি কানেই নিচ্ছ না-"

তাকে থামিয়ে দিয়ে দণ্ডীবাবু বললেন, "থাম তো! খালি এক কথা।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কথাটা কী?"

দণ্ডীবাবু ফ্যাঁচ করে বড়ই বেমানান হাসিটি হাসলেন। আসলে তাঁর রুক্ষ কেঠো চেহারার জন্য সবসময় মুখে তিতকুটে জিনিস গেলার ভাব। হাসলে মনে হয়, খ্যাঁক করে কামড়ে দিলেন। বললেন, "ভূত! যে সে ভূত নয়, গঙ্গার মড়াখেকো পিশাচ! ছেলেটা কাটরার মাঠে থাকতে থাকতে কী একটা হয়ে গেছে যেন। সবসময় উদ্ভুট্টে কথাবার্তা। বলে কী জানেন? গাছপালা, পাখপাখালি, পোকামাকড় সবকিছুর কথা বুঝতে পারে।"

'পারি তো!" ফান্টু বলল, "সাধুবাবা আমাকে বলে গেছেন, যার প্রাণ আছে, সেই কথা বলে। চেষ্টা করলেই বোঝা যায়, কী বলছে।"

বললুম, "কিন্তু তুমি ভূত-প্রেত-পিশাচ এসব বিশ্বাস করো কি?"

ফান্টু বলল, "করি। দেখেছি যে।"

"কী দেখেছ বলো।"

দণ্ডীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "খুব হয়েছে, আর নয়। সাধুবাবা না, ওই রমজান আর মুকুন্দ ওর মাথাটি খেয়েছে। জয়ন্তবাবু, দোহাই আপনাকে। ফিরে গিয়ে যেন এইসব উদ্ভুট্টে কথাবার্তা কাগজে ছাপবেন না। একে তো আপনাদের কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা গঙ্গুবাবু জ্যান্ত কাকতাড়ুয়ার ভৌতিক খবর ছাপিয়ে হুলুস্থুলু বাধিয়েছেন। আড়তে অসংখ্য জায়গার লোক এসে আমাকে জেরায়-জেরায় জেরবার করে দিচ্ছে। এবার আপনিও যদি ভূত-প্রেত পিশাচের খবর ছাপেন, তিষ্ঠোনো যাবে না। আমাকে আড়তের কারবার ছেড়ে, এই ফার্ম ছেড়ে হিমালয়ে পালাতে হবে।"

ফান্টু বড় আকারে নিঃশব্দে হেসে বলল, "হিমালয়ে গেলে সাধুবাবার দেখা পেয়ে যাবে, মামা।"

"যাচ্ছি!" দণ্ডীবাবু ভেংচিকাটা মুখ করে বললেন। "বলিস তোর পিশাচ ব্যাটাচ্ছেলেকে, দণ্ডীবাবু লড়ে যাচ্ছে, লড়বে। কাকতাড়ুয়া নই, দুঠেঙে মানুষ। হাতে বন্দুক। খুলি উড়িয়ে দেব।"

এ-সব কথার নিশ্চয় একটা মানে আছে, আমার বুঝে নেওয়া দরকার। তাই বললুম, "দণ্ডীমশাই, পিশাচটি আপনার মতে মানুষ?"

আমার কথা শেষ করার আগেই দণ্ডীবাবু বললেন, "আলবাত মানুষ। নইলে রক্তের ছাপ কেন? বেগুনখেতের পেছনকার কাঁটাতারের বেড়ায় খোঁদল ছিল কেন? বুঝলেন না? প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বেগুনগাছ। ঝাঁকড়া ইয়াব্বড় পাতা। ব্যাটাচ্ছেলে করে

কি, বেড়ার খোদল দিয়ে গুঁড়ি মেরে বেগুনখেতে ঢোকে। ঢুকে কাকতাড়ুয়ার নীচেটা ওপড়ায়। গুঁড়ি মেরে সেটাকে নাচাতে নাচাতে খেতময় ঘোরে আর ভুতুড়ে সুর ভাঁজে। ঔই দেখেই ভয় পেয়ে আমি ফার্মহাউসে রাত্রিবাস ছেড়ে দেব। দিচ্ছি। যাও-বা কোনও-কোনও রাতে বাড়িতে থাকতুম, আর থাকছি না। দেখি তোমার দৌড়।"

বললুম, "ব্যাপারটা পরিষ্কার হল এতক্ষণে। কিন্তু কে সে?"

দণ্ডীবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "সেটাই তো বোঝা গেল না।" তারপর চাপাস্বরে ফের বললেন, "সেইজন্যই ডিটেকটিভ এজেন্সিতে যাওয়া। বুঝলেন না?"

"হুঁ, এও স্পষ্ট, কেউ বা কারা আপনার রাত্তিরে ফার্মহাউসে থাকা পছন্দ করছে না।"

"করছে না।"

"কিন্তু কেন?"

দণ্ডীবাবু এবার আমার ওপর চটলেন। "আহা, সেজন্যই তো ডিটেকটিভ ভাড়া করা। আপনারা কাগজের লোকেরা খালি প্রশ্ন করতেই জানেন। তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন না।" বলে ফের আগের মতোই বেমানান একটি ফ্যাঁচ করলেন, অর্থাৎ হাসলেন। "সরি, আপনি আমার গেস্ট। কিছু মনে করবেন না। ব্যাপারটা যত ভাবছি, তত প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। আমি মশাই টি আর. দণ্ডী, এ তল্লাটের বাঘ বলে আমাকে। ওই বিটকেল কাকতাড়ুয়ার নাচ দেখিয়ে ভড়কানোর চেষ্টা? বড্ড অপমানজনক ব্যাপার নয়? বলুন আপনি।"

সায় দিয়ে বললুম, "সত্যি অপমানজনক। তবে আপনি বলছিলেন জেলাসি।"

দুঃখিত মুখে অর্থাৎ আরও তেতো গেলার ভঙ্গিতে দণ্ডীবাবু বললেন, "আপাতদৃষ্টে জেলাসিই মনে হচ্ছে। এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না! দেখি, ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করতে পারেন কি না।"

ফাণ্টু আমাদের দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কথা শুনছিল। এতক্ষণে বলল, "রিপোর্টারদা ক'টা বাজছে দেখুন তো?

ঘড়ি দেখে বললুম, "ছটা তেতাল্লিশ!"

"আর সতেরো মিনিট পরে প্রিন্স অ্যালবার্ট ফুটতে শুরু করবে। যাই, কাছে গিয়ে বসে থাকি।"

ফাণ্টু উঠে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলুম, "কী ফুল ফাণ্টু?"

ফাণ্টু বলল, "গোলাপ। দেখবেন তো আসুন না।"

দণ্ডীমশাই বললেন, "দিনে দেখবেন জয়ন্তবাবু। ফাণ্টু, বসে থাকতে হয় তো তুই থাকবি। খালি বাতিক।"

ফান্টু বলল, "রিপোর্টারদা, সকালে কিন্তু ফোটো তুলতে হবে। পুরো ফুটতে ভোর হয়ে যাবে। দেখবেন কত্ত বড় গোলাপ।"

সে চলে গেলে কর্নেলের কথা মনে পড়ল। হায় বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ! না এসে কী হারালেন, জানেন না। এই ফান্টুচন্দ্রের মধ্যে যেন কর্নেলের আদল। ছাদের বাগানে কোনও অর্কিডের ফুল ফোটার পথ চেয়ে উনিও এমনি করে পাশে বসে রাত কাটান।

একটু পরে পূর্বদিকে গঙ্গার ওপারে বিশাল লালরঙের জিনিসটি যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। রঙ বদলে চাঁদটা ছোট হলে মুকুন্দ গান গাইতে গাইতে দু'হাতে ব্যাগ নিয়ে ফিরল। রমজান তার সঙ্গে। দণ্ডীবাবু বললেন, "নন্দীভৃঙ্গী! বুঝলেন জয়ন্তবাবু? একজন গেল বাজারে, একজন জমি দেখতে। ফিরল জোড় বেঁধে। যত্ত সব!"

ওঁর চটে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলুম না। মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, "স্যার, শিবমন্দিরে আবার এক সাধু এসে ধুনি জ্বেলেছেন দেখে এলুম। মাথায় পেল্লায় জটা।"

দণ্ডীবাবু বললেন, "তা হলে তো এ-রাতে শিবমন্দিরে তোদের মড়া গড়াবে।"

দুজনেই জিভ কাটল। মুকুন্দ বলল, "বাবা ধ্যানে বসেছেন। দেখে মনে হল ধ্যান ভাঙতে ভোর হয়ে যাবে। তা ছাড়া স্যার, ঘরে গেস্ট। রাঁধাবাড়া ফেলে সাধুসঙ্গ করা কি উচিত?" সে হন্তদন্ত হয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল।

রমজান পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে দণ্ডীবাবুর হাতে দিল। বলল, "গেটের কাছে পড়ে ছিল। মুকুন্দ বলল, ফেলে দে। ফেলে দিলে চলে? যদি বেনামি চিঠি হয়? যা ভুতুড়ে কাণ্ড চলেছে রাতবিরেতে।"

দণ্ডীমশাই ব্যস্তভাবে পড়ে বললেন, "ধুস্, পদ্য লিখেছে কেউ। ফান্টুও হতে পারে, কিচ্ছু বলা যায় না। নেচারের মধ্যে থাকলে মনে কত ভাব জাগে মানুষের।"

ওঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দেখি, লাল আঁকাবাঁকা হরফে লেখা আছে ঃ

নিঝুম রাতে গাছগাছালির মাথার ওপর
উঠলে চাঁদ,
বেগুনখেতে পাততে যাব শেয়াল ধরার
ফিচেল ফাঁদ।

বললুম, "দণ্ডীবাবু পদ্যটা হয়তো নিছক পদ্য নয়। কেউ যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। শেয়াল-ধরা ফাঁদ পাততে আসবে বেগুনখেতে এবং 'ফিচেল' কথাটাও সন্দেহজনক।"

ঠিক এইসময় কোথায় বিকট শব্দে সত্যিই শেয়াল ডেকে উঠল। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। দণ্ডীমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, "কাটরার মাঠে এখনও শেয়াল আছে তা হলে?"

রমজান বলল, "কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে দু'একটা আছে। কখনও-সখনও ডাকে শুনেছি।"

বারকতক হোয়া-হোয়া করে ডেকে শেয়ালটা চুপ করে গেল। কেমন একটা ভয়-জাগানো অনুভূতি আর গা-ছমছম-করা ভাব পেয়ে বসল আমাকে। আবছা জ্যোৎস্নায় নিঝুম পরিবেশের ভেতর ফাণ্টুর দেখা পিশাচটার সবে ঘুম ভাঙল বুঝি! একটা প্যাঁচা ক্র্যাও-ক্র্যাও করে ডাকতে ডাকতে শিবমন্দিরের দিকে চলে গেল।

মুকুন্দের ডাকে রমজান চলে গেল। দণ্ডীমশাই আস্তে বললেন, "চ্যালেঞ্জ না কী বলছিলেন যেন?"

"হ্যাঁ। পদ্যটা কেমন যেন রহস্যজনক।"

দণ্ডীমশাই কাগজটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে পড়লেন। তারপর বাঁকা মুখে বললেন, "খুলি উড়িয়ে দেব। ফিচলেমি করে দেখুক না। ঢের ফাঁদ আমার দেখা আছে।"

বলে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধে বন্দুক, একহাতে লম্বা টর্চ। বেগুনখেতের দিকে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেলেন। সাহসী মানুষ, সন্দেহ নেই। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই গেলেন নিশ্চয়।

একটু পরে কাকতাড়ুয়াটির ওপর তাঁর টর্চের আলো পড়তেআঁতকে উঠলুম। পাঞ্জাবি পরে কাকতাড়ুয়ার খুলি-মুণ্ডটি দাঁত বের করে আঁধারচোখে তাকিয়ে যেন হিহি হাসছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলুম সঙ্গে-সঙ্গে।

ফাণ্টু এসে গেল। "রিপোর্টারদা, প্রিন্স অ্যালবার্ট মুখ খুলেছে। মামা কোথায়?"

বললুম, "তোমার মামা বেগুনখেতে ঢুকেছেন।"

ফাণ্টু জোরালো হেসে বলল, "এই রে, কাঁটায় আটকে ফাঁদে পড়ার অবস্থা হবে সেদিনকার মতো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেগুনখেতে ঢুকলে কী হয়, এখনও শিক্ষা হয়নি মামার।"

"আচ্ছা, ফাণ্টু, তুমি পদ্য লেখো কি?"

ফাণ্টু কান পর্যন্ত হাসি টেনে একটু পরে বলল, "লিখতে ইচ্ছে করে রিপোর্টারদা। পারি না। বেগুনের সঙ্গে বিল দিতে গেলে সেগুন আনতে হয়। বেগুন আর সেগুনে কত তফাত বলুন!"

"আহা, তুমি পদ্য লিখেছ কি না জানতে চাইছি।"

"নাঃ, পোষায় না। ততক্ষণ সয়েল টেস্ট করতে মাথা ঘামানো ভাল।" ফাণ্টু

ঠিক কর্নেলের মতোই চুল থেকে একটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিল। দিয়ে বলল, "তবে এই এরিয়ায় পদ্য লিখতে একজনই পারেন।"

"কে তিনি?"

"ভাণ্ডারী-মাস্টারমশাই!" ফাণ্টু প্রশংসা করে বলল। "আমাদের স্কুলে বাংলা পড়াতেন। রিটায়ার করেছেন গতবছর। বিকেলে গঙ্গার ধারে একলা ঘুরে বেড়ান। মাথায় লম্বা চুল, চিবুকে তেমনি লম্বা একগোছা ছুঁচলো দাড়ি। ওঁকে দেখে আপনি হেসে সারা হবেন। কিন্তু গুণী মানুষ।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ফাণ্টু চাপা স্বরে ফের বলল, "মামা জানতে পারলে বকবেন। কিন্তু লুকিয়ে ফার্মের এটা-সেটা দিয়ে আসি। খুব গরিব হয়ে গেছেন ভাণ্ডারী-মাস্টারমশাই। সেদিন একটা বেগুন পেয়ে দেখুন না, একখানা পদ্য দিয়েছেন। দারুণ পদ্য।"

ফাণ্টু ঘরে ঢুকে পদ্যটা নিয়ে এল। 'ভাণ্ডারী'-তে 'ণ্ড' আছে। শুনেই অস্বস্তি লেগেছিল। এবার হাতের লেখা দেখে অস্বস্তিটা বেড়ে গেল এবং রহস্যটাও জটিল হয়ে পড়ল।

একই ছাঁদের হরফ। তবে নীলচে কালিতে লেখা

কেল্লাবাড়ির দারোয়ানের বংশ
তাই পদবী দণ্ডী
তারই এক মাসতুতো ভাই চণ্ডী
চোর-জোচ্চোর দেশটা করছে ধ্বংস
হস্তে তৌল দণ্ড
পাষাণ্ড আর ভণ্ড
বেচছে ভেজাল ভুসি ও খোল সর্ষে
ষণ্ডদুটি আছে বড়ই হর্ষে
অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা বাপ
বস্তার ভেতর রাস্তা টুঁড়ছে সাপ!

পদ্যটা পড়ে বললুম, "এর মানে কী বলো তো? 'বস্তার ভেতর রাস্তা টুঁড়ছে সাপ।' একথা কেন লিখেছেন ভাণ্ডারীমশাই?"

ফাণ্টু বলল, "পদ্যের আবার মানে থাকে নাকি? পদ্য পদ্য। কই, দিন। লুকিয়ে রেখে আসি। মামা দেখলেই হয়েছে।"

"এটা আমার কাছে থাক, ফাণ্টু।"

"রাখবেন, রাখুন। কিন্তু সাবধান রিপোর্টারদা, মামার চোখে যেন না পড়ে।"

"না না। তুমি ভেবো না।" বলে পদ্যটা ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করে দিলুম। শিগগির হালদারমশাইকে দেখানো দরকার। মুকুন্দের কথায় টের পেয়েছি, শিবমন্দিরের সাধুটি কে।

এইসময় বেগুনখেতের দিক থেকে দণ্ডীবাবুর ডাক শোনা গেল, "ফাণ্টু, ফাণ্টা।"

ফাণ্টু বলল, "এই রে! যা ভেবেছিলুম। মামা আটকে গেছেন কাঁটায়!" সে ঘরে ঢুকে একটা কাটারি বের করে নিয়ে দৌড়ে গেল।

অবস্থাটা দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। বেগুনখেতের অনেকটা ভেতরে আবছা জ্যোৎস্নায় একটা কালো মূর্তির বুক থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খুম নড়াচড়া করছেন দণ্ডীমশাই। ফাণ্টু বুকসমান উঁচু বেগুনগাছের জঙ্গলে দিব্যি ঢুকে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, "টর্চ কী হল মামা?"

দণ্ডীবাবু চিঁ চিঁ করে করুণ স্বরে বললেন, "কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে কোথায় পড়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছিনে!"

"বন্দুকটা পড়ে যায়নি তো?"

"না না। খালি কথা বাড়ায়। অ্যাই যাঃ, গেল, নতুন জামাকাপড় ফর্দাফাঁই হয়ে গেল। কী........কী সাঙঘাতিক বেগুনগাছ রে বাবা! যেন জ্যান্ত! নড়লেই খিমচি—উঃ! ইঃ!"

আমার কাছে টর্চ আছে। কিন্তু দণ্ডীবাবুর দুর্দশা উপভোগ করার চেয়ে এই সুযোগে ঝটপট ভাণ্ডারীমশাইয়ের পদ্যটা শিবমন্দিরে সাধুবেশী গোয়েন্দার কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি মনে হল। ফার্মের মাঝ-বরাবর কেচিলতে রাস্তা। দু'ধারে সুন্দর কেয়ারি-করা বেড়াগাছ। গেট খুলে গঙ্গার ধারে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শিবমন্দিরের দিকে চললুম। কানে ভেসে এল, "ওঁং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!" তারপর ধুনির আলোও চোখে পড়ল।

তারপরেই আচমকা উলটে পড়ে গেলুম।

হোঁচট খেয়ে পড়িনি। কে বা কারা পেছনে ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর।

টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পেলুম না। আমার মুখে টেপ সেঁটে দিল। তারপর আমার হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধতে বাঁধতে কেউ ফিসফিসিয়ে বললে, "চুপচাপ না থাকলে শ্বাসনলি কাটা যাবে।" কাজেই চুপচাপ থাকতেই হল। শ্বাসনলি কাটা মড়া হয়ে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না।

চার

কিন্তু তারপর সত্যিই আমাকে মড়া হতে হল, শ্বাসনলি কাটা না হলেও। অর্থাৎ জ্যান্ত মড়া। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখলুম, একটা খাটিয়া এল। চারটে ছায়ামূর্তি সেই খাটিয়ায় আমাকে তুলে চিতপাত শুইয়ে দিল। তারপর খাটিয়া কাঁধে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "বলো হরি! হরি বো-ও-ল!"

মন্দিরচত্বরে ধুনির আলোয় জটাজুটধারী হালদারমশাইকে স্পষ্ট দেখলুম, উঁচুতে থাকার দরুণ। চোখ বুজে ধ্যানস্থ। মাত্র হাত-দশেক পাশ দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে শ্মশানযাত্রার পথে মনে-মনে ওঁর মুণ্ডুপাত করছিলুম। তাকিয়ে তো দেখবেন কী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! বিকট স্বরে হরিধ্বনি কানে যাচ্ছে, একবার অন্তত মুখ তুলে চোখ খোলা উচিত ছিল না কি?

বটতলার পর ফাঁকা মাঠ। এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়, কিছুগাছ। এতক্ষণে প্রচণ্ড ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। আর, মড়ার খাটিয়ায় তোলার সময় যদিও তাই ভেবেছিলুম। এরা নির্ঘাত আমাকে চিতায় শুইয়ে আগুন জ্বেলে দেবে. তাই যত হরিধ্বনি দিচ্ছে, তত চমকে-চমকে উঠছি। হৃৎপিণ্ড তুমুল লাফালাফি করছে।

অন্তত আধ-কিলোমিটার পরে খাটিয়া মাটিতে নামল। চাঁদটা গঙ্গার ওপর থেকে ফাণ্টুর মতো কার্টুন-হাসি হাসছে আমার দশা দেখে। এবার ছায়ামূর্তি-চতুষ্টয় আমাকে খাটিয়ার সঙ্গে সেঁটে আগাগোড়া বাঁধল। একজন শি-শি শব্দে হেসে ভুতুড়ে গলায় বলল, "জলে ফেলে দেরে, তলিয়ে যাক।"

অন্যজন বলল, "পাঁজাটাক কাঠ থাকলে চিতেয় দিতুম!

আরেকজন বলল, "অ্যাই, আর এখানে নয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ভুতুড়ে গলাটি সেইরকম শি-শি করে হেসে বলল, "পিশাচবাবা এসে কড়মড়িয়ে খাবে বরং। চল্, এবার সাধুবাবার একটা ব্যবস্থা করি।"

একজন হঠাৎ নড়ে উঠল। "অ্যাই! পিশেচবাবা আসছে!"

চারজন বিকট স্বরে "বলো হরি! হরি বো-ও-ল" বলতে বলতে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। জায়গাটা যে শ্মশান, পোড়া কাঠের গন্ধে অনুমান করতে পারছিলুম। খাটিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধায় এখন আমার নড়াচড়ার সাধ্যি নেই। অতিকষ্টে চোখের তারা কোণস্থ করে জ্যোৎস্না ঝিলমিল জল এবং একটা উঁচু ন্যাড়া গাছ দেখতে পাচ্ছিলুম। শিমুলগাছই হবে। সেখান থেকে অলুক্ষুণে প্যাঁচর ডাক শোনা গেল। তারপর দূরে ডেকে উঠল একটা শেয়াল—সেই শেয়ালটাও হতে পারে। শেয়ালের ডাক থামলে শুকনো পাতায় খড়খড়, মসমস শব্দ শোনা গেল। পিশেচবাবা বলতে নিশ্চয় পিশাচ যাকে ফাণ্টু দেখেছে এবং সেই পিশাচ নরমাংসভোজী হওয়াই সম্ভব?

এখন কথা হল, সে আসছে দুষ্ট-চতুষ্টয় তাকে আসতে দেখে পালিয়ে গেল। মড়মড়, খসখস শব্দ ক্রমাগত শুনছি। যে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে, তাও বুঝতে পারছি। পিশাচ বলে যদি কিছু সত্যিই থাকে, তার জ্যান্ত মাংসে অরুচি হলে তবেই আমার বাঁচার চান্স অন্তত নব্বই শতাংশ। নইলে তো গেছিই!

ভেবে ঠিক করলুম, গোঁ-গোঁ আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দেব, আমি মড়া নই, জ্যান্ত। খড়খড়, খসখস শব্দটা আমার বাঁদিকে ঝোপের ওধারে এসে থেমে গেল। চোখ কোণস্থ করে ঝোপের ওধারে লম্বাচওড়া পিশাচবাবার ছায়ামূর্তিও দেখতে পেলুম।

অমনি নাকে যথাসাধ্য দম টেনে দিয়ে সেই দম টেপআঁটা মুখ দিয়ে জোরে ওঁ কিংবা গোঁ ধ্বনিসহযোগে ঠেলে দিলুম। ফুটুৎ করে একটা শব্দ হল এবং টেপটির একদিক উপড়ে গেল।

টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "পিশাচবাবা, আমি মড়া নই, জ্যান্ত মানুষ।"

অমনি বিদঘুটে গলায় পিশাচবাবা বলল, "হাঁউ মাঁউ খাঁও! মানুষের গন্ধ পাঁও!" তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে খাটিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল এবং হা-হা-হা-হা করে অট্টহাসি হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, অট্টহাসিটা চেনা ঠেকছে। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পিশাচবাবার মুখে সাদা দাড়ি। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পরনে জ্যাকেট ও পাতলুন। গলা থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা ও বাইনোকুলার। মাথায় টুপি। পিঠে কিটব্যাগ আঁটা। হাতে একটি ছড়িও দেখতে পাচ্ছি। হুঁ, 'হ্যালুসিনেশন' বলে একরকম অসুখ আছে? সেই অসুখে ধরলে মানুষ ভুলভাল দেখে শুনেছি।

অথবা মৃত্যুকালীন সুখস্বপ্ন। অবশ্য, যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পিশাচ কতরকম রূপ ধরতেও পটু। এই শ্মশানের মানুষখেকো পিশাচবাবা আমাকে কামড়ে খাওয়ার সময় যাতে বেশি চ্যাঁচামেচি, কান্নাকাটি না করি, সেজন্যই আমার সুপরিচিত রূপটি ধরেই দেখা দিয়েছে এবং কোন্ জায়গা থেকে খেতে শুরু করবে, তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। মরিয়া হয়ে চোখ বুজে ফেললুম।

তারপর টের পেলুম, দড়িগুলো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে! পায়ের দড়ি খুলে গেল এবং ছদ্মরূপধারী পিশাচবাবা আমাকে ঠেলে অন্যপাশে কাত করে হাতের দড়িও খুলে দিল। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তড়াক করে উঠেই পালানোর চেষ্টা করলুম।

কিন্তু পারলুম না। আমার কাঁধে থাবা পড়ল এবং আবার সেই হা-হা-হা-হা অট্টহাসি। "জল, ডার্লিং! এ-মুহূর্তে খানিক জল দরকার। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলে ঘিলু চাঙ্গা হবে। ওঠো, উঠে পড়ো।"

কয়েক হাত নীচেই গঙ্গা। বেগড়বাঁই না করে হুকুম তামিল করলুম। তারপর সত্যিই ঘিলু চাঙ্গা হল এবং রুমাল বের করে মুখ মুছতে বললুম, "তা হলে স্বপ্ন নয়?"

"নয়, সেটা এখনও বুঝতে না পারলে আরও খানিকটা জলের ঝাপটা দাও।"

"দরকার হবে না। কিন্তু আমাকে উদ্ধারের জন্যে আপনি কি মন্ত্রবলে উড়ে এলেন কলকাতা থেকে?"

"মন্ত্রবলে নয়, ডার্লিং। চার চাকার মোটরগাড়িতে—এক্সপ্রেস বাসে।"

"কিন্তু রাতবিরেতে এই শ্মশানে ছুটে আসার কারণ কী?"

"পিশাচবাবার হুকুমে। তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে।"

প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, দূরে বিকট চ্যাঁচানি শোনা গেল, "বলো হরি! হরিবো-ও-ল!" কর্নেল আমাকে টানতে টানতে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। কাঁধ ধরে ঠেলে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলুম "ওরা নির্ঘাত হালদারমশাইকে আমার মতো বেঁধে আনছে। উনি শিবমন্দিরে সাধু সেজে—"

"চুপ! স্পিকটি নট।"

চুপ করে থাকলুম। হরিধ্বনি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সাবধানে উঁকি মেরে দেখলুম, একটু দূরে চার ছায়ামূর্তি কী একটা বয়ে আনছে। তবে খাটিয়ায় নয়। কাছাকাছি আসামাত্র কর্নেল বিদঘুটে গলায় একখানা হুঙ্কার ছাড়লেন, কতকটা বাঘের গজরানির মতো।

শোনামাত্র ওরা থমকে দাঁড়াল। তারপর কাঁধের লম্বাটে জিনিসটা ফেলে দিয়ে পিটটান দিল। কর্নেল দৌড়ে গেলেন। আমিও।

হাঁ, জটাজুটধারী হালদারমশাই-ই বটে। মুখে টেপ সাঁটা, আমারই মতো। আগাগোড়া দড়ি জড়ানো গায়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, জটা ও দাড়ি খুলে যায়নি এবং কাঁধ থেকে ফেলে দেওয়ায় চোটও খাননি। কর্নেল বাঁধন খুলে দিতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দুই ঠ্যাঙে সিধে দাঁড়ালেন এবং জটা-দাড়ি নিজেই খুললেন। দেখলুম, টেপটি নকল গোঁফদাড়ির সঙ্গে সেঁটে থাকায় ওঁর সুবিধে হয়েছে বেশি। সহজেই খুলে গেল।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, আলখাল্লাধারী হালদারমশাই অবাক হলেন না কর্নেলকে দেখে। মুখ দিয়ে যে ধ্বনি বেরোল, তা হল, "খি-খি-খি-খি........!"

কর্নেল বললেন, "আছাড় খেয়ে ব্যথা লাগে নি তো হালদারমশাই?".

"হঃ, কী যে কন! সয়েল না, স্যাণ্ড। বালু বালু!" বলে খালি পায়ে বুড়ো আঙুলে নরম মাটির অবস্থাটা বুঝিয়েও দিলেন।

কর্নেল বললেন, "মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিন বরং—"

"ক্যান?"

"আপনার ওপর এমন কেটা সাঙ্ঘাতিক ধকল গেল। মনে হচ্ছে, এখন ও আপনি ধাতস্থ হতে পারেননি।"

"অ্যাঁ!" হালদারমশাই এতক্ষণে চমকালেন। কর্নেল এবং আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে লম্বা পায়ে জলের ধারে গেলেন।

একটু পরে আলখাল্লায় মুখ মুছতে-মুছতে ফিরে এসে বললেন, "কী......কী আশ্চর্য ঘটনা। কর্নেলস্যার, আপনি? এতক্ষণ তাই চেনা-চেনা ঠেকছিল। আপনি কখন লেন? আর এই শ্মশান-মশান জায়গায় কী.........কী অবাক!"

কর্নেল বললেন, "সব কথা পরে হবে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় হালদারমশাই! যে-কোনও সময়ে পিশাচবাবার আবির্ভাব ঘটতে পারে। চলুন, কেটে পড়া যাক।"

হালদারমশাই বললেন, "পিশাচবাবা! সে আবার কে?"

"ভুলে গেছেন দেখছি। নোটবইতে টুকেছিলেন না?"

হালদারমশাই চুপ করে গেলেন।

জ্যোৎস্না খানিকটা ঝলমলে হয়েছে। কোথাও গমখেত, কোথাও ধবধবে ন্যাড়া চষামাটি, কোথাও ঝোপঝাড় আর গাছের জটলা। মাঠের মধ্যে দূরে বা কাছে বিদ্যুতের আলো জুগজুগ করছিল। বাঁ দিকে পশ্চিমে সোজা এগিয়ে সামনে কালো চাপ-চাপ উঁচু-নীচু পাঁচিলের মতো জিনিসটা দেখিয়ে কর্নেল বললেন, "কেল্লাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।"

জিজ্ঞেস করলুম, "ওখানে গিয়ে কী হবে? বরং দণ্ডীবাবুর ফার্মে যাই চলুন।"

কর্নেল আস্তে বললেন, "এসো তো।" তারপর পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে নাড়তে থাকলেন।

কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের দিকে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা এদিক-ওদিক নড়াচড়া করে নিভে গেল। কর্নেলও টর্চ নেভালেন। আলখাল্লাধারী হালদারমশাই বললেন, "এক মিনিট! এক মিনিট। জটা-দাড়ি না পরলে এ পোশাকে বড্ড বিচ্ছিরি দেখাবে। জয়ন্তবাবু, একটু হেল্প করুন। বিটকেল টেপটা ছাড়ানো যাচ্ছে না।"

টেপটা ছাড়িয়ে দিলুম। কিন্তু গোঁফ আটকে থাকল তাতে। হালদারমশাই সেটা ফেলে দিয়ে কষে জটা-দাড়ি আঁটলেন। তারপর বললেন, "চলুন, আই অ্যাম রেডি অ্যাণ্ড স্টেডি।"

পায়ের কাছে আলো ফেলে কর্নেল আগে হাঁটছিলেন। একটু পরে শুকনো

খাল অর্থাৎ গড়খাইয়ের সামনে পৌঁছুলুম। সাবধানে নেমে গেলুম। নরম দূর্বাঘাসে গড়খাইটা ভরে আছে। ওপারের ঢালে একফালি পায়ে-চলা রাস্তা। উঠতে অসুবিধে হল না। রাস্তার ওপর ঝোপঝাড় ঝুঁকে রয়েছে। সামনে আবার সেই রহস্যময় টর্চের আলো জ্বলে উঠল। কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন, "সঙ্গে গেস্ট আছে নন্দবাবু। আগে চা দরকার। হবে তো?"

অবাক কাণ্ড। জবাব পদ্যে এল ঃ
খাবেন নেহাত চা
সে আর এমন কথা কী
কুকারে কেটলিটাও
চাপিয়ে রেখেছি
গেস্ট পেলে তো ধন্যই
প্রস্তুত সেজন্য।

কর্নেল থামিয়ে না দিলে পদ্যটা চলত। তবে মজাটা হল, কর্নেলও পদ্যেই থামালেন ঃ

যথেষ্ট যথেষ্ট
খামোকা কেন কষ্ট।

একটা লণ্ঠন জ্বালানো হচ্ছিল। জবাব এল ফের পদ্যেই এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপা খিকখিক হাসি ঃ

পদ্য বলা কষ্ট নয় বদভ্যাস
ব্রেনে যদি বসত করেন বেদব্যাস।

হ্যাঁ আমার অনুমান সঠিক। ফাণ্টুর কাছে শোনা সেই ভাণ্ডারী মাস্টারমশাই। কিন্তু দেখলে হাসি পাবে বলেছিল, পেল না। একটু রোগা, টিঙটিঙে, একটু কুঁজো, প্রচণ্ড লম্বা নাক। চিবুক থেকে অন্তত আট ইঞ্চি লম্বা গোঁফের মতো দাড়ি ঝুলছে, আর মাথায় লম্বা সন্নেসিচুল। মুখে অমায়িক হাসি। পরনের পাঞ্জাবি এত লম্বা যে, ধুতি ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

গাছ ও ঝোপের ভেতর কোনও রকমে টিকে থাকা, দরজা জানালার কপাট লোপাট হওয়া, হাঁ-হাঁ করা একটা ঘর। ছোট্ট' গেরস্থালি পাতা।

ফাণ্টু বলেনি এখানেই কবি ভাণ্ডারীমশাইয়ের ডেরা। হয়তো সে জানে না এই ডেরার খবর। ভাণ্ডারীমশাই সাধুবেশী হালদারমশাইকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন,

হচ্ছে সন্দেহ।
সাধু নন অন্য কেহ।

হালদারমশাই নিশ্চয় পদ্য বানাতে পারেন না। কারণ তিনি জবাবে তাঁর প্রসিদ্ধ "খি-খি-খি-খি" উপহার দিলেন। কর্নেল বললেন "ঠিক ধরেছেন নন্দবাবু, ইনিই সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার।"

"তা হলে নমস্কার," বলে কবিবর মিষ্টি করে হাসলেন।

ডিটেকটিভ এনেছে দণ্ডী।
খবর পেয়েই চণ্ডী।
কালীগঞ্জে প্রেজেন্ট
একটা ইনসিডেন্ট।
বাধাতে পারে শেষটা—"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "কী এই কেসটা?"

কবি নন্দ ভাণ্ডারী কেটলিতে ফুটন্ত জলে চা-পাতা ফেলে, সেটা নামিয়ে রেখে দুধ গরম করতে দিলেন। তারপর তক্তাপোশের তলা থেকে কাপ-প্লেট বের করে বাইরে ধুতে গেলেন। হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, "শেষটার সঙ্গে কেসটা বেশ মিলেছে হালদারমশাই।"

হালদারমশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি হাসতে-হাসতে বললুম, "কেসটা বুঝতে দরকার একটু চেষ্টা।"

হালদারমশাই একটু চটে গেলেন। "ধুর মশাই! খালি পদ্য। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। পদ্য-টদ্য আমার আসে না। ওদিকে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে। বেগুনখেতে—"

বাইরে থেকে কবিবর বললেন—

বেগুনখেতে রাতবিরেতে নাচত কাকতাড়ুয়া।
চুপিসাড়ে ঝোপেঝাড়ে বলত শেয়াল ক্যা হুয়া।
দণ্ডীবাবু ফন্দি করে যেই আনল ডিটেকটিভ।
চণ্ডীচরণ বুঝল তখন এবার সে ইনএফেকটিভ।

তারপর ঘরে ঢুকে দুধের পাত্র নামিয়ে কুকার নেভালেন। চা তৈরি করতে করতে ফের ভাণ্ডারীমশাই আপনমনে আস্তে বললেন,

হচ্ছে ভয়
কী হয়, কী হয়।
ছেলেটা যে বোকা।
জিনিয়াস একরোখা।
ওরে পোড়ামুখো।
তোর হাতেই হুঁকো।
খেয়ে যাচ্ছে ভূত—

হালদারমশাই চটেই ছিলেন। বলে উঠলেন, "কী অদ্ভুত!"

কর্নেল তারিফ করার ভঙ্গীতে বললেন, "আসছে হালদারমশাই, আসছে।"

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন, "কী?"

"পদ্য।"

আমি ফোড়ন না কেটে পারলুম না। "এবং ছন্দও।"

হালদারমশাই গুম হয়ে বসে রইলেন। মনে হল, যা ঘটেছে সেটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছেন। কবি নন্দ ভাণ্ডারীর মুখেও সেই আমুদে ভাবটা নেই। হাতে হাতে চা এগিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড একটা ধকলের পর গরম চা আমাকে চাঙ্গা করতে থাকল। হালদারমশাইকেও বটে: কারণ তাঁর সন্নেসি-মুখে প্রশান্তি ফুটতে শুরু করল।

ভাণ্ডারীমশাই চা শেষ করে বললেন,

অনারেবল গেস্ট।
নাউ টেক রেস্ট।
ওয়ান থিং টু ক্লিয়ার।
ইফ ইউ হিয়ার
দা জ্যাকল হাউলস।
সামথিং ইজ ফাউল।

তক্তাপোশের তলা থেকে তিনি একটা পুঁটুলি বের করলেন। তারপর সেটা বগলদাবা করে কর্নেলের দিকে চোখ নাচিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলুম, হালদারমশাই কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল লণ্ঠনের দম কমিয়ে দিলেন। বললেন, "কী বুঝলেন বলুন হালদারমশাই!"

"প্রচুর—প্রচুর রহস্য।"

"হ্যাঁ, রহস্য প্রচুরই। আপনাকে বলেছিলুম, 'ণ্ড' বর্ণটি যেখানে, সেখানেই গণ্ডগোল। কবি নন্দলাল ভাণ্ডারীকেও দেখলেন। 'ণ্ড' বর্ণটি তাঁর নামেও আছে। কাজেই কিছু গণ্ডগোল তাঁরও আছে। তবে সেটা মাথায়।"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় হল কীভাবে?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "গত একমাস যাবৎ নন্দবাবু আমাকে পদ্যে চিঠি লিখে আসছেন। পাগলের পাগলামি ভেবে গ্রাহ্য করিনি। তারপর কাগজে সত্যিই ভুতুড়ে কাকতাড়ুয়ার খবর বেরোল। আজ সকালে হালদারমশাই আর তুমি গেলে। হালদারমশাইয়ের কাছে দণ্ডীবাবুর আসার খবর পেলুম। তখন নন্দবাবুর পদ্যগুলোকে গুরুত্ব দিতেই হল। উনি লিখেছিলেন ঃ

ভাঙা কেল্লাবাড়ি আমার ইদানীংকার আস্তানা।
মুখে দাড়ি দুজনকারই সেটাই চেনার রাস্তা না?

"অতএব পরস্পর চেনাচিনির অসুবিধে হয়নি।"

"শ্মশানে গিয়েছিলেন কেন?

"হরিধ্বনি শুনেই নন্দবাবু আমাকে শ্মশানে যেতে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। উনি ভেবেছিলেন দণ্ডীবাবুকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে। তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলুম। আমাকে দেখে পিশাচবাবা ভেবে লোকগুলো খাটিয়া ফেলে পালিয়ে গেল। তখনও ভাবিনি, তোমাকে ওরা ধরে এনেছে। তোমার কান্নাকাটি শুনে তবে বুঝলুম—"

"মোটেও কান্নাকাটি নয়।" প্রতিবাদ করলুম। "আমি যে জ্যান্ত মানুষ, সেটাই জানাতে চাইছিলুম।"

হালদারমশাই প্রচণ্ডভাবে খি-খি-খি-খি করলেন এতক্ষণে। তারপর বললেন, "খাইছে আর কি?"

বললুম, "কিন্তু পিশাচবাবার ব্যাপারটা কী? ফান্টুও বলছিল, তাকে দেখেছে।"

কর্নেল বললেন, "কাটরার মাঠের নরমাংসভোজি পিশাচবাবার কথা তোমাকে বলেছিলুম, মনে নেই? শুনলুম দণ্ডীবাবু আর চণ্ডীবাবু দুজনেরই ওপর তাঁর নজর।"

হালদারমশাই বললেন, "জিনিয়াস ছেলেটার হাতে ভূতের হুঁকো খাওয়ার কথা বললেন পোয়েটমশাই। বড়ই রহস্যজনক। কর্নেলস্যার কিছু ক্লু পেলেন?"

"কিসের?" কর্নেল আনমনে জবাব দিলেন। কারণ তিনি যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছিলেন।

হালদারমশাই বললেন, "হুঁকোর।"

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, সেই সময় শেয়ালের ডাক শোনা গেল। অমনি উঠে দাঁড়ালেন। "ইফ দা জ্যাক্‌ল হাউলস—সামথিং ইজ ফাউল" বলে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় দৌড়েই গেলেন বলা উচিত।

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "খাইছে! পোইদ্য। বুঝলেন না? পোইদ্য—পইট্রি! কর্নেল-সারেরে খাইছে।" ঐ-কারের মতো একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন গোয়েন্দাপ্রবর। তারপর গেরুয়ার আলখাল্লার ভেতর থেকে নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন। শেয়ালটা থেমে গেল হঠাৎ। তার একটু পরে বন্দুকের গুলির শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। পরপর দু'বার। হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "এখানে বসে থাকার মানে হয় না আর। চলুন জয়ন্তবাবু, কী ঘটছে দেখে আসি।" বলে আমাকে টেনে ওঠালেন।

সেই গড়খাই পেরিয়ে মাঠে পৌঁছনোর পর শ্মশানের দিক থেকে হরিধ্বনির শব্দ ভেসে এল। অমনি হালদারমশাই দম-আটকানো গলায় বললেন, "আবার কারে বাঁধল?"

বলে আচমকা টাট্টু ঘোড়ার মতো গমখেত ভেঙে উধাও হয়ে গেলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর গা ছমছম করতে থাকল। জ্যোৎস্নার রাতে কাটরার মাঠে একা পড়ে গিয়ে এখন প্রতিমুহূর্তে ভয়, হুঁ—সেই নরমাংসভোজী পিশাচবাবারই! কে জানে, সামনে বা পেছনে কোনও গর্ত থেকে বা ঝোপঝাড় ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেই গেছি।

দণ্ডীবাবুর ফার্মটা কোনদিকে ঠাহর করার চেষ্টা করলুম। বাঁ দিকে একটু দূরে বিদ্যুতের আলো জুগজুগ করছে। ওইটেই হবে। মরিয়া হয়ে সেইদিকে নাক-বরাবর হাঁটতে থাকলুম।

পাঁচ

ফার্মহাউস এলাকা একেবারে সুনসান নিশুতি। বেগুনখেতে কালো হয়ে কাকতাড়ুয়াটি দাঁড়িয়ে আছে। মড়ার খুলি এমনিতেই দেখতে বিটকেল, তার ওপর সময়টা এরকম। শেয়ালের ডাক শুনে কর্নেলের দৌড় এবং শ্মশানের হরিধ্বনি শুনে ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের নিমেষে অন্তর্ধান, ওদিকে নরমাংসভোজী পিশাচবাবার ব্যাপারটাও কম সাঙ্ঘাতিক নয়। কাজেই কাকতাড়ুয়াটির দিকে এখন না তাকানো উচিত।

খোলা বারান্দায় ফাণ্টু দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিল, তাঁর হাতে দোনলা বন্দুক। সেই বন্দুকটাই হবে। কিন্তু ইনি তো দণ্ডীবাবু নন, তাঁর বিপরীত। নাদুসনুদুস, বেঁটে। মুখের ভাব অমায়িক। প্রথমে ফাণ্টুই আমাকে দেখতে পেল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "রিপোর্টারদা, কোথায় গিয়েছিলেন হঠাৎ? আমি তো আপনার জন্য ভেবে-ভেবে সারা। শেষে বড়মামা খুঁজতে গেলেন আপনাকে।"

বেঁটে ভদ্রলোক একটু যেন চমকে গিয়েছিলেন। তারপর মিঠে হাসলেন। "আসুন-আসুন! এতক্ষণ ফাণ্টু আপনার কথাই বলছিল। কাগজে ওর ছবি বেরোবে শুনে খুব ভাল লাগল।"

ফাণ্টু বলল, "আপনি পিশাচবাবার পাল্লায় পড়েননি তো রিপোর্টারদা?"

"নাঃ।" বলে বেতের চেয়ারে বসে পড়লুম। বেজায় ক্লান্ত। শুতে পেলে বাঁচি, এমন অবস্থা। শরীরের গিঁটে-গিঁটে ব্যথা, যা বাঁধা বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা! মাথাও ঝিমঝিম করছে রহস্যের চোটে।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। "আমার নাম চণ্ডীচরণ খাঁড়া। তুলোদা আমার মাসতুতো দাদা। আর বলবেন না স্যার। ভুসির বস্তায় মড়ার খুলি ঢুকিয়ে দিয়েছিল কেউ। নেহাতই রসিকতা। কিন্তু তুলোদা'র আবার সবতাতে বাড়াবাড়ি। বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়ার মাথায় সেটি বসিয়ে দিয়ে কেলেঙ্কারি বাধিয়েছেন। খবর পেয়ে ছুটে এলুম। হচ্ছেটা কী, হাতেনাতে দেখে তারপর ব্যবস্থা।"

ফাণ্টু বলল, "তোমাকে দেখে কিন্তু আর নড়ছে না, দেখছ ছোটমামা!"

"নড়ুক না। তুলোদা'র চেয়ে আমার হাতের টিপ কেমন দেখিয়ে ছাড়ব?"

"কিন্তু বন্দুকে তো আর কার্টিজ নেই, ছোটমামা। বড়মামা দুটোই ফায়ার করে ফেলেছেন!"

চণ্ডীবাবু বন্দুকে মোচড় দিয়ে খালি কার্তুজ দুটো বের করে দেখে ফেলে দিলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "তুলোদা'র একটুতেই বড়াবাড়ি।"

ফাণ্টুও খুব হাসতে লাগল। "উড়ো পদ্য পেয়ে শেয়াল-ধরা ফাঁদ খুঁজতে জামাকাপড় ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে বড়মামার। বের করে আনতে সে এক ঝামেলা। মেজাজ খাপ্পা হয়েই ছিল, আরও খাপ্পা করে দিল।"

"কে?"

"আবার কে? কাকতাড়ুয়া।"

"নড়াচড়া করছিল নাকি?"

"তুমি এতক্ষণ কী শুনলে? পর-পর দুটো ফায়ার করেও বড়মামার রাগ পড়তে চায় না। মুকুন্দদা আর রমজানদা এসে অনেক করে বোঝাল। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হল। তারপর এই রিপোর্টারদা'র কথা বললুম। তখন বড়মামা রিপোর্টারদা'কে খুঁজতে বেরোলেন টর্চ নিয়ে।"

"হ্যাঁ রে ফাণ্টু, তুলোদা পিশাচবাবার পাল্লায় পড়েনি তো?"

ফাণ্টু একটু ভেবে বলল, "একটা কথা মাথায় আসছে ছোটমামা!"

"কী কথা বল্ তো?"

"বড়মামাকে পিশাচবাবা কিছু বলবে না। কেন জানো? আজ সন্ধ্যে থেকে শ্মশানে তিনটে মড়া গেল।"

"গেল বটে। হরিধ্বনি দিচ্ছিল।"

"পিশাচবাবা এখন ওই তিনটে মড়া খেতেই ব্যস্ত। পেট ফুলে ঢোল হবে।"

"ঠিক বলেছিস।" বলে চণ্ডীবাবু আমার দিকে ঘুরলেন। "সওয়া দশটা বাজে প্রায়। স্যারকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। ফাণ্টু, ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থা কর্। তোদের নন্দীভৃঙ্গীর সাড়া নেই—দ্যাখ্, গাঁজা টেনে পড়ে আছে নাকি?"

ফাণ্টু চলে গেল কিচেনের দিকে। চণ্ডীবাবু গুলিশূন্য বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে বললেন, "খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন স্যার। আমি তুলোদা'কে খুঁজে নিয়ে আসি। মাঠে তুলকালাম করে বেড়াচ্ছে হয়তো।"

চণ্ডীবাবু চলে গেলেন গেটের দিকে। একটু পরে ফাণ্টু ফিরে এসে বলল, "রিপোর্টারদা, ওরা কেউ নেই। না মুকুন্দ, না রমজানদা!" সে একটু রাগ করেছে বোঝা যাচ্ছিল। ফের বলল, "বড়মামা আসুন, এবার সব বলে দেব।"

"কী বলে দেবে ফাণ্টু!"

ফাণ্টু প্যাঁচার মতো মুখ করে বলল, "ওরা রোজ রাত্তিরে চুপিচুপি কোথায় যায়। আমাকে বলতে বারণ করেছিল, তাই বলিনি মামাকে। এবার দেখছি বলতেই হবে।"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "তা হলে সত্যি গাঁজা খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে না বলছ?"

"হ্যাঁঃ!" বলে ফাণ্টু হাই তুলল। "চলুন রিপোর্টারদা, আমরা খেয়ে নিই।"

"তোমার মামারা ফিরে আসুন। একসঙ্গে খাব বরং।"

ফাণ্টু হঠাৎ হাসল। "তা হলে চলুন রিপোর্টারদা, প্রিন্স অ্যালবার্টকে দেখে আসি। একা যেতে ভয় করছে। আজ রাতে বড্ড বেশি শেয়াল ডাকছে। শেয়াল ডাকলেই বুঝতে পারি পিশাচবাবা বেরিয়েছে।"

ফার্মহাউসের পাশ দিয়ে একফালি পায়ে চলা রাস্তা। কয়েক পা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। বললুম, "কী হল?"

ফাণ্টু বলল, 'টর্চ? আমার টর্চটা বড়মামা নিয়ে গেছেন। আপনার কাছে টর্চ নেই?"

"ছিল," বলতে গিয়ে সামলে নিলুম। করণ, তা হলে ওকে সবকথা খুলে বলতে হয়। বলার মুড নেই। তাই বললুম, "নেই।"

"নার্সারির ওখানে একটা চালাঘর আছে। আলোটা জ্বেলে দেব, চলুন। একটু দূরে অবশ্যি—তা হলেও দেখা যাবে।" বলে ফাণ্টু হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে লাগল। ওর সঙ্গ ধরতে বারকতক পা হড়কে আছাড় খাওয়ার উপক্রম। তারপর সামনের দিকে গমখেত পড়ল। আঁকাবাঁকা আলপথে অনেকটা যাওয়ার পর ফাণ্টু বলল, "নার্সারির এরিয়ায় এসে গেছি রিপোর্টারদা। এই দেখুন, কতরকম ক্যাকটাস, পাতাবাহার আর ঝাউ লাগিয়েছি। ওইখানে গোলাপবাগান। পাঁচ রকমের গোলাপ আছে। প্রিন্স অ্যালবার্ট—"

ফাণ্টু থেমে গেল। খানিকটা দূরে হঠাৎ আলো জ্বললো। বিদ্যুতের আলো। সেই আলোয় দেখলুম, চণ্ডীবাবু একটা চালাঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে মুকুন্দ ও

রমজানের সঙ্গে কথা বলছেন। ফান্টু খুব অবাক হয়ে বলল, "ছোটমামা ওখানে কী করছেন?"

সে দৌড়তে যাচ্ছিল, টেনে ধরে আটকে দিলুম। বললুম, "চুপ। বরং দুজনে আড়ালে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিই, চলো।

ফান্টুর মনে ধরল কথাটা। ঝাউ, ক্যাকটাস, পাতাবাহারের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে কাছাকাছি এক জায়গায় বসে পড়লুম। হাত-বিশেক দূরে চালাঘরটা, সবকিছুই দেখা ও শোনা যাচ্ছে। চণ্ডীবাবু দুটো প্লাস্টিকের থলে পাঞ্জাবির দুই পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "বন্দুকটা তুলোদা'র ঘরে রেখে দিয়ে যা! আর এই নে, পাঁচটাকা করে বাড়িয়েই দিলুম।"

রমজান ও মুকুন্দ টাকাগুলো পকেটে ঢোকাল। তারপর মুকুন্দ ফিক করে হেসে বলল, "পিশাচবাবা এতক্ষণ দণ্ডী-স্যারের হাড় চুষছে। খুব রাগী লোকের হাড়ে টক-ঝালটা বড্ড বেশি থাকে।"

চণ্ডীবাবুও ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসলেন। রমজান বলল, "কাগজের বাবুটিকে আমার কেমন সন্দেহ হয়, বাবুমশাই।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ হে! শ্মশান থেকে দিব্যি ফেরত এল দেখে আমি তো তাজ্জব। পিশাচবাবা ওকে খেল না কেন? তা ছাড়া বাঁধন খুলে পালিয়ে এল কী করে?"

মুকুন্দ বলল, "আপনার লোকগুলো কোনও কম্মের নয়। বরাবর দেখে আসছি, সবতাতেই বড্ড তাড়াহুড়ো করে। কাকতাড়ুয়া নাচাতে গিয়ে গুলি খেয়ে রক্তারক্তি হল।"

"ধুস্, রক্ত নয়, কুঙ্কুমের ছোপ।" চণ্ডীবাবু মুখ বাঁকা করে বললেন। "ওদিন দোলপূর্ণিমা ছিল না? হোলির কুঙ্কু-পটকা। বেন্দাটা অতি চালাক। কে ওকে বলেছিল, কাকতাড়ুয়ার গলায় কুঙ্কুম-পটকা বাঁধতে? জানা কথা, তুলোদা আগের রাত্তিরের মতো মুণ্ডু তাক করেই গুলি ছুঁড়বে। হাঁদারাম!"

মুকুন্দ ও রমজান বেজায় হাসতে লাগল। মুকুন্দ বলল, "তাই বলুন! পটকা ফেটে রঙবেরঙ।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "রঙবেরঙ করতে গিয়ে আমাকেও বিপদে ফেলেছিল আর কি। তুলোদা'র তো হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি। কলকাতা থেকে গোয়েন্দা এনে— যাকগে, আলো নেভাও। আর শোনো, গোয়েন্দাবাবু তো পিশাচবাবার পেটে গেছে। কাগজের বাবুটিকেও ফের শ্মশানে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। বেন্দার দল তোমাদের হেল্প করবে।"

রমজান বলল, "এক কাজ করা যাক। কাগজবাবুর খাবারে আফিমের রস মিশিয়ে দিলেই, ব্যস, মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়বে। তখন ওকে চ্যাংদোলা করে রেখে আসা যাবে।"

মুকুন্দ সায় দিয়ে বলল, "পিশাচবাবার শেষরাত্তিরে নিশ্চয় খিদে পাবে। তখন ওকে খাবে।"

কথাগুলো শুনে শিউরে উঠেছিলুম। ফান্টু আমাকে চিমটি কাটলে ফিসফিসিয়ে বললুম, "চুপ।"

আলো নিভে গেল। তার পর কাছেই কোথাও শেয়ালের ডাক শোনা গেল। চণ্ডীবাবু চালাঘর থেকে নেমে জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালেন। বললেন, "ফার্মের জমি তুলোদা ফান্টুর নামে উইল করে রেখেছে। ফান্টু তো আমার ভাগনে। আশা করি, বেগড়বাঁই করবে না।"

মুকুন্দ বলল, "না, না। ফান্টু তো জানেই না কিসের চাষ করছে। চণ্ডী-স্যার বীজ এনে দিতেই সয়েল টেস্ট করে কতরকমের সার দিয়ে ফুলে ফুলে ছয়লাপ করে দিয়েছে। মাথা আছে বটে!"

চণ্ডীবাবুর বন্দুকটা রমজানের কাঁধে। সে আর মুকুন্দ আমাদের দিকে, চণ্ডীবাবু উলটোদিকে সবে কয়েক-পা হেঁটেছেন, অমনি কোথাও একটা অমানুষিক গর্জন শোনা গেল। কতকটা এইরকম, "খ্র্যা-ও-ও! খ্র্যাঁ-ও-ও! খ্যাঁ-ও!"

তারপর চণ্ডীবাবুর সামনাসামনি ঝোপ ফুঁড়ে কালো একটা মূর্তি বেরোল। চণ্ডীবাবু টর্চ জ্বেলেই "বাবা রে" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। টর্চটা বোধ করি আতঙ্কের চোটে হাত থেকে পড়ে নিভে গেল। কিন্তু ওই এক পলকের আলোয় দেখতে পেলুম দু'ঠেঙে কালো গোরিলার মতো একটি প্রাণীকে। ভয়ংকর মুখ থেকে সাদা দুটো কষদাঁত বেরিয়ে আছে। দু'হাতে বড়-বড় নখ।

ফান্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করল, "পিশাচবাবা। পিশাচবাবা!"

রমজান ও মুকুন্দের এক গলায় আর্তনাদ শুনলুম। তারপর তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েই পালিয়ে গেল। চণ্ডীবাবু পালাতে যাচ্ছেন, সেই সময় চালাঘরের পেছন থেকে কেউ এসে তাঁকে জাপটে ধরল। জ্যোৎস্নায় আবছা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ধস্তাধস্তি বেধেছে মনে হচ্ছে। তারপরেই, কী আশ্চর্য, কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম, "হালদারমশাই, চালাঘরের আলোটা জ্বেলে দিন। শিগ্গির।"

আলো জ্বলল।

কর্নেলকে দেখলুম, সবে ধরাশায়ী দশা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। টুপিটা পড়ে গেছে। টাক ঝকমক করছে। চণ্ডীবাবু অদৃশ্য। হাত ফস্‌কে পালিয়ে গেছেন বোঝা গেল

পিশাচবাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আলখাল্লা ও জটাজুটধারী হালদারমশাই চালাঘর থেকে নেমে খি-খি-খি-খি করলে পিশাচবাবার ভয়ঙ্কর মুখ থেকে মানুষের ভাষায় পদ্য বেরোল, সঙ্গে ফোঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস।

গঙ্গায় দিল দণ্ডী ঝম্প
চণ্ডীও দিল লম্বা লম্ফ।

পদ্য শুনেই ফাণ্টু লাফিয়ে উঠল এবং 'মাস্টারমশাই' বলে চিক্কুর ছেড়ে দৌড়ে গেল।

আমিও গেলুম। ভয়ঙ্কর মুখোশ এবং কালো কাপড়ে তৈরি মনুষ্যাকৃতি খোলসের টিপ-বোতাম পুট পুট করে খুলে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন কবি নন্দলাল ভাণ্ডারী। সহাস্যে ফাণ্টুকে বললেন,

ওরে বাবা ফাণ্টুস
একটুকু চাই হুঁশ
বললেও ইঙ্গিতে
পারিসনি বুঝে নিতে
মামা এনে দিল বীজ
যত্ন করে চষেছিস
জানিস এইগুলো কী
ওপিয়াম পপি রে।

বলে পায়ের কাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে ফেললেন। ফাণ্টু বলল, "এগুলো তো ফুল মাস্টারমশাই, পপিফুল!"

কবি ভাণ্ডারীমশাই চটে গেলেন।

এই দ্যাখো ছেলেটা
কী যে ভেলভেলেটা
বোঝালেও বোঝে ভুল
বলে কিনা পপিফুল।

ফাণ্টু অবাক হয়ে বলল, "তা হলে কী এগুলো?"

ভাণ্ডারীমশাই বললেন,—

শোন তবে আগাগোড়া
সব সাপ নয় ঢোঁড়া
কোনওটার থাকে বিষ
এই বার বুঝেছিস
এই পপি ডেঞ্জারাস
আফিং-এরই নির্যাস।

ফাণ্টু একটু গুম হয়ে থাকার পর বলল, "হুঁ. বুঝেছি। তাই মুকুন্দদা রমজানদা গাছগুলোর ডগা চিরে রাখত। রস বেরিয়ে আঠার মতো জমে থাকত আর চুপিচুপি রাত্তিরে এসে সেগুলো খুলে নিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরতো। আমাকে বলত, মামাকে যেন না বলি। আমি অত কি জানি, বলুন তো?"

ভাণ্ডারীমশাই পৈশাচিক ছদ্মবেশ গুটিয়ে পুঁটলি বানালেন এবং সেটি বগলদাবা করে বললেন,

ওরে সোনা গুড বয়
করে ফ্যাল ডেস্ট্রয়
বিলম্ব নয় বাপ
হাতে দেবে হ্যাণ্ডকাপ
আবগারি দারোগা
তব তেরা ক্যা হোগা
ব্রিং সাম গুড বিষ
আভি কর দে ফিনিশ।

ফাণ্টু বলল, "এখনই বিষ স্প্রে করে দিচ্ছি, জ্বলেপুড়ে ফিনিশ হয়ে যাবে।"

সে ফার্মহাউসের দিকে দৌড়ে গেল। কর্নেল বললেন, "আসুন নন্দবাবু, ফাণ্টু ওপিয়াম পপি জ্বালিয়ে দিক। আমরা ফার্মহাউসে গিয়ে দেখি, দণ্ডীবাবু সাঁতার কেটে ফিরতে পারলেন নাকি।"

ভাণ্ডারীমশাই হাই তুলে বললেন,

রাত নিঝুম
পাচ্ছে ঘুম
উঠছে হাই
ডেরায় যাই।

তারপর সটান ঘুরে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। জ্যোৎস্নায় তাঁর ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে শেয়ালের ডাক শোনা গেল। সেদিকে। অদ্ভুত মানুষ!

হালদারমশাই ততক্ষণে চালাঘরে গিয়ে ছদ্মবেশ ছেড়েছেন এবং সেটি তিনিও পুঁটুলি বানিয়ে বগলদামা করে বেরোলেন। প্যাণ্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ছিল। বোঝা গেল, আলখাল্লার ভেতর প্যাণ্ট-শার্ট পরেই ছিলেন। অবশ্য পা-দুটো খালি। বললেন, "কী কাণ্ড! পোইদ্যের লগে পিশাচ আর শৃগালের সম্পর্ক আছে শুনি নাই। এক্কেরে শৃগালের ডাক।"

বললুম, "উনি শেয়াল ডাকতে পারেন নাকি?"

"ওই তো ডাকছেন! শুনছেন না?"

কর্নেল বললেন, "আমার টর্চটা খুঁজে বের করতে হবে। দণ্ডীবাবুর বন্দুকটাও।"

খোঁজাখুঁজি করতে-করতে ফাণ্টু এসে পড়ল। হাতে স্প্রে। হাসতে-হাসতে বলল, "ওদিকে এক কাণ্ড। বড়মামা এসে গেছেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। বললেন, গঙ্গাস্নান করে এলুম। আমি তো জানি. পিশাচবাবার ভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বলেত গেলে রেগে যাবেন। তাই সে-কথা বললুম না। তবে পপিফুলের ব্যাপারটা আর যা-যা হয়েছে এখানে. সব বলেছি। শুনে মামা হতভম্ব।"

বললুম, "তোমার মামা জানেন না এগুলো আফিংগাছ।"

ফাণ্টু বলল, "না। বড়মামাকে তো চণ্ডীমামা—মানে, ছোটমামা ফুলের বীজ বলে কোত্থেকে এলে দিয়েছিলেন। বড়মামা আপনাদের জন্যে ওয়েট করছেন। শিগ্‌গির যান। মামার অবস্থা শোচনীয়। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকলে কী হবে? রাত্তিরে গঙ্গার জল যা ঠাণ্ডা!"

কর্নেল টর্চ খুঁজে পেলেন। তারপর বন্দুকটাও পাওয়া গেল। হালদারমশাই বন্দুক কাঁধে এবং পুঁটুলি বগলদাবা করে মার্চের ভঙ্গীতে পা বাড়ালেন। কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন.

কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা
বেগুনভাজা আর পরোটা
কিংবা লুচি অর্ধডজন
ইচ্ছে হয় করি ভোজন
দিচ্ছে কেডা
রাত বারোটায়।

হালদারমশাই খি-খি সহযোগে বললেন, "খাইছে! পোইদ্যে পাইছে।"

বললুম. "আপনাকেও, হালদারমশাই! আপনাকেও পদ্যে পেয়েছে। সাবধান।"

হালদারমশাই সম্ভবত সাবধানতাবশেই চুপ করে গেলেন। পদ্যের সঙ্গে পিশাচ ও শেয়ালের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন উনি। পিশাচ যদি বা সাজতে পারেন, শেয়ালের ডাক ডাকতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

ছয়

দণ্ডীবাবু ঘরের ভেতর তক্তাপোশের বিছানায় সত্যিই কম্বলমুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। আমাদের দেখে করুণ মুখে বললেন, "আসুন, আসুন! ফাণ্টুর মুখে সব শুনলুম। শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। ওই চণ্ডী—পাষণ্ড ষণ্ড, ভণ্ড আমার মাসতুতো ভাই। আমাকে ফাঁসাবার কী ষড়যন্ত্র করেছিল, দেখুন! তারপর লোকে বলত, চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক ঘটনা!"

দেখলুম, বারান্দার বেতের চেয়ারগুলো ঘরে ঢোকানো হয়েছে এবং তা আমাদেরই খালি করে বসতে দেওয়ার জন্যে তো বটেই। আমরা বসলুম। হালদারমশাই বললেন, "দণ্ডীবাবু, কর্নেল-স্যারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই! ইনি - "

কথা কেড়ে দণ্ডীবাবু বললেন, "কী আশ্চর্য, শ্মশানে ইনিই আমার বাঁধন খুলে দিলেন মনে পড়ছে—হুঁ, দাড়ি দেখেই চিনতে পারছি। নমস্কার স্যাব, নমস্কার। বুঝতেই পারছেন, ওই অবস্থায় শত্রু-মিত্র চেনা কঠিন। আমি ভাবলুম, পিশাচবাবার চেলা-টেলা হবে। পিশাচবাবার খাওয়াদাওয়ার সুবিধে করে দিচ্ছে।" বলে সেই অদ্ভুত 'ফ্যাঁচ'

শব্দটি বের কবলেন মুখ থেকে। অর্থাৎ দুর্লভ হাসিটি হাসলেন।

হালদারমশাই বললেন, "ইনি স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আমার গুরুদেব কইতে পারেন এনাবে। ইনি না আইয়া পড়লে কী যে হইত, কওন যায় না।

আবেগে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "অমন করে জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত হয়নি দণ্ডীবাবু! আপনি বিচক্ষণ মানুষ। ভাল করে তাকিয়ে দেখবেন তো?"

দণ্ডীবাবু বললেন, "ওই যে বললুম, শত্রু-মিত্র চেনার অবস্থা ছিল না। গেলুম জয়ন্তবাবুকে খুঁজতে, আর আচমকা কারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর চ্যাংদোলা করে তুলে হরি বোল বলতে বলতে শ্মশানে ফেলে পালিয়ে গেল। এদিকে ইদানীং পিশাচবাবার গল্পটা প্রচণ্ড রটেছিল। আপনি আমার বাঁধন খুলেছেন, তখন সাক্ষাৎ-পিশাচবাবা এসে আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে হুঙ্কারও দিচ্ছে। ওই অবস্থায় জলে ঝাঁপ না দিয়ে উপায় কী, বলুন স্যার?"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে, দণ্ডীবাবু।"

"বলুন, বলুন!"

"আপনার ফার্মে পপিফুলের খেতটা যে আসলে ওপিয়াম পপির খেত সেটা কি আপনি জানতেন না।?"

"বিশ্বাস করুন। ওপিয়াম কী থেকে হয়, আমি জানতুম না। একটু আগে ফাণ্টু সব বলে গেল। আমি জানতুম ফুল না ফুল! পপিফুল! ফাণ্টুর ফুলের বড্ড শখ। চণ্ডী যে সেই সুযোগ নেবে, কে জানত? গত অক্টোবরে চণ্ডী নিজের হাতে একটা বীজেব প্যাকেট দিয়ে গেল। বলল, ফাণ্টুকে দিও। এগুলো পপিফুলের বীজ।

দারুণ ফুল ফুটবে। গন্ধে মউমউ করবে। বদমাস! জোচ্চোর! পরের হাতে হুঁকো খাওয়ার ফন্দিটা কেমন দেখুন।

"ইদানীং আপনি ফার্মে এসে রাত্রিবাস করছিলেন কেন, দণ্ডীবাবু?"

দণ্ডীবাবু একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে শ্বাস ফেলে বললেন, "সারাটা দিন আড়তে কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকি। বড্ড একঘেয়ে লাগে। ছেলেমেয়েও নেই বাড়িতে, শুধু গিন্নি আর আমি। তাই অনাথ ভাগনেটাকে এনে রেখেছিলুম। সে থাকে ফার্মে। ছেলেমানুষ তো! রাতবিরেতে কী হয়, যা অবস্থা আজকাল। এও একটা কথা। তবে আরেকটা কথা হল, খটকা।"

"কিসের খটকা?"

"ফাণ্টু বলেছিল, চণ্ডী আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে ফার্মে আসে। বুঝুন ব্যাপারটা। কোথায় ঔরঙ্গাবাদ, আর কোথায় কাটরার মাঠ! চণ্ডী আসে, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করে যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, সন্ধ্যাবেলায় কেন? ফাণ্টুটার এগ্রিকালচারে মাথা আছে। আর সব ব্যাপারে আস্ত বোকা। এদিকে চণ্ডী লোক ভাল নয়। কাজেই খটকা লেগেছিল। সন্ধ্যার আগেই ফার্মে এসে কাটতে শুরু করলুম। ব্যস! কাকতাড়ুয়ার নাচিয়ে আমাকে ভয় দেখানোর খেলা আরম্ভ হল।"

ফাণ্টু এসে গেল। বড় করে হেসে বলল, "জ্বালিয়ে দিয়েছি মামা ফিনিস।"

চণ্ডীবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "গেস্টদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ফাণ্টু! অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ফাণ্টু বলল, "মুকুন্দদা রান্না করে রেখেছে মামা।"

চণ্ডীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "চোর! চোর! চোরদের রান্না গেস্টদের খাওয়াব কীরে হাঁদারাম? তা ছাড়া তুই তো বললি, খাবারে আফিমের রস মিশিয়ে দেবার চক্রান্ত করছিল। কাল সকালে সব খাবার শ্মশানে ফেলে দিয়ে আসব। মড়াখেকো শেয়াল-কুকুরের পেটে যাক। তুই এক কাজ কর বরং। বেগুনখেতে যা। বেগুন নিয়ে আয়। আমি ময়দা ছেনে পরোটা বানাচ্ছি। লুচি করতে হলে রাত পুইয়ে যাবে। তার চেয়ে পরোটা ইজ ইজি। কী বলেন স্যার? কর্নেল সায় দিলেন। হালদারমশাই উৎসাহে দাঁড়ালেন। তারপর "চলুন, আমিও হাত লাগাই" বলে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় বাইরে কাছেই শেয়াল ডেকে উঠল, "হোয়া হোয়া হোয়া!"

একটু থমকে দাঁড়ালেন চণ্ডীবাবু ও হালদারমশাই। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গীতে কিচেনে গিয়ে ঢুকলেন। বললুম, "কর্নেল, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হল তাহলে। রাত বারোটায় পরোটা আর বেগুনভাজা। খাসা। কিন্তু শেয়ালের ডাক শুনে মনে হচ্ছে আরেকজন গেস্ট আসছেন হয়তো।"

তারপরই হঠাৎ বাইরে ফাণ্টুর চিৎকার শোনা গেল। "মামা মামা।"

সব্বাই বেরিয়ে গেলুম। দণ্ডীবাবু হাঁক দিলেন,—কী হয়েছে রে?

বেগুনখেতের দিকে হাত তুলে আবার বলল, "কাকতাড়ুয়াটা আবার নাচছে—ওই দ্যাখো।"

চমকে উঠতেই হল। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কাকতাড়ুয়া দু'হাত ছাড়িয়ে নাচতে এগিয়ে আসছে। দণ্ডীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "বন্দুক। বন্দুক। বন্দুক নিয়ে আয় ফাণ্টু!"

অমনি কাকতাড়ুয়া পদ্যে বলে উঠল ঃ

বেগুনখেতে কাকতাড়ুয়া
নিশুত রেতে নাচ করে
ডাকে শেয়াল কেয়া হুয়া
ভূরিভোজন আঁচ করে
দণ্ডীভায়া এ কী বিচার
করবে গুলি বন্দুকে
উপকারী বন্ধুকে?

দণ্ডীবাবু সহাস্যে বললেন, "ভাণ্ডারীভায়া নাকি? আরে, এসো, এসো! সুস্বাগতম্! তবে এ কেমন আসা হে? বেগুনখেতে বড্ড কাঁটা। জামাকাপড় আটকে ফর্দাফাঁই হয়ে যাবে যে।"

কবি নন্দলাল ভাণ্ডারী কাকতাড়ুয়াটির আড়াল থেকে বেরোলেন।

না, বেরোলেন বলা ভুল হচ্ছে। দেখা দিলেন। তারপরেই আর্তনাদ করলেন,

"ওরে ওরে ফাণ্টা
সত্যিই কাঁটা রে
আগে কে বা জানত
শেয়ালের ফাঁদ তো
হয় এইরকমই
কণ্টকে জখমই
অঃ উঃ বাবা রে
বাঁচা রে বাঁচা রে......"

ফাণ্টু কাটারি এনে উদ্ধার করতে গেল তাকে। হালদারমশাই ক্রমাগত খি-খি-খি-খি করছিলেন। শেষে বললেন, "কী কাণ্ড! বাইগনখ্যাতখান একেরে লণ্ডভণ্ড!"

বললুম, "সাবধান হালদারমশাই। আবার আপনাকে পদ্যে পেয়েছে।"

অমনি হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "না, না। কথার কথা।"

কুমড়ো রহস্য

স্টেশন তখনও অন্তত আধাকিলোমিটার দূরে, ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। ট্যাক্সির সামনে ও পিছনে গাদাগাদি করে প্রায় এক ডজন যাত্রী ঠাসা ছিল। এ-মুল্লুকে নাকি এটাই রেওয়াজ। তবে শীতের দাপটে অবস্থাটা খুব একটা অসহনীয় মনে হচ্ছিল না। তা ট্যাক্সিওয়ালা দশ কিলোমিটার পথ আসতে ইতিমধ্যে তিনবার ভাড়া বাড়িয়েছে। এবার কলকব্জা বিগড়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে চতুর্থ দফা বাড়াবার ফন্দি ভেবেই আমরা যাত্রীরা ঝটপট নেমে এলুম। এবং যাঁদের ঠ্যাংগুলো লম্বা, তাঁরা সবার আগে দেখতে-দেখতে উধাও হ'য়ে গেলেন।

একটু পরে দেখি, আমি আর ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া আর জনপ্রাণীটি নেই। ট্যাক্সিওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে কোন ফন্দিফিকির বা ধূর্তামির চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লোকটা করুণ মুখে এঞ্জিনেব কলকব্জার দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম, "কী দাদা, কী বুঝছেন?"

লোকটা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নেহী সাব। আপ পাঁয়দল চলা যাইয়ে।"

হুঁ, ভেবেছে আমি ওর হাড়জিবজিরে গাড়িটা মূর্চ্ছাভাঙার অপেক্ষায় আছি আসলে এতক্ষণ ঠাসাঠাসিতে আমার শরীরে আগাগোড়া ঝিম ধবে গেছে। পা দুটোতে কোন সাড় নেই। তাই সেই ঝিমুনি কাটিয়ে নিচ্ছি। এবং সেটা ওবে বুঝিয়ে দেবার জন্যই রাস্তার ক্ষপরে পা দুটো ঘোড়ার মত ঠুকতে ঠুকতে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। কাছেই একটা ব্রিজ রয়েছে। নদীটা বেশ চওড়া। তবে আর্ধেকেব বেশি বালিতে ভরা, বাকিটায় কালো জল। স্রোত বইছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বিকেল হয়ে গেছে। শীতের দিন ঝটপট ফুরিয়ে যায়। হিসেব করে দেখলুম, ট্রেনের এখনও মিনিট কুড়ি দেরি। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলেও ট্রেন ধরা যাবে। সঙ্গে একটা কিটব্যাগ ছাড়া কোন বোঝা নেই। তাছাড়া জায়গাটা কেন যেন খুব ভাল লাগছিল। একধারে ছোটবড় পাহাড়। তার উপত্যকা শীতের শস্যে সবুজ হয়ে আছে। অন্যধারেও পাহাড় আছে। আর আছে ঝোপঝাড় আর মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল। সামনে ওই স্টেশনের কাছে যা একটা বসতি—তাছাড়া কাছাকাছি কোন বসতির চিহ্ন চোখে পড়ছিল না।

মনে হলো, জায়গাটা ভ্রমণ বিলাসীদের পক্ষে মোটামুটি পছন্দসই!

হঠাৎ আমার চোখ গেল ডাইনে নদীর পাড়ে জঙ্গলের দিকটায়। ঝোপের মধ্যে কী একটা বসে আছে যেন। বাঘ-ভাল্লুক নাকি? বলা যায় না, এই জঙ্গলে জনহীন জায়গায় বিশেষ করে শীতকালে জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়তেও পারে।

ধূসর রঙের প্রাণীটি আমার দিকে পিঠে রেখে ওত পেতে আছে। একবার ভাবছি, ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে সাবধান করে দিই। আবার ভাবছি, আমার ডাকডাকানি শুনে যদি দাঁত-নখ বাগিয়ে তেড়ে আসে? অবশ্য রাস্তাটা যথেষ্ট উঁচু এবং আন্দাজ দেড়শো মিটার দূরত্বে রয়েছে ওটা।

কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে ওটা উঠে দাঁড়াল এবং তক্ষুণি বুঝলুম চোখের ভুল হয়েছে। ওটা ধূসর রঙের কোট-প্যান্ট পরা একজন মানুষই বটে। হাতে কী একটা রয়েছে। গা ছমছম করে উঠল এবার। অন্যরকম ভয়ে। হাতে কি ওটা? পিস্তল? কাউকে খুন করার জন্যে ওত পেতে আছে লোকটা। কিন্তু কোটপ্যান্ট এবং দস্তুর মতো সায়েবী টুপিপরা কোন লোক কাউকে খুন করার জন্যে ওভাবে ওত পেতেছে. এটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না।

অথচ ওর গতিবিধি সন্দেহজনক। সন্দেহ আরও বাড়ল. যখন দেখলুম, লোকটা হাতের কালোরঙের জিনিসটা তুলে গুলি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হলো এবং ওইভাবে পা টিপে ঝোপঝাড় ভেঙে এগুতে থাকল।

তারপর দেখি, সে দৌড়তে শুরু করেছে। গুরুতর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আমার বুক টিপটিপ করছে এবার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি. গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ শুনব। ওর হাতের জিনিসটা যদি বন্দুক হতো, তাহলে শিকারীই ভাবতুম। পিস্তল দিয়ে কি কেউ পাখি বা জন্তু-জানোয়ার শিকার করে?

দৌড়ে সে যেখানে ঢুকল সেখানে কিছু উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে। ছায়ায় অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর সে অন্তত এক মিনিটের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপারটা দেখেছে নাকি জানার জন্যে ওদিকে ঘুরলুম। না. ও এখনও এঞ্জিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আবার যখন সেই লোকটাকে দেখতে পেলুম, তখন সে নদীর পাড়ে হাঁটু দুমড়ে বসেছে এবং পিস্তল তাক করে রেখেছে। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে ব্যাপারটা দ্রুত জানিয়ে দিলুম। দু-জন মানুষ এখানে থাকতে একটা খুনখারাপি হবে! যে ট্যাক্সিওয়ালা তিন তিনবার যাত্রীদের চাপ দিয়ে ভাড়া বাড়িয়েছে, তার বিবেকও এবার নড়ে উঠল। ''এইসা?''

বলে সে তার ট্যাক্সি থেকে একটা লোহার ডান্ডা বের করল। তারপর চোখ কটমট করে আমাকে ডাক দিল। আমারও একটা কিছু হাতে নেওয়া দরকার। অগত্যা

ওর এঞ্জিনের মধ্যে রাখা একটা রেঞ্চ তুলে নিয়েই রওনা দিলুম। উত্তেজনায় মাথার ঠিক নেই।

ট্যাক্সিওয়ালা উঁচু রাস্তা থেকে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় চাপা স্বরে কী বলতে বলতে ঝোপঝাড় ভেঙে এগুতে থাকল। আমি ওর পিছু পিছু চলেছি। দুজনেই সতর্ক, আচমকা ধরে ফেলব ওকে।

আমাদের দিকে পিঠ রেখে লোকটা এখনও তেমনি বসে আছে। টুপিপরা মাথাটা সামনে ঝুঁকছে, হাতের পিস্তল একেবারে নাকের ওপর তুলে তাক করে রেখেছে। সম্ভবত হতভাগ্য মানুষটি অর্থাৎ যাকে ও খুন করবে, সে নীচে নদীতে নিশ্চিন্তে কিছু করছে-টরছে। কিছু টের পাচ্ছে না। খুনে লোকটির হাতে পিস্তল আছে বলেই আমরা এত সাবধান হয়েছি। পা টিপে টিপে এগিয়ে কয়েক মিটার দূরে থেকে ট্যাক্সি ওয়ালা রড তুলল এবং আমিও রেঞ্চটা বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "খুন করলে! খুন করলে! পাকড়ো পাকড়ো!" ভুলেই গেলুম যে, ওর হাতে পিস্তল আছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তঘাতক ঘুরে ব্যাপারটা দেখেই হুড়মুড় করে নদীতে ঝাঁপ দিল। ট্যাক্সিওয়ালা রড নাচিয়ে পাড় থেকে শাসাতে শুরু করল। "পিস্তল ফেঁক দো! নেহি তো ডাণ্ডা মারেগা হাম!"

আমি তখন হতভম্ব হয়ে গেছি। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। নাকি এখনও লিটনগঞ্জের সেই সরকারি অতিথিশালায় শুয়ে একটা বিদ্ঘুটে স্বপ্ন দেখছি?

কালো এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে বুক-অব্দি ডুবিয়ে হতভাগ্য গুপ্ত ঘাতক এখন ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তার টুপিটা খুলে পড়ে কাগজের নৌকোর মতো ভেসে যাচ্ছে অল্প অল্প স্রোতে, এবং তার ফলে মাথাজোড়া যে টাকটি এই গোলাপি রোদ্দুরে চিকমিক করছে, সেটি অতি প্রসিদ্ধ এবং আমার সুপরিচিত। তার সান্টা ক্লজ সদৃশ্য সাদা অনবদ্য গোঁফ-দাঁড়িতে এখন বিস্তর জলকাদা লেগেছে।

এবং তার হাতের সেই পিস্তলটা পরিণত হয়েছে বাইনোকুলারে। এবং তা হয়েছে বলেই আমাদের বোকামির শাস্তি পাইনি। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেটে হাসি ঘুলিয়ে উঠেছে। হায় বুড়ো ঘুঘু। এ কী দশা তোমার! ট্যাক্সিওয়ালা লোহার রডটা ফের তুলতেই করুণ আওয়াজ এল, "জয়ন্ত! ওকে একটু বুঝিয়ে বলো যে, এটা পিস্তল-টিস্তল নয়, সামান্য একটা দূরবীণ।"

এতক্ষণে আমি হাসতে পারলুম। হো হো করে হেসে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা অবাক হয়ে বলল, "ক্যা জী? কোই জান পহচান্ আদমি? কৌন হ্যায় উও?"

বললুম, "থোড়া গলতি হুয়া দাদা। মাফ কিজিয়ে। উও দেখিয়ে আপকা ট্যাক্সিমে বাচ্চালোক ক্যা গড়বড় কর্ রাহ্য।"

সত্যি-সত্যি কাচ্চাবাচ্চারা ওই জনহীন রাস্তায় ওর ট্যাক্সিতে হামলা করেনি, কিন্তু উপায় নেই। ওই নিমজ্জিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে হবে। শীতের বিকেলে নদীর জল ওঁর পক্ষে নিশ্চয় আরামদায়ক হচ্ছে না। যাই হোক, আমার মিথ্যে কথায় কাজ হলো, ট্যাক্সিওয়ালা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ওর হাতে সেই ছোট্ট রেঞ্চটা গুঁজে দিতেই সে জঙ্গল ভেঙ্গে রাস্তায় তার ট্যাক্সির দিকে দৌড় দিল।

নিমজ্জিত বৃদ্ধের দিকে ঘুরে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললাম, "জলটা কি খুব ঠাণ্ডা?"

উনি করুণ হেসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ! আমি এবার উঠতে পারব। তবে দয়া করে তুমি আমার টুপিটা উদ্ধাব করো।"

হাসতে হাসতে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে ধীরে ধীরে ভাসমান টুপিটা উদ্ধার করে দেখি, উনি পাড়ে উঠেছেন এবং কী আশ্চর্য, আবার চোখে বাইনোকুলার রেখে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন! ভিজে পোশাক থেকে জল ঝরছে সমানে। কিন্তু এতক্ষণে সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে ওঁর প্রচলিত নাম বা বদনাম ধরে ডেকে ফেললুম, "হাই ওল্ড ঘুঘু! নিমুনিয়া হবে যে!"

উনি কানই দিলেন না। দৌড়ে গিয়ে ওঁর কাঁধ খামচে ধরলুম। তখন হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। "মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান! তুমি জানো না, কী সাংঘাতিক ক্ষতি করেছো আমার! অনেক কষ্টের পর বিরল প্রজাতির একটা উড-ডাকের দেখা পেয়েছিলুম। আর কি তাকে খুঁজে পাব?"

ওঁর কথায় এবার অনুতাপ জাগল। বললুম, "এই দুর্ঘটনার জন্য আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্ষমা করুন এবং চলুন, যেখানে উঠেছেন, সেখানে গিয়ে পোশাক বদলাবেন।"

"এক মিনিট, জয়ন্ত! আমি প্রজাপতি ধরা জালটা নিয়ে আসি।"

বলে উনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন। সেদিকে তাকিয়ে দেখি গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বেড়া দেখা যাচ্ছে। বুড়ো দেখতে দেখতে কী কৌশলে সেই বেড়ার ফাঁক গলিয়ে অদৃশ্য হলেন। তখন ব্যাপারটা ভাল করে দেখার জন্য বেড়াব দিকে এগিয়ে গেলুম।

একটা কৃষিফার্ম বলে মনে হল। নদীর ধারে চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে কেউ চাষবাস করেছে। অঢেল শীতের ফসল ফলে রয়েছে। তরকারিও লাগানো আছে। বুড়ো এখন হামাগুড়ি দিয়ে কুমড়োক্ষেতের দিকে

এগোচ্ছেন। দুর্লভ প্রজাতির কতগুলো প্রজাপতি ওঁর জালে ধরা পড়েছে জানি না, তবে আমার চোখ পড়ল কুমড়োগুলোর দিকে। কিন্তু ওগুলো কি সত্যি কুমড়ো, না পাথর? চতুর্দিকে অজস্র ছোটবড় পাথর পড়ে আছে। অনেক রকম গড়ন, নানান রঙের। কিন্তু কুমড়োক্ষেতের ওগুলোব মসৃণ নিটোল গড়ন আর সোনালি রঙ দেখেই বুঝতে পারলুম, পাথর নয়। অতএব কুমড়ো ছাড়া আর কী!

আমার বৃদ্ধ বন্ধু ওখানে হাঁটু মুড়ে সাবধানে জাল গুটোচ্ছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে বাজখাঁই গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই! অ্যাই! অ্যাই!" তারপর দেখি, গামবুটপরা, নাদুস-নুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক হাতে খুরপি নিয়ে দৌড়ে আসছেন। এই রে! এবার আর বুড়োকে বাঁচানো যাবে না। আমি বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ঢোকার জন্যে সাধ্যসাধনা করছি তার মধ্যে শুনি, উভয় পক্ষই হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠলেন।

"জয়ন্ত! এসো। আলাপ করিয়ে দিই।"

ডাক শুনে বেড়া গলিয়ে ঢুকে পড়লুম। খামারের মালিক অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বেড়ার ফাঁকটা বেড়ে গেছে সম্ভবত. সেদিকেই ওঁর নজব।..... ...

খামারের মালিকের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক । ভদ্রলোক আসলে একজন কৃষিবিজ্ঞানী। নাম ডঃ রঘুনাথ গিনতিওয়ালা। সংক্ষেপে ডঃ গিন্‌তি। অনেককাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। ভাল বাংলা বলেন। এই খামার তাঁর ল্যাবরেটরী। গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। তাছাড়া এক ঋতুর ফসল কীভাবে অন্য ঋতুতে ফলানো যায়, তা নিয়েও মাথা ঘামান। আমার কৌতূহল ওঁর ফলানো কুমড়ো সম্পর্কে। প্রশ্ন শুনে হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনারা বাঙালীরা কুমড়োর ছক্কা খেতে খুব ভালবাসেন। ওদিকে লিটনগঞ্জের কলকারখানা এলাকায় অজস্র বাঙালী আছেন। বলতে পারেন, তাঁদের মুখ চেয়েই আমি এই উৎকৃষ্ট জাতের কুমড়ো ফলিয়েছি। ওখানকার অফিস ক্যান্টিনগুলোতে তরিতরকারি জোগায় একটা এজেন্সি। তারা আমার ক্ষেতের কুমড়ো ট্রাকবোঝাই করে কিনে নিয়ে যায়। আপনার বন্ধু কর্ণেল সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করুন. সত্যি না মিথ্যে।"

কর্ণেল সাহেব অর্থাৎ 'বুড়ো ঘুঘু' বলে পরিচিত কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার এই খামারবাড়ির পাশের ঘর থেকে ভিজে পোশাক ছেড়ে ডঃ গিন্‌তির বেঁটে পাজামা-পানজাবী এবং আস্ত কম্বল জড়িয়ে এতক্ষণে এলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে আরাম করে বসে বললেন, "জয়ন্ত ডঃ গিন্‌তির কুমড়োগুলো কিন্তু অকালকুষ্মাণ্ড!"

ডঃ গিন্‌তি হো-হো করে হেসে উঠলেন, "কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড।"

কর্ণেল বললেন, "তাছাড়া আর কী বলব? সচরাচর কুমড়ো পরিণত আকার পেতে এবং পাকাপোক্ত হতে অনেক দিন লেগে যায়। আপনার এই কুমড়ো মাত্র তিন মাসেই প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। ভেতরটা লাল টুকটুকে।"

ডঃ গিন্‌তি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন। বললেন, "না না। লাল বলা ঠিক নয়, হলদে। আপনি তো ভেতরটা দেখার সুযোগ পাননি এখনও। বরং কাল সকালে আপনার ফরেস্ট-বাংলোয খানিকটা পাঠিয়ে দেব। তখন—"

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন, "সরি। ভেতরটা তো এখনও দেখিইনি। তবে যেন মনে হচ্ছে, ভেতরটা লাল হওয়াই উচিত।"

"কেন বলুন তো?"

"বুঝলেন ডঃ গিন্‌তি, আমার ইদানীং উদ্ভিদবিজ্ঞানেব দিকেও ঝোঁক চেপেছে। সেদিন একটি পত্রিকায় দেখছিলুম, অবিকল এই জাতের কুমড়ো পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফলে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওই সব দ্বীপে দুশো বছর আগে কুমড়ো কী তা কেউ জানতই না। ১৭৬৯ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী টমাস কুক প্রথম তাহিতি দ্বীপে বিলিতি কুমড়োর কিছু বীজ পুঁতে এসেছিলেন। তার প্রায় একশো বছব পরে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন গিয়ে দেখেন, মাটির গুণে বিশাল আকারের কুমড়ো ফলেছে। তা এখনও দ্বীপেব লোকেরা ভয়ে কুমড়ো ছোঁয় না। ওখানকার একটা দ্বীপের নাম ইস্টার দ্বীপ। তাদের ধাবণা সেখানকার লোকেবা যে পক্ষিদেবতাব পূজো করে, এ বুঝি তাবই ডিম! বুঝুন অবস্থা!

আমি ও ডঃ গিন্‌তি হেসে উঠলুম। এই সময় কফি এল। আরাম করে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্ণেলবুড়ো কোনো ব্যাপাবে একবাব মুখ খুললে তো থামতে চান না। আবার পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফিরেছেন। গতিক দেখে ডঃ গিন্‌তি আমার দিকে চেয়ে ইশারা করে বললেন, "ইয়ে, এবার জয়ন্তবাবু ব্যাপ' টা শোনা যাক। বলুন জয়ন্তবাবু, কী দেখে এলেন লিটনগঞ্জে?"

কর্ণেল চিমটেয় অগ্নিকুণ্ড থেকে এক টুকরো অঙ্গার তুলে চুরুট ধরাতে ব্যস্ত হলেন। আমি বললুম, "ব্যাপার সত্যি সংঘাতিক। হেভি ওয়াটার প্ল্যান্টেব প্রায় অর্ধেকটা বিস্ফোরণে গুঁড়ো হয়ে গেছে। সরকারী গোয়েন্দাবা এখনও তদন্ত কবছেন। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু আঁচ করা যাচ্ছে না যে, অত কড়াকড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কীভাবে অন্তর্ঘাত ঘটল।"

ডঃ গিন্‌তি শিউরে উঠলেন। "বলেন কী! অন্তর্ঘাত? তাহলে ফিরে গিয়ে আপনাদের পত্রিকায কড়া করে লিখবেন জয়ন্তবাবু।"

কর্ণেল তাঁর দিকে ঘুরে দুষ্টু হেসে বললেন, "রিপোর্টার জয়ন্তর খুব সুনাম আছে, ডঃ গিন্‌তি। ওর কলমের জোরে সরকারী অফিসেব চেয়ারগুলো কেঁপে ওঠে শুনেছি।"

পাল্টা খোঁচা মেরে বললুম, "আর আপনার? আপনারও তো বুড়ো ঘুঘু বলে যথেষ্ট নাম আছে।"

কর্নেল আচমকা কাসতে শুরু করলেন। সর্বনাশ। জলেনাকানি-চুবানি খাওয়ার ফলাফল। ডঃ গিন্‌তি আমাকে কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু না, কর্নেল সামলে নিয়েছেন। বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখাবার ক্ষমতা আছে ওঁর। রুমালে নাক মুছে বললেন. "এবার ওঠা যাক। বাংলোয় ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

ডঃ গিন্‌তি বললেন, "সঙ্গে লোক দেব। আলো দেব? কিছু ভাববেন না। তা জয়ন্তবাবু, ওই হেভিওয়াটার প্ল্যান্ট ব্যাপারটা কী বলুন তো? বুঝতেই পারছেন, আমি নিছক কৃষিবিদ্যার চর্চা করি।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। "এবার উঠি ডঃ গিন্‌তি! আপনার আতিথ্যে এবং সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আপনার এই কাপড়চোপড় আর কম্বল ফেরত পাঠাব। এসো জয়ন্ত!"

বলে উনি সটান বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু কুয়াশাও ঘন হয়ে জমেছে। আর কনকনে ঠাণ্ডার কথা না তোলাই ভাল। মনে হচ্ছিল, কর্নেল বুড়োর পাল্লায় পড়াটা ঠিক হয়নি। সোজা ভারুণ্ডি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলে ভাল করতুম।

এই জঙ্গলের পথে হাড়কাপানো শীতে ফরেস্ট বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এবার বাঘ-ভাল্লুকের ভয় হচ্ছিল। শুনলুম ভারুণ্ডি জঙ্গলে বুনো হাতিরও উৎপাত আছে। তবে ডঃ গিনৃতির লোকটির হাতে আলো আছে।

ফরেস্ট বাংলোয় আরাম করে বসে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সবার সামনে আমাকে বুড়ো ঘুঘু বলাটা তোমার বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। না—আমি রাগ [illegible]। কিন্তু কথাটা তোমার তলিয়ে দেখা উচিত। তুমি কি এলিয়ট রোডে আমার ফ্ল্যাটের নতুন নেমপ্লেটটা লক্ষ্য করোনি?"

একটু হেসে বললুম, "করেছি! লেখা আছে : কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রকৃতিবিদ্‌। বুড়ো-ঘুঘুর বাসা বলে পরিচিত ফ্ল্যাটের মধ্যে এখন কাচের জার ভর্তি! তাতে প্রজাপতি-পোকামাকড়েরা ডিম পাড়ছে। হরেক পাখপাখালির মমি সাজানো রয়েছে! দুর্লভ এবং বিরল প্রজাপতির নমুনা। কিন্তু হে বৃদ্ধ, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাছাঁড়া অভ্যাস যায় না মলে। দশ কিলোমিটার দূরে লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রহস্যময় দুর্ঘটনা আর ভারুণ্ডি ফরেস্ট বাংলোয় এক প্রাক্তন গোয়েন্দার অবস্থিতি কি নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার? দুয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই? আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।"

কর্ণেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, "একেবারে কাকতালীয়। আমাকে সরকার ওসব ব্যাপারে কোনো অনুরোধ করেননি। আমি এসেছি উড-ডাকের খবর পেয়ে। খবরের কাগজের লোক হলেও ওসব খবরে তোমার মাথাব্যাথা থাকে না। নইলে সম্প্রতি ভারুগুির জঙ্গলে উড-ডাকের আবির্ভাবের খবর তোমার চোখে পড়ত। যাক গে, এবার খাওয়ার ব্যাবস্থা করা দরকার। তোমর নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। আমি চৌকিদারকে দেখি। ততক্ষণ তুমি ফায়ারপ্লেসের অগ্নিকুণ্ডটার দায়িত্ব নাও। কাঠ গুঁজে দিতে ভুলো না যেন।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি বসে আছি তো আছিই। আর ওঁর পাত্তা নেই। বাংলো গোরস্থানের মতো স্তব্ধ। একা বসে থাকতে গা ছমছম করছে। প্রায় দুঘন্টা পরে কর্ণেল ফিরলেন। বললুম "এত দেরী যে?"

কর্ণেল বললেন, "রাতের কাজটুকুও সেরে এলুম। আশা করি, আমার সেই অত্যদ্ভুত ক্যামেরার কথা তুমি ভোলনি।"

"হ্যাঁ, অত্যদ্ভুত ক্যামেরাই বটে। প্রতাপগড় জঙ্গলে ওটা পেতে রাখতে দেখেছিলুম সেবার। জন্তুদের জল খেতে যাওয়ার পথে গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা তার নীচে মাটিতে পোঁতা ছিল! ক্যামেরার লেন্সের সামনে দিয়ে পঞ্চাশ গজ অব্দি মাটিতে কেউ হেঁটে গেলেই অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক সিস্টেমে সেই স্পন্দন ধরা পড়বে এবং আপনা-আপনি শাটারটা ক্লিক করবে। ফ্ল্যাশ বালব জ্বলবে এবং ছবি উঠে যাবে। কর্ণেলের মতে, জন্তুদের স্বাভাবিক চেহারার ছবি এভাবেই তো তোলা সহজ।"

বললুম, "কোথায় ক্যামেরা পেতে এলেন?"

চাপা হেসে কর্ণেল বললেন, "ডঃ সিন্‌হার কুমড়োক্ষেতে। কারণ, তখন ওখানে কয়েকটা অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখেছিলুম। ওটা কী প্রাণী দেখা দরকার।"

বুড়োর বাতিকের কোন তুলনা নেই। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন একমাত্র ভাবনা, সকাল হলেই আমাকে কেটে পড়তে হবে। লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রিপোর্ট কীভাবে লিখব, তাই ভাবতে থাকলুম। কর্ণেলও অবশ্য আর মুখ খুললেন না। কেমন গম্ভীর হয়ে চুরুট টানতে থাকলেন।

খেয়েদেয়ে শুতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। ক্লান্তির ফলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই ঘুম ভাঙল কর্ণেলের ডাকে। দেখি, সকাল হয়ে গেছে। কর্ণেল অভ্যাসমতো কখন এই প্রচণ্ড শীতের ভোরেও বাইরে ঘুরে এসেছেন। গায়ে ওভারকোট, মাথায় হনুমান- টুপি, হাতে ছড়ি। বললেন, "গুড মর্নিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে। এখন উঠে পড়ো এবং দ্রুত চোখমুখ ধুয়ে এসো।"

বললুম, "দ্রুত কেন? কোথাও বেরুবেন বুঝি?"

"বেরুব। অবশ্য তাতে তোমার লাভই হবে। কথা দিচ্ছি।"

"লাভের দরকার নেই। আমি সোজা গিয়ে ট্রেন ধরব।" বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলুম।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দেখি কর্ণেল বিছানায় ফোটোর গুচ্ছের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "জয়ন্ত, আমার রাতের ফসল। দেখে যাও, তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

একটা ফোটো তুলে নিয়ে সত্যিসত্যি চক্ষু চড়কগাছ আমার। এ কী দৃশ্য! কুমড়োক্ষেতে একটা বিশাল কুমড়োর ওপর ঝুঁকে ডঃ গিন্‌তি কী যেন করছেন. এক হাতে ক্ষুদে টর্চ রয়েছে। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্ণেল হাসলেন। "ডঃ গিন্‌তি নিশ্চয় রাতদুপুরে নিজের কুমড়ো নিজে চুরি করছেন না?"

"তাহলে কী করছেন? নিশ্চয় কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-টরীক্ষা করছেন।"

"ঠিক তাই। অসাধারণ ওঁর গবেষণা।" কর্ণেল তারিফ করে বললেন। "খুব অধ্যবসায়ী লোকও বলব, জয়ন্ত। যাকগে। সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপের রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল। সম্ভবত জন্তুটা ওঁকে দেখে আর ওখানে পা বাড়ায়নি।"

চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খাওয়ার পর কর্ণেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "জয়ন্ত, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলে আমাকে আপত্তির সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে-টানতে বেরুলেন। কুয়াশার ফাঁকে হাল্কা রোদ ফুটেছে। কিন্তু ঠাণ্ডার কথা না তোলাই ভাল। বাংলো থেকে উতরাই রাস্তায় নেমে গেলুম কিছুদূর। তারপর সমতলে আরও কিছুটা এগিয়ে চমকে উঠলুম। গাছপালার আড়ালে একটা জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জীপে কারা বসে আছে। কর্ণেল তাদের ইশারা করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঝোপে ঢুকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে জয়ন্ত। একটু কষ্ট করো।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"স্বচক্ষে দেখবে চলো।"

পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, উপায় কী! ঝোপঝাড় ও পাথরের আড়ালে এগোচ্ছি। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শুনছি। কতক্ষণ পরে কর্ণেল একটু উঁচু হয়ে চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, "এসে গেছে! দেখবে নাকি জয়ন্ত? দেখই না!"

বাইনোকুলারে চোখ রাখতেই ডঃ গিন্‌তির খামারবাড়ির গেট নজরে পড়ল। একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকের গায়ে যা লেখা আছে, স্পষ্ট পড়তে পারছি।

'উম্মর সিং ক্যাটারিং কোম্পানি'। ট্রাকে তরিতরকারি বোঝাই হচ্ছে। ডঃ গিন্‌তি এবং তাঁর লোকেরা তদারক করছেন। আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাবলুম না। এই স্বাভাবিক ব্যাপারে এত লুকোচুরি বা ওত পেতে বেড়ানোর কারণ কী?

হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, "চলে এসো জয়ন্ত। পাখি ফাঁদে পড়েছে।"

তারপর আমার প্রায় বাঘের লেজে-বাঁধা শেয়ালের অবস্থা হল। খামারবাড়ির গেটে পৌঁছে ফের চমকে উঠলুম। ট্রাক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী এক দঙ্গল পুলিশ। ডঃ গিন্‌তি দু'হাত তুলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন! কর্নেলকে দেখে কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "দেখেছেন, দেখেছেন কর্নেল, কী জঘন্য অত্যাচার!"

কর্নেল গম্ভীরমুখে কোন কথা না বলে ট্রাকের কাছে গেলেন এবং কাঠবেড়ালির মতো উঠে পড়লেন। তারপর হেঁট হয়ে একটা বিশাল কুমড়ো তুলে বললেন, "আসুন মিঃ শর্মা। খুব সাবধানে ধরবেন। কিন্তু এর মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ আছে। বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

একজন পুলিশ অফিসার হাত বাড়িয়ে কুমড়োটা নিয়ে সাবধানে ধরে রইলেন। কর্নেল নেমে এসে তাঁর হাত থেকে কুমড়োটা নিলেন। তারপর মাটিতে রেখে বোঁটার কাছে চাপ দিলেন। একটা লম্বা-চওড়া ফালি উঠে এল। উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে একটা ধূসর রঙের মস্ত গোল জিনিস ভরা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি খুলে গেল। থরথর করে কাঁপতে থাকলুম।

কর্নেল বললেন, "তাহলে বুঝতে পারছ জয়ন্ত তোমার কাজের জন্যে কেমন একখানা স্টোরি পেয়ে গেলে! আশা করি, এবার এও বুঝেছ যে লিটনগঞ্জের হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় টাওয়ারকেও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ক্যান্টিনে এই বিশেষ চিহ্নিত কুমড়োটি যেত এবং সেখান থেকে পাচার হত টাওয়ারের মধ্যে। যাকগে, আমার কাজ শেষ। বাকি যা কিছু, মিঃ শর্মার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এসো জয়ন্ত, আমরা বাংলোয় ফিরি। তোমার ট্রেন সেই এগারোটায়। ততক্ষণে তুমি এই অকালকুষ্মাণ্ডের রহস্যময় কাহিনীর একটা খসড়া করে নিতে পারবে। তবে মনে রেখো, কুমড়ো-রহস্য আমি দৈবাৎ টের পেয়েছিলুম। প্রজাপতি-ধরা জাল পাততে গিয়েই।"

আসতে আসতে শুনলুম, পেছনে ডঃ গিন্‌তি গর্জে বলছেন, "নেমকহারাম। আমার পাজামা-পাঞ্জাবী-কম্বলটা পর্যন্ত এখনও ফেরত দিল না।"

অন্ধকারে রাতবিরেতে

কেকরাডিহি যেতে হলে ভামপুর জংশনে নেমে অন্য ট্রেনে চাপতে হবে। কিন্তু ভামপুর পৌঁছতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। ট্রেন ঘন্টাছয়েক লেট। খোঁজ নিয়ে জানলুম, কেকরাডিহি প্যাসেঞ্জার রাত নটায় ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন সেই ভোর সাড়ে-পাঁচটার আগে নয়।

কনকনে ঠাণ্ডার রাত। এরই মধ্যে জংশন স্টেশন একেবারে ঝিম মেরে গেছে। তা ছাড়া, তেমন কিছু বড় জংশনও নয়। লোকজনের ভিড় এমনিতে কম। চায়ের দোকানি ঘুমঘুম গলায় পরামর্শ দিল, "পাঁচ লম্বর পেলাটফরমে কেকরাডিহির টেরেন রেডি আছে। চোলিয়ে যান। আরামসে শুত্ করুন।"

শুনে তো লাফিয়ে উঠলুম আনন্দে। ওভারব্রিজ হয়ে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি সত্যি তাই। ইঞ্জিনবিহীন একটা ট্রেন কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানুষটি নেই। মাথার ওপর ছাউনি বলতেও কিছু নেই। একফালি চাঁদ নজরে পড়ল, শীতে তার চেহারাও খুব করুণ।

কিন্তু যে কামরার দরজা খুলতে যাই, সেটাই ভেতর থেকে আটকানো। জানালাগুলোও বন্ধ। বুঝলুম ভেতরে বুদ্ধিমান লোকগুলো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রচুর লোক জমে উঠেছে! দরজা খুলে তা বরবাদ করার ইচ্ছে নেই কারুর। অবশ্য চোর-ডাকাতের ভয়ও একটা কারণ হতে পারে। দরজা টানাটানি করে কোথাও কোনো সাড়া পেলুম না।

হন্যে হয়ে শেষদিকটায় গিয়ে শেষ চেষ্টা করলুম। তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চ্যাঁচামেচি করে বললুম, "দরজায় বোমা মেরে উড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি। আমার কাছে বোমা আছে কিন্তু!"

এই শাসানিতেই যেন কাজ হল। একটা জানালা একটু খুলে গেল। তারপর ভারী গলায় কে বলল, "কী আছে বললেন?"

কথাটা চেপে গিয়ে বললুম, "আহা, দরজাটা খুলুন না। ঠাণ্ডায় জমে গেলুম যে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "বোমা না কী বলছিলেন যেন?"

"আরে না, না।" হাসবার চেষ্টা করে বললুম, "ওটা কথার কথা। দয়া করে দরজাটা খুলে দিন।"

"মাথা খারাপ মশাই? বোমাওয়ালা লোককে ঢুকিয়ে শেষে বিপদে পড়ি আর কি। বোমা মারতে হয়, অন্য কামরায় গিয়ে মারুন। আমি ঝামেলা ভালবাসি না।"

লোকটা জানালার পাল্লা নামিয়ে দিল, দমাস শব্দে। অদ্ভুত লোক তো! রাগে-দুঃখে অস্থির হয়ে কী করব ভাবছি, সেই সময় গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখলুম। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গুনগুনিয়ে গান গেয়ে কেউ আমারই মতো এক বগি থেকে আরেক বগি পর্যন্ত ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে বুঝি। মিটমিটে আলোয় লোকটির চেহারা নজরে এল। ঢ্যাঙা, হনুমান-টুপিপরা লোক। গায়ে আস্ত কম্বল জড়ানো। লম্বা বিরাট একটা নাক ঠেলে বেরিয়েছে মুখ থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমাকে দেখে। তারপর খি খি করে হাসল। "ঢোকার ছিদ্র পেলেন না বুঝি? মশাই, এ লাইনের ব্যাপারই এরকম। সেজন্য সুচ হয়ে ঢুকতে হয়। তারপর দরকার হলে ফাল হয়ে বেরুন না কেন?"

কথার মানে কিছু বুঝলুম না। পাগল-টাগল নয় তো? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল "আপনি দেখছি একেবারে কচি খোকা! বুঝলেন না কথাটা?"

ঠাণ্ডার রাত। জনহীন প্ল্যাটফর্মে পাগলকে ঘাঁটানো উচিত হবে না। বললুম, "বুঝলুম বৈকি!"

"কচু বুঝেছেন! এই দেখুন, সুচ হয়ে কেমন করে ঢুকতে হয়।" বলে লোকটার সামনেকার একটা জানালা খামচে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওপরে ওঠাল।

তারপর আমাকে হকচকিয়ে দিল বলা যায়। জানালায় গরাদ আছে। অথচ কি করে সে তার অতবড় শরীরটা নিয়ে ভেতরে গলিয়ে গেল কে জানে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কিন্তু তারপরেই ভেতরে গণ্ডগোল বেধে গেছে। আগের লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছে খ্যানখেনে গলায়, "এ কী মশাই! এ কী করছেন? একী! একী! আরে..."

এবং কামরার দরজা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল। সম্ভবত আগের লোকটাই বোঁচকাবুঁচকি-বিছানাপত্র নিয়ে একলাফে নীচে এসে পড়ল। তারপর দুদ্দাড় শব্দ করে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে দৌড়ুল।

দেখলুম, একটা বালিশ ছিটকে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আর ফিরেও তাকাল না এদিকে। এবার সুচ-হওয়া লোকটিকে দেখতে পেলুম দরজায়। খিকখিক করে হেসে বলল, "বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। যাক্ গে, ভালই হল। আসুন, আসুন। এক্ষুনি আবার কেউ এসে হাজির হবে। আর শুনুন, ওই বালিশটা কুড়িয়ে নিয়ে আসুন। আরামে শুতে পারবেন।"

বালিশটা কুড়িয়ে নিলুম। ঠিকই বলেছে। বালিশটা শোয়ার পক্ষে আরামদায়কই হবে। এর মালিক যে আর এদিকে এ-রাতে পা বাড়াবে না, সেটা বোঝাই যায়। ব্যাপারটা যাই হোক, ভারী হাস্যকর তো বটেই।

কামরার ভেতরটা ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। লোকটা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি নামিয়ে আটকে দিল। দেশলাই জ্বেলে একটা খালি বার্থে বসে পড়লুম। লম্বানেকো লোকটা বসল পাশের বার্থে। তারপর আগের মতো খিকখিক করে হেসে বলল, "খুব জব্দ হয়েছে। একা পুরো একটা কামরা দখল করে বসে ছিল ব্যাটাচ্ছেলে।"

আমিও একচোট হেসে বললুম, "ডাকাত ভেবেই পালিয়েছে, বুঝলেন।"

"উঁহু, ডাকাত ভাবেনি। অন্য কিছু ভেবে থাকবে।"

"কিন্তু আপনি গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকলেন কী করে বলুন তো?"

"কিচ্ছু কঠিন নয়। সে আপনিও পারেন। তবে তার আগে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।"

আগ্রহ দেখিয়ে বললুম, "কী কষ্ট?"

লোকটা অন্ধকারে অদ্ভুত শব্দে হাই তুলে বলল, "যাকগে ওসব কথা। বললেও কি আপনি সে কষ্ট করবেন?"

"কেন করব না? অমন সরু ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢোকাটা যে ম্যাজিক মশাই। আমার ধারণা, আপনি একজন ম্যাজিশিয়ান।"

"তা বলতে পারেন। তবে আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।"

অন্ধকারে নড়াচড়ার শব্দ হল। বুঝলুম ম্যাজিশিয়ান লোকটা শুয়ে পড়ল। বালিশটা পেয়ে আমার ভালই হয়েছে। আমিও শুয়ে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারটা অসহ্য লাগছিল। দম আটকে যাবার দাখিল। তা ছাড়া, বদ্ধ জায়গায় শোবারও অভ্যাস নেই। তাই একটু পরে উঠে পড়লুম। মাথার কাছের জানালাটা যেই ওঠাতে গেছি, লোকটা হাঁ-হাঁ করে উঠল। "করেন কী, করেন কী। সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনোর মতো লোকের অভাব নেই বুঝতে পারছেন না? অসুবিধেটা কিসের?"

"দেখুন, বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। বরং একটু ফাঁক করে..."

কথা কেড়ে লোকটা খাপ্পা মেজাজে বলল, "ধ্যাত্ মশাই! বললুম না? আবার কে এসে ঢুকবে, তখন আমারই ঝামেলা হবে। আপনার আর কী! বন্ধ করুন বলছি।"

অগত্যা ফের শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমের দফারফা হয়ে গেছে। বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে অস্বস্তি, তার ওপর প্রচণ্ড হিমকাঠ পিঠের তলায়। সঙ্গে গরম চাদরও নেই। প্যান্ট-কোট হিমে বরফ হয়ে গেছে। পাশের লোকটার গায়ে কম্বল। তাই আরামে ঘুমোচ্ছে। নাকও ডাকছে।

ক্ষণ পরে চুপিচুপি উঠে বসলুম। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের জানালার পাল্লাটা নিঃশব্দে ঠেলে ইঞ্চি-দুই ফাঁক করে রাখলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম ফের। এবার বদ্ধ ঘরের সেই অস্বস্তিটা কেটে গেল।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন। হঠাৎ কী একটা দুদ্দাড় শব্দে উঠে বসলুম দুড়মুড় করে। কামরা আগের মতো ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। জানালার সেই ফাঁকটা আর নেই। কিন্তু ভেতরে একটা ধস্তাধস্তি বেধেছে যেন। "কে, কে" বলে চেঁচিয়ে উঠে দেশলাই হাতড়াতে থাকলুম। খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদিকে দরজাটা দমাস করে খুলে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। কে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার পাশের বার্থে কেউ এসে বসল। বললুম, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"কিছু না। আপনি শুয়ে পড়ুন। কেকড়াডিহি লাইনে এমন হয়েই থাকে।"

কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলুম। পাশের বার্থের লোকটার গলার স্বর ছিল একটু খ্যানখেনে। এটা কেমন গুরুগম্ভীর যেন। দেশলাইটা খুঁজে পাওয়া গেল এতক্ষণে। সিগারেট ধরানোর ছলে কাঠি জ্বেলে সেই মিটমিটে আলোয় যাকে দেখলুম, সে অন্য লোক। তবে তার গায়ের কম্বলটা আগের লোকেরই মনে হচ্ছে। এ লোকটার নাক বেজায় চ্যাপটা। তা ছাড়া, মুখে একরাশ গোঁফদাড়ি। মাথার টুপিটাও অন্য রকম। গম্ভীর স্বরে বলল, "কী দেখছেন?"

অবাক হয়ে বললুম, "আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন বলুন তো?"

"কেন? আমাকে কি সঙ্গী হিসেবে পছন্দ হচ্ছে না?"

"না না—মানে, বলছিলুম কী, আপনিও কি জানালার ফাঁক গলিয়ে ঢুকেছেন?"

"ঠিক তাই। বুঝলেন না? যা ঠাণ্ডা পড়েছে!"

"তা পড়েছে। কিন্তু আপনিও দেখছি একজন ম্যাজিশিয়ান।"

"তা বলতেও পারেন।"

"আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?"

হ্যা হ্যা করে হেসে নতুন সঙ্গী বলল, "বেজায় ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে কাতুকুতুতে ওস্তাদ। কিন্তু আমি কী করি জানেন তো? কামড়ে দিই। আপনি?"

"আম? আমি কিছুই পারি না।" বলে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। সিগারেটের আগুনে ঘড়ির কাঁটা দেখে নিলুম। দুটো পাঁচ। আর ঘন্টাতিনেক এসব উপদ্রব সহ্য করে কাটাতে পারলে আর চিন্তা নেই। ঘুম আর এসে কাজ নেই।

পাশের নতুন সঙ্গীর কিন্তু নড়াচড়ার শব্দ নেই। শুয়ে পড়লে টের পেতুম।

তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ওই যে বলল কামড়ে দেওয়ার পক্কে।, সে... হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দেবে না তো? ভাব করার জন্যে বললুম, ইচ্ছে করছে না?"

প্রকাণ্ড হাই তোলার শব্দ করে বলল, "নাঃ। আপনি ঘুমোন।"

"ঘুম আসছে কৈ? বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। সম্ভবত, জানালা খুললে আপনারও আপত্তি হবে। কাজেই..."

"না, না। আপত্তির কারণটা বুঝলেন না? আবার কেউ ঢুকে গণ্ডগোল বাধাবে যে।"

"আগের ভদ্রলোক বলছিলেন, জানালার গরাদ গলিয়ে ঢোকা শিখতে হলে নাকি একটু কষ্ট করতে হবে। কিন্তু কষ্টটা কি, সেটা চেপে গেলেন। আপনি বলতে পারেন ব্যাপারটা কী?"

"খুব পারি। তবে আপনি ভয় পাবেন যে!"

"মোটেও না। দেখুন না, আমি কি ভয় পেয়েছি?"

হ্যা হ্যা করে হাসল সে। "যাক ওসব কথা। আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে লোভ হচ্ছে। একটা সিগারেট দিন, টানি।"

সিগারেট দিয়ে দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিতে গিয়ে আবার চমকে উঠলুম। আরে, এ তো সেই গোঁফদাড়িওলা লোকটা নয়। কুমড়োর মতো মুখ, চকচকে টাক—এ আবার কখন এল?

কিন্তু তক্ষুনি গণ্ডগোল বেধে গেল। পাশ থেকে কে চেঁচামেচি করে বলল, "এই মশাই। আমার সিগারেট আপনি টানছেন যে। জিজ্ঞেস করুন তো ওঁকে, কে সিগারেট চাইল।"

ফস্ করে আবার কাঠি জ্বাললুম দেখি, গোঁফদাড়িওলা লোকটি কুমড়ো মুখো লোকটির পাশে বসে আছে। তার মুখে-চোখে রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, "কী মুশকিল। আপনি আবার কীভাবে ঢুকলেন?"

নতুন লোকটি অদ্ভুত হেসে বলল, "আমি আগে থেকেই ছিলুম। অনেকক্ষণ থেকে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলুম। সাহস করে আসতে পারছিলুম না। এ ভদ্রলোকের যে কামড়ে দেওয়া অভ্যেস।"

গোঁফদাড়ি হেঁড়ে গলায় বলল, "এবার যদি কামড়ে দিই।"

"সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব। আসুন না কামড়াতে।"

বিবাদ মিটিয়ে দিতে বললুম, "আহা, ঠান্ডার রাতে কামড়া-কামড়ি ভাল কাজ নয়। নিন, আপনিও একটা সিগারেট নিন।"

আমি আবার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। চোখ দুটো পাশের বার্থের দিকে। দুটো সিগারেট জুলজুল করে জুলছে অন্ধকারে। এবার কেন কে জানে, ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি।

হইহট্টগোলে সেই ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি কামরা জুড়ে একদঙ্গল লোক। বোঁচকাবুঁচকিও কম নেই। এখন আলো জ্বলছে। জানালাগুলো হাট করে খোলা। এই রে! সর্বনাশ হয়েছে তাহলে। গরাদ গলিয়েই পিলপিল করে এরা বুঝি ঢুকে পড়েছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। অমনি খালি জায়গা পেয়ে একদল লোক হইহই করে এসে বসে পড়ল। দুজনকে সিগারেট দিয়ে সামলেছি, এতজনকে কীভাবে সামলাব ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলুম।

কিন্তু তারপর চোখ গেল দরজার দিকে। দরজা খোলা। অতএব এরা তারা নয়। তাদের তন্নতন্ন করে খুঁজে পেলুম না। তারা কোথায় গেল, গোঁফদাড়ি এবং কুমড়ো—অর্থাৎ সেই অন্ধকারের ম্যাজিশিয়ানরা?

আমার মাথার তলা থেকে বালিশটাও উধাও। যাক্ গে, একটা অভিজ্ঞতা হল তাহলে। টিকিটের ঘন্টা দিচ্ছিল। পাঁচটা বাজে।